# বিপন্ন প্রহরে

শফীউদ্দীন সরদার

# বিপন্ন প্রহর

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৩৭

১ম সংস্করণ

| | |
|---|---|
| রজব | ১৪১৮ |
| কার্তিক | ১৪০৪ |
| নভেম্বর | ১৯৯৭ |

বিনিময় ঃ ১১৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BPONNO PROHOR by Shafiuddin Sarder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 116.00 Only.

www.amarboi.org

# দু'টি কথা

"বিপন্ন প্রহর" আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের নয় নম্বর উপন্যাস। একে সিরিজ বলা হলেও, আমার এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর কোনটাই কোনটার অবশিষ্ট অংশ নয়। প্রত্যেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ কম্‌প্লীট উপন্যাস। ঐতিহাসিক কাল অনুসারে বাংলার মুসলিম ইতিহাসের একটার পর একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে এক একটি উপন্যাস রচনা করা হয়েছে বলেই একে সিরিজ বলা যায়। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী দ্বারা বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে অদ্যতক্‌ বাংলার মুসলমান শাসন ও সমাজ কি পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছে, এর সুদিন-দুর্দিন ইতিহাস-ঐতিহ্য এই উপন্যাসগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে। উপন্যাসগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

| ক্রমিক নং | নাম | ঘটনা বা সময় | প্রকাশক |
|---|---|---|---|
| ১. | বখতিয়ারের তলোয়ার | বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় | মদীনা পাবলিকেন্স |
| ২. | গৌড় থেকে সোনার গাঁ | বাংলায় স্বাধীন সাল্‌তানত্‌ প্রতিষ্ঠা | আধুনিক প্রকাশনী |
| ৩. | যায় বেলা অবেলায় | গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকাল | মদীনা পাবলিকেন্স |
| ৪. | বিদ্রোহী জাতক | রাজা গণেশের রাজত্বকাল | বাংলা সাহিত্য পরিষদ |
| ৫. | বার পাইকার দুর্গ | সুলতান বারবাক শাহ্‌ ও দরবেশ ইসমাইল গাজী | আধুনিক প্রকাশনী |
| ৬. | রাজ বিহঙ্গ | আলাউদ্দীন হোসেন শাহর রাজত্বকাল | আধুনিক প্রকাশনী |
| ৭. | শেষ প্রহরী | দাউদ খাঁন কাররানী ও কালাপাহাড় | মল্লিক ব্রাদার্স (কলিকাতা) |
| ৮. | প্রেম ও পূর্ণিমা | সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় | আধুনিক প্রকাশনী |
| ৯. | বিপন্ন প্রহর | নবাব মুর্শিদকুলী ও সরফরাজ খান | আধুনিক প্রকাশনী |
| ১০. | সূর্যাস্ত | পলাশীতে সূর্যাস্ত | বাংলাদেশ কো-পারেটিভ বুক সোসাইটি |
| ১১. | পথহারা পাখী | পলাশীর পরে ফকির মজনুশাহ্‌ | বার্ড পাবলিকেন্স |
| ১২. | বৈরী বসতি | সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, তিতুমীর | আধুনিক প্রকাশনী যন্ত্রস্থ |

এই পর্যন্ত লেখা ও প্রকাশ পাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে। আর চার পাঁচখানা উপন্যাসের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীকে কভার করার ইরাদা রাখি। সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

www.amarboi.org

এই বইয়ের ব্যাপারে কৃতজ্ঞা জানাই দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার কর্মকর্তাদের—যে পত্রিকায় এই "বিপন্ন প্রহর" উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সম্মানিত প্রকাশকগণসহ এ কাজে আমাকে যারা উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অধ্যাপক আঃ গফুর, কথা শিল্পী ইউসুফ শরীফ, বন্ধুবর হাসিবুল হাসান ও আধুনিক প্রকাশনীর আবদুল গাফ্ফার ভাইকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলে তবেই আমার স্বার্থকতা।

www.amarboi.org

# ১

ঃ আঃ—
ঃ খুন–খুন, মানুষ খুন—
ঃ খুন ! সেকি ! কৈ ? কোথায়—?

চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসতে লাগলো। ছেলে-ছোক্‌রা জোয়ান-বৃদ্ধ। হরেক কিসিমের মানুষ। আড়াল থেকে জেনানারাও উঁকিঝুঁকি পাড়তে লাগলো। দিনে-দুপুরে মানুষ খুন—মামুলী কথা নয় !

গাঁয়ের নাম ফৌজীপুর। বড়োসড়ো এক গাঁ। কোন্‌কালে বা কবে কোন্ ফৌজ এখানে ছিল, তা কেউ জানে না। কোন ফৌজদার বা ফৌজী লোকের আবাসেরও নাম-নিশানা এ গাঁয়ে কোথাও নেই। তবু এ গাঁয়ের নাম ফৌজীপুর আর এ নামের সার্থকতা গ্রামবাসীরাই তৈয়ার করে নিয়েছে। জরুর এ গাঁ সালার-সেপাই আর জঙ্গী মরদের গাঁ। জবরদস্ত এক ফৌজ ছিল এ গাঁয়ে। রাজা-বাদশাহ্ উজির-নাজির ঘায়েল করা ফৌজ। তল্লাটের লোক-লস্কর তাদের ভয়ে কাঁপতো। গাঁ'টা আজ ফৌত্ পড়ে গেলেও, এ গাঁয়েরই লোক তারা। তারাই বা কম যায় আজ কিসে ?

মুর্শিদাবাদ শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক আবাদী এলাকায় এ গাঁয়ের অবস্থান। মুর্শিদাবাদ থেকে স্থলপথে উড়িষ্যার দিকে যাতায়াতের ইতি-মধ্যেই ছোটবড় অনেকগুলো পথ তৈয়ার হয়েছে। কাঁচাভাঙ্গা উঁচুনীচু মেঠো পথ। তারই একটা ছোট পথ এই ফৌজীপুরের বুক চিরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে। ফৌজীপুরের আশেপাশে আরো অনেক গাঁ-বসতি থাকলেও, কেন্দ্রস্থলে ফৌজীপুর একক এক গাঁ। এ গাঁয়ের বড় আকর্ষণ মুনিব বাড়ী। বাড়ীর মালিক ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেব মুর্শিদাবাদ শহরের বড় মসজিদের ইমাম। শহরেই তাঁর বসত। এককালে ইমাম সাহেব এই বাড়ীতেই থাকতেন। এখন এ বাড়ী তাঁর খামার বাড়ী। তিনি একজন জোতদার। ফৌজীপুর সহকারে চারপাশের অনেকগুলো গাঁ জুড়ে তাঁর জোতভূঁই। চারপাশের গ্রামবাসীরা সবাই তাঁর প্রজা। এই মুনিব বাড়ীতে এখন তাঁর আদায়কারী ও পাইক-পেয়াদা থাকে। মাঝেমধ্যে বা মৌসুমকালে ইমাম সাহেবের পরিবারের কেউ কেউ এখানে আসেন আর দিন কয়েক থাকেন। তাঁর পরিবারের জেনানারাও কখনো কখনো শহর ছেড়ে এখানে এসে কয়েকদিন নিরিবিলির আস্বাদ গ্রহণ করেন।

ঐ খুন-খারাবীর কারবারটা ঘটলো এই মুনিব বাড়ীর সামনেই। মুনিব বাড়ীর বাহির আঙ্গিনার কিঞ্চিৎ দূরে রাস্তার উপর। রাস্তাটার অপরপাশে কিছু ছোটবড় গাছ-গাছড়া ও ঝোপঝাড়। এরপরেই আরো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া ঝোপঝাড় কাতারবন্দি হয়ে দূরে এক অরণ্যের সাথে মিশে গেছে। এদিকে শুধু ঝোপঝাড় আর খোলা মাঠ। লোক বসতি বিরল। মুনিব বাড়ীর সামনে ঐ রাস্তা বেয়ে একজন সওয়ারী বিদ্যুৎ বেগে মুর্শিদাবাদ শহরের দিকে ছুটছিলেন। এখানে এসেই এক আততায়ীর তীর বিদ্ধ হয়ে



www.amarboi.org

তিনি উচ্চৈস্বরে "আঃ" করে উঠলেন এবং অশ্বের লাগাম টেনে ধরেই অশ্ব থেকে গড়িয়ে এসে টলতে টলতে শাটপাট হয়ে জমিনের উপর পড়ে গেলেন। পোষমানা অশ্ব। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বটিও সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল এবং 'চিঁহি' করে আওয়াজ দিয়ে ঘাড়-মাথা ঝাড়তে লাগলো।

তীরটা এলো ঐ ঝোপঝাড়ের দিক থেকেই। মুনিব বাড়ীর বাহির আঙ্গিনায় কিতাবউদ্দীন দাঁড়িয়েছিল। সে চমকে উঠে দেখলো, ফৌজী লেবাস পরা একটা লোক তীর বিদ্ধ হয়ে অশ্ব থেকে রাস্তার উপর গড়িয়ে পড়লো এবং ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আর একটা অশ্বপদশব্দ দূরের দিকে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ সে "খুন-খুন, মানুষ খুন — " বলে চীৎকার দিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়া সওয়ারীর দিকে ছুটলো।

কিতাবউদ্দীনের চীৎকার শুনেই চারপাশ থেকে ছুটে এলো লোকজন। মুনিব বাড়ীর পাইক-পেয়াদাও ছুটে এলো। ছুটে এলেন মুনিব বাড়ীর অন্যতম মুরুব্বী আবিদ হোসেন সাহেব। সকলেই এসে দেখলেন, সওয়ারীটির জ্ঞান এখনোও যায়নি, তবে তিনি একেবারেই সজ্ঞাহীন। আরো তারা দেখলেন, অদূরে জমিনের বুকে পুঁতে আছে একটা তীর। তীরটা সওয়ারীর বাম বাহুর একপাশে লেগে মাংস খানিক কেটেছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ক্ষত বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। ক্ষতটা এমন কিছু বড় নয়। এ কারণেই একটা লোক একেবারেই জ্ঞান হারাতে পারে না। সবাই বুঝলেন, তীরের ফলায় বিষ মাখানো ছিল। তীব্র বিষ। এটি ঐ বিষের ক্রিয়া।

ঘটনাটা শুনামাত্রই কয়েকজন লোক ঝোপের দিকে দৌড়ালো। অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু আততায়ীর কোন রকম অনুসন্ধান পেলো না।

ইতিমধ্যেই সওয়ারীকে ধরাধরি করে সবাই মুনিব বাড়ীর দহলীজে নিয়ে এলেন। সাধ্যমতো পরিচর্যার মাধ্যমে সবাই মিলে সওয়ারীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করলেন। স্থানীয় বৈদ্যরাও এসে তাঁদের কায়দা-কৌশল খাটালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সওয়ারীটি মূর্দাবৎ পড়ে রইলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণ একটা প্রবাহ ছাড়া, তাঁকে জিন্দা বলে সনাক্ত করার আর কোন কিছুই রইলো না। সবারই ধারণা হলো, আর একটু পরেই শ্বাস-প্রশ্বাসের ঐ ক্রিয়াটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।

আফসোস করতে লাগলেন সবাই। সওয়ারীটা উঠতি বয়সের এক সুদর্শন নওজোয়ান। তেজোদীপ্ত তরুণ। কোথায় থেকে ছুটে সে মরার জন্যেই এখানে এসে পৌঁছেছিল। আহা বেচারী !

লোকজনের ভিড় ক্রমেই ফিঁকে হয়ে গেল। আফসোস্ মুখর জনতা একে একে নিজের কাজে ফিরে গেল। খাটিয়ার উপর শোয়ানো সওয়ারীকে ঘিরে নিয়ে পাড়ার কিছু লোকের সাথে মুনিব বাড়ীর লোকজন বসে বসে প্রহর গুণতে লাগলেন।

ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেবের পরিবারের কিয়দংশ মুর্শিদাবাদ শহর থেকে কয়দিন আগে এই বাড়ীতে এসেছেন। নারী-পুরুষ মিলে ছয়-সাতজন লোক। এঁদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি ইমাম সাহেবের চাচাতো ভাই বিপত্নীক আবিদ হোসেন সাহেব। বয়োবৃদ্ধ মানুষ। তাঁর সাথে এসেছেন ইমাম সাহেবের বিধবা কন্যা আজিজুন নেছা, আজিজুন নেছার কন্যা মাহমুদা খাতুন, বিশ্বস্ত নওকর কিতাবউদ্দীন, আর একজন



www.amarboi.org

নওকর ও কাজের ঝি। ইমাম সাহেবের নাতী আফসারউদ্দীন সাহেবই এঁদের নিয়ে এসেছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসার এক তরুণ মোহাদ্দেস্। নবাব মুর্শিদকুলী খানের অন্তিম অবস্থার খবর শুনে অচিরেই আবার ফিরে আসবেন বলে তিনি গতকালই সদরে ছুটে গেছেন।

প্রহরের পর প্রহর কেটে চললো। সওয়ারীটি মরলোও না, তাঁর জ্ঞানও ফিরে এলো না। পূর্ববৎ নাভিটাই শুধু কিঞ্চিৎ উঠানামা করতে লাগলো। লোকজন সরিয়ে দিয়ে আজ্জিজুন নেছা ও মাহমুদা খাতুনও এসে সওয়ারীকে দেখে গেলেন। সওয়ারীটির কচিমুখ দেখে আজ্জিজুন নেছার দীলও খুবই আর্দ্র হলো। অনুচ্চকণ্ঠে তিনিও অনেক আহাজারী করে গেলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দুই একজন ছাড়া প্রতিবেশী লোকেরাও আস্তে আস্তে উঠে গেল। রইলেন শুধু মুনিব বাড়ীর লোকেরা। চাকর-নফর ও পাইক-পেয়াদা ক'জন সহ আবিদ হোসেন সাহেব। পাইক-পেয়াদা সহকারে যে দুইজন আদায়কারী এই মুনিব বাড়ী আগ্‌লে নিয়ে থাকতেন, আবিদ হোসেন সাহেবেরা এসে পড়ায়, তাঁরাও ছুটি নিয়ে ক' দিনের জন্যে ঘর-সংসার দেখতে গেছেন।

আবিদ হোসেন সাহেব মুস্কিলে পড়ে গেলেন। মুনিব বাড়ীই এ গাঁয়ের বড় বাড়ী। এখান থেকে সওয়ারীটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার মতো কাছে কোলে তেমন কোন বাড়ীও ছিল না, সে মুখও তাঁদের ছিল না। পাইক-পেয়াদা চাকর-নফর থাকা সত্ত্বেও এমন প্রস্তাব তোলাটা শুধু অসংগতই নয়, সেটা এ বাড়ীর ইজ্জতের পরিপন্থী। অথচ এ বাড়ীতে এখন দায়িত্বশীল লোক বলতে বৃদ্ধ আবিদ হোসেন সাহেব শুধু একা। চারক-পেয়াদার দায়িত্বজ্ঞান আর কতটুকু ?

ভাবতে ভাবতেই মাগরিবের আযান হলো। সাবইকে নিয়ে ওখানেই জামাত করে আবিদ হোসেন সাহেব মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এরপর রাত যতই বাড়তে লাগলো। দু' একজন প্রতিবেশী তখনও যারা ছিল, তারাও উঠি উঠি করতে লাগলো। দেখেশুনে আবিদ হোসেন সাহেব অন্দর মহলে এলেন। নিজে তিনি মুরুব্বী লোক হলেও, অন্দরের তথা এ বাড়ীর বর্তমান কর্ত্রী ইমাম সাহেবের কন্যা আজ্জিজুন নেছা বেগম। তাঁর কাছে এসে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—বড় মুসিবতে পড়া গেল যে আম্মাজান ! এখন কি করা যায় ?

আজ্জিজুন নেছাও এসব কথাই ভাবছিলেন। জবাবে তিনি বললেন—ঐ সওয়ারীর কথা বলছেন চাচাজান ?

ঃ হ্যাঁ আম্মা। ওখানে আমি কতক্ষণই বা থাকি আর বেচারীটাকে সারারাত ঐ পাইক-পেয়াদার মর্জির উপর ফেলে রেখে কেমন করেই বা আসি ?

ঃ সে কথাতো ঠিকই চাচাজান। এমন একজন অসহায় মরণাপণ্ন লোককে সেরেফ পাইক-পেয়াদার হাতে তো কোন মতেই ফেলে রাখা যায় না। কিতাবউদ্দীন কিছুটা বিশ্বস্ত হলেও, তারই বা হুঁশবুদ্ধি আর দায়িত্বজ্ঞান কতখানি ? খানিক পরেই ঘুমিয়ে গিয়ে নাক ডাকাতে শুরু করবে সবাই। বেচারীটা মরে গেলেও টের পাবে না, জ্ঞান ফিরলে তার কোন আর্তিও এদের কানে পড়বে না। হয়তো বা এক ফোঁটা পানির জন্যে কাত্‌রিয়ে কাত্‌রিয়েই মরে যাবে বেচারা !



www.amarboi.org

দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—উঃ ! এটা ভাবা যায় না। সেরেফ ওদের হাওলায় ফেলে রাখলে একটা মস্তবড় অমানুষিক কাজ হবে। ইনসানীয়তির মস্তবড় বরখেলাফ হয়ে যাবে। কি যে করি ? নাকি আমারই বিছানপত্র পার করে নেবো ওখানে ?

ঃ আপনি একা ? এই বয়সে আপনিই বা কতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন ?

ঃ তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু—

ঃ এক কাজ করুন। ধরাধরি করে বেচারীকে এই অন্দরমহলে নিয়ে আসুন।

ঃ অন্দর মহলে ?

ঃ হ্যাঁ। আপনার ঘরটাতো ফাঁকে আর ওখানে দুই কামরা। আপনার পাশের কামরাটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ও কামরাটা দেউটির একদম সামনে আর দেউটির দিকে দুয়ারও আছে। ছেলেটাকে এনে ঐ কামরায় তুলুন। পাইক-পেয়াদাও ওখানে এসে থাকুক। মাঝের দুয়ার দিয়ে আপনি আপনার ঘরে থেকেই ছেলেটার প্রতি সর্বক্ষণ নজর রাখতে পারবেন।

সমস্যার সমাধান পেয়ে আবিদ হোসেন সাহেব উৎসাহভরে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, একথা তো ঠিক। এটা অবশ্যই করা যায়।

ঃ করা যায় নয় চাচা। এইটেই করতে হবে। বাইরের দুয়ার দিয়ে চাকর পেয়াদা যাতায়াত করতে পারবে। অন্দরের ভেতর দিকে আসতে হবে না কারো। আমরাও মাঝে মাঝে আপনার কামরায় এসে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। পালাক্রমে জেগে থাকতে হবে আমাদের।

ঃ আম্মাজান !

ঃ আল্লাহর কি ইচ্ছে জানিনে। তিনি যখন বেচারাটাকে এনে আমাদের ঘাড়ে ফেলেছেন, আমরা তো আর আমাদের কর্তব্যে কোন ত্রুটি রাখতে পারিনে ?

সেইটেই করা হলো। আবিদ হোসেন সাহেব খুশী হয়ে পাইক-পেয়াদা সহকারে মুমূর্ষু সওয়ারীটাকে এই কামরায় পার করে নিলেন। অতপর আবিদ হোসেন সাহেব তাঁর কামরায় দরজার এপাশে কুরসী পেতে বসে গেলেন। মুনিব সামনে থাকায়, দরজার ওপাশে কিতাবউদ্দীন সহ পাইক-পেয়াদারাও সজাগভাবে সওয়ারীটাকে পাহারা দিয়ে রইলো এবং বৈদ্যদের নির্দেশ মতো করণীয়গুলো করতে লাগলো। অন্য নওকরটিও ছুটোছুটি করে এদের যোগান দিতে লাগলো।

গড়িয়ে চললো রাত। দরজার পর্দা ফেলে দিয়ে আজিজুন নেছা ও মাহমুদা খাতুনও হর-হামেশাই এ কামরায় আসতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে আবিদ হোসেন সাহেবকে বিরাম দিয়ে কুরসীর উপর বসে থাকতে লাগলেন।

মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেল, তবু সওয়ারীটির অবস্থার কোন উত্থান-পতন ঘটলো না। দেহখানা তার লাশের মতো নিঃশ্চল হয়ে খাটের উপর পড়ে রইলো। পুনঃ পুনঃ সকলেই পরীক্ষা করে দেখলেন, যাই-যাই-করা জানটা তাঁর এখনও না গিয়ে কোথায় যেন একটুখানি আটকে আছে আর তার জন্যেই তাঁর নাড়ি-নিঃশ্বাসের ক্ষীণ একটা



www.amarboi.org

প্রক্রিয়া এখনও অনুভূত হচ্ছে। সে প্রক্রিয়া এতটাই ক্ষীণ যে, তাঁকে মুর্দা বলে ঘোষণা করা না গেলেও, জিন্দা বলে ভেবে নেয়াটা রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। ইহলোক পরলোক বলে যে দুইটি লোক আছে, ঠিক যেন তার মাঝামাঝি এক স্থানে এলোকের এখন অবস্থান। যেন দুয়ার খোলা না থাকায়, জানটা তাঁর অপর লোকে প্রবেশ করতে পারছে না, ধাক্কা খেয়ে পুনঃ পুনঃ পূর্বস্থানে ফিরে আসছে।

এ রকম একটা মুমূর্ষু জান যে এতক্ষণ আটকে থাকে, এ অভিজ্ঞতা উপস্থিত কোন ব্যক্তিরই ছিল না। অপরপক্ষে, এক নিমিষের মধ্যেই যে জান বের হয়ে যাওয়ার কথা, তা যখন না গিয়ে হাজার নিমেষ অবহেলে পার করে দিচ্ছে, তখন তার দেহের অবস্থার কোন রকম উন্নতি হবে না — এটাও তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। সবই ঐ একজনের খেলা। হায়াত-মউতের মালিক ঐ একজনই। তাই অবাক-তাজ্জব হলেও হা'ল কেউ ছাড়লেন না। ক্ষতস্থানে দাওয়াই প্রয়োগ ও সম্ভাব্য প্রক্রিয়ায় পরিচর্যা করা সহ সজাগ হয়ে সবাই তাঁকে পাহারা দিয়ে রইলেন।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছের উপর কথা নেই। সুবেহ সাদিকের দিকে সকলেই বিপুল আগ্রহে লক্ষ্য করলেন। সওয়ারীটার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া ক্রমেই একটু জোরদার হয়ে উঠছে এবং তার নাড়ি-নাভির উঠানামা ক্রমেই একটু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকলেই আশান্বিত হয়ে উঠলেন এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ফজরের ওয়াক্ত হলো। আযান শুনে আবিদ হোসেন সাহেব মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করার সাথে বেচারীর হায়াতদারাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ পেশ করে এলেন। অন্যান্য নারী-পুরুষ পালাক্রমে গৃহেই ফজরের নামায আদায় করে আবার সওয়ারীটির প্রতি মনোযোগী হলেন।

বেচারীটা বেঁচে গেলেন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁর হাত-পায়ের নড়ন-চড়ন শুরু হলো। প্রহর খানেক পর তার জ্ঞানটাও একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগলো। সকলেই সতর্ক হয়ে রইলেন। আরো খানিক পরে সওয়ারীটা চোখ মেলে তাকালেন এবং হাতপা টেনে উঠে বসার ক্ষীণ একটা চেষ্টা করলেন। তা দেখে কয়েকজন তাঁকে আলতোভাবে তুলে বসালে, সওয়ারীটা বার বার তাঁর শুষ্ক ঠোঁট চাটতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঈষদোষ্ণ এক পাত্র দুধ এনে মুখের সামনে ধরা হলো, তিনি ঢক্ ঢক্ করে তার অর্ধেকটা পান করলেন এবং পানঅন্তে পুনরায় আস্তে আস্তে চোখ মুজলেন। অভুক্ত পেটে আহার পড়ায় তিনি কিছুটা শ্রান্তিগ্রস্ত হলেন বুঝে তাঁকে আবার শুইয়ে দেয়া হলো।

দুপুর বেলায় সওয়ারীর ফের ঘুম ভাঙ্গলো। এবার তিনি নিজেই উঠে বিছানার উপর বসলেন এবং ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সবার দিকে চাইতে লাগলেন। এই সময় তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হলে অবশ ও কম্পিত কণ্ঠে তিনি তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জবান তাঁর পরিস্ফুট না হওয়ায়, তা থেকে কিছুই উদ্ধার করা গেল না।

এবার তাঁকে দুধ ও পাতলা ধরনের খাদ্য খাওয়ানো হলো। খাওয়ার পর তিনি আরো সতেজ হয়ে উঠলেন এবং স্বচ্ছভাবে সবার দিকে তাকিয়ে নিজেই কিছু বলার কোশেশ্ করলেন। কিন্তু কণ্ঠের উপর তখনও তাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আসেনি দেখে



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব তাঁকে পুনরায় শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। স্মৃতি ও স্নায়ুর উপর চাপ ফেলতে দিলেন না।

আহারের ক্রিয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁকে পাহারা দিয়ে বসে থাকার কোন প্রয়োজন আর রইলো না। নিশ্চিন্ত হয়ে সকলেই নিজ নিজ কাজে ফিরে গেল। আবিদ হোসেন সাহেব কাছে-কোলেই রইলেন। মাঝে মাঝে কিতাবউদ্দীনও এসে ঘরের ভেতরে-বাইরে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। আজ্জিজুন নেছা ও মাহমুদা খাতুনও সময়ে সময়ে আবিদ হোসেন সাহেবের কক্ষে এসে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে যেতে লাগলেন।

বিকেলে কিতাবউদ্দীন গাঁয়েরই এক ছোট্ট হাটে বাজার করতে গেল। আসরের আযান শুনে আবিদ হোসেন সাহেবও মসজিদে যাওয়ার জন্যে তৈয়ার হয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি আজ্জিজুন নেছাকে ডেকে বললেন—আমি যাবো আর নামায আদায় করেই ফিরে আসবো। ততক্ষণ তোমরা মা-মেয়ে দুইজন একটু নজর রাখবে লোকটার প্রতি। ইতিমধ্যেই তিনি যদি ঘুম থেকে উঠেনে আর কিছু চান, তুমি তো তার মায়ের মতো, সম্ভব হলে নিজেই তুমি দেবে, না হলে আর একটা নওকর তো হাতের কাছে রইলোই, তাকে দিয়ে দেয়াবে।

আবিদ হোসেন সাহেব সমজিদে চলে গেলেন। তাঁর কক্ষে এসে সময়ে মা, সময়ে মেয়ে, কুরসীর উপর বসে থাকতে লাগলেন। একটু পরেই আজ্জিজুন নেছাকে জরুরী কাজে অন্দরের ভেতরের দিকে যেতে হলো। পর্দার আড়ালে বসে রইলো মাহমুদা খাতুন।

মাহমুদা খাতুন কোন বালিকা বা কিশোরী নয়। সে সাবালিকা মেয়ে। যৌবন এসে তার উপর ভর করেছে অনেক কয় বছর আগেই। কৈশোরের চঞ্চলতা তাড়িয়ে তার দীলে এখন স্থান নিয়েছে রমণীর গাম্ভীর্য। বাইরের ঝড় থেমে গেছে। ঝড় বইছে ভেতরে। যৌবন ঘটিত নানা প্রশ্নে অন্তর এখন উতলা। অনাঘ্রাত জিন্দেগীর সুবাসিত হাতছানিতে তনুমন বিহ্বল। খোয়াব ও কল্পনার কুসুমিত কাননে এখন তার বসবাস। দৈর্ঘে-প্রস্থে পৃথিবী তার আগাগোড়াই রঙ্গিন। চোখে তার বনহরিণীর চাঞ্চল্য, দীলে তার প্রস্রবণের আবেগ। পুলকের সামান্যতম পরশেও দীল তার আন্দোলিত হয়ে উঠে। সৌন্দর্যের কিঞ্চিৎ প্রভাও তাকে বিমোহিত করে তোলে। নতুনের ছোঁয়া আনে অচেনা শিহরণ। মন করে বিমনা।

এমনই এক অচেনা শিহরণে মাহমুদা এখন আন্দোলিত। মুমূর্ষু সওয়ারীটার মনোরম মুখশ্রী তাকে বিমোহিত করেছে। তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি ও অনুপম দেহ-সৌষ্ঠব গভীর একটা দাগ কেটেছে মাহমুদা খাতুনের অন্তরে। সুডৌল বাহু, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, ঝাঁকড়া চুল ও কনকপ্রভা বিনিন্দিত গৌর বর্ণ মিলে সওয়ারীর মনোলোভা মুখাকৃতি মাহমুদার চিত্তের গতি বিকল করে দিয়েছে। এ মুখাকৃতি সেরেফ সুন্দরই নয়, যেন এক সুদক্ষ শিল্পীর মনের মাধুরী দিয়ে খোদাই করা মুখাকৃতি। বিষের ক্রিয়ায় বিমলিন মুখমণ্ডলের মধ্যেই মাহমুদা খাতুন আগন্তুকের এই সুবিমল সৌন্দর্যের অনুসন্ধান পেয়েছে। তাঁর চোখে-মুখে দেখে এসেছে নিষ্পাপের প্রতিকৃতি ও



www.amarboi.org

পবিত্রতার আদল। বলা বাহুল্য, সওয়ারীটার চেহারা সত্যিই আকর্ষণীয় চেহারা, আধিক্যটুকু মাহমুদা খাতুনের অন্তরের সৃষ্টি।

যা-ই হোক, সেই থেকেই মাহমুদা খাতুন উন্মনা। মনে তার এক অব্যক্ত আহাজারী। মনহারানোর উন্মাদনা নয়, মন কাঁদানো বেদনা। আহা বেচারী ! তাঁর অবস্থান ও অর্জন যে রকমই হোক, এমন এক মনভোলানো সৌন্দর্যের ও নিষ্পাপ প্রতিমূর্তির এমন এক অপমৃত্যু, দীল তার সেই থেকেই বিকল করে রেখেছিল। এক্ষণে, অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেচারীর এই অব্যাহতি, হরষ-মিশ্রিত নয়া আর এক অস্থিরতা মাহমুদাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে এই বেচারা, কি তার পরিচয়, কোন স্তরে অবস্থান, কেন এই অঘটন—এবম্প্রকার অসংখ্য প্রশ্ন তার দীলে এখন ভিড় করেছে এক সাথে। মন দেয়ার অত্যাগ্রহে এই আকুলতা নয়, অচেনাকে চেনার পুলকই প্রবলতর এখানে। রহস্য উদ্‌ঘাটনের কৌতুহলই এখানে সর্বাধিক সক্রিয়। ভাল লাগাই ভালবাসা নয়। মন দেয়াতে মাল-মস্‌লা লাগে আরো। মন হারাতে লাগে আরো বাউরী বায়ের প্রবাহ। থাক সে কথা।

পর্দার এপারে বসে বসে মাহমুদা খাতুন যখন এসব প্রশ্নে অস্থির, সেই সময় পর্দার ওপারে "পানি–পানি" বলে সওয়ারীটা একটা অস্ফুট আওয়াজ দিলেন। চমকে উঠে মাহমুদা খাতুন উঁকি দিয়ে দেখলো, সওয়ারীটা পূর্ববৎ শুয়ে আছেন। চোখ তাঁর মুদ্রিত। কোন কিছু না ভেবেই মুখের নেকাব এঁটে নিয়ে ঘটনাটা জানার জন্যে সে সওয়ারীর কক্ষে এলো এবং অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে সওয়ারীর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পরও সওয়ারীটা পূর্ববৎ ঘুমিয়েই রইলেন, কোন আর সাড়াশব্দ করলেন না দেখে, মাহমুদা খাতুন ফিরে আসতে গেলো। ফিরে আসার কালে হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো, কক্ষটির বাইরের দিকের দুইটি জানালার একটি এখনও বন্ধ আছে আর সে জন্যে কক্ষের মধ্যে আলোর খানিক অভাব ঘটেছে। এতে করে সে জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো এবং একটু দূরে দুইটি বিড়াল ছানাকে অপরূপ ভঙ্গিতে খেলা করতে দেখে মুখের নেকাব খুলে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর সে আবার সওয়ারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি একটু চিন্তা করলো। এরপর সওয়ারীর দিকে নজর তুলেই সে চমকে উঠে দেখলো, সওয়ারীটা ইতিমধ্যেই বিছানার উপর উঠে বসেছেন এবং সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

জানালা খোলার শব্দে ঘুম ভাঙ্গার পর সওয়ারীটা উঠে বসেই হতভম্ব হয়ে দেখলেন, এক অপরূপা তরুণী তাঁর একদম একপাশেই দাঁড়িয়ে আছে এবং শেষ বিকেলের সূর্যের উত্তাপহীন রশ্মি তার মুখে এসে ঠিকড়ে পড়ায়, সে মুখ আরো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সওয়ারীটা এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেছেন এবং পূর্ণজ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। নিজেকে অকস্মাৎ এই আচানক পরিবেশে আবিস্কার করায় তিনি ভুলেই গেছেন যে, হুরীপরী তুল্যা এক তরুণীর মুখের দিকে তিনি চেয়ে আছেন এবং সুন্দরীটি তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরও চোখ তিনি নামাননি।

সওয়ারীটার নজরে কোন পাপের স্পর্শ ঐ অবস্থায় ছিল না এবং থাকলেও তাঁকে খুব একটা দোষ দেয়ারও ছিল না। মাহমুদা খাতুনের রূপ রবীশশীকে শরম দেয়া



www.amarboi.org

আর দরবেশকে বিভ্রান্ত করা রূপ। আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট যে কোন সৌন্দর্য অবলোকনে কোন অপরাধ না থাকলে, এ সৌন্দর্য দুদণ্ড চেয়ে দেখে না কে ?

সওয়ারীটাকে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেই মাহমুদা খাতুন চমকে উঠে মুখের নেকাব এঁটে দিতে দিতে ত্রস্তপদে কক্ষান্তরে ফিরে যেতে লাগলো। সে এসে দুই কক্ষের মাঝের দরজায় পৌছতেই সওয়ারীটি কুণ্ঠিত কণ্ঠে ডাক দিলেন—এই যে শুনুন—

মাহমুদা খাতুন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁচার যাঁর কোন আশাই ছিল না, সেই লোক বেঁচে উঠে ডাক দিয়েছেন। এ ডাক সে উপেক্ষা করতে পারলো না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলতেও পারলো না। দরজার কাছে এসে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। সওয়ারীটি পুনরায় ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—এ আমি কোথায় ? আমি এখানে কেন ?

জবাবে মাহমুদা খাতুন মৃদকণ্ঠে বললো—আপনি আহত হয়ে রাস্তায় পড়েছিলেন। আমরা তুলে এনেছি।

খেয়াল হতেই সওয়ারিটি বললেন—ও-হ্যাঁ, তাইতো ! আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ ! আল্লাহ্ আপনাদের অশেষ ভালাই করুন। কিন্তু আমার ঘোড়া ? আমার ঘোড়াটি কি—

ঃ জিনা, হারিয়ে যায়নি। ওটাও এনে রাখা হয়েছে আর ঠিক মতো দানাপানি দেয়া হচ্ছে।

আশ্বস্ত হয়ে সওয়ারীটি খোশদীলে বললেন—আল্লাহর কি রহম ! আর আপনাদের কি মেহেরবানী !

অতপর লহমাখানেক চুপচাপ। সওয়ারীটা আর প্রশ্ন করলেন না। মাহমুদা খাতুন ইতস্তত করে বললো—আপনি কি পানি চাইলেন ?

ঃ পানি ? কৈ, নাতো ?

ঃ আপনি যে ঘুমিয়ে থেকে পানি পানি করলেন ?

ঃ তাই কি ? তাহলে হয়তো স্বপনে। আমার কিছু খেয়াল নেই।

আবার খানিক বিরতি। এরপর মাহমুদা খাতুন প্রশ্ন করলো—কে আপনি ? কোথাকার লোক আপনি ?

ঃ আমি ? আমি মুর্শিদাবাদের লোক। মুর্শিদাবাদেই থাকি।

ঃ মুর্শিদাবাদে ?

ঃ জি-জি। নবাব মুর্শিদ কুলী খানের নামে জায়গাটার নামতো এখন মুর্শিদাবাদ।

ঃ কি করেন সেখানে ?

ঃ আমি একজন সৈনিক।

ঃ সৈনিক ?

ঃ জি. সেপাই।

মাহমুদা খাতুন তাঁকে একটু বড় কিছু আশা করেছিল। সেপাই শুনে সে কিঞ্চিৎ দমে গেল। এরপর ফের বললো—কার সেপাই আপনি ?

ঃ নবাবের। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের। আমি নবাবের অধীনে নকরী করি।

ঃ এখানে এলেন কোত্থেকে ?



www.amarboi.org

ঃ উড়িষ্যার কাছাকাছি এক এলাকা থেকে। নবাব মুর্শিদকুলী খান সাহেবের ইন্তেকালের খবর শুনে আমি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছিলাম।

মাহমুদা খাতুন চমকে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। উনি ইন্তেকাল করেছেন?

ঃ জ্বি। সেই খবর পেয়েই আমি যাচ্ছিলাম।

ঃ কবে ইন্তেকাল করলেন?

ঃ যখন আমি যাচ্ছিলাম তার আগের দিন।

মাহমুদা খাতুন থামলো। তারপর আবার প্রশ্ন করলো—আপনাকে তীর মারলো কে?

ঃ কোন অচেনা দুশমন।

ঃ দুশমন! আপনার সাথে কি তার দুশমনী?

ঃ আমার সাথে নয়। দুশমনীটা বাপ-বেটার মধ্যে। অর্থাৎ মরহুম নবাব মুর্শিদ-কুলী খানের জামাতা সুজাউদ্দীন খান সাহেব আর সুজাউদ্দীন খানের আওলাদ সরফরাজ খান সাহেবের মধ্যে।

ঃ বলেন কি!

ঃ ঠিক দুশমনী বলা চলে না। মসনদ নিয়ে মনকষাকষি আর কি।

ঃ তাহলে আপনাকে মারার কারণ কি ঘটলো?

ঃ আমি তাঁদের কোন একপক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছি ভেবে, অপরপক্ষের চাম্‌চেরা কেউ এ কাজটা করেছে বলেই আমার ধারণা। এছাড়াতো আর কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছিনে আমি।

ঃ আপনি কোন পক্ষের লোক?

ঃ আমার কোন পক্ষ নেই। বাপ-বেটা দুইজনই আমার কাছে সমান।

ঃ তাজ্জব! আপনি তো নাকি সেরেফ একটা সেপাই। একটা সেপাই মেরে কি ফায়দা ঐ চাম্‌চেদের।

সওয়ারী এবার ঈষৎ হেসে বললেন—ওরাই জানে।

অদূরে আবিদ হোসেন সাহেবের কণ্ঠ শোনা গেল। মাহমুদা খাতুন দরজা পেরিয়ে আসতে গিয়েই ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—ওহ্‌হো, আপনার নামটা তো জানা হলো না?

ঃ আমার নাম? আমার নাম দিলওয়ার আলী।

মাহমুদা খাতুন অন্দরের দিকে ছুটে এলো এবং আবিদ হোসেন সাহেবকে সামনে পেয়েই বললো—দাদু, সওয়ারীটা ভাল হয়ে গেছেন। উনি কথা বলছেন।

আবিদ হোসেন সাহেব দ্রুতপদে সওয়ারীর কক্ষে চলে এলেন এবং তাঁকে সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখে সানন্দে তার হদিস খবর নিতে লাগলেন। খবর শুনে আরো অনেকেই কক্ষে এসে হাজির হলো। আজিজুন নেছা বেগমও এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালেন। দিলওয়ার আলী নিজের নামটা বলে মাহমুদা খাতুনকে যে পরিচয়টুকু দিয়েছিলেন, এদের সামনে সেইটুকুরই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। নিজের বা রাজনৈতিক



www.amarboi.org

পরিস্থিতির অধিক গভীরে গেলেন না বা তা নিয়ে শ্রোতারা কেউ পীড়াপীড়িও করলেন না। দিলওয়ার আলী লক্ষ্য করলেন, নবাব মুর্শিদকুলী খান সাহেবের ইন্তেকালের খবর সবাই সবিস্ময়ে শুনলেন, কিন্তু তা নিয়ে তেমন কোন আফসোস্ এ মকানের কোন কেউই করলেন না। অতপর দিলওয়ার আলীর আগ্রহে তাঁর আহত হওয়ার পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী আবিদ হোসেন সাহেব দিলওয়ার আলীকে সবিস্তারে শোনালেন। তামাম কথা শুনার পর দিলওয়ার আলী সবার প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানালেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হলো। দিলওয়ার আলী সেই থেকেই একই লেবাসে ছিলেন। আবিদ হোসেন সাহেব এবার তাঁর ধোওয়া-মুছা, লেবাস বদল ও আহারাদির ব্যবস্থার দিকে মন দিলেন। দিলওয়ার আলীও নীরবে আবিদ হোসেন সাহেবের ইচ্ছে আদেশ মেনে চললেন। সেদিন আর কোন কথা বললেন না।

পরের দিন সকালেই তিনি বিদায় নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একথা শুনেই আবিদ হোসেন সাহেব সরবে ছুটে এসে বললেন— আরে-আরে ! সেকি ! শরীর তো আপনার মোটেই সবল হয়ে উঠেনি। বিদায় নেবেন মানে ? এতবড় একটা ধাক্কার পর এখনই কি অশ্ব ছোটানো সম্ভব ?

দিলওয়ার আলী সবিনয়ে বললেন— ধীরে ধীরে চালালে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

কণ্ঠে জোর দিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন— সেই ধীরে ধীরে চালিয়ে যাওয়ার গরজটা কি পড়লো আপনার ? আর দু' একদিন বিরাম নিতে অসুবিধে হলোটা কি ?

দিলওয়ার আলী শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন— না, খুব একটা অসুবিধের কথা নয়। তবে—

ঃ তবে ?

ঃ আপনাদের অনেক তকলিফ দিয়েছি। আর কত তকলিফ দেবো, বলুন ?

ঃ বটে !

ঃ বিগত দুইদিন দুইরাত আমি আপনাদের তটস্থ করে রেখেছি। আমার জন্যে আপনাদের কারো ঠিকমতো আহার নিদ্রা হয়নি। একেবারেই আচানকভাবে এসে এত তকলিফ দেয়ার পর আর কি তকলিফ বাড়ানো উচিত হবে আমার ?

আবিদ হোসেন সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন— কে আপনাকে তকলিফ দিতে বলেছিল ? আমরা কি কেউ বলেছিলাম, এখানে এসে ঐভাবে মউতের মুখে পড়ুন আপনি ?

ঃ জি ?

ঃ আরো হপ্তাকাল যদি ঐ হালতেই থাকতেন, জ্ঞান যদি এই দুইদিনেই না ফিরে আসতো, তাহলে আপনার ঐ উচিত জ্ঞান কোথায় থাকতো শুনি ?

দিলওয়ার আলীর মাথাটা নুয়ে পড়লো। তিনি নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন— তা অবশ্য ঠিক। জ্ঞান না ফিরলে কি আর আমি করতে পারতাম !

ঃ তাহলে ? তখন যদি আমাদের তকলিফের কথা আপনার ভাবার বিষয় না হলো, এখন সেটা এতবেশী করে ভাবছেন কেন ?



www.amarboi.org

ঃ না-মানে, জ্ঞান না ফিরলে বাধ্য হয়েই আপনাদের তকলিফের কারণ হয়ে থাকতে হতো আমাকে। আমি আপনাদের কেউ নই। তবু আমার জন্যে অনেক করেছেন আপনারা। আর আপনাদের যা মহৎ দীল, তাতে ঐ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে যে আরো আপনারা আমার জন্যে করতেন, এ নিয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু আল্লাহর রহমে এখন যখন আর সে অবস্থা নেই—

আবিদ হোসেন সাহেব কথা কেড়ে বললেন—তখন কেটে পড়াই ভাল, এই তো ?

ঃ না, কথাটা ঠিক —

ঃ একেই বলে, "খেয়েদেয়ে পাখীটি, বনের দিকে আঁখিটি।"

ঃ জি ?

ঃ আপনি আমাদের কেউ নন জেনেও যখন অতবড় ঝামেলাটা বয়ে বেড়াতে পারলাম, এখন আর এই সামান্যটুকু পারবো না কেন ? এ নিয়ে আপনার এত ভাবনা কিসের ?

ঃ জনাব !

ঃ যাবেন তো জরুর। শরীরটা সুস্থ হোক, দেহমনে বল আসুক, তার পরে যাবেন। আজই যাবেন মানে ? কাজের তাড়া থাকলেও, মরে গেলেতো কোন তাড়াই থাকতো না।

দিলওয়ার আলী আর কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। অধোবদনে লহমাখানেক বসে থাকার পর সআবেগে বললেন — আপনারা সত্যিই বড় আজব মানুষ !

ঃ কেন-কেন, আজব মানুষ কেন ?

ঃ পরের মুসিবতকে এতটা আপন করে দেখতে কি সাধারণ আর সব মানুষ পারে ?

ঃ কেন পারে না ? সাধারণ মানুষেরা কি ইনসান নয় ? জীব জানোয়ার ?

ঃ তওবা-তওবা ! তা হবে কেন ?

ঃ তবে ? ইনসানই তো ইনসানের মুসিবত দেখবে। জীব জানোয়ারের মুসিবতও ইনসানই দেখবে। মানুষের মুসিবতে মানুষ এগিয়ে আসবে এটাতো মানুষের একান্তই এক স্বাভাবিক কর্তব্য !

ঃ জনাব !

ঃ এখানে অস্বাভাবিকতাটা দেখলেন কি ? এইটুকুই মানুষ যদি না করবে, তাহলে আশরাফ-উল-মাখলুকাত বলে নিজেকে দাবী করার হকটা তার কোথায় ?

ঃ জি-জি। একথা তো একশোবার সত্যি। তবে কিনা —

ঃ আমরা অনেকেই তা করিনে !

ঃ জি-জি।

ঃ তবু মানুষ বলে তো বটেই, নিজেদের মুসলমান বলেও দাবী করি।

ঃ জি, আফসোস্টা তো এখানেই।

ঃ শুধু কি ঈমান আনলেই আর তস্‌বিহ্ টিপলেই মুসলমান হওয়া যায় ? "ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখেরাতে হাসানাতাওঁ"—ইহ দুনিয়ায় ও



www.amarboi.org

আখেরে নিজের ভালাই কামনা করবো আর ইহ দুনিয়ার কল্যাণের কাজ কেউ করবো না, তাহলে ইহ দুনিয়ার ভালাইটা আসবে কোত্থেকে ? শুধু ঐ একদিক—মানে আখেরাত নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে ?

ঃ জনাব !

ঃ তাহলে তো আমাদের প্রিয় নবী করিম (সা) সেরেফ আখেরাত নিয়েই পর্বতের গুহায় পড়ে থাকতেন। তাঁকে এত যুদ্ধ করতেও হতো না, এত তকলিফ সহ্য করতেও হতো না। মানুষের সমাজ জীবন সুন্দর করার কাজে তিনি এত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন ?

ঃ অবশ্যই অবশ্যই। সেটা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে আমাদের।

ঃ আপনাকে জ্ঞানী লোক বলেই মনে হচ্ছে। অধিক বলার জরুরত নেই। তবু কথা প্রসঙ্গে না বলে পারছিনে যে, আর্তের খেদমত, বিপন্নের বিপদমুক্তি, দুঃখীর দুঃখ মোচন, জুলুমের প্রতিবিধান, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সাথে সামিল হওয়া—এমন হাজারটা কাজ নির্ধারিত এবাদত ও নির্দিষ্ট ফরয পালনের সাথে মুসলমানদের অবশ্যই করণীয় কাজ। এগুলোকে ঝামেলা মনে করলে মুসলমানের চলবে কেন ? আল্লাহ্ তায়ালা যে এগুলোকেও এবাদতের সামিল করে দিয়েছেন।

ঃ জনাব !

ঃ মানুষ মাত্রেই সৎকাজ করবে, এইটেই তো আশা করবে মানুষ। আর মুসলমানদের কাছে এটা শুধু আশা করার বিষয়ই নয়। সৎকাজ মুসলমানদের করতেই হবে। তাদের জন্যে এটা অপরিহার্য।

ঃ তাজ্জব ! জনাব এতটাই ভাবেন ?

ঃ আমার তো ব্যক্তিগত ভাবনা নয় এটা। ঐ যে পাক কুরআনেই এটা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে—"ওয়াবাশশিরিল্ লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস্ সালেহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজ্‌রি মিন্ তাহ্তিহাল আনহার" অর্থাৎ ঐসব লোকদের শুভসংবাদ দাও, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজের আমল করে, তাদের জন্যে অবশ্যই জান্নাত আছে যার (জান্নাতের) পাদদেশে নহর প্রবাহিত। এখানে শুধু ঈমানের কথাই বলা হয়নি, সৎকাজের কথাও সমানভাবে বলা হয়েছে। সৎকাজ না করে রেহাই আছে মুসলমানদের ?

ঃ মারহাবা-মারহাবা। জনাব বিলকুল হক কথাই বলেছেন।

ঃ তবে ? ধরে নিন, আপনার ঐ দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা সৎকাজ করার সামান্য একটু মওকা পেলাম। এটাতো আমাদের স্বার্থেই আমরা করেছি। এখানের তকলিফের প্রশ্ন কোথায় ?

ঃ জনাব !

ঃ আপনার দুর্ঘটনাটা অন্যখানে ঘটলে আমরা জানতেও পারতাম না। আর এই সৎকাজটুকু করার মওকাও নসীবে আমাদের জুটতো না।

দিলওয়ার আলী পুনরায় সশব্দে বলে উঠলেন—তবু আমি বলবো, সত্যিই আপনারা তুলনাহীন মানুষ।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব এবার প্রগাঢ় কণ্ঠে বললেন—আরে ভাই, আমিই যদি আপনার সামনে ঐ দুর্ঘটনায় পড়তাম, আপনি সেটা না দেখলে, মানুষ এহ্‌সান পাবে কোথায় ?

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হলো। দিলওয়ার আলী আর আপত্তি করতে পারলেন না। স্থির হলো, আরো দু' তিন দিন যা প্রয়োজন, সে কয়দিন অপেক্ষা করবেন তিনি এবং তারপরে যাবেন।

বিকেলে খোশ গল্পে বসে দিলওয়ার আলীও আবিদ হোসেন সাহেব কথায় কথায় নবাব মুর্শিদকুলী খানের ইন্তেকালের প্রসঙ্গে চলে এলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি মৃত্যু শর্য্যায় ছিলেন, অনেক চেষ্টা তদবির করার পরও অবশেষে তিনি ইন্তেকালই করলেন, এতটা প্রথমে ভাবতেই কেউ পারেনি—এসব কথা দিলওয়ার আলী শোনালেন। এ প্রসঙ্গে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—তিনি পরহেজগার লোক ছিলেন, এবাদত বন্দেগী অনেক করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন—এ কামান জরুর আমি করবো। তবে নিজের অজ্ঞানতার জন্যেই হোক আর উদাসিনতার জন্যেই হোক, এই বাংলা মুলুকে মুসলমান কওমের আর মুসলমান শাসনের যে ক্ষতি তিনি করে গেলেন, সেটা তরিয়ে উঠতে এখানকার মুসলমানেরা কোনদিনই পারবে কিনা, তা ঐ আলেমুল গায়েবই জানেন।

সচকিত হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন—কেন জনাব, একথা বলছেন কেন ?

আবিদ হোসেন সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সে কথা অনেক কথা ভাই। ওসব কথা তুলে এই পরিবেশটা ভারী করতে চাইনে। চম্বুক কথা হলো, তিনি তাঁর ঐ রাজস্ব ব্যবস্থার নামে এ মুলুকে মুসলমানদের শক্তি ক্ষয়ই করে গেলেন।

বিষয়টা আঁচ করে দিলওয়ার আলী কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং উদাসীন কণ্ঠে বললেন—অর্থাৎ ?

ঃ এখন ওটা থাক ভাই। মওকা হলে সে আলোচনা অন্য সময় করা যাবে। এবার বলুন, মরহুম নবাবের পর এখন বাংলার নবাব হচ্ছেন কে ? তাঁর জামাতা, না নাতী ?

ঃ মরহুম নবাব তো তাঁর নাতীকেই মসনদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দিল্লীর বাদশাহর সনদটা এলো কিনা, এখান থেকে তা বলাতো এখন আমার পক্ষে কঠিন। আমির-উমরাহদের মধ্যে এ নিয়ে আগে থেকেই একটা মতভেদ ছিল। জানিনে এখন কি হচ্ছে সেখানে।

আবিদ হোসেন সাহেবের পালংকের উপর বসেই উভয়ে এই আলাপ-আলোচনা করছিলেন। কক্ষে আবিদ হোসেন সাহেব একাই আছেন ভেবে মাহমুদা খাতুন "দাদু-দাদু, টাট্‌কা খবর আছে"—বলে ছুটতে ছুটতে তার কক্ষে এসে ঢুকলেন। মাহমুদা খাতুনের মুখ মস্তকে কোন নেকাব-আব্রু ছিল না। তার আজানু লম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠদেশে দিগন্তব্যাপী মেঘের আকারে বিস্তৃত ছিল। দৌড়ের আন্দোলনে সে কেশদাম জানু থেকে মস্তকতক্‌ মহাসাগরের উর্মির মতো আছড়ে



www.amarboi.org

আছড়ে পড়ছিল। ঐ অবস্থায় কক্ষে ঢুকে দিলওয়ারের উপর নজর পড়তেই "তওবা" বলে বাঘ দেখারও অধিক সে চমকে উঠলো এবং ছিটকে আবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। আবিদ হোসেন সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন—আরে সেকি—সেকি! চলে যাচ্ছিস্ কেন? সেই টাট্‌কা খবরটা কি তা দিয়েই যা।

দরজার বাইরে এসে সে ধমক দিয়ে বললো—ধ্যাৎ!

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—আহ্‌হা, দিলওয়ার আলীতো তোর কিছুটা ভাইয়ের মতো। এতটা চমকে উঠার কি আছে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে মাহমুদা খাতুন অভিযোগের সুরে বললো—দাদু!

ঃ অবশ্য বেগানা মানুষ, শরম পাওয়ারই কথা। আমি তোকে বেআব্রুভাবে আসতে বলছিনে এখানে? কি খবর এনেছিস্, ঐ আড়াল থেকেই বল্।

ঃ বাংলার এখন নবাব কে, তা জানেন?

ঃ কে?

ঃ মরহুম নবাবের জামাতা সুজাউদ্দীন খান সাহেব।

ঃ সেকি! এ খবর কোথায় পেলি?

ঃ ভাইজান লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন। তাঁর ফিরে আসতে আরো ক'দিন দেরী হবে, এই খবর দিয়েছেন।

ঃ তাই নাকি? কোথায় সে লোক?

ঃ চলে গেছে। কিতাবউদ্দীনকে এই খবর দিয়ে সে বাড়ীতে চলে গেছে। এই গাঁয়েরই লোক।

ঃ তাজ্জব!

ঃ দিলওয়ার আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এই সন্দেহই ছিল আমার। যা ভেবেছিলাম, তা-ই হলো।

দিলওয়ার আলী উদাস হয়ে উঠলেন। মাহমুদা খাতুনের উদ্দেশ্যে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—কিতাবউদ্দীন কোথায়?

মাহমুদা খাতুন বললো—সে আবার দহলীজের দিকে গেছে।

ঃ শুধু তাকেই বলেছে, না অন্যেরা কেউ শুনেছে?

ঃ তা আমি জানিনে।

ঃ কিতাবউদ্দীন ঠিক শুনেছে তো?

ঈষৎ গোস্বাভরে মাহমুদা খাতুন বললো—আরে বাবা! আমাকে এত জেরা কেন? গরজ থাকলে বাইরে গিয়ে কিতাবউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করুন। আমি ওসবের কি জানি?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ আমাকে কি বলেছে, না অত জানার আমার ঠেকা আছে? আপনার ঠেকা থাকলে কিতাবউদ্দীনের খোঁজ করুন গে'। না হয় ঐ লোকটার কাছেই যান।

সম্বিতে ফিরে এসে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাহলে কিতাবউদ্দীনের খোঁজ করি।



www.amarboi.org

অতপর তিনি দিলওয়ার আলীকে বললেন—চলুন ভাই সাহেব, এখান থেকে উঠা যাক। ছুঁড়িটা বেজায় ক্ষেপে গেছে।

মাহমুদা খাতুন ফের গোস্বাভরে বললো—দাদু!

ঃ যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। চলুন ভাই, জল্‌দি জল্‌দি চলুন। বড্ড জেদী মেয়ে। দেরী হলে গালমন্দও করতে পারে।

হাসতে হাসতে দেউটির দিকের দরজা দিয়ে উভয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিষের ক্রিয়ায় জর্জরিত শরীরে পুরোপুরি শক্তি ফিরে আসতে বেশ কিছুটা সময় নিলো। ফলে, আরো দিন তিনেকের আগে দিলওয়ার আলী বিদায় নিতে পারলেন না। এই কয়দিনে এই পরিবারের প্রত্যেকের কাছে তিনি আরো বেশী পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হলেন। তাঁর সলজ্জ আচরণ আর অমায়িক ব্যবহারে পরিবারের সকলেই প্রীত হলেন। মুরুব্বীরা তাকে স্নেহের নজরে নিলেন, চাকর-নফর ও ছোটরাও তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল হলো। আজিজুন নেছা বেগম মাঝে মাঝে এসে পর্দার আড়াল থেকে তাঁর সাথে কথা বলে মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করে গেলেন।

মাহমুদা খাতুনের সাথে আর তাঁর সরাসরি কোন কথা হয়নি। তবে দেউটি দিয়ে যাতায়াত করার কালে কয়েকবারই উভয়ে উভয়ের মুখোমুখী হয়েছেন এবং উভয়েই শরম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছেন। মাহমুদা খাতুন যতবারই লক্ষ্য করেছেন ততবারই দেখেছেন, লোকটা চমকে গিয়ে সেই যে মাথা নীচু করলেন, অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে সে মাথা আর উঠলো না।

দিলওয়ার আলী সেই থেকেই আবিদ হোসেন সাহেবের ঐ পাশের কক্ষেই আছেন। একে শারীরিকভাবে দুর্বল মানুষ, তার উপর আর মাত্র দুইতিন বা দিন চারেকের ব্যাপার। এর জন্যে আর বেচারাকে দহলীজে পাঠিয়ে দেয়াটা গৃহস্বামীরা ভদ্রতা মনে করেননি। দিলওয়ার আলী নিজেই একবার সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে খামুশ করে দিয়েছেন আজিজুন নেছা বেগম সাহেবা নিজেই। তিনি বলেছেন, "কেন বাপজান, দহলীজে গেলে তো আর আমরা তোমার হদিস নাগাল পাবো না বা দু'টো কথা বলতেও পারবো না। এ কয়দিন ছেলের মতো থাকলে, এই সামান্য সময়ের জন্যে আবার হঠাৎ করে পর হতে চাও কেন?" দিলওয়ার আলী তার জবাব দিতে পারেননি।

বিদায়ের আগের দিন। জোহরের নামাযের পর দিলওয়ার আলী তাঁর কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠার পর তাঁর খুব পানির তেষ্টা পেলো। অন্যান্য দিন তাঁর শিয়রে সবসময়ই পাত্র ভরা পানি থাকতো। পাত্র আজ খালি। কিতাবউদ্দীনের ভুলের জন্যেই এই কিঞ্চিৎ ত্রুটিটা ঘটে গেছে। কিতাবউদ্দীন বাইরে থাকায় এবং আবিদ হোসেন সাহেব দহলীজে প্রজাদের নিয়ে দরবার করতে বসায়, পানির জন্যে একে ওকে ডাকাডাকি করেও দিলওয়ার আলী কারো সাড়াশব্দ পেলেন না। অন্য আর এক নওকর যেটা ছিল, সে কুড়োল নিয়ে অন্দরের এক কোণে কাঠ ফাঁড়াইয়ে ব্যস্ত। ঘটনাচক্রে আজিজুন নেছা বেগমও তাঁর কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর ডাক এঁদের কানেও পৌঁছলো না। ডাকাডাকিটা শুনতে পেলো কাজের ঝি। সে মাহমুদা খাতুনকে



www.amarboi.org

জানাতেই মাহমুদা খাতুন দ্রুতপদে আবিদ হোসেন সাহেবের কক্ষে এসে হাজির হলেন এবং একটু ইতস্তত করার পর পর্দার আড়াল থেকে বললেন—আপনি কি কাউকে ডাকছিলেন ?

মানুষের সাড়া পেয়ে দিলওয়ার আলী সাগ্রহে বললো—জ্বি-জ্বি। একটু পানির প্রয়োজন ছিল।

ঃ পানি ?

ঃ জ্বি। বড্ড পিয়াস লেগেছে।

হঠাৎ মাহমুদা খাতুনের মাথায় দুষ্টুমী চেপে গেল। সে ফস্ করে বললো—সত্যি সত্যিই পিয়াস লেগেছে, না খোয়াবের ঘোরে বলছেন ?

ঃ মানে ?

ঃ আপনি তো আবার ঘুমিয়ে থেকেও "পানি-পানি" করেন।

খেয়াল হতেই দিলওয়ার আলী শব্দ করে হেসে উঠলেন। নির্মল হাসি। মাহমুদারও হাসি পেলো। হাসি চেপে সে বললো—হাসছেন যে ?

ঃ না মানে, আপনি ঠিকই বলেছেন। অমনটি মাঝে মাঝে আমার হয়।

ঃ এবারেরটি কেমনটি ?

ঃ জ্বি ?

ঃ সত্যিই তেষ্টা, না খোয়াব ?

ঃ আরে, এবারতো আমি ঘুমিয়ে নেই। সত্যিই আমার পানির পেয়াস লেগেছে। মেহেরবানী করে কাউকে যদি ডেকে দিতেন—

ঃ কাকে ডেকে দেবো ? কাছেকোলে তো কেউ নেই ?

দিলওয়ার আলী হতাশ কণ্ঠে বললেন—ও—। আচ্ছা, তাহলে থাক।

ঃ আমি দিলে চলবে ?

ঃ আপনি ? হ্যাঁ, মানে তা আবার চলবে না কেন ?

ঃ সামনে গেলে লতার মতো নুয়ে পড়বেন নাতো ?

ঃ কেমন ?

ঃ আপনার শরমবোধটা তো দেখেছি অত্যন্ত প্রকট। হঠাৎ করে সামনে পড়লেই একদম কুপোকাত।

দিলওয়ার আলীর তখন বেজায় পিপাসা। তিনি ম্লান হেসে বললেন—ও, এই কথা ? তা ঘটনা হলো—

বলেই তিনি ঢোক চিপলেন। তা লক্ষ্য করেই মাহমুদা খাতুন বললো—আচ্ছা দাঁড়ান—

মাহমুদা খাতুন তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে একপাত্র পানি নিয়ে ফিরে এলো। এরপর মুখের নেকাব এঁটে দিয়ে পানির পাত্র হাতে সে দিলওয়ার আলীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বিনা বাক্যব্যয়ে দিলওয়ার আলী তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে পানির পাত্র নিলেন এবং ঢক্ ঢক্ করে তামামটুকুই পান করলেন। অতপর মুখ মুছে শূন্য পাত্র ফিরিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন—আহ্, বাঁচালেন !



www.amarboi.org

নেকাবের তলে ঠোঁটটিপে হেসে মাহমুদা খাতুন বললো — কৈ এবার তো শরম পেয়ে মাথা নোয়ায়ে রইলেন না ? গরজ বড় বালাই, তাই নয় ?

মওকা পেয়ে দিলওয়ার আলীও জবাব না দিয়ে পারলেন না। বললেন, জ্বি, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কেবল আমার শরমটাই তো দেখছেন, নিজেরটা দেখছেন না ?

ঃ নিজেরটা !

ঃ আমি না হয় শরম পেয়ে নুয়ে পড়ি। কিন্তু আপনার শরমবোধটাতো তার চেয়েও মারাত্মক। শরম পেলে আপনি দেখি একদম লাফিয়ে উঠেন।

ঃ বটে ! শোধ নিচ্ছেন নাকি ?

ঃ শোধ ? কি সাংঘাতিক কথা ! তাই কি আমি নিতে পারি ? শুনেছি, আপনি নাকি খুব জেদী মেয়ে। রাগ করলে গা'ল-মন্দও করেন। ভয় নেই আমার দীলে ?

ঃ দুর্নামের সবদিকই তো খেয়াল রেখেছেন দেখছি। সুনামের দিকটাই কেবল বাদ।

ঃ বাদ ! সেকি বলছেন ? আপনাদের সুনাম করার যে কত কথা দীলে আমার—

ঃ আমি অন্যের কথা বলছিনে, আমার কথা বলছি।

ঃ আপনার কথা ?

চকিতে একটু চিন্তা করেই দিলওয়ার আলী আবার কলকণ্ঠে বলে উঠলেন — ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনার তুলনাহীন খুব সুরাতের কথা আমি বলবো না। ওটা বেয়াদবী। আপনার গুণটাই কি কম ? পরের খেদমত করতে আপনিই কি কম যান কিছু ?

ঃ খেদমত !

ঃ খেদমত আর স্নেহ-মমতা। আপনিই কি কম দরদ দেখালেন ? আমার ডাকাডাকি কেউ শুনতে পেলো না। তা দেখে এই যে আপনিই আমার তেষ্টার পানি এনে দিলেন, অচেনা অপর বলেও একজনের কষ্টে আপনি চুপ থাকতে পারলেন না, এইটেই কি কম কথা ? আপনাদের দীলের তুলনা হয় না। পরকে আপনারা আপন বানাতে জানেন।

মাহমুদা খাতুন কতকটা অজ্ঞাতেই শিহরিত হয়ে উঠলেন। ক্ষণকাল চুপ থেকে সহজ কণ্ঠে বললেন — তা জেনেই বা লাভ কি ? পর কি কখনো আপন হয় ?

ঃ হয় না ?

ঃ কৈ হয়, সবাই আমরা আপনার জন্যে এত কিছু করলাম, তবুতো আপনাকে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না ? যাই যাই করে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

দিলওয়ার আলী হুঁশে এলেন। মাহমুদা খাতুনের অভিযোগটা বুঝলেন। একটু থেমে তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন — কি করবো বলুন ? আমি নকরী করি পরের। মরে গেলে কথা ছিল না। তা যখন যাইনি, সামনে এখন আমার অনেক কাজ। এখানে কয়দিন আর এভাবে বসে থাকতে পারি আমি ?

সমঝে গিয়ে মাহমুদা খাতুনও মৃদুকণ্ঠে বললো — তা অবশ্য ঠিক। যাবেন, যান। তবে চোখের আড়াল হয়েই আমাদের কথা বিলকুলই ভুলে যাবেন না যেন ? সেটা মানুষের কাজ হবে না।



www.amarboi.org

ভেতরে তার আম্মা ডাকাডাকি শুরু করায় সচকিত হয়ে মাহমুদা খাতুন ফের বললো—আম্মা আমার খোঁজ করছেন। আমি যাই। তবে কথা ঐ একটাই, একেবারেই ভুলে যাবেন না যেন—

পরেরদিন সকলের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দিলওয়ার আলী বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দেউটি পেরিয়ে আসতেই পেছন ফিরে দেখলেন, দেউটির অদূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মাহমুদা খাতুন। তার মুখমণ্ডল মলিন।

# ২

চাওয়া-পাওয়া আর হওয়া-না হওয়ার গতি-প্রকৃতি পৃথক। পরিস্থিতির পাঁয়তারা তার পৃষ্ঠপোষক। কেউ না চাইতেই পায়, কেউ বল-বুদ্ধির জোরে পেয়ে তবে ছাড়ে। কাউকে মানুষে হওয়ায়, কেউ নিজে নিজেই হয়ে যায়। নবাব শায়েস্তা খান নবাব হতে চাননি, কিন্তু ভক্তি-আপ্লুত জনগণ তাঁকে নবাব বানিয়ে ছেড়েছে। নবাব মুর্শিদকুলী খানকে কেউ নবাব বানাতে যায়নি, মুর্শিদকুলী খান নিজেই নিজেকে নবাব বানিয়ে নিয়েছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁকে নবাব হওয়ার মওকাও এনে দিয়েছে, তাঁকে নবাব হতে বাধ্যও করেছে। বলা বাহুল্য, সবকিছুতেই আল্লাহ তায়ালার মদদটাই মূল।

ঈসায়ী ১৭০৭ সনে বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইন্তেকাল করলেন। এরপর তাঁর মসনদ নিয়ে বংশধরদের হাতে বংশদণ্ডের মার-কাটারী কুঁদন আর বাংলা মুলুকে স্বার্থ ও ক্ষমতা নিয়ে কিছু প্রধান প্রধান কর্ম-কর্তাদের "লড়কে লেংগে" আচরণ মুর্শিদকুলী খানকে *ঠেলেঠুলে* এনে মসনদে বসিয়ে দিয়েছে। নবাব শায়েস্তা খানের পরে কয়েকজন সুবাদার, বিশেষ করে শাহজাদা আজিম-উশ-শান, "বাপ ভালা না ভাইয়া ভাইয়া, সবছে ভালা রুপাইয়া"—এই 'ধুন' বুকে নিয়ে বাংলা মুলুকে সুবাদার হয়ে এলেন এবং সবাই তাঁরা সুবাদার হয়েই গেলেন, নবাবের আসন পেলেন না। মুর্শিদকুলী খান দেওয়ান হয়ে বাংলা মুলুকে এলেন এবং কালক্রমে বাংলা ও উড়িষ্যার নবাব পদে আসীন হয়ে মসনদটাকে বংশ-পরম্পরায় অলংকৃত করার সুব্যবস্থা করলেন। বাদশাহর সনদ প্রাপ্তির ব্যাপার একটা থাকলেও, উত্তরাধিকারের প্রশ্নই অতপর অধিকতর বিবেচ্য বিষয় হলো।

কিন্তু "একটা বেটা দেরে আল্লাহ একটা বেটা দে, কামাই খেতে চাইনে মরলে মাটি দেবে কে?"—এই চিরন্তন ও অনুক্ত আর্তি বুকে নিয়ে নবাব মুর্শিদকুলী খান ইন্তেকাল করলেন। শুধু মাটি পাওয়ার আকাঙ্খাটাই তাঁর ছিল না, এত তকলিফ করে যে মসনদ তিনি বংশগত করে গেলেন, সেই মসনদটা রোশনাই করে বসার জন্যে একটা বেটার বড় প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর সে প্রয়োজন মেটেনি। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি কন্যা যিনাতুন নেছাকে সুজাউদ্দীন খানের সাথে শাদি দিয়ে



www.amarboi.org

অনেক আগেই সে অভাব পূরণ করার কোশেশ্ করেন। সুজাউদ্দীন খান ছিলেন সুযোগ্য ব্যক্তি। বীর, বিচক্ষণ ও সদ্বংশজাত। দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরের এক প্রভাবশালী মুঘল কর্মকর্তার পুত্র ছিলেন সুজাউদ্দীন। সেখানেই পরিচয়, সম্প্রীতি এবং সবশেষে কন্যার সাথে শাদি দিয়ে তাঁকে পুত্র বানালেন মুর্শিদকুলী খান। কালক্রমে জামাইকে উড়িষ্যার সহকারী সুবাদারও বানিয়ে দিলেন।

কিন্তু "চাইলেন দুধ, পাইলেন ঘোল।" তাঁর সাধ পূরণ হলো না। সুজাউদ্দীন খানের সাথে কন্যার শাদি দিয়ে পাওয়ার মধ্যে সাকুল্লে পেলেন তিনি সরফরাজ খান নামের এক নাতী। বেটার অভাব পূরলো না। কারণ কয়েকটা। ছোট কারণ — চরিত্র ও মেজাজে বেজায় গরমিল। শ্বশুর-জামাই দুইজন দুই বলয়ের লোক। শ্বশুর শরিয়তপন্থী পরহেজগার মানুষ। জামাই ধর্মের প্রতি উদাসীন এক বিলাসপ্রিয় ব্যক্তি। বড় কারণ — সুজাউদ্দীন খান শাদি করলেন আর একটা। নয়াবিবিও তাঁকে মুহম্মদ তকী খান নামের আর একটা পুত্রের পিতা বানালেন। সেই সাথে নয়াবিবি প্রেমের মায়া বিস্তার করে ছায়ার মতো এঁটে রইলেন খসমের পেছনে। বিনিময়ে খসমও কসম খাওয়ার মতো সবলে আঁকড়ে ধরলেন নয়াবিবির আঁচল। প্রেমের প্রতিযোগিতায় পয়লা বিবি যিনাতুন নেছা পরাস্ত হলেন। পতির আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি ঠাঁই নিলেন পিতার ঘরে। পুত্র সরফরাজ খান সহকারে তিনি পিতার সাথে মুর্শিদাবাদে রয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দফার পত্নী পুত্র নিয়ে উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার সুজাউদ্দীন খান উড়িষ্যায় ঘর বাঁধলেন। বিমর্ষ নবাব মুর্শিদকুলী খান দেখেশুনে নিঃশ্বাস ফেললেন সজোরে।

এ ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারতো। থেমে যেতে পারতো তাঁর আফসোসের রেশ। পুত্রের অভাব না মিটলেও কষ্টার্জিত মসনদে নাতীকে বসিয়ে দিয়ে তিনি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে পারতেন। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলী খানের সে আশাও পরিপূর্ণ হলো না। তাঁর নিজের হাতই নিজের গালে চড় মারলো ঠাশ্ করে। গাল ও হাতটা অবশ্য রূপক, চড়টাও এলো তাঁর মৃত্যুর পর। ফলে, তাতে কোন আঘাত তিনি পেলেন কিনা, জানা যায়নি।

ব্যাপারটা রূপকথারই মতো। কোন এক কামেল পুরুষ নাকি সদয় হয়ে এক অসহায় মূষিককে প্রথমে বিড়াল, তারপরে কুকুর এবং সবশেষে বাঘ বানালেন। বাঘ হয়েই মুষিকটা সেই কামেল পুরুষকেই খাবো বলে হামলা করে বসলো। ক্রুদ্ধ হয়ে কামেল পুরুষ তখনই আবার বাঘটাকে মুষিক বানিয়ে দিলেন। মুর্শিদকুলী খানের ঘটনাটাও অনেকটা এই রকমই। গরমিলটা রইলো শুধু শেষের দিকে। তাঁর বানানো বাঘটা সরাসরি তাঁকে হামলা না করে তাঁর বংশধরকে হামলা করে খেয়ে ফেললো। সরাসরি তাঁকে হামলা করলেও এই দুই ঘটনা এক রকম হতো না। কারণ, মুর্শিদকুলী খান কোন কামেল পুরুষ ছিলেন না যে, বাঘটাকে ফের তখনই মুষিক বানিয়ে দেবেন। গরমিলটা থেকেই যেতো।

সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বি উচ্ছেদ করে যাঁদের তিনি নিজের লোক ও নিজের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন, যাঁদের সাহায্যে ও সমর্থনে বাংলায় তিনি নবাব হয়ে বসলেন, সর্বোপরি, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যাঁদের তিনি কালক্রমে বাংলা মুলুকের 'রাজা-নির্মাতা'



www.amarboi.org

শক্তি হিসেবে গড়ে তুললেন এবং একান্তই নিজের লোক বলে যাঁদের তিনি জেনে গেলেন, তাঁরা যে আপন ছাড়া অন্য কারো লোক কুত্রাপিও ছিলেন না, নিজেদের সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাইরে যে মুনিবের ইচ্ছে মাফিক কোন রাজা তাঁরা বানান না, এটা যদি মুর্শিদকুলী খান তাঁর জীবদ্দশায় নিরূপণ করতে পারতেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তিনি দম ফেটে মরে যেতেন। তার আগেই তিনি মরে গিয়ে এই অপমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন। ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করায়, মুর্শিদকুলী খানের পরবর্তী দুই দুইজন নবাবও আগে মরে গিয়ে এই রকমই অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন।

থাক সে কথা। সুজাউদ্দীন খান সাহেব দ্বিতীয় পত্নী ও পুত্র নিয়ে ফারাগে থাকার অধিক আর কোন দুরভিসন্ধি তাঁর দীলে ছিল না। নবাব মুর্শিদকুলী খানের পরে তাঁর নিজের পুত্র সরফরাজ খানই বাংলার নবাব হবেন, এটা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আর সে জন্যে তিনি মোটেই নাখোশ ছিলেন না। ফূর্তিফার্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়াতেই খুশী ছিলেন তিনি। তখ্ত-মসনদ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাননি।

কিন্তু তিনি ঘামাতে না গেলেও, এ নিয়ে যাঁদের মাথার ঘাম ইতিমধ্যেই ঝরে পড়ে পা ভিজিয়ে ফেলছিলো, তারা অর্থাৎ সেই রাজা-নির্মাতা গোষ্ঠী নিশ্চুপ হয়ে রইলেন না। কালক্রমে মুর্শিদকুলী খানের আন্তরিক ইচ্ছা আঁচ করে, অর্থাৎ নাতী সরফরাজ খানকে মসনদে বসানোর মনোভাব টের পেয়ে, তাঁরা তলে তলে কোমর বেঁধে ফেললেন। বাংলা মুলুকে কোন ব্যক্তি নবাব হলে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে পারবেন, কয়েক শতাব্দির ব্যর্থ চেষ্টাকে সফল করতে পারবেন—এ ভাবনা তাঁদের সুচিন্তিত অগ্রিম ভাবনা। সুলতানী আমলের মতো কোন বংশগত শাসন বাংলা মুলুকে শক্তিশালী হোক, এটা তাদের লক্ষ্যের পরিপন্থী। কোন শক্তিশালী শাসক নবাব শায়েস্তা খানের মতো বাংলা মুলুকে সুদৃঢ় শাসন কাঠামো গড়ে তুলুন, এটা তাঁরা হতে দিতে নারাজ। নবাবের পর নবাব বদল করে বাংলা মুলুকে একটা রাজনৈতিক কোন্দল, অশান্ত পরিবেশ এবং দেশের একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জিয়িয়ে রাখাই মূল লক্ষ্য তাদের। পাঁচশত বছরেরও অধিককাল ধরে বুকের উপর চেপে থাকা পাথরটা সরিয়ে ফেলার মওকা, কে জানে কোন মুহূর্তে আসে? তখন তো প্রশাসন শক্ত আর স্থিতিশীল থাকলে চলবে না? সেই সাথে, যার পেছনে মদদ দিলে আর যাকে তুলে নাচালে তাঁদের স্বার্থ আর প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকে, সে দিকেও সজাগ লক্ষ্য তাঁদের। তাঁরা তার পেছনে ততক্ষণই থাকবেন, যতক্ষণ প্রয়োজন। গরজ ফুরালে সে বা তার বংশধররা জাহান্নামে যাক, তা নিয়ে তাদের দেখার কিছু নেই। শুধু দেখতে হবে, কোন্ লোককে নবাব করলে সবকূলই অক্ষুণ্ন রাখা যায় এবং দেখতে হবে, তাঁদের উপর অন্ধবিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমানোর লোক কে? এক্ষণে তাঁদের সেই প্রয়োজন ও পছন্দের লোক সুজাউদ্দীন খান, সরফরাজ খান নন। সুজাউদ্দীনের পেছনে তাঁরা কোমার বেঁধে মগজ খরচ করতে লাগলেন।

ফলশ্রুতিতে, মসনদের প্রতি প্রথম দিকে ইচ্ছে-আগ্রহ না থাকলেও, পরবর্তীতে সুজাউদ্দীন খানও মসনদের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন। সেই 'রাজা-নির্মাতা' গোষ্ঠী



www.amarboi.org

কায়দা করে তাঁর দুই আওলাদের মধ্যে এমন বিভেদ পয়দা করে দিলেন যে, সরফরাজ খানের সাথে মুহম্মদ তকী খান মুর্শিদাবাদে ঝগড়া করতে এসে সরফরাজ খানের হাতে মরতে মরতে কোনমতে উড়িষ্যায় পালিয়ে এসে বাঁচলেন। খবর শুনে তকীখানের আম্মাজান আঁত্কে উঠলেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় শংকিত হয়ে উঠে প্রতিবিধানের জন্যে তিনি খসমকে তাড়া করে ফিরতে লাগলেন। যথাসময়ে বিবি-খসম উভয়ের কাছেই হিতোপদেশ বিতরণ করা হলো। বিবি আরো উতলা হয়ে উঠলেন। সুজাউদ্দীনকে সম্ঝে দেয়া হলো, সরফরাজ খানের ক্ষতি হোক, কথাটা তা নয়। কথাটা হলো, তকী খানকে হেফাজত করার গরজেই সুজাউদ্দীনের নবাব হওয়া প্রয়োজন। তখ্‌তেরও একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। সুজাউদ্দীন খান টপ্‌কে গেলেন এবং সেই মোতাবেক তৈয়ার হতে লাগলেন।

বিলাস প্রিয় হলেও সুজাউদ্দীন খান ছিলেন বীর ও বিচক্ষণ। পরিবেশও ছিল তাঁর একান্ত সহায়। উড়িষ্যায় তিনি এই সময় ভাগ্যবিড়ম্বিত ও ভাগ্যান্বেষী এত ও এমনসব সাহসী লোক পেলেন, যাদের দিয়ে তিনি দিনে দিনে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে ফেললেন। তাঁর প্রশাসনিক বিচক্ষণতাও তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পথে যথেষ্ট সহায়ক হলো। এর সাথে পেলেন তিনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও বিচক্ষণ দুই ব্যক্তিকে। হাজী আহম্মদ ও মীর্জা মুহম্মদ আলী ওরফে আলীবর্দী খান নামক দুই ভাইকে। এই দুই ভাইয়ের আম্মা ছিলেন বিখ্যাত সেই 'আফসার' গোত্রের মেয়ে, যে গোত্রের লোক ছিলেন সুজাউদ্দীন খানের পূর্ব পুরুষগণও। ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে এই দুই ভাই যখন উড়িষ্যায় এসে অসহায়ভাবে পথে পথে ফিরছিলেন, আত্মীয়তার পরিচয় পেয়ে সুজাউদ্দীন খান এঁদের লুফে নিলেন এবং শাসনকার্যে নিয়োগ করলেন। অল্প দিনেই প্রশাসনে ও সামরিক বিভাগে এই দুই ভাই, বিশেষ করে আলীবর্দী খান, অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিলেন। সুজাউদ্দীনও তাঁদের তর তর করে অনেক উপরে তুললেন এবং দিনে দিনে প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ শিখরে তুলে দিলেন। এক্ষণে বাংলার মসনদ দখল করার অভিপ্রায়ে সুজাউদ্দীন খান তাঁদের মদদ চাইলে, তাঁরা সংগে সংগে মগজ ও তলোয়ার নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

অতপর বাংলার দিকে চাইতেই, যাঁরা তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুর্শিদকুলী খানের নিজের হাতে গড়ে তোলা সেই নবজাগ্রত ও 'রাজানির্মাতা' শক্তির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিরা একবাক্যে সুজাউদ্দীন খানের পক্ষ গ্রহণ করলেন, মুর্শিদকুলী খানের কথা ভুলেও ভাবলেন না। মুর্শিদকুলী খানের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তাঁর একান্ত প্রিয় ব্যক্তি জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ, যাকে তিনি অর্থলগ্নির বা ব্যাংক ব্যবসায়ের সামান্য অবস্থা থেকে তুলে এনে বাংলার শেঠ ও জগৎ শেঠ (বাংলার ব্যাংকার ও বিশ্বব্যাংকার) বানালেন, সেই জগৎ শেঠ মুর্শিদকুলীকে ত্যাগ করে সুজাউদ্দীনের সাথে যোগ দিলেন। সুজাউদ্দীনের সাথে যোগ দিলেন দিল্লীর দরবারে নিয়োজিত মুর্শিদকুলী খানের একান্ত আপন ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বলকিষেণ বা বলকৃষ্ণ। মুর্শিদকুলী খানের নির্দেশে বলকৃষ্ণ সরফরাজ খানের নামে সম্রাটের সনদ আনতে গিয়ে গোপনে ও দিল্লীর দরবারের প্রভাবশালী সভাসদ খান-ই-দুররানের সহায়তায় সুজাউদ্দীনের নামে সনদ বানিয়ে নিলেন। বলকৃষ্ণ ও অন্য কয়েকজন সহ জগৎ শেঠই এই সময়ে ছিলেন ঐ 'রাজা নির্মাতা' গোষ্ঠীর মূল ব্যক্তি। মূল ব্যক্তির



www.amarboi.org

ইশারায় ঐ গোষ্ঠীর তামামই সুজাউদ্দীনের পক্ষ নিলো। কৃতজ্ঞতার ঋণ তাদের এতটুকুও কণ্ঠরোধ করলো না।

ঘনিয়ে এলো সময়। উড়িষ্যায় খবর এলো, নবাব মুর্শিদকুলী খানের আয়ু আধা হপ্তার অধিককাল আর নেই। তার আগেও শেষ হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে পুত্র তকী খানের উপর উড়িষ্যার ভার রেখে সুজাউদ্দীন খান হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দী খান সহ তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে রওনা হলেন। বর্তমান মেদিনীপুরে এসেই তিনি মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যু খবর পেলেন। সেই সাথে সম্রাটের সনদ অর্থাৎ বাংলা ও উড়িষ্যা — এই উভয় প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে সুজাউদ্দীন খানের নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে বলকৃষ্ণ সেখানে এসে হাজির হলেন। (উল্লেখ্য যে, বিহার তখনও বাংলার সাথে যোগ হয়নি, দিল্লীর অধীন ভিন্ন সুবাদার বিহার শাসন করতেন।) নিজের নামে সনদ পেয়ে সুজাউদ্দীনের সাহস ও উল্লাস শতগুণে বেড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ স্থানের নাম রাখলেন "মোবারক মঞ্জিল" অর্থাৎ সৌভাগ্যের স্থান।

অতপর অতর্কিতে মুর্শিদাবাদ এসে তিনি সোজা 'চেহেল সেতুনে' অর্থাৎ নবাব মুর্শিদকুলী খানের চল্লিশ স্তম্ভের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সামনে সনদ পাঠ করে শুনিয়ে তড়িঘড়ি মসনদে উঠে বসলেন। বলা বাহুল্য, 'রাজানির্মাতা' শক্তিই তামাম ব্যবস্থা করার সাথে শক্ত হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সুজাউদ্দীনকে রাজা বানিয়ে দিলো।

সরফরাজ খানের নামে বাদশাহর সনদ নিয়ে বলকৃষ্ণ তখনও না আসায় এবং তাঁর ওয়ালেদ যে অতর্কিতে এসে মসনদ দখল করবেন, এটা কল্পনা করতে না পারায়, সরফরাজ খান তখনও মসনদ দখল করেননি। অকস্মাৎ ওয়ালেদের এই পদক্ষেপে প্রথমে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং পরক্ষণেই মসনদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে পিতার বিরুদ্ধে তলোয়ার খুললেন। কিন্তু তখনই আবার তাঁকে নিরস্ত হতে হলো। কাজটা এখন শক্ত কাজ। তদুপরি সরফরাজ খানের আম্মাজান ও নানীজান পিতার সাথে বিরোধিতা করার এই হীনতা ও দুর্ণাম থেকে বিরত থাকার জন্যে তাঁকে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন ও চাপ সৃষ্টি করলেন। অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনও ঐ একই উপদেশ দিলেন। দেখেশুনে সরফরাজ খান তলোয়ার কোষবদ্ধ করে পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং অতপর তাঁর নিজস্ব বাসস্থান নুক্‌তাখালীতে ফিরে গেলেন।

মুর্শিদকুলী খানের আশা পুরোটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তাঁর আশার মুখে মুঠো মুঠো ছাই ছিটিয়ে দিয়ে তাঁরই একান্ত আপন করে প্রতিষ্ঠা করা শক্তি সুজাউদ্দীনকে মসনদে এনে বসালো। এখানেই শেষ নয়। তারপরেও কৃতজ্ঞতার ছকে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে আর একজনকে মসনদে এনে বসিয়ে দিয়ে এবং মুর্শিদকুলী খানের বংশের বাতি এক ফুঁয়ে নির্বাপিত করে তারা তাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করলো। এ প্রসঙ্গ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ফৌজীপুর থেকে মুর্শিদাবাদে ছুটে এসে দিলওয়ার আলী দেখলেন, নাটকটা পুরোপুরিই অভিনীত হয়ে গেছে। অভিনেতা আর দর্শক তো কেউ নেই-ই, মঞ্চে আর



www.amarboi.org

চট-মাদুরও নেই। চারদিক নীরব ও নির্বিকার। শহরবাসীদের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা ছাড়া বাড়তি কোন হৈচৈ বা হুড়-হাঙ্গামা গোটা শহরের কোন প্রান্তেই নেই।

সেনানিবাসে এসে দিলওয়ার আলী তাঁর চত্বরে ঢুকতেই দৌড়ে এলো সেপাইরা। "হুজুর এসেছেন—হুজুর এসেছেন"—বলে তারা খোশ প্রকাশ করতে লাগলো। দিলওয়ার আলীর বিশ্বস্ত সহকারী আসাদুল্লাহ শশব্যস্তে এসে সালাম দিয়ে বললো—কি খোশনসীব ! এসে গেছেন উস্তাদ ? বাঁচা গেল! আমরা সবাই ভেবে সারা ! এই মুহূর্তে সবাই আছেন, কেবল আপনি নেই। কোথায় গেলেন, কোথায় রইলেন, কি সমাচার—একদিনের কাজে গিয়ে দেড় হপ্তাকাল নেই—কেউ কোন দিশে করতে পারছিনে।

সংক্ষিপ্ত জবাবে দিলওয়ার আলী বললেন—তাই নাকি ?

দিলওয়ার আলীর হাত থেকে অশ্বের লাগাম নিতে নিতে আসাদুল্লাহ্ বললো—জি-জি। যান উস্তাদ, আপনি গিয়ে দহলীজে বসুন। একটু বিরাম নিন। আমি খান সাহেবদের খবরটা দিয়ে আসি।

ঃ খান সাহেবদের ?

ঃ জি হ্যাঁ। আপনার চিন্তায় উনারা বড়ই পেরেশান হয়ে আছেন।

জনৈক সেপাই ডেকে অশ্বটাকে অশ্বশালায় পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েই আসাদুল্লাহ হন হন করে রওনা হলো। দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে এগিয়ে গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

দিলওয়ার আলী। তরুণ এক সেনানায়ক। জায়গীরদার-তরফ-দারদের অনিয়মিত সেনা-সৈন্যের বাইরে রাজধানীতে নবাবের যে নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক ফৌজ আছে, দিলওয়ার আলী সেই ফৌজের অন্যতম সেনানায়ক। দিল্লীর বাদশাহর দোহাজারী তিনহাজারী মনসবদারের মতো মুর্শিদাবাদের নবাবের এক একজন সেনানায়ক সার্বক্ষণিক ফৌজের এক এক অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সংখ্যায় এঁরা অনেক এবং দিলওয়ার আলী এঁদেরই একজন। শুধু একজনই নয়, অত্যন্ত উৎসাহী ও বিচক্ষণ একজন। কিছু ধান্দাবাজ সেনানায়কের ঈর্ষার কারণ হলেও, সরল-সৎ-তরুণ সেনানায়কদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও উস্তাদতুল্য ব্যক্তি। ঈমানদার মুরব্বী সেনানায়কদের কাছে তিনি অতিশয় স্নেহাস্পদজন। বয়সে তরুণ হলেও, সাহস, সততা ও বিচক্ষণতার জন্যে দিলওয়ার আলীর কদর দেন সকলেই। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কোন পরামর্শে বসার আগে দিলওয়ার আলীর খবর করেন সৎপন্থী নবীন-প্রবীন তামাম সেনানায়ক। তাঁর মতামত যোগ না হলে কোন সিদ্ধান্তই তাঁদের মনমতো হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে সেনানায়ক গাউস খানই তাঁকে পেয়ার করেন সর্বাধিক। সেনানায়ক শরাফউদ্দীন, শমশির খান, মীর কামালদের প্রীতিও তাঁর প্রতি অফুরন্ত। দরদ অঢেল।

খবর পেয়েই সবার আগে গাউস খান এলেন। শরাফউদ্দীন ও শমশির খনও একটু পরেই হাজির হলেন। গাউস খান এসেই প্রশ্ন করলেন—এই যে, ফিরেছো তাহলে যা হোক ! তবিয়ত ঠিকঠাক তো ?



www.amarboi.org

জবাবে দিলওয়ার আলী বললেন—জি, ঠিকঠাক।

ঃ শরীর-মন মজবুত ?

ঃ জি। আলহামদুলিল্লাহ, মজবুতই।

ঃ এদিকের খবরতো সব শুনেছো ?

ঃ জিনা, সব নয়। তবে আসার পথে অনেকখানি শুনেছি।

ঃ খুশী হয়েছো ?

দিলওয়ার আলী ম্লান হেসে বললো—আমার খুশী অখুশীর কি আছে চাচা ?

মসনদ দখলের ঐ সংকটের মুহূর্তে দিলওয়ার আলীকে তালাশ করে না পেয়ে গাউস্ খান সাহেব যেমন তাঁর জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তেমনই তাঁর উপর কিছুটা ক্ষুব্ধও ছিলেন। তিনি তাই কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বললেন—বটে ! সেরেফ বাহাদুর লড়াইয়াই নও, রাজনীতিও ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা আয়ত্ব করে ফেলেছো দেখছি !

দিলওয়ার আলী ঈষৎ হেসে বললেন—একথা কেন চাচা ?

ঃ বলছি তোমার আচরণ দেখে। এমন একটা চরম মুহূর্তে তোমার এই গায়েব হয়ে থাকা থেকেই এটা আমার মনে হচ্ছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ কোন রকম-কিসিম নেই। তুমি খুব সেয়ানা হয়ে গেছো আর খুব কায়দা করে চলতে শিখেছো—এই হলো সাফ কথা।

ঃ কায়দা ?

ঃ জরুর। বাপ-বেটার মসনদ নিয়ে খেলা। লড়াই শুরু হলে কোন্ পক্ষ নিতে কোন্ পক্ষ নিয়ে ঠকে যাবে ভয়ে, তুমি কায়দা করে আগেই উধাও হয়ে গেছো, যাতে করে লড়াই শেষে ফিরে এসে বিজয়ীর ঝাণ্ডা উড়াতে পারো। গায়ে কোন কালির দাগ না থাকে।

দিলওয়ার আলীর হাসির বেগ বেড়ে গেল। তিনি হাসি চেপে বললেন—সাব্বাস! সেরেফ এইটুকুই ভেবেছেন ? আর কিছু ভাবেননি ?

ঃ আর কিছু !

ঃ হারুপক্ষে যোগ দিয়ে আপনারা যারা হেরে গেছেন, ফিরে এসে যাতে করে তাদের মাথার উপর আমি বনবন করে তলোয়ার ঘোরাতে পারি, এটাও আমার আর একটা মতলব—একথাটা ভাবেননি ?

গাউস্খান অভিমান ভরে বললেন—তা আর অসম্ভব কি ? এ দুনিয়ায় কি বিশ্বাস আছে কাউকে ?

ঃ নেই ?

ঃ কৈ রইলো ? যেসব আচানক মন মতলবের পরিচয় দিচ্ছে এখন সবাই, তাতে আর কাকে কি বলবো ?

ঃ অতএব, হে নাদান দিলওয়ার আলী, তুমি একজন না-ফরমান ইনসান। বিশ্বাসের অযোগ্য এক গাদ্দার আদমী।

গাউস্ খান ধমক দিয়ে বললেন—আরে থামো ! এতটা কে বলছে তোমাকে ? তুমি সুবিধেবাদী হয়েছো, এই হলো কথা।



www.amarboi.org

ঃ সুবিধেবাদী হয়েছি ?

ঃ একশো বার হয়েছো। লড়াইটা লাগে-লাগে। শাহজাদা সরফরাজ খান তলোয়ার খুলে ফেললেন। এখন কোন্ পক্ষে যাই আমরা, কি আমাদের করা উচিত, কেউ কোন দিশে করতে না পেরে কোথায় দিলওয়ার আলী, খোঁজ-খোঁজ। ব্যস্ ! দিলওয়ার আলী লাপাত্তা ! আমরা মরলাম কি বাঁচলাম, দিলওয়ার আলীর তা নিয়ে কোন ভাবনা নেই। এরপরও কথা বলো ?

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন — তবুও যে না বলে পারছিনে চাচা ?

ঃ মানে ?

ঃ মানেটা হলো, আপনার বাপদাদারা ছাতু খেতেন ভাল করতেন। আপনি কেন খামাখা আমাদের দেখাদেখি পান্তা খাওয়া ধরলেন ? ফায়দা তো কিছু হলো না ? দেহটাও কমে গেল, মগজটাও খুললো না।

গাউস্ খাঁন গরম চোখে বললেন — এই ছোকরা, কি বলতে চাও তুমি ?

ঃ একটা গল্প বলতে চাই।

ঃ গল্প ?

ঃ জি-জি, একটা কাহানী। এককালে বদরু খাঁ নামে এক ছাতুখোর আমাদের মকানে কাজ করতো। রাস্তার দিক থেকে প্রায়ই গরু এসে আমাদের বাহির আঙ্গিনার ছোট্ট সব্জি ক্ষেতটা খেয়ে যেতো। বদরু খাঁকে সে কথা বলার সাথে সাথে সে ক্ষেত পাহারায় লাঠি হাতে রাস্তার দিকে মুখ করে ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। বদরু খাঁ দাঁড়িয়ে থাকতেই অন্য দিক দিয়ে একপাল গরু ঢুকে ক্ষেতটা খেতে খেতে তার একদম পিঠের কাছে চলে এলো। বদরু খাঁ দাঁড়িয়েই রইলো। টের পেয়ে তাকে ডেকে সে কথা বলতেই সে বললো — "নেহি সাব, এদিক দিয়ে কোন গরু ঢোকেনি।" অন্যদিক দিয়ে ঢোকার কথা বলাতে সে জবাব দিলো — "তব্ মেরা কেয়া কসুর ? এদিক দিয়ে গরু আসে, একথা বলেছেন। দুস্রা দিকের কথাতো আমাকে বলেননি?"

শরাফউদ্দীন ও শমশির খান ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিলেন। একথায় তাঁরা হো হো করে হেসে উঠলেন। গাউস্ খান সক্রোধে বললেন — এ কাহানীর অর্থ ?

ঃ অর্থ হলো, ঐযে বদরু খাঁর মাথায় একবার ঢুকেছে, ঐদিক দিয়ে গরু আসে, ব্যস্ ! সাকুল্লে ঐটুকুই তার খেয়াল। গরু যে অন্যদিক দিয়েও ঢুকতে পারে, বলে না দিলে তার মগজে তা খেলবে না। এইতো হলো ছাতুখোরের মগজ।

কপটরোষে গাউস্ খান বললেন — হুঁশিয়ার কমবখ্ত ! আমাকে অপমান ?

ঃ অপমান নয় চাচা। ওর মতো আপনিও যে সেরেফ ঐ একটা বুঝই বুঝে আছেন, সেই কথা বলছি।

ঃ মতলব ?

ঃ আমার এই গায়েব হয়ে থাকার পেছনে যে অন্য কারণও থাকতে পারে, সেটা একটুও ভাবলেন না ?

ঃ অন্য কারণ !

ঃ জি। আজরাইল মিয়া এসে যে আমাকে পাকড়াও করে তার মকানতক্ নিয়ে



www.amarboi.org

গেল, দুইদিন দুইরাত তার সাথে সমানে ধস্তাধস্তি করে যে কোন মতে ফস্‌কে এসে বাঁচলাম, সেটা তো দেখছেন না ?

সকলেই একথায় চমকে উঠে বললেন — কেয়া গজব ! সেকি–সেকি !.

দিলওয়ার আলী এবার তাঁর বাম বাহুর আস্তিন তুলে অর্ধশুষ্ক ঐ ক্ষতটা সবাইকে দেখালেন এবং সংক্ষেপে ঘটনাটা বয়ান করে শোনালেন। ঘটনা শুনে গাউস্ খান অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন — নাউজুবিল্লাহ্ ! সে কথা তো বলবে ? আমাকে মাফ করে দাও বাপ ! এতটা আমি বিলকুল ভাবিনি।

শরাফউদ্দীন প্রশ্ন করলেন — কি তাজ্জব ! তীরটা তাহলে মারলো কে ?

দিলওয়ার আলী বললেন — কে মারলো, তখন সেটা আঁচ করতে পারিনি। কিন্তু এখন তা পারছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ সুজাউদ্দীন খান সাহেব যে সসৈন্যে পেছনে পেছনে আস্‌ছেন, সেটাতো আমি জানিনে। আমাকে ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে ঐ পক্ষেরই কেউ ভেবে নিয়েছে, এই খবর আমি শাহজাদা সরফরাজ খানের কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

গাউস খান বললেন — ঠিক ঠিক, বিলকুল ঠিক।

শরাফউদ্দীন বললেন — তারাতো পেছনে রইলো। ওখানে এসে আগেই ওঁৎ পেতে বসে রইলো কিভাবে ?

গাউস্ খান ঠেশ্ দিয়ে বললেন —

ব্যস্ ! এইতো মগজের দৌড় আপনাদের। ওরা এসে বসে থাকবে কেন ? যারা ওদের ডেকে আনছে, তারা কি সবাই বেয়াকুফ ? খবরটা আগেই যাতে করে মুর্শিদাবাদে না পৌঁছে, সে ব্যবস্থা করবে না ওরা ? পথঘাট বাঁধবে না ?

শরাফউদ্দীন চিন্তা করে বললেন — হ্যাঁ, এটা হতে পারে। গাউস খান বললেন — হতে পারে নয়, এইটেই হয়েছে। শাহজাদা সরফরাজ খানের নামে সনদ আনতে লোক গেল আর তেলেসমাতি খেলের মতো কোন লোক না পাঠিয়েই সুজাউদ্দীন খান সাহেব কিভাবে তা পথের মাঝেই পেয়ে গেলেন, এটা তলিয়ে দেখছেন না ?

দিলওয়ার আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — বলেন কি ! এমনটিও ঘটেছে ?

গাউস্ খান বললেন — সেরেফ এইটুকুই ? আরো কতজনকে চোখের উপর আরো কত খেলা খেলতে দেখলাম ! এই মাত্র এসেছো। চোখকান খোলা রেখে দুইদিন অপেক্ষা করো, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে।

দিলওয়ার আলী উষ্ণ কণ্ঠে বললেন — তো আপনারা বসে বসে করলেন কি ? দু' চারটেকে শুইয়ে দিতে পারলেন না ?

ঃ কি করে দেবো ? যার মড়া সে যদি না কাঁদে, বাইরে থেকে কি করতে পারি আমরা ?

ঃ কেন. শাহজাদাও নাকি তলোয়ার হাতে নিয়েছিলেন ?

ঃ নিলে কি হবে ? তখনই যে সেটা আবার কেড়ে নেয়া হলো।

ঃ কেড়ে নেয়া হলো ! কে কেড়ে নিলো ?

ঃ মূলত তাঁর আম্মাজান আর নানীজান।



www.amarboi.org

ঃ কেন-কেন, তাঁরা তা করলেন কেন ?

গাউস্ খান বিরক্ত হয়ে শমশির খানদের বললেন—এই ছোকরাটাকে কি বোঝাবেন, বোঝান আপনারা ভাই সাহেব। এটা আবার মগজের বড়াই করে ! বিলকুল গাল্টু মাল !

শমশির খান বললেন—বুঝলেন না দিলওয়ার মিয়া ? এ লড়াইয়ে তাঁদের যে কেবলই লোকসান। কোনভাবেই লাভের আশা নেই। বিশেষ করে তাঁর আম্মাজানের কি মুসিবত দেখো, বেটা মরলে তিনি পুত্রহারা হন, খসম মরলে বিধবা হয়ে যান। কোন্ দিকে যাবেন এখন বেচারী !

বুঝতে পেরে দিলওয়ার আলী নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন—জি, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ ওদিকে আবার ইয়ার-দোস্ত-রিস্তেদারেরা সবাই ওয়ালেদের সাথে লড়াই করাটা হীন কাজ বলে বোঝালেন। বুঝে সমজে শাহজাদাকে বাধ্য হয়েই থামতে হলো।

দিলওয়ার আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—এটাও অবশ্য ঠিক। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে, শাহজাদা ঠিকই করেছেন।

গর্জে উঠলেন গাউস্ খান। বললেন—ঠিকই করেছেন ?

দিলওয়ার আলী বললেন—ঠিক নয়। শাহজাদার মতো একজন সৎ আর এলেমদার লোকের পক্ষে একাজটাতো জরুর ন্যক্কারজনক কাজই হতো।

গাউস্ খান দাঁত পিষে বললেন—আর শাহজাদার বাপের পক্ষে এটা খুব তারিফের কাজ হয়েছে বুঝি ?

ঃ চাচা !

ঃ জিন্দেগীভর দেখেছি, বাপের মুখের খানাই ছেলেরা কেড়ে খায় আর বাপেরাও মুখ থেকে বের করে তা খাওয়ায়। কিন্তু ছেলের মুখের খানা বাপ কখনো কেড়ে খায়, দুর্দান্ত দুর্ভিক্ষেও আমার নজরে এটা পড়েনি। সুজাউদ্দীন খান সাহেব এটাও দেখিয়ে ছাড়লেন।

শরাফউদ্দীন সাহেব আপত্তি তুলে বললেন—আহা, তাঁকে এমন সরাসরি দোষারোপ করছেন কেন ভাই সাহেব ? তিনি তো এখন সজ্ঞানে নেই তেমন। অনেকটা খেলার পুতুল হয়ে গেছেন। খেলোয়ারেরা যেভাবে নাচাচ্ছেন, সেইভাবে নাচছেন।

ঃ থুথু দেই ঐ নাচনে। এমন একজন বিচক্ষণ মানুষ, মতলববাজরা নাচালে আর নাচলে ? বিচক্ষণ না ছাই ! নাদান-নাদান, আস্ত একটা গিদ্ধর।

শমশির খান শংকিত কণ্ঠে বললেন—আহ্ ! থামুনতো ভাই সাহেব। তিনি এখন নবাব। দেওয়ালেরও কান আছে, একথা কি ভুলে গেলেন ?

ঃ আরে রাখুন আপনার দেয়ালের কান ! ও ভয় বুঝদীলেরা করুকগে। হক কথা বলতে এই গাউস্ খান ডরায় না।

ঃ কিন্তু আমাদের এত গোস্বা হয়ে লাভ কি খান সাহেব ? তাঁদের বাপ-বেটা শ্বশুর-জামাইয়ের ব্যাপার। ও নিয়ে আমাদের এত বুক চাপ্‌ড়িয়ে ফায়দা কি ?



www.amarboi.org

ঃ চাপড়াবো না ? নূন খেয়েছি যার, সেই মরহুম নবাবের ইচ্ছে-ইরাদার এতটা বেইজ্জতি হলো, এটা কি বুকে আমাদের বাজবে না ?

দিলওয়ার আলী পুনরায় চিন্তিত কণ্ঠে বললেন— মুসিবতের কথা ! বেইজ্জতি যা হবার তাতো হয়েই গেছে। চাচা কি এখনও তাকে নবাব বলে স্বীকার করতে নারাজ?

গাউস্ খান থামলেন। এরপর চাপা একটা নিশ্বাস ফেলে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন— আমার রাজী-নারাজে এমন কি আসে যায় বলো ? নবাব তো তিনি হয়েই গেছেন। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছায় আর তো কোন ব্যতিক্রম হবে না ?

ঃ তাহলে আর এসব কথা বলছেন কেন ?

ঃ বলছি দুঃখে। সুজাউদ্দীন খানের মতো একজন মানুষেরও এই রকম মতিভ্রম হলো ! দুনিয়াতে আর ভরসা রইলো কি ?

ঃ চাচা !

ঃ মরহুমের নূনের দক এখনোও যে গলায় এসে ধাক্কা মারছেরে বাপ !

ঃ কিন্তু নূনের মালিক তো আর মরহুম নন। মালিক এখন এই নয়া নবাব। তাঁর নূন ইতিমধ্যেই খাওয়া শুরু করেছেন আর অতপর খেতেই থাকবেন। তারও তো দক আছে ?

ঃ সে তো বটেই। আমরা হুকুমের গোলাম। যার নূন খাবো, গুণ তার গাইতে হবে জরুর। কিন্তু অতীতটাকে ভুলতে বড় তকলিফ হচ্ছে।

ঃ ভুলে যান–ভুলে যান। অতীত ছেড়ে দিয়ে বর্তমানের দিকে নজর দিন। মুলুক আর কওমটার জন্যে আমরা, এই গোলামেরা, কতটুকু কি করতে পারি, সেসব কথা ভাবুন।

ঃ আমাদের যা করার তাতো সাকুল্লে ঐ ময়দানে। আমরা ভেবে আর কতটুকু কি করতে পারি বাপজান ! রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আর পরিকল্পনার সাথে যারা সরাসরি-ভাবে জড়িত তাদের, বিশেষ করে মুসলমান নামধারীদের, ঈমানী জোশ্ আর হুঁশবুদ্ধি আল্লাহ্ তায়ালা না বাড়ালে—

কথার মাঝেই দৌড়ে এলো আসাদুল্লাহ। সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো — শিগ্গির–শিগ্গির আপনারা বেরিয়ে আসুন জনাব। নবাব বাহাদুর আমাদের সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন করতে আসছেন।

আলোচনায় ছেদ পড়লো। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সকলেই বেরিয়ে এলেন।

অকেজোর একটা বালাই— লোকে তাকে অবজ্ঞা করে। সয়ে গেলে এটাও গা কাটে না। সে তখন নির্বালাই। অকেজোর কাছে কেউ কাজের প্রত্যাশা করে না। ফলে, তার অখণ্ড অবসর ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। কিন্তু কেজোর ব্যাপার বিপরীত। আরাম তার হারাম। সে খানিকটা সুনামের হকদার হয় আর এই হকদার হওয়ার হাদিয়া দিতেই তাকে হরওয়াক্ত হয়রান হয়ে ফিরতে হয়। হাড়ে তার বাতাস পায় না। একটা কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার পুরস্কার আশরফী নয়, আর একটা শক্ত কাজের আহ্বান।



www.amarboi.org

সে পারদর্শী, কাজের লোক, অন্যকে দিয়ে পণ্ড করে কাজ নেই, এটাও সে-ই করুক। অতপর তার পরেরটাও। কাজের লোক হওয়ার এটি এক সভ্রান্ত সাজা।

দিলওয়ার আলীও এই সাজা ভোগ করলেন খানিক। সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন করার কালে নবাব সুজাউদ্দীন খানের নজরে পড়ে গেলেন তিনি। সামরিক শৃঙ্খলা, শাসনব্যবস্থা, অস্ত্রাগার-অশ্বশালার হাল হকিকত, সেপাইদের বেতন-ভাতা, নিয়ম-অনিয়ম—ইত্যাদি ব্যাপারগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কালে সন্তোষজনক কৈফিয়ত ও সুচিন্তিত সুপারিশের জন্যে দিলওয়ার আলীকেই শেষ পর্যন্ত কথা বলতে হলো। এতে করে দিলওয়ার আলীর সৎ সাহস, সামরিক ব্যাপারে তাঁর সার্বিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি জটিলতা নিরসনে তাঁর পরিচ্ছন্ন মতামত অল্পক্ষণেই নবাবকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করলো। নবাব তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। অতপর দিনমান এই তদন্ত কাজেই নয়, পর পর কয়েকদিন আধাসামরিক ও সমমানের কাজেও নবাব তাঁকে পেছনে পেছনে ঘোরালেন।

দিলওয়ার আলীর এ শ্রম বিফলে গেলো না। তিনি নবাবের প্রীতি পেলেন। উপরি পাওনা পেলেন তিনি চলমান প্রবাহের সাথে পরিচিত হওয়া এবং নবাবের মানসিকতা একান্তভাবে আঁচ করার প্রশস্ত এক মওকা। দরবার-দপ্তর-মহল তক্ নবাবের পেছনে ঘুরে ঘুরে নবাবের তৎপরতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর একটা সুস্পষ্ট ধারণা পয়দা হলো। তিনি দেখলেন, সর্বত্রই নবাব একটা সন্তোষজনক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান। নিজের প্রতি সকলের আস্থা ও শ্রদ্ধা পয়দা করতে নবাব সুজাউদ্দীন খান একান্তভাবে আগ্রহী। কাজের ফাঁকেই দিলওয়ার আলী জানলেন, স্বল্প দোষের অনেক কয়েদীকে নবাব বাহাদুর ইতিমধ্যেই মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রশাসনে বিপুল রদবদল এনে বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য লোকদের নিয়োগদান করেছেন। জায়গীরদার ও জমিদারদের মনোরঞ্জনে তিনি অনেক ছাড় দিয়েছেন এবং আরো অনেক দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে সততা ও নিষ্ঠার প্রতি সজাগ থাকার জন্যে সবাইকে কঠোর হুঁশিয়ারী শুনিয়েছেন। সামরিক শক্তির সমর্থন ও আস্থা অর্জনের জন্যে নবাব যে নিদারুণভাবে তৎপর, সামরিক ঘাঁটি তদন্তকালেই দিলওয়ার আলী তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন।

সবকিছু লক্ষ্য করে দিলওয়ার আলী বুঝলেন, নবাব সুজাউদ্দীন খান সত্যিই একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। কোলের ভাত ঝোলে ভেজানোর তামাম কায়দা জানেন তিনি। বোঝেন তিনি সময়োচিত পদক্ষেপের গুরুত্ব। তাঁর বিচক্ষণতার আরো পরিচয় দিলওয়ার আলী পেলেন মহলের এক নওকরের কাছে। এক ফাঁকে নওকরটি তাঁকে শুনালো, "নবাব হলেও হুজুরতো আমাদের আম্মা বেগমের প্রতিনিধি। এ মসনদ আর মুলুকের মূল মালিক আম্মা বেগম, মানে মরহুম নবাবের বেটি জিনাতুন নেছা হুজুরাইন। এই নবাব হুজুর নিজেই সে কথা আম্মা বেগমকে বুঝিয়ে বলেছেন। আম্মা বেগম জেনানা আদমী বলে নবাব হুজুর তাঁর পক্ষ হয়ে কাজ করছেন। এছাড়া



www.amarboi.org

আমাদের শাহজাদাকেও নবাব হুজুর খুব পেয়ার করেন। হাজার হলেও বাপ তো? এ কারণে আগে তাঁদের রাগ থাকলেও, এখন আর তা নেই। তারা এখন খুব খুশী।"

নওকরের মুখে একথা শুনে, দিলওয়ার আলী বুঝলেন, সুজাউদ্দীন খান সাহেব শুধু বিচক্ষণই নন, তিনি সুযোগ্য ও সুচতুরও বটে। শাহজাদা সরফরাজ খানের চেয়ে এ মুলুক পরিচালনায় নিসন্দেহে তিনি যোগ্যতর ব্যক্তি। সুজাউদ্দীন খান সম্বন্ধে দিলওয়ার আলীর বিরূপ ধারণা বহুলাংশে হ্রাস পেলো।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নবাবের প্রতি শ্রদ্ধা আনতে পারলেন না মারাত্মক এক কারণে। নবাবের মারাত্মক এক ভ্রান্তি ও দুর্বলতার জন্যে। তিনি প্রতিক্ষেত্রেই লক্ষ্য করলেন, হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দী খানদের প্রতি তাঁর এক স্বাভাবিক দুর্বলতা তো আছেই, তার চেয়েও বড় কথা, জগৎ শেঠ বলকিষেণ ও আলম চাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি সশব্দে শ্বাস ট্যনতেও রাজী নন। তাঁরা এটা পছন্দ করবেন কিনা, ওটা তাদের মনঃপূত হবে কিনা এ নিয়ে সবক্ষেত্রেই নবাব বাহাদুর মহাব্যস্ত। এত সুচতুর হওয়া সত্ত্বেও, এদের কাছে নবাবকে এতটা নির্ভরশীল আর এদের প্রীতি হাসিলে নবাবকে এত তৎপর দেখে, দিলওয়ার আলীর অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যথিত হলো। এ মুলুকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সামরিক বাহিনীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার কালেও সবার সামনে নবাব বাহাদুর কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে বললেন— "শেঠ বাবুদের সমর্থনের একটা প্রশ্ন আছে বটে, প্রশাসনের তাঁরা কর্ণধার ব্যক্তি আর ব্যয়বৃদ্ধির ব্যাপার এটা। তাঁদের মতের বাইরে কোন কিছুই হতে পারে না। তবু আমি বলে কয়ে যেভাবে হোক, এ ব্যাপারে তাঁদের সমর্থন আদায় করে নেবো।"

দিলওয়ার আলী সংগে সংগেই ব্যাপারটা তখন বোঝেননি। এই কয়দিন পর তিনি যা বুঝলেন তাহলো, বেগম যিনাতুন নেছার প্রতিনিধি হয়ে নন, যেন এঁদেরই প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন বাংলার বর্তমান নবাব সুজাউদ্দীন খান। এর ফলে, নবাবের বিচক্ষণতা তামামটুকুই দিলওয়ার আলীর কাছে পান্‌সে হয়ে গেল। নবাবের পিছে কয়েকদিন ঘোরার পর তিনি যখন পুরোপুরি ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেন, তখন দীল তাঁর মধুর চেয়ে তিক্ত রসেই অধিকতর সিক্ত। অন্তরে তাঁর অনুক্ষণ হতাশার এক আর্তি—হায়রে আমার দেশ! হায়রে দেশের কর্ণধার!

এই আর্তিই সেদিন তাঁকে সারাবেলা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ালো। রাতেও এ তাড়া থেকে রেহাই তিনি পেলেন না। এ নিয়ে কারো সাথে আলাপ করার মানসিকতা সেদিন তাঁর ছিল না। প্রয়োজনও ছিলো না। কারণ, যেটা তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে এলেন, যাঁদের সাথে আলাপ করবেন, পরোক্ষভাবে হলেও, তাঁর আগেই তাঁরা অনেকেই এটা জানেন।

বাহুল্য চিন্তা ঝেড়ে ফেলে রাত্রিকালে দিলওয়ার আলী শান্তভাবে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। যতবারই তিনি চিন্তার গতি অন্যদিকে ঘোরানোর কোশেশ করলেন, ততবারই ব্যর্থ হলেন। ঘুরে ফিরে ঐ চিন্তাই নিজের অজ্ঞাতে এসে


www.amarboi.org

মনজুড়ে বসতে লাগলো। রাত যখন অনেক, চারদিক নিস্তব্ধ, তখন আবার ঘি পড়লো আগুনে। অদূরে সেপাই ছাউনিতে বিবাগী এক সেপাই আপন খেয়ালে গাইছে—

"(ও তুই) সামনের দুয়ার বন্ধ করিলি—
পেছন দুয়ার রইলো খোলা,
সেইদিক দিয়ে হচ্ছে চুরি—
টের পেলিনে আপন ভোলা,
পেছন দুয়ার রইলো খোলা।।"

উদাত্ত সুর। আকর্ষণীয় বিলাপ। ঐ সুর কানে পড়তেই দিলওয়ার আলীর তামাম স্নায়ু পুনরায় সজাগ হয়ে উঠলো। তিনি কান পেতে রইলেন। এ যেন অন্য কারো বিলাপ নয়। তাঁরই আত্মার উক্তি প্রতিধ্বনীর মতো দূরে গিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠছে। গান যখন থামলো, সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে দিলওয়ার আলী কেবলই এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন।

## ৩

১০ই মহররম। কারবালার মর্মন্তুদ স্মৃতি বিজড়িত দিন। সরকারী চত্বর ছাড়া মুহররমের মাতমে মুর্শিদাবাদ শহরটা তামামই মুখরিত। বিশেষ করে শহরের মফস্বল এলাকাগুলো কাড়ানাকাড়ার আওয়াজে কয়দিন ধরে তোলপাড়। কারবালার খুনের বদলা নেয়ার আক্রোশে উন্মত্ত লাঠিয়ালরা পাল্লা দিয়ে লাঠি খেলছে মহল্লায় মহল্লায়। জংয়ের আবহ জাগরুক করে খেলার সাথে তাল দিচ্ছে কাড়ানাকাড়ার কর্ণভেদী বিরামহীন শব্দ। অলি-গলি আঙ্গিনায় আহাজারী করে ফিরছে শোকাবেগে আচ্ছন্ন মর্সিয়ার দল। মুখোমুখি দুই কাতারে দাঁড়িয়ে, কখনও বা চক্রাকারে বসে মর্সিয়ার সাথে তারা মাটি ও বুক চাপ্‌ড়িয়ে শোক প্রকাশ করছে। তলোয়ার-লাঠি-চামর হাতে উদ্ভ্রান্ত কাসেদের খণ্ড খণ্ড কাতার কয়েকদিন পথে পথে মাতম গেয়ে দৌড়িয়েছে। আজ তারা মঞ্জিলে ফিরে যাচ্ছে। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের "হায় হোসেন" আর্তনাদে পথ-প্রান্তর এখনও মূর্ছিত হয়ে আছে।

কাসেদেরা ক্ষান্ত হচ্ছে। তাদের স্থান দখল করছে তাজিয়ার মিছিল। শহীদ ইমাম হোসেন (রা)-এর মাজারের বৃহদাকার প্রতিকৃতি বা তাজিয়া কাঁধে নিয়ে কাড়ানাকাড়া সহকারে বিভিন্ন স্মৃতিচারণের দল শহরের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করছে। তাদের পিছে ঢল নেমেছে বাল-বাচ্চা, জোয়ানবৃদ্ধ, বেশুমার মানুষের। রাজপথ জনপথ সমাকীর্ণ করে নাকাড়াধ্বনী সহ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভাবগম্ভীর মিছিল। স্থানে স্থানে জমে উঠেছে আলোচনা ও দোআ খায়েরের মাহফিল। শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মসজিদে মসজিদে আনযাম করা হয়েছে বিশেষ মোনাজাতের।

সরকারী বেসরকারী তামাম চত্বরে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড স্থগিত বা স্থবির হয়ে গেছে। সকলেরই মন আজ চলমান মাতম-মর্সিয়ার দিকে। সকলেই সেইদিকে উন্মুখ।



www.amarboi.org

কেউ উন্মুখ চেতন বা অবচেতন শোকে, কেউ বা শুধুই পুলকে। নিত্যদিনের তৎপরতার প্রতি কমবেশী সকলেই আজ উদাসীন।

কিন্তু চৌকিদারের নেই শ্বশুরবাড়ী, সেপাইয়ের নেই পিতৃ শোকেও আফসোস্ করার অবকাশ। জং বাধলে বাপের লাশ জমিনে রেখে তলোয়ার হাতে ছুটতে হয় সেপাইকে। দিলওয়ার আলীও ছুটছেন। বাপের লাশ ফেলে রেখে না হলেও, কারবালার স্মরণে ভাবান্তরের কিছুমাত্র অবকাশ না রেখে। মুহররমের শিক্ষা যে ত্যাগের, মর্সিয়ার নয়, আজকের দিনে একথাটা একজনকেও বুঝিয়ে বলার ফাঁক-ফুরসুৎ না রেখে। কোন জং এখনোও বাধেনি, তবে বাধার মহড়া জোরদার হয়ে উঠেছে। দূরে এক নদীবন্দরে বিদেশী বণিকেরা, বিশেষ করে ইংরেজেরা, স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রহস্তে শান দিচ্ছে তলোয়ারে। যখন তখন তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারা। খবর পেয়েই বাংলার নবাব খবর করার ভার দিয়েছেন দিলওয়ারের উপর। দিলওয়ার আলী বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। পরিস্থিতি যাচাই করে অবিলম্বে ফিরে এসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সঠিক সুপারিশ তিনিই করতে পারবেন। এ মনীষা অনেকেরই নেই।

অতএব, দিলওয়ার আলী অশ্বপৃষ্ঠে ছুটছেন। অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর পেছনে ছুটছে দিলওয়ার আলীর সহকারী আসাদুল্লাহ ও পাঁচ-ছয়জন অশ্বারোহী সেপাই। শহর থেকে বেরিয়ে অনেক দূরের নদীবন্দরে আজকেই তিনি পৌছবেন এবং খবর করে পারলে, রাতের মধ্যেই ফিরে আসবেন,— এই হলো দিলওয়ার আলীর ইরাদা। বেলাটা বেশী নেই, তাই গতি তাঁর ক্ষিপ্র।

কিন্তু শহর থেকে বেরুতে গিয়ে অনেকবারই গতি তাঁকে খর্ব করতে হলো। গতিপথের বাঁকে মোড়ে প্রায়শঃই তাঁর সামনে পড়তে লাগলো মাতম-মর্সিয়ার জটলা। অশ্বের লাগাম টেনে ধরে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে তিনি সঙ্গী-সাথী সহকারে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এই প্রক্রিয়ায় চলতে চলতে এক স্থানে এসে তাঁকে একেবারেই দাঁড়িয়ে যেতে হলো। সামনে তাঁর তাজিয়ার এক জনাকীর্ণ মিছিল। রাজপথে তিলধারণের ঠাঁই নেই। ফাঁক নেই কোন স্থানে সূচাগ্র প্রবেশের।

দিলওয়ার আলী চিন্তায় পড়ে গেলেন। আসাদুল্লাহর এ পথে পূর্ব যাতায়াত ছিল। সে বিকল্প পথ বাত্‌লে দিলো। অগত্যা সেই বিকল্প পথ ধরলেন তিনি। অশ্বের লাগাম টেনে রাজপথ থেকে নামলেন এবং কাতারবদ্ধ দালান-কোঠার পেছন দিয়ে পায়ে হাঁটা কাঁচাপথে অশ্বচালনা করতে লাগলেন। কিছু গাছ-গাছড়া ঝোপঝাড় আর বিচ্ছিন্ন দু' চারটি কুটির-কুঁড়ের মাঝখান দিয়ে পথ। এই পথেই দল নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন দিলওয়ার আলী। আর কিছুদূর এগুলেই কয়েকটা পাকাবাড়ী এবং তারপরেই ফের রাজপথে তাঁরা উঠতে পারবেন। নীরবে তাঁরা এগুচ্ছেন। চারদিকে সরবে ধ্বনিত হচ্ছে কাড়ানাকাড়ার বোল্ আর মর্সিয়ার আওয়াজ। আসতে আসতে একতলা এক সুদৃশ্য দালান ঘরের কাছাকাছি এলেন তাঁরা। পথ এখানে দাল্যনটির একদম পেছন ঘেঁষে গেছে। রাস্তা আর দালানটির মাঝে হাতদশেক ফাঁক। গোটা দুই পাতা বিরল আম গাছ পথ থেকে এই দালান ঘরের ছাদটিকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ঐ ফাঁকাস্থান টুকুতে শংকিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে।



www.amarboi.org

ঐ দালানের কাছে আসতেই দালানটির সামনের দিক থেকে বিপুল বেগে মর্সিয়ার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো। স্পষ্ট হয়ে উঠলো মাটি ও বুক চাপড়ানোর শব্দ আর মর্সিয়ার ভাষা। বোঝা গেল, এই দালান বাড়ীর আঙ্গিনায় বা সামনেই কোথাও মর্সিয়ার দল মর্সিয়ার আসর বসিয়েছে। জনৈক গায়ক সুর করে আগে আগে মর্সিয়ার এক একটা ছত্র গেয়ে যাচ্ছে আর তার পরে পরেই তার সঙ্গীরা মাটি ও বুক চাপড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে সেই ছত্রের পুনরাবৃত্তি করছে ঃ

গায়ক ঃ "(ওই) কান্দেরে সখিনা বিবি ঘোড়ার বাগ্‌ডোর ধরিয়া—
সঙ্গীরা ঃ (ওই) কান্দেরে ....................................ধরিয়া—
গায়ক ঃ (ওই) খালি পৃষ্ঠে এলে ঘোড়া, সওয়ার কোথায় ছাড়িয়া।
সঙ্গীরা ঃ (ওই) খালি পৃষ্ঠে ................................ছাড়িয়া।
গায়ক ঃ (ওই) সখিনা কান্দিয়া বলে, কেন রাতি পোহাইল—
সঙ্গীরা ঃ (ওই) সখিনা কান্দিয়া ........................পোহাইল—
গায়ক ঃ (ওই) আমারো বিয়ার কলেমা কোন্ মওলানায় পড়াইল।
সঙ্গীরা ঃ (ওই) আমারো ....................................পড়াইল।
গায়ক ঃ (ওই) বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, রাতের শোভা চান্দোনী—
সঙ্গীরা ঃ (ওই) বাড়ীর ........................................চান্দোনী—
গায়ক ঃ (ওই) মায়ের কোলে শিশুর শোভা, নারীর শোভা সোয়ামী।
সঙ্গীরা ঃ (ওই) মায়ের ........................................সোয়ামী।"

মর্সিয়ার ঐ আবেদন দিলওয়ার আলীর দীল আকর্ষণ করলো। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি লাগামে মৃদু টান দিয়ে অশ্বের গতি মন্থর করে দিলেন। ইতিমধ্যেই দালানটির ছাদের উপর অনেকগুলো নারী কণ্ঠের হাসির ঝংকার উঠলো। এতে করে এটাও বোঝা গেল, পরপুরুষের নজর এড়িয়ে ঐ রমণীকুল নিশ্চয়ই ছাদে বসে মর্সিয়ার মাতম শুনছেন। কণ্ঠস্বরে মনে হলো, তাঁরা অধিকাংশেই তরুণী। মর্সিয়াদলের কসরত দেখেই হোক, আর অন্য কোন পুলকেই হোক, তরুণীগুলো এক সাথে খলখল করে হেসে উঠলেন। এই হাসতে গিয়ে এক তরুণী বেজায় বিষম খেয়ে কাশতে কাশতে ছাদের এই পেছন দিকে চলে এলেন। এরপর তিনি ছাদের নীচে থুথু ফেলে লহমাখানেক ওখানেই এবং ঐদিকে মুখ করেই অধমুদ্রিত নয়নে দাঁড়িয়ে থেকে দম নিলেন। মাথা তাঁর উন্মুক্ত। মুখে কোন ঢাকনা নেকাব নেই। হাসি শুনেই দিলওয়ার আলী ছাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার তিনি এই তরুণীকে একদম নিকট থেকে চোখের সামনে দেখলেন। দেখেই তিনি বিপুলভাবে চমকে উঠলেন এবং ক্ষণিকের জন্যে সম্বিত হারিয়ে ফেললেন। এ তরুণী সেই তরুণী। সেই ফৌজীপুরের মাহমুদা খাতুন। তাঁর অবচেতন মনের কোণে লুকিয়ে থাকা অনিন্দ সুন্দরী সেই চিত্তহারী নারী।

লহমাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেই মাহমুদা খাতুন চলে গেল। সে তার বিষম খাওয়ার দকেই আচ্ছন্ন ছিল। কোনদিকে লক্ষ্য করার গরজও তার ছিল না, সে অবকাশও তার ছিল না। বিষমের ধাক্কা সামলে নিয়েই সে তার পূর্ব স্থানে ফিরে গেলো এবং



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দিলওয়ার আলীর দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

দিলওয়ার আলী হতভম্ভ। অশ্বের গতি পুরোপুরি থামিয়ে দিয়ে কি করবেন, কি বলবেন, মাহমুদাকে ডাকবেন, না বাড়ীটার সামনের দিকে যাবেন—এসব কিছুই স্থির করতে না পেরে, তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একদৃষ্টে ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি বিলকুল ভুলেই গেলেন, পেছনে তাঁর সঙ্গীরা আছে এবং তারা এটা লক্ষ্য করছে।

দিলওয়ার আলী অশ্ব থামিয়ে দিতেই তাঁর সঙ্গীরাও অশ্ব থামিয়ে দিয়ে কারণটা জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। চলমান ধূয়া-আওয়াজ ও রমণীকুলের হাসাহাসি তাদেরও কর্ণগোচর হয়েছে। এমন হৈহুল্লোড় ও হাসি-উল্লাস তামাম পথই তারা শুনতে শুনতে আসছে। এর প্রতি তাদের কোন ভিন্ন আকর্ষণ ছিল না। সর্বোপরি, কিছুটা পশ্চাতে থাকার দরুন, মাহমুদা খাতুনের আবির্ভাবও নজরে তাদের পড়েনি। ছাদের দিকে চেয়ে তারা কিছুই দেখতে পেলো না। ফলে, কি কারণে তাদের দলপতি হঠাৎ এমন আওয়ারা হয়ে গেলেন, এটা বুঝতে না পেরে, তারাও নিমেষখানেক হতবুদ্ধি হয়ে রইলো। এরপর আসাদুল্লাহ্ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কি হলো উস্তাদ? থামলেন যে?

আসাদুল্লাহ্‌র ডাকে দিলওয়ার আলী সম্বিতে ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধমুখী দৃষ্টি নীচের দিকে নিয়ে স্বপ্নোত্থিতের মতো তিনি বললেন—এ্যাঁ!

আসাদুল্লাহ্ ফের প্রশ্ন করলো—কি? ব্যাপার কি?

অপ্রস্তুত কণ্ঠে দিলওয়ার আলী বললেন—না, মানে কিছু না।

ঃ তাহলে আর দেরী করছেন কেন?

ঃ দেরী?

ঃ এভাবে চলতে তো পথেই আমাদের রাত হয়ে যাবে।

অশ্বপৃষ্ঠে সোজা হয়ে বসতে বসতে দিলওয়ার আলী বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা ঠিক।

ঃ তাহলে চলুন—

ঃ হ্যাঁ, চলো—

লাগাম টানতে গিয়ে দিলওয়ার আলী ফের পেছন ফিরে বললেন—এই মকানটার কথা খেয়াল রেখো তো আসাদ মিয়া।

ঃ কেন উস্তাদ?

ঃ সে কথা পরে। এই মকানটা চিনে রাখবে, এইটে আগে বুঝে নাও।

ঃ জি আচ্ছা উস্তাদ। এ এলাকা মোটামুটি আমার চেনা।

ঃ বেশ। তাহলে এবার এসো—

দিলওয়ার আলী পুনরায় অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। তার সঙ্গীরাও আবার তাঁর পেছনে ছুটতে লাগলো। লাগাম টেনে অশ্বটাকে ইশারা দিতে লাগলেন বটে কিন্তু দিলওয়ার আলীর দৃষ্টি তখন উদাস, অন্তরে তাঁর মাহমুদা খাতুনের মুখ, মগজ জুড়ে ভিড় জমানো ফৌজীপুরের স্মৃতি।



www.amarboi.org

মাহমুদা খাতুন। ফৌজীপুরের একফালি বিদ্যুতের চমক। ফৌজীপুর থেকে আসার কালে মাহমুদা খাতুনের মুখই সারা পথ ভাস্বর ছিল দিলওয়ার আলীর অন্তরে। মুর্শিদাবাদের অবস্থাটা জানার একটা প্রবল আগ্রহ থাকলেও, মাহমুদা খাতুনের স্মৃতিই প্রবলতরভাবে তাঁর অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অতপর মুর্শিদাবাদের রাজনীতির জটিলতার আবর্তে পড়ে সে স্মৃতি তাঁর বাধ্য হয়েই অনেক নীচে তলিয়ে যায়। মাথা তোলার ফাঁক না পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে মরে যায় না বিলকুল। মাথা তোলার কসরতটা অব্যাহতই থাকে। অলক্ষ্যেও অবচেতনভাবে মাহমুদা খাতুনের কথা ইতিমধ্যেই দীলে তাঁর উঁকি দিয়েছে কয়েকবার। কিন্তু রাজনৈতিক হতাশা ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে প্রসঙ্গ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরার অবকাশ তিনি পাননি। ছাই চাপা আগুনের মতো মাহমুদা খাতুনের স্মৃতি অলক্ষ্যে তাঁর অন্তরে ধিকধিক করে জ্বলতে থাকে।

এক্ষণে সে আগুন ছাইয়ের স্তূপ ভেদ করে লকলকে শিখা বিস্তার করলো। মাহমুদা খাতুনের কথা, মাহমুদা খাতুনের সৌরভ আবার তাঁর অন্তরে মূর্ত হয়ে উঠলো। তার ছন্দময় আচরণ, নির্মল অন্তর এবং বিশেষ করে বিদায়কালে তার ঐ বিষাদমাখা মুখমণ্ডল, দিলওয়ার আলীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো আবার। মাহমুদা খাতুনের নানাজানের নামটা খেয়াল না থাকলেও, দিলওয়ার আলী মোটামুটি জেনেছিলেন, মাহমুদা খাতুনের নানাজান এখানেরই এক মসজিদের ইমাম, এই শহরেই তাঁর বসত এবং মাহমুদারাও তার নানাজানের সাথে এই শহরেই থাকেন। দিলওয়ার আলী এবার প্রায় নিঃসন্দেহই হলেন যে, ঐ একতলা মকানটাই মাহমুদা খাতুনের নানাজানের মকান এবং মাহমুদারা সবাই এখন এই মকানেই আছেন।

সহকারী আসাদুল্লাহকে মকানটি চিনে রাখতে বলার পর, কিভাবে তিনি তাঁদের সাথে সাক্ষাত করবেন এখানে, এ নিয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। অনেক পুলক-তাড়িত অনুভূতিই দীলে তাঁর উদয় হতে লাগলো। এমন অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ করে তাঁর চিন্তার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল। তাঁর খেয়াল হলো, মাহমুদা খাতুনের কি সেসব কথা মনে আছে আগের মতো ? সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুই বদলে যায়। মাহমুদা খাতুন নিজে কি তাঁকে নিয়ে অতটা আর ভাবছেন ? মাহমুদা খাতুনের অন্তরে দিলওয়ার আলীর দখল কি কিছুমাত্র আছে আর ? তা যদি না থাকে, সময়ের প্রবাহের সাথে পাল্লা দিয়ে তার ঐ ক্ষণিকের অনুভূতি যদি টিকে থাকতে না পারে, তাহলে তো এসব তাঁর তামামই আকাশ কুসুম কল্পনা। নিছকই ছাইয়ের দড়ি পাকানো ! নেতিয়ে পড়লেন দিলওয়ার আলী। এসব কথা মনে আসতেই তিনি আবার আস্তে আস্তে মুষড়ে পড়লেন হতাশায়।

এই সময় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসাদুল্লাহ বললো— কোনদিকে যাবেন উস্তাদ ? বন্দরের কাছাকাছি এসে গেছি।

সচকিত হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললো— ও হ্যাঁ, চলো, এখানকার প্রশাসনিক দপ্তরে আগে যাই। ঘাটে যাবো পরে।

মাহমুদা খাতুনের স্মৃতিচারণ বাদ দিয়ে দিলওয়ার আলী এবার কর্তব্যের দিকে সজাগ হলেন এবং দলবল সহকারে প্রশাসনিক দপ্তরের দিকে ছুটলেন।



www.amarboi.org

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বিদেশী বেনিয়াদের যে সংঘর্ষের খবর নবাব বাহাদুর পেয়েছিলেন, তা পুরোপুরি ঠিক নয়, একটা উল্টা-পাল্টা খবর। বিদেশী বেনিয়াদের সংঘর্ষটা আসলে জার্মান বেনিয়াদের সাথে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ—এরাই এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করতে চায়, আর কাউকে তারা এখানে এ ব্যবসায় আসতে দিতে নারাজ। স্থানীয় প্রশাসন জার্মান বণিকদের সহায়তা করলে অন্যান্য বণিকেরা, বিশেষ করে ইংরেজেরা, আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয় ঠিকই, তবে তখনই আবার ঐ তিন দেশীয় বণিক জোটের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়, নজর তাদের অন্যদিকে ঘুরে গেছে। জার্মানদের তাড়ানোর বেলায় একে অপরের দোস্ত হলেও, ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ—এরা কেউ কারো দোস্ত নয়, একে অন্যের গলাকাটা দুশমন। তাদের নিজের মধ্যে বিরাজমান ঐ দুশমনীটা অকস্মাৎ জোরদার হয়ে উঠায়, লাঠালাঠিটা শুরু হয়েছে তাদের মধ্যেই এবং তারা অন্যত্র সরে গিয়ে ঐ লাঠালাঠি করছে, এখানে আর কোন রকম হুড়-হাঙ্গামা নেই।

বিস্তারিত খবর করে দিলওয়ার আলী দেখলেন, সত্যিই এই ইংরেজেরা সর্বক্ষেত্রেই সর্ববিধ কুকর্মের গুরু। এদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস ক্রমেই এতটা বেড়ে যাচ্ছে যে, এ মুলুকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই এদের উপর অচিরেই শক্ত একটা আঘাত হানা প্রয়োজন। তবে সে আঘাত হানার জায়গাটা এই নদীবন্দর নয়, ইংরেজদের মূল ঘাঁটি "ফোর্ট উইলিয়াম" নামের কলিকাতার ঐ কুখ্যাত দুর্গ। ওটি উৎপাতের ও ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের এমনই একটি ঘাঁটি হয়েছে যে, অচিরেই ওটি গুঁড়িয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু কাজটি শক্ত কাজ। আভ্যন্তরীণ কোন্দলেই যারা অনুক্ষণ ব্যস্ত, তাদের দ্বারা একাজটি সম্পাদন করা কোনদিনই সম্ভবপর হবে কিনা, কে জানে!

এখানে আর আপাতত কোন পদক্ষেপ নেয়ার জরুরত নেই দেখে, দিলওয়ার আলী সেই রাত্রেই ফিরলেন না। সঙ্গী-সাথী সহকারে পরের দিন ফিরে এসে এ খবর তিনি নবাবকে জানালেন এবং অতপর ধীরে সুস্থে মকানে ফিরে এলেন।

দিলওয়ার আলীর মকানটা গড়নে সুন্দর বটে, কিন্তু ধরনে দরবেশের আখড়ার চেয়ে বড় একটা জৌলুশদার নয়। সেনানিবাসের অভ্যন্তরে পুরুষ চালিত সংসার। তাঁর ভাই একজন অনেকটা উঁচুতবকার লোক হলেও, ভাইয়ের মকানটা ভাবী সাহেবার ভাই-ভগ্নি ও আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি। ওখানে অন্যকারো প্রতিপত্তি বিলকুল অবাঞ্ছিত ব্যাপার। বরদাস্তের বিষয়বস্তু নয়। ভাইয়ের প্রভাবটাও সেখানে বহুলাংশে নিস্প্রভ। বাইরে যদিও বাঘ, তবু ভাই ওখানে বিড়াল। তাই ওখানে থেকে দিলওয়ার আলী স্বস্তির সন্ধান পাননি। নকরীতে আসার পর থেকেই এই সেনানিবাসে তিনি স্বস্তির নীড় গড়ে নিয়েছেন, যদিও নীড়বাসীদের নিয়ে তিনি অস্থির থাকেন অহর্নিশ। সংসারে তাঁর বাড়তি লোক তিনজন। বাবুর্চি নামদার খাঁ, নওকর কলিমউদ্দিন এবং একটা ঠিকে ঝি। ঝিকে নিয়ে ঝুট ঝামেলা নেই। সে এসে তার নির্ধারিত কাজ করে চলে যায়। কলিমউদ্দিনও কমবেশী কাজ পাগলা মানুষ। তার কল কালে ভদ্রে বিগড়ে। দিলওয়ার আলীর এরা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু নামদার খাঁ একাই তাঁর তাম্‌দারীর আন্‌যাম করে প্রতিদিন। নামদার খাঁ একজন পশ্চিম দেশীয় লোক। জাতে



www.amarboi.org

গোত্রে খোট্টা। গেইবা ভূট্টার ছাতু টকবোধে অনেকদিন আগেই সে বাংলার ভাত খাওয়ার জন্যে বাংলা মুলুকে আসে। বুদ্ধির অভাবে অনেক স্থানে গাট্টা খাওয়ার পর সে গড়িয়ে গড়িয়ে একদিন এই সেনানিবাসে পৌঁছে এবং সেপাইদের রন্ধনশালায় বাবুর্চি হয়ে ঢোকে। কিন্তু সেখানেও স্থান হয় না। তার রন্ধনের বাহারে সেপাইকুল ক্রন্দন রোধ করতে না পেরে, অর্ধচন্দ্র আকারে তাদের হাতগুলো নামদার খাঁর গর্দানে স্থাপন করে এবং সমবেত কণ্ঠে কুটম্বসুলভ সম্বোধনে নামদার খাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

এই সময় এই চত্বরে মুসলমান সেপাইদের আহার-বাসস্থান ও ইবাদাতখানার পরিদর্শকের দায়িত্ব দিলওয়ার আলীর উপর ছিল। দিলওয়ার আলীর নকরীর এটা প্রথম দিক। বয়সে তখন আরো বেশী তরুণ তিনি। দীল তাঁর আরো বেশী তরল এবং আবেগটা আরো বেশী উষ্ণ। সেপাইদের কাছে আক্কেল সেলামী লাভ করার পর নামদার খাঁ এসে দিলওয়ার আলীর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে—হজৌর হামার কি হোবে?

হকচকিয়ে গিয়ে দিলওয়ার আলী বলেন—কি হোবে মানে?

নামদার খাঁ বলে—হাম্ কাঁহা যায়েগা, কাঁহা রহেগা, আউর নোকরী কাঁহা মিলেগা?

ঃ নকরী না পাও, নিজ মুলুকে নিজের মকানে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে কাজের তালাশ করোগে।

ঃ হামার কুয়ী মকান-উকান নেই হজৌর।

ঃ আত্মীয়-স্বজন-রিস্তেদার তো আছে। তাদের কাছে যাও—

ঃ কেহ্ নাই হজৌর। বিলকুল হামি একা।

ঃ তাহলে আর ভাবনা কি? টুকিটাকি একটা কিছু করলেই তো তোমার একটা পেট চলে যাবে। এর জন্যে নকরীর কি জরুরত?

ঃ তব্ হামার 'বহু'র ছাছুড়ি কি খাবে? উও আউরাত তো বিলকুল মর্ যায়েগা হজৌর।

ঃ 'বহু'র ছাছুড়ি!

ঃ হামার 'জরু'র ছাছুড়ি।

দিলওয়ার আলী ধাঁধাঁয় পড়ে যান। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—'জরু'র ছাছুড়ি মানে? তোমার বউয়ের শাশুড়ি?

ঃ হঁ হজৌর। ওহি বাত্ ঠিক।

ঃ তাজ্জব! তোমার বউয়ের শাশুড়ি মানে তো তোমার আম্মা?

ঃ নেহি হজৌর, আম্মা নেহি। হামার বহুর ছাছুড়ি। হামার আব্বা আম্মা কুয়ী আদমী জিন্দা নাই। বহুত আগারী তামাম মৌত্ হৈ গৈল্।

ঃ তাহলে? ঐ শাশুড়িটি কে?

এই শাশুড়ির যে ব্যাখ্যা নামদার খাঁ দেয়, তা শুনে দিলওয়ার আলী হো হো করে হাসবেন, না নামদার খাঁর গালে কড়া একটা থাপপড় মারবেন, দিশে করতে পারেন



www.amarboi.org

না। তার 'বহু'র ছাছুড়ি হলেন নামদার খাঁর স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর আম্মা। তার স্ত্রী কুলসুমকে যারপরনেই ভালবাসতো নামদার খাঁ। কিন্তু নামদার খাঁ আলাভোলা লোক হওয়ায়, কুলসুম তাকে তেমন ভালবাসতো না। সে মহল্লার এক চতুর লোকের পাল্লায় পড়ে যায়। এতে করে, একদিন নামমাত্র অছিলায় সে নামদার খাঁর সাথে চরমভাবে ঝগড়া শুরু করে এবং শেষ অবধি তালাক দাবী করে। কুলসুমের দজ্জালপনায় অস্থির হয়ে নামদার খাঁও ক্রোধের বশে তৎক্ষণাৎ তাকে তালাক দিয়ে ফেলে। আর পায় কে ? কুলসুম তখন খোশদীলে গিয়ে ঐ চতুর আদমীটাকে নিকাহ্ করে বসে। কিন্তু এই দুস্‌রা খসমের সাথে কয়েকদিন ঘর করার পরই ভুল ভাঙ্গে কুলসুমের। তার এই দুস্‌রা খসম সেরেফ চতুরই ছিল না, সে ছিল মাতাল ও খন্নাস আদমী। প্রায়দিনই সে কুলসুমকে বেদম প্রহার করতে থাকে এবং অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে থাকে। নামদার খাঁর কদর এবার বুঝতে পারে কুলসুম। লোক মারফত খবর দিয়ে সে নামদার খাঁকে জানায়, নামদার খাঁ রাজী থাকলে, এই খসমের তালাক নিয়ে সে আবার নামদার খাঁকে নিকাহ করতে আগ্রহী।

এই খবরেই নামদার খাঁর সাবেক মুহব্বত উথলে উঠে। সে অধীর আগ্রহ নিয়ে তার স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার এন্তেজার করতে থাকে। নামদারের নসীবটা প্রথম দিকে তার খুবই সহায় হয়। তালাকের অপেক্ষা তাকে অধিককাল করতে হয় না। খন্নাসপনা করতে গিয়ে কুলসুমের দ্বিতীয় খসম শিগ্গিরই খুন হয় এবং কুলসুম ফের বিধবা হয়। পরিষ্কার হয় পথ। কিন্তু নামদার খাঁর নসীবটা এই শেষের দিকে এসে আবার হঠাৎ করে বেঈমানী করে বসে। ইদ্দতকাল পার না হতেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কুলসুম বিবি তার দুস্‌রা খসমের পশ্চাদধাবন করে এবং তার পিছেপিছে পরলোকে চলে যায়। তার দুস্‌রা খসমের কবরের পাশেই তাকে কবর দেয়া হয়। কুলসুমের এই দ্বিতীয় স্বামীর বৃদ্ধা মাতার তিন কুলে কেউ ছিল না। বুড়িটা কুলসুমকে জার্‌রা ভালবাসতো। তাই মৃত্যুর আগে কুলসুম বিবি নামদার খাঁকে ডেকে বলে, "নিকাহ্ তো আমাদের হলো না, তোমার পেয়ারও আর পেলাম না। পারলে আমার এই শাশুড়িটাকে একটু দেখো। বেচারীর কেউ নেই। হয়তো না খেয়েই মারা যাবে।"

ব্যস্ ! বিবিকে ফিরে না পাওয়ার ব্যথায় নামদার খাঁ বিবির এই শাশুড়িটাকেই আঁকড়ে ধরে এবং অতপর এই শাশুড়িটার ভরণ-পোষণের মধ্যে দিয়েই নামদার খাঁ তার সেই কেটে পড়া পত্নীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে থাকে। সেই পত্নীর অন্তিম ইচ্ছেকে পরম মূল্য দিয়ে তখন থেকেই নামদার খাঁ নানাস্থানে নকরী করে বেড়াতে থাকে এবং মাহিনাটা গোটাই তার "বহু'র ছাছুড়ির" নামে পাঠাতে থাকে। এতে কেউ প্রতিবাদ করলে সে জারজার হয়ে কেঁদে বলে, এটা তার পত্নীর অন্তিম ওয়াক্তের ইচ্ছা, তাকে কেটে ফেললেও এ ইচ্ছার ব্যতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ধন্য পত্নী প্রেম!

দিলওয়ার আলী এত খবর তখনই জানতে পারেন না। তখন শুধু জানতে পারেন, তার 'বহুর ছাছুড়ি' মানে তার স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর আম্মা এবং তার ভরণ-



www.amarboi.org

পোষণ করাটা নামদার খাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় কাজ। এতে দিলওয়ার আলী একই সাথে তাজ্জব ও বিরক্ত হন। তিনি নামদার খাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু নামদার খাঁ নাছোড়া বান্দা। তার ঐ এক ধূয়া "হুজৌর হাম কাঁহা যায়েগা ? হামার বহুর ছাছুড়ি কিয়া খায়েগা ?" দিলওয়ার আলীর পা আর সে ছাড়ে না। দিলওয়ার আলীর দীলও তখন খুব কাঁচা। ঘটনাটা যা-ই হোক, একটা এতিম বুড়ি অনাহারে মারা যাবে, এ চিন্তা মনে আসায় রাগটা তার পড়ে যায়। অবশেষে নামদার খাঁর হাত এড়াতে না পেরে তাকে তিনি নিজের মকানেই নিয়ে আসেন। একজন বাবুর্চির প্রয়োজনও তাঁর ছিল। নামদার খাঁকে এনে তিনি নিজের মকানেই বাবুর্চি পদে বহাল করেন।

সেই থেকেই নামদার খাঁ তাঁর মকানেই আছে এবং বাবুর্চিগিরি করছে। তার পাক খেতে গিয়ে দিলওয়ার আলীও সেই থেকে অনেক বিপাকে পড়েছেন। রন্ধনের স্বাদে ক্রন্দনের উদ্রেক তাঁরও অনেকবার হয়েছে। তবুও নামদার খাঁ তাঁর মকানেই আছে এবং বাবুর্চি হয়েই আছে। কারণটা শক্ত কারণ। কাজে তার অনেক গলদ থাকলেও, দীলে তার তিল পরিমাণ গলদ নেই। ওটি দুগ্ধবৎ শুভ্র। সে অত্যন্ত সরল ও বিশ্বস্ত। তার উপরও কথা, ভাল মানুষ পেয়ে সে অল্পদিনেই দিলওয়ার আলীকে তার আত্মার সাথে এমনইভাবে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে যে, দিলওয়ার আলীই এখন তার বাপ, দিলওয়ার আলীই তার মা, ভাই-বেরাদর পুত্র-কন্যা একাধারে দিলওয়ার আলীই সব। তার 'বহুর ছাছুড়ি'কে মাহিনা পাঠানোর অভ্যাসটা সে ধরে রাখে। ইতিমধ্যে সে বুড়িও ইন্তেকাল করায় নামদার খাঁ এ দুনিয়ার তামাম দিক ছেড়ে দিয়ে একমাত্র দিলওয়ার আলীকেই আঁকড়ে ধরেছে সবলে। দিলওয়ার আলীই এখন তার অবলম্বন ও উল্টাভাবে এখন আবার নামদার খাঁ-ই দিলওয়ার আলীর বাপ, দিলওয়ার আলীর মা, দিলওয়ার আলী তার নয়নমণি। তার সামনে দিলওয়ার আলীর গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড় কাটবে, নামদার খাঁর জ্ঞান থাকতে তা হবার নয়। দিলওয়ার আলীর ঐ কয়দিন বেখবর থাকার সময়টা নামদার খাঁ প্রায় অনাহারেই কাটিয়েছে। দিলওয়ার আলীর নিজের ও তাঁর সংসারের ভালমন্দের দায় যেন আর দিলওয়ার আলীর নয়, তামাম দায় নামদার খাঁর একার। নামদারকে তাড়ায় কে ?

দুধেল গাইয়ের লাথি কারো গায়ে লাগে না। নামদার খাঁর গলতি তেমনি দিলওয়ার আলীর গা-সহা। তার কাজের গলতি দিলওয়ার আলী এখন আর তেমন ধরেন না। তবে তাঁর মেজাজটা খাট্টা হয় নামদার খাঁ বিগড়ে গেলে। এ দোষটা নামদার খাঁর আছে। সংসারটার কিছুমাত্র ক্ষতি হওয়া দেখলে বা দিলওয়ার আলীর বদনামীর কোন কথা কানে পড়লে, নামদার খাঁ আর মেজাজটা ধরে রাখতে পারে না। সেই সাথে আছে তার এক বাড়তি রাগ। সে রাগটা ভজন সিং এর উপর। ভজন সিং সেপাই ছাউনির হিন্দু সেপাইদের বাবুর্চি বা পাচক। সে সেখানে দিব্যি হালে আছে। কিন্তু নামদার খাঁর নসীবে সেখানে গলাধাক্কা জুটেছে। নামদার খাঁর ধারণা, রন্ধনের কায়দাটা ভজন সিং ইচ্ছে করেই নামদার খাঁকে বাতলে দেয়নি আর তার রন্ধনের গলতিটা ভজন সিংই ধরিয়ে দিয়েছে বলে সেখানে তার বাবুর্চির পদ টেকেনি। ভজন



www.amarboi.org

সিং এরও বুদ্ধি কম, মেজাজ কড়া। ফলে, তুচ্ছতম কারণেই এই দুইয়ের মধ্যে লড়াই বাধে মাঝে মধ্যেই। এদের মধ্যে শত্রুতারও শেষ নেই, ওদিকে আবার এই দুইয়ের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও এ দুনিয়ায় বিরল। দুইজনই এরা পশ্চিম দেশীয় লোক। একই এলাকার মানুষ। জাতে গোত্রেও দুইজনই এরা খোট্টা। লড়াইকালে দুইজনই এরা দুইজনকে জড়িয়ে ধরে। কারো একটু আঘাত লাগলে অন্যে আবার ওখানে বসেই সে জায়গাটা মালিশ করে।

তাদের সে লড়াইটা হঠাৎ করেই বেধে গেল আবার। বন্দরের ঐ খবরটা নবাবকে পৌছে দিয়ে দিলওয়ার আলী মকানে ফিরে আসতেই খানিক দূর থেকে দেখেন, ভজন সিং ও নামদার খাঁ নাম ডাক জাহির করে গর্জন করছে সমানে এবং পরস্পর পরস্পরকে হামলা করার জন্যে কাছা-আস্তিন গুটাচ্ছে। লড়াইটা শুরু হলো অতি তুচ্ছ কারণে এবং নিতান্তই কথাচ্ছলে। নামদার খাঁ অন্দরে কর্মরত ছিল। সেপাই ছাউনি থেকে ঘরে ফেরার কালে ভজন সিং কি এক খেয়ালে ব্যস্তপদে দিলওয়ার আলীর মকানের কাছে এলো এবং ফটকের এপার থেকে নামদার খাঁর উদ্দেশ্যে হাঁক শুরু করলো — আবে হৈ ইয়ার, কাঁহা গৈল্ হো —

ভজন সিংয়ের গলা শুনেই নামদার খাঁ সোল্লাসে জবাব দিল — হৈ, আন্দারমে হো। না গৈল্ কাঁহা —

ঃ বাহার আ যাও ইয়ার, তুহার সাথে মজাদার বাত্ আছে। কুছু খিস্তির বাত্ —

ঃ হাইরে বাবা। ঠারো-ঠারো, হাম আসি গৈল্ তুরুৎ —

নামদার খাঁ দৌড়ের উপর ফটকের বাইরে এলো এবং ভজন সিংকে জড়িয়ে ধরে অভিমান ভরে বললো — বহুৎ রোজ হো গৈল্ ইয়ার, তু আর ইধার আসিলেক নাই। দরছন না হৈল্।

জবাবে ভজন সিং সহাস্যে বললো — হারে ইয়ার, তুহার ছরন নাইরে বা ! দো-রোজ হাম আসিলেক নাই সাচ্। দো-রোজ বহুত রোজ না হোবে জরুর।

খেয়াল হতেই নামদার খাঁ শরম পেয়ে বললো — হাইরে বা ! হাঁ-হাঁ। হাম বেভুল হো গৈল্ ইয়ার।

নামদার খাঁর বাহুবন্ধন ছাড়াতে ছাড়াতে ভজন সিং বললো — এক জব্বোর বাত্ আছে ইয়ার। একঠো দিগ্‌দারীর বাত্।

ঃ সাচ্ ? তব্ কহো-কহো —

ঃ এক ছালে সেপাই নোক্‌রী করিছে হিঁয়াপর। উহার তামাম ধান্দা আছে, বহুর ধান্দা নাই।

ঃ বহুর ধান্দা !

ঃ হাঁ-হাঁ। গিদ্দর লোগ্ মকানে বহু ছোড়্‌কে আসি নোক্‌রীকে বহু বানাই লইছে। আস্‌লী বহু খারিজ।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা !

ঃ কেত্তাদিন হো গৈল্, ওহি সেপাই মালুম। ছালে লোগ্ মকানে ওয়াপস্ না গৈল্।



www.amarboi.org

ঃ এহি বাত ?

ঃ হাঁ ইয়ার। দেখিয়া দেখিয়া বহু আখুন উহার মরদের তালাশে লোগ্ ভেজিয়া দিয়াছে।

ঃ লোক ভেজিয়া দিয়াছে ?

ঃ কি করিবে, তুম কহো ? মরদ বহুর খবর করিলো না। তাই বহু আখুন উহার মরদের তালাশ করিতেছে।

ঃ বুড়াবাত্-বুড়াবাত্ ! তু কাঁহাছে এহি খবর ছুনিলেক্ বটে ?

ঃ হাই ভাগোয়ান ! বহু যাহারে ভেজিয়া দিয়াছে, ওহি আদমী ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে হামার কাছে আসি গৈলো। বহুর চিট্‌ঠি দেখাই হামারে কহিল— "এহি সেপাই লোগ্‌কে পয়চান করিয়া দাও, হামি উহারে চিট্‌ঠি দেবে হামি কহিল— "চিট্‌ঠি হামারে দাও, দপ্তরে ভেজিয়া দিবেক বটে। দপ্তর উহারে ঢুঁড়িবে।" লেকেন দিলেক নাই। কহিল, জেনানা লোগ্ চিট্‌ঠি দিয়াছে, উহা তুহারে দেবেক কেনে ? ওহি সেপাইকে পয়চান করিয়া দাও।"

ঃ আচ্ছা !

ঃ হামি উহারে কাঁহা পাইবে, কহো ? ছালে সেপাই তো হিন্দু না আছে, মুসলমান আদমী আছে। মুসলমান সেপাইদের তো হামি জিয়াদা পয়চান না হৈরে বা ? হামি বহুর ঐ লোগ্‌কে ভাগাই দিলাম বটে।

ঃ ভাগাই দিলে বিলকুল ?

ঃ দিলাম তো ঠিক। লেকেন কোম্‌লা ছোড়িবেক তো কোম্‌লী ছোড়িবেক নাই। উও লোগ্ দুস্‌রা দিকে ঢুঁড়িতে গৈলো, হামি চলিয়া আসিল।

ঃ হারে বাবা ! ওহি সেপাই মুসলমান ?

ঃ হাঁ-হাঁ। ছালে বেঈমান সেপাই।

ঃ বেঈমান ?

ঃ জরুর। বহু ঢুঁড়িবে আউর ছালে মরদ বসিয়া মউজ্ করিবে ? উও বেঈমান তো জরুর।

নামদার খাঁর অনুভূতিতে ঘা লাগলো। সে নাখোশ কণ্ঠে বললো— নেহি-নেহি। ওহি সেপাই তব্ মুসলমান না আছে ইয়ার। কেহু দুস্‌রা লোগ্ আছে।

ভজন সিং সবিস্ময়ে বললো— দুস্‌রা লোগ্ !

ঃ আলবত্। মুসলমান না আছে।

ঃ হারে বা। হামি ছুনিয়া লইলো, ওহি সেপাই মুসলমান, আর তু হামারে ঝুটা বানাই দিবেক ?

ঃ হাঁ-হাঁ, দিবেক বটে।

ভজন সিং তেতে উঠলো। বললো — কেয়া কাহা ! হাম ঝুটা লোগ্ ?

ঃ বিলকুল ঝুটা। ওহি লোগ্ কভ্‌ভি মুসলমান না হোবে।

ঃ আলবত্ মুসলমান।



www.amarboi.org

ঃ হরগিজ নেহি। তু ছালে বানোয়াট কাহানী ছুনাই দিলেক।

ঃ হুঁশিয়ার নামদার ! বানোয়াট কাহানী। কিস্ লিয়ে বানোয়াট হো গৈল্, কহো?

নামদার খাঁ সরবে বলে উঠলো — মুসলমান কভ্ভি বেঈমান না হোবে, বেঈমান কভ্ভি মুসলমান না হোবে। উও ছালে দুস্‌রা জাত হোবে জরুর।

ঃ দুস্‌রা জাত হোবে ! তব্ উহার নাম মুসলমান নাম কেনে হোবে, কহো।

ঃ মুসলমান নাম ! কেয়া নাম, বাতাও ?

ঃ ওহি সেপাইয়ের নাম দিলওয়ার আলী।

নামদার খাঁ গর্জে উঠে বললো — খামুশ্ ভোজ্‌না —

ভজন সিং সক্রোধে বললো — কেনেরে ? তু হামারে ডর দেখাইবেক কেনে ?

ঃ ওহি সেপাইয়ের নাম দিলওয়ার আলী না আছে।

ঃ না আছে ?

ঃ কেহু দুস্‌রা আলী আছে।

ঃ তাজ্জব ! হর বাত্‌মে দুস্‌রা ! যো লোগ্ ঢুঁড়িতে আসিল ওহি লোগ্ কহিল, বহুর মরদের নাম দিলওয়ার আলী। সেপাই দিলওয়ার আলী তু ছালে হামারে বুড়া বাত্ বুলিবেক কেনে ?

ঃ আলবত্ বুলিবেক। ওহি নাম হামার হজৌরকা নাম। হজৌরের নামে বদনামী দিবি তো হামি তুহারে ছাড়িয়া দেবেক নাই, হাঁ।

ঃ তুহার হজৌর কা নাম হৈল্, কি তুহার ভাগোয়ানকা নাম হৈল, উতে হামার কোন্ ঠেকা হো গৈল্ রে নাম দারিয়া ? হামি জানিয়া লইছে, ওহি সেপাইয়ের নাম দিলওয়ার আলী। ব্যস্ ! পান্‌ছো বার দিলওয়ার আলী। ওহি ছালে বেঈমান দিলওয়ার আলী জরুর।

নামদার খাঁ লাফিয়ে উঠে বললো — ঠাহার যা ভোজ্‌না, ফির বুলিবেক নাই।

ভজন সিংও সবিক্রমে বললো — আলবত্ বুলিবেক।

ঃ বুলিবেক নাই —

ঃ বুলিবেক–বুলিবেক —

ঃ হুঁশিয়ার ভোজ্‌না —

ঃ খবরদার নাম দারিয়া ! বুলিলে তু কিয়া করিবেক, কহো ?

ঃ মগুরী চালাইবেক। মুদ্‌গরিয়া গাট্টা লাগাইবেক।

ভজন সিং লাফ দিয়ে সামনে এসে বললো — রামকা কিরিয়া ! তুহারে হামি ছাতু বানাই দিবেক জরুর।

ঃ রহিম কা কছম ! তুহারে হামি ময়দা বানাই ছাড়বেক, হাঁ !

ঃ নাম দারিয়া —

ঃ ভোজ্‌না —

ঃ জয় হনুমানজি —

ঃ ইয়া আলী —

উভয়ে উভয়ের উপর পড়ে পড়ে, এই মুহূর্তে দিলওয়ার আলী সেখানে এসে



www.amarboi.org

হাজির হলেন এবং ধমক দিয়ে দুইজনকে দুইদিকে সরিয়ে দিলেন। দিলওয়ার আলীকে দেখে দুইজনই চুপ্সে গেল এবং ভেজা বেড়ালের মতো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দিলওয়ার আলী সক্রোধে বললেন — কি ব্যাপার ? ফের হলো কি তোমাদের ?

উভয়েই নীরব। দিলওয়ার আলী ধমক দিয়ে বললেন — চুপ্ রইলে যে ? জবাব দাও ?

ভজন সিং কাঁচুমাচু করে বললো — গল্‌তি হো গৈল্ হজৌর !

ভজন সিং ফের নীরব। দিলওয়ার আলী এবার নামদার খাঁকে প্রশ্ন করলে, সেও ঐ একই কণ্ঠে বললো — সিরেফ্ গল্‌তি হো গৈল্ !

সেই গল্‌তিটা কি, এটা বের করতে দিলওয়ার আলীকে বেগ পেতে হলো। ওরা দুইজনই জড়িয়ে পেঁচিয়ে যা বললো, তা বিশ্লেষণ করে দিলওয়ার আলী অবশেষে বুঝলেন, তাঁর নামেরই এক সেপাইয়ের বিবি তার খসমের খোঁজে একটি খত সহ লোক পাঠায় লোকটা এসে ভজন সিং-এর সামনে পড়ে। ভজন সিং সেই সেপাইকে না চেনায় লোকটাকে বিদায় করে দেয় এবং সে কাহিনী এসে নামদার খাঁকে বলে। সেপাইটা তার বিবির খবর রাখে না জেনে ভজন সিংয়ের রাগ হয় এবং সে ঐ সেপাইয়ের উদ্দেশ্যে বদ জবান বলে। কিন্তু সেই সেপাইয়ের নাম দিলওয়ার আলী হওয়ায়, নামদার খাঁ তার হজৌরের নামের বদনামী বরদাস্ত করতে পারে না। ফলে, এই লড়াইটা শুরু।

ঘটনাটা বুঝতে পেরে দিলওয়ার আলী সহাস্যে নামদার খাঁকে বললেন — তা এতে ভজন সিং-এর কসুরটা কোথায় ?

এবার নামদার খাঁ সখেদে বললো — কছুর নাই ? উ তো হজৌরের নামে বদনামী দিলেক বহুত্।

ঃ আরে, আমার নামে বদনামী দেবে কেন ? দিলওয়ার আলী নামের সেই সেপাইটার বদনামী করেছে।

ঃ উ নাম তো আপ্‌কা নাম হজৌর।

ঃ আরে পাগল ! দিলওয়ার আলী নামটা কি এ দুনিয়ায় সেরেফ আমার একার নাম ? এই নামের আরো কত লোক আছে।

ঃ হজৌর !

ঃ আমাদের এই ঘাঁটিতে হাজার হাজার সেপাই আছে। তাদের মধ্যে যে আরো কয়জনের নাম দিলওয়ার আলী, তার ঠিক কি ?

নামদার খাঁ এবার চিন্তিত কণ্ঠে বললো — তব্ তো হামার গল্‌তি হো গৈল্ ? আখুন হামি কি করিবেক বটে !

এরপর সে ভজন সিংকে উদ্দেশ্য করে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললো — আবে তু বোল্‌না ইয়ার, আখুন হামার কাম কি আছেরে বা ?

ভজন সিংও চিন্তিত কণ্ঠে বললো — গল্‌তি তো হামারও ভি হো গৈল জরুর। হামি কেনে উ নামের বদনামী করিলেক ?



www.amarboi.org

ঃ তব্ ?

ঃ আ-যাও ইয়ার, সিনা মিলাও। ঝামেলা ছাফ হৈ যাইবেক।

ঃ হাঁ-হাঁ, ওহি বাত্ ঠিক।

উভয়ে উভয়কে আবেগ ভরে জড়িয়ে ধরলো। এদের আচরণ দেখে দিলওয়ার আলী কেবলই মনে মনে হাসতে লাগলেন। অতপর তারা দিলওয়ার আলীর কাছে মাফ চাইতে এলে দিলওয়ার আলী সহাস্যে বললেন— যুগ যুগ জিয়ো।

পরের দিন দিলওয়ার আলী তার সহকারী আসাদুল্লাহ্কে ডেকে বললেন —আসাদ মিয়া, আমার সে কথাটা কি মনে আছে ?

আসাদুল্লাহ্ উৎসুক হয়ে বললো— কোন্ কথা উস্তাদ ?

ঃ ঐ যে গত পরশু নদী বন্দরে যাওয়ার পথে বলেছিলাম, এই মকানটা চিনে রাখো, খেয়াল আছে ?

আসাদুল্লাহ্ উৎসাহ ভরে বললো— জ্বি-জ্বি, খেয়াল থাকবে না কেন উস্তাদ ? বলুন, কি করতে হবে ?

ঃ ওখানে যে যেতে হয় একবার ?

ঃ আমি তৈয়ার। বলুন, গিয়ে কি করবো ?

ঃ খোঁজ নিয়ে দেখবে, ও মকানটা কোন ইমাম সাহেবের মকান কিনা। আর ওখানে আবিদ হোসেন সাহেব নামের কোন মুরুব্বী লোক আছে কিনা।

ঃ থাকলে ?

ঃ তাঁকে বলবে, ফৌজীপুরে আহত হয়ে যে দিলওয়ার আলী আপনাদের মকানে ছিল, সে আপনাদের সালাম জানিয়েছে এবং সে আপনাদের সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী।

ঃ তারপর ?

ঃ কবে আর কখন গেলে আমি তাঁর সাক্ষাত পাবো, এটাও জেনে আসবে ?

ঃ জি আচ্ছা উস্তাদ। সেরেফ এইটুকুই, না আর কোন কথা আছে ?

ঃ না, আর তেমন কি কথা ? তবে মকানে তাঁরা সবাই সহি-সালামতে আছে কিনা এটা জেনে নেবে আর মাহমুদা খাতুন এবং তাঁর আম্মাকে আমার সালাম পৌছাতে বলবে।

ঃ মাহমুদা খাতুন !

ঃ হ্যাঁ। মাহমুদা খাতুন আর তাঁর আম্মাকে।

ঃ জি আচ্ছা-জি আচ্ছা।

বলেই আসাদুল্লাহ ফের ইতস্তত করে বললো— তা ওঁরা কারা উস্তাদ ? ঐ মা-মেয়ে দুইজন ?

ঃ ওঁরা ঐ মকানেরই লোক।

ঃ ওঁদের আপনি চেনেন ?

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন— চিনবোনা কেন ? ওঁরাও তো আমার জন্যে অনেক করেছেন।



www.amarboi.org

ঃ মানে !

ঃ কি ব্যাপার ! ভুলে গেলে সে কথা ? আমার ঐ দুর্ঘটনার কথা তো সবই শুনেছো ? তীর বিদ্ধ হয়ে ফৌজীপুরে আমি যে মকানে আশ্রয় পেয়েছিলাম, মানে যাঁরা আমাকে মকানে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করেছিলেন, ওঁরাও সেই মকানের লোক। ঐ মা-মেয়ে দুইজনই আমার অনেক যত্ন নিয়েছিলেন।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আসাদুল্লাহ্ বললো—বলেন কি উস্তাদ ! এই ব্যাপার ? তা উনারা আবার এখানে, মানে এই শহরে এলেন কি করে ?

ঃ এখানেই তো থাকেন ওঁরা। ঐ ফৌজীপুরে উনারা তখন বেড়াতে গিয়েছিলেন।

ঃ আচ্ছা ! তাহলে ঐ মকানটাই তাঁদের মকান ?

ঃ সেইটেই তো তোমাকে জেনে আসতে বলছি। এই শহরে কোন্ মকানে থাকেন তাঁরা, সেটা আমি জানিনে।

ঃ তাজ্জব ! তাহলে কি করে আপনার ধারণা হলো যে, এই শহরে এত মকান থাকতে ঐ মকানই তাঁদের মকান হতে পারে আর উনারা ওখানে থাকতে পারেন ?

দিলওয়ার আলী ঈষৎ হেসে বললেন—ঐ মকানটার ছাদের উপর মাহ্মুদা খাতুনকে সেদিন আমি দেখলাম যে ?

আসাদুল্লাহ্ পুলক বিস্ময়ে বললো—এ্যাঁ-সেকি !

ঃ তোমরা কিছুটা পেছনে ছিলে, তাই দেখতে পাওনি। আমি তাঁকে ঐ ছাদের উপরই দেখলাম সেদিন।

ঃ মা'শাআল্লাহ ! তাই কি আপনি ঘোড়াটা থামিয়ে দিয়ে ঐ ছাদের দিকে তাকিয়েছিলেন ?

দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে বললেন—জ্বি।

ঃ কি কাণ্ড–কি কাণ্ড ! তাহলে তখনই তাঁকে ডাক দিয়ে জেনে নিলেন না কেন ?

ঃ সে ফুরসুৎ পেলাম কৈ ? মাহ্মুদা খাতুন হঠাৎ একটু ছাদের এদিকে এসেই আবার যে তখনই ফিরে গেলেন।

ঃ ডাক দিতেন তাঁকে ?

ঃ পাগল। ঐ হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আমার ডাক কি তিনি শুনতে পেতেন, না সমীচিন হতো সেটা ?

ঃ কেন হতো না উস্তাদ ?

ঃ আরে ! উনারা আমার উপকার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু উনারা বা উনি আমার কোন আত্মীয়ও নয়, আর ডাকাডাকি করার মতো তেমন কোন জোরদার সম্পর্কও নেই। সম্পর্ক বলতে এইটুকু যে, উনারা আমার উপকার করে ছিলেন। সামনে থাকলে তাঁদের কুশলটা জিজ্ঞেস করতে পারতাম। কিন্তু সেরেফ সে কারণেই একটা মেয়ে-ছেলের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাঁকি করাটা কি বেত্তমিজী হতো না ? এত উৎসাহ দেখানোও তো দৃষ্টিকটু লাগতো।

আসাদুল্লাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তা অবশ্য ঠিক।

একটু থেমে আসাদুল্লাহ ফের কৌতুহলী হয়ে উঠে বললো—আচ্ছা উস্তাদ, একটা প্রশ্ন করবো ?



www.amarboi.org

আসাদুল্লাহর কৌতুলটা আঁচ করে দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে বললেন— একটা কেন, দিলে প্রশ্ন থাকলে দশটা করো।

ঃ আপনি গোস্বা হবেন নাতো ?

ঃ কি তোমার প্রশ্ন তা না জেনে আগেই সেটা কি করে বলি ?

ঃ আমি ঐ মেয়েটার ব্যাপারে দু' একটা প্রশ্ন করতাম উস্তাদ। গোস্বা না হয়ে জবাব দিলে খুশী হতাম।

দিলওয়ার আলী এই আন্দাজই করেছিলেন। চকিতে তিনি একটু অপ্রতিভ হলেন। সংগে সংগে নিজেকে সামলে নিয়ে মুচ্‌কি হেসে বললেন— আচ্ছা করো তো দেখি—

ঃ মেয়েটার বয়স কত উস্তাদ ?

দিলওয়ার আলী বুঝলেন, আসাদুল্লাহর পুলকটা ছোট-খাটো নয় এবং অল্পতে নিবৃত্ত হবারও নয়। তাই রশিটা ঢিলে করে দিয়ে সহজ কণ্ঠে বললেন— সেটা জানবো কি করে ? আমি কি তাঁর জন্ম তারিখ জানি ? তবে উনি একজন যুবতী, এইটুকু বলতে পারি।

ঃ আচ্ছা। তা উনি কি বিবাহিতা, না অনূঢ়া উস্তাদ ?

ঃ অনূঢ়া, মানে কুমারী।

ঃ চেহারা কেমন উস্তাদ ? মানে তাঁর সুরাতটা—

ঃ অপূর্ব—তোফা ! ওরকম খুব সুরাতের আউরাত গোটা এই শহরটায় আর দু' চারটে আছে কিনা সন্দেহ।

ঃ মা'শাআল্লাহ ! তা উনিও আপনার খেদমত করেছিলেন, তাই নয় উস্তাদ ?

ঃ জরুর করেছিলেন।

ঃ খুব আন্তরিকতাও দেখিয়েছিলেন বোধ হয় ?

ঃ খুব—খুব। গভীর আন্তরিকতা নিয়েই আমার খেদমত উনি করেছিলেন।

ঃ সোবহান আল্লাহ ! তাহলে উস্তাদ আর একটা প্রশ্ন করি ?

আসাদুল্লাহর উৎসাহ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। দিলওয়ার আলী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন— করো।

ঃ তাঁকে কি আপনার ভাল লেগেছে উস্তাদ ?

ঃ কেন লাগবে না ? ভাল লাগার মতোই যে মেয়ে উনি।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ ! এই মেয়েটার সাথে যদি উস্তাদের শাদি হয়, তাহলে কেমন হয় উস্তাদ ?

ঃ চমৎকার হয়।

ঃ মারহাবা ! মারহাবা ! তাহলে এই মেয়েকেই শাদি করুন না উস্তাদ ?

ঃ শাদি করবো ?

ঃ করবেন না ? আপনার যখন এতটা পছন্দের মেয়ে—

দিলওয়ার আলী ভেতরে ভেতরে উষ্ণ হয়ে উঠছিলেন। এবার তিনি বিদ্রূপের সুরে বললেন— তখন আর আমার আপত্তি করার কি আছে, এইতো ?

আসাদুল্লাহ আপন জোশে বললো— জ্বি উস্তাদ, জ্বি।



www.amarboi.org

ঃ কিন্তু আসাদ মিয়া, আসমানের চাঁদটাও যে আমার খুব পছন্দের। ওটাকে পেতেও যে আমার খুব ইচ্ছে হয়।

আসাদুল্লাহ্ থতমত করে বললো — উস্তাদ !

ঃ চাঁদের দিকে তাকালে মনে হয়, ওটাও আমার দিকে তাকাচ্ছে। তুমি একটু চেষ্টা করে ওটাও আমার হাতে এনে দাও না ?

ঃ সেকি উস্তাদ ! তাই কি সম্ভব ?

দিলওয়ার আলী জ্বলে উঠলেন। তপ্ত কণ্ঠে বললেন — তাহলে তুমি কি করে ধারণা করো যে, আমি ইচ্ছে করলাম আর অমনি মাহমুদা খাতুনকে শাদি করে ফেললাম ? তিনি কি রাস্তার কোন লাওয়ারিশ বস্তু ?

ঃ উস্তাদ !

ঃ তোমাকে আমি খুব বুদ্ধিমানই মনে করতাম। তোমার বুদ্ধি যে এতটা কম, তা কখনো ভাবিনি।

ঃ কেন উস্তাদ ?

ঃ একজনকে যেই কিছুটা ভাল লাগলো আর অমনি তাকে শাদি করে ঘরে আনলাম, এ ধরনের ছাড়পত্র কি দুনিয়ার সবাই আমাকে দিয়ে রেখেছে, না ঐটিই আমার একমাত্র কাজ আর স্বভাব ?

ঃ না — মানে, কথা হলো —

ঃ তাঁদের মেয়ের শাদি তাঁরা কোথায় দেবেন, মাহমুদা খাতুন কার প্রতি অনুরক্ত আছেন, আমি তাঁদের আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা, এসব খবর কোন কিছু না জেনেই, এ খোয়াবটা মাথায় তোমার এলো কি করে ?

ঃ উস্তাদ।

ঃ তাঁরা আমাকে মুসিবতে সাহায্য করেছেন, আমাকে মেহেরবানী করেছেন, একজন ইনসানের মুসিবতে আর একজন ইনসানের যতখানি দরদ দেখানো উচিত, তাই তাঁরা করেছেন। এখানে কৃতজ্ঞ হওয়ার বদলে শাদির চিন্তা ছাপপড় ফেঁড়ে আসে কি করে ?

ঃ না, আমি বলছিলাম, শাদিটাতো করতেই হবে তাই —

ঃ উৎসাহ খাটো করো আসাদ মিয়া। যেটুকু জেনে আসতে তোমাকে বলেছি ঐটুকুই জেনে এসো। ঐ ফালতু খেয়াল টেনে এনে তাঁদের কাছে আমাকে অকৃতজ্ঞ বানিও না।

ঃ জি আচ্ছা উস্তাদ।

আসাদুল্লাহ্ মাথাটা নীচু করলো। মুখে হাসি টেনে দিলওয়ার আলী বললেন — নাখোশ হলে ?

ঃ জিনা–জিনা।

ঃ আসাদ মিয়া, যখন যে কাজটা আশু করার দরকার, তখন চিন্তাকে সেই কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। অহেতুক বাড়তি প্রসঙ্গ টেনে আনলে সে কাজটা সুষ্ঠু হয় না বরং পরিস্থিতিটা ঘোলাটে হয়।



www.amarboi.org

ঃ জি উস্তাদ, বুঝতে পেরেছি।

ঃ আচ্ছা, তাহলে এবার যাও—

খবর করে আসাদুল্লাহ ফিরে এলো। সে এসে দিলওয়ার আলীকে মলিন মুখে জানালো, ও মকান কোন ইমাম সাহেবের মকানতো নয়ই, ওর আশেপাশের কোন মকানও কোন ইমাম সাহেবের নয় এবং ও মহল্লার কোন লোকই কোন মসজিদে ইমামতি করেন না। আবিদ হোসেন সাহেব নামের কোন লোককেও তাঁরা জানেন না বা চেনেন না। বরং ওখানকার অনেকেই আসাদুল্লাহকে বলেছেন, "আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন, অন্যদিকে খোঁজ করুন গে।"

খবর শুনে দিলওয়ার আলী অবাক হয়ে গেলেন। ওখানকার কোন মকানই তাঁদের মকান না হলে মাহমুদা খাতুন ওখানে ঐ ছাদের উপর এলেন কি করে ? দেখতে তো এক বিন্দুও ভুল হয়নি তাঁর। একদম কাছে থেকে সরাসরি দেখলেন। চিনতেও কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, দেখামাত্রই চিনলেন। তবু ও মকান বা আশেপাশের কোন মকানই তাঁদের নয়—একি ভেল্কিবাজী !

চিন্তা করে দিলওয়ার আলী খেই করতে পারলেন না। নিজের মকান না হলেও কোন আত্মীয় বা ইয়ার বান্ধবের মকান তো হতে হবে জরুর। আর সে ক্ষেত্রে তাঁদের কাউকে না কাউকে অবশ্যই ওখানকার লোক চিনবে ! দিলওয়ার আলী অবশেষে বুঝলেন, এর মধ্যে রহস্য কিছু আছে এবং কোনদিন যদি তাদের সাথে সাক্ষাত ঘটে তার, একমাত্র সেইদিনই এ রহস্য উদ্ঘাটন হওয়া সম্ভব। এখন এ চিন্তা অর্থহীন।

দিলওয়ার আলীর উৎসাহ তরল হয়ে গেল। মাহমুদা খাতুনকে নিয়ে তাঁর খোয়াব দেখার তেমন কোন উৎসাহ আর রইলো না। পূর্বের অনুভূতিটাই আবার জোরদার হয়ে উঠলো। ঐ সামান্য কয়দিনের স্মৃতি নিয়ে মাহমুদা খাতুন আজও বসে থাকবেন তাঁর চিন্তায়, এটা কোন যুক্তিসংগত কথা নয়। তাঁর ঐ সাময়িক অনুভূতিটা যে সময়ের সাথেই ফিঁকে হয়ে যাবে, এইটেই স্বাভাবিক। দিলওয়ার আলীর এ আধিক্য একতরফা এবং সংগত কারণেই এটা হাস্যকর।

দিলওয়ার আলী থেমে গেলেন। এ চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি শক্ত দীলে স্থির করলেন, সৌজন্য সাক্ষাত একটা হওয়া উচিত আর তা ঠিকানা যখন আপৃছে আপ্ জানা যাবে, তখন হলেই চলবে। বড়জোর, ফৌজীপুরের দিকে আবার কোনদিন যাওয়ার কারণ ঘটলে, সেখানে গিয়ে তিনি এঁদের এই শহরের ঠিকানাটা জেনে নেবেন আর ইতিমধ্যে পথেঘাটে অন্য কোন ইমাম সাহেবের সাক্ষাত পেলে মাহমুদা খাতুনের নানাজানের খবর জিজ্ঞেস করে দেখবেন। তিনি ছেদ টানলেন মাহমুদাকে নিয়ে অহেতুক এই চিন্তা বিলাসে।

কিন্তু এ রোগ বড় কঠিন রোগ। গাঝাড়া দিলেই এ রোগ অমনি গা থেকে নামে না। দিলওয়ার আলীরও নামলো না। অতপর কয়েকদিন তিনি মনমরা হয়েই রইলেন। করণীয়গুলো সবটুকুই ঠিকঠাক করে গেলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা নাই-নাই ভাব অনুক্ষণই জাগরুক হয়ে রইলো। কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা



www.amarboi.org

অনুভূতি, কিসের একটা অভাব, বলা যায় না বুঝা যায় না—এ ধরনের কি একটা অতৃপ্তি তাঁর দীলটাকে ঘিরে রইলো দিন কয়েক। কি তাঁর ছিল, কি তাঁর নেই, সজাগ হয়ে খুঁজতে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ অজ্ঞাতে-অসাবধানে অচেনা এক শূন্যতা তাঁর মনের কোণে অহর্নিশ ঘুর ঘুর করতে লাগলো। এভাব তাঁর আগে কখনো ছিল না। ফৌজীপুরে তাঁর ঐ অবস্থানের পর থেকেই এই থাকা না থাকার অনুভূতিটা জন্মলাভ করেছে এবং সেই থেকেই লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে সক্রীয় হয়ে আছে।

কাজ সেরে দিলওয়ার আলী দপ্তর থেকে বেরুলেন। ফাঁকা-উদাস মন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি অন্য চত্বরে এলেন এবং সেনানায়ক গাউস খানের দহলীজে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। আড়াল ও নিভৃত স্থানে গাউস খানের দহলীজ। সেখানে তখন ঝড় বইছে রাজনৈতিক বিক্ষোভের। দিলওয়ার আলী দেখলেন, বিক্ষোভের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি রাজপুত বিজয় সিংহ। সেনানায়ক বিজয় সিংহ গরম প্রসঙ্গ তুলে গাউস খানের দহলীজটা গরম করে ফেলেছেন। সে আগুনে খড় দিচ্ছেন সেনানায়ক গাউস খান, শমশির খান, মীর কামাল, মীর সিরাজউদ্দীন, সভাসদ হাজী কোরবান আলী ও আরো কয়েকজন সেনানায়ক। সবাই তাঁরা বক্তা। শ্রোতা নেই একজনও। দিলওয়ার আলী এসে এক কোণে চুপচাপ শ্রোতা হয়ে বসলেন।

প্রসঙ্গটা নবাব সুজাউদ্দীন খানের প্রশাসনিক কার্যকলাপ। তাঁর প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও আচরণ বিধি। আলোচ্য বিষয় বুঝতে পেরেই দিলওয়ার আলী আকৃষ্ট হলেন। বাস্তবিকই সুলতানের পদক্ষেপগুলো একেবারেই সামঞ্জস্যহীন এক তাল-বেতালের গোলক ধাঁধা। মস্‌নদ লাভের পর তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথেই পুত্র সরফরাজ খানকে বাংলার দেওয়ান, পুত্র মুহম্মদ তকী খানকে উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার ও জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীকে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) সহকারী সুবাদার বানিয়ে উভয় প্রদেশে সর্বোচ্চপদে নিজের লোককে বসালেন এবং এতে করে যথার্থই দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তামাম ক্ষমতা অন্যখানে অর্পণ করে এদের তিনি ক্ষমতাহীন নামসর্বস্ব শাসনকর্তায় রূপান্তরিত করলেন। জগৎ শেঠ, বলকৃষ্ণ, হাজী আহম্মদ, আলীবর্দী, আলম চাঁদ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নবাব সুজাউদ্দীন খান একটি প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করলেন এবং রাজ্য চালনার সার্বিক ক্ষমতা এদের হাতে ন্যস্ত করলেন। নবাব, দেওয়ান ও সহকারী সুবাদারদের নামমাত্র মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে এই পরিষদই প্রকৃতপক্ষে এ মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে রাজ্য চালনা করতে লাগলো।

পরিহাসের এখানেই শেষ নয়। সেই সাথে এই পরিষদের প্রতিটি ব্যক্তিকে এতটাই তিনি ক্ষমতাশালী করে তুললেন যে, শেষে এঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যাওয়ার কোন উপায়ই আর নবাব ও তাঁর পুত্র-জামাতার রইলো না। এঁদের মন-মেজাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলো তাঁদের প্রত্যেককে।

আলম চাঁদ ছিলেন উড়িষ্যায় সুজাউদ্দীন খানের মুহুরী বা গৃহস্থালীর হিসাব রক্ষক। উড়িষ্যা থেকে এনে নবাব তাঁকে ক্ষমতায় তুলতে তুলতে অতি অল্পদিনেই এত উপরে তুললেন যেন রাজ্যের তিনি অন্যতম ভাগ্যবিধাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। নবাব তাঁকে বাংলার নিজামতের (ফৌজদারী শাসন বিভাগের) দেওয়ান ও



www.amarboi.org

এক হাজার জাঠ সৈন্যের মনসবদার বানিয়ে "রায় রায়ান" নামের এমন এক উপাধি বা খিতাবে তাঁকে ভূষিত করলেন যে, না কোন উজির, না দিওয়ানী ও নিজামতের কোন ব্যক্তি অদ্যতক এ খিতাব ভূষিত হওয়ার কিস্‌মত লাভ করেছেন। এ খিতাব এক সার্বভৌম ও অবিসংবাদিত ক্ষমতার প্রতীক এবং সে ক্ষমতার অধিকারী আলম চাঁদ প্রকৃতপক্ষেও ছিলেন।

ফতে চাঁদ জগৎ শেঠ বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক তো ছিলেনই, তার উপর ছিলেন তিনি সমুদয় জামদরিদের (যাঁরা ছিলেন প্রায় সকলেই হিন্দু) নেতা ও গুরু। ফলে, জমিদারদের আনুগত্য পাওয়ানা-পাওয়াটা তাঁর মর্জির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাঁর ক্ষমতা আকাশচুম্বি হয়ে গেল।

এদিকে হাজী আহম্মদ ও তদীয় ভ্রাতা আলীবর্দীর হাতে রইলো তলোয়ারের বাঁট। তাঁরা রইলেন সামরিক শক্তির নেতৃত্বে। উল্লেখ্য যে, তখন তাঁরা সকলেই প্রবীন লোক। নাতী-নাতনীর মানুষ। হাজী আহম্মদ, আলীবর্দী, নবাব সুজাউদ্দীন সকলেই। শাহজাদা সরফরাজ খানও তখন একজন শ্বশুর, কোন নয়া জামাতা নন। হাজী আহম্মদ তখন জোয়ান জোয়ান তিন আওলাদের ওয়ালেদ আর আলীবর্দী খান সাবালিকা তিন কন্যার পিতা। আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের সাথে তিন কন্যার শাদি দিয়ে ভাইয়ের সাথে আলীবর্দী খান আরো অধিক একাত্ম হলেন। তলোয়ারের বাঁটটা প্রায় সবটুকুই রইলো আলীবর্দীর তিন জামাতা বা হাজী আহম্মদের তিন আওলাদের হাতে। বড় আওলাদ নওয়াজিস্‌ মুহম্মদ নবাবের সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষ বা আরিজ পদে নিযুক্ত হলেন। সমুদয় সামরিক ব্যক্তির বেতন ও ভাগ্যোন্নয়ন গেল নওয়াজিস্‌ মুহম্মদের হাতে। মেঝো আওলাদ মীর্জা সাইদ আহম্মদ রংপুর ও ঘোড়াঘাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। কনিষ্ঠ আওলাদ মুহম্মদ হাশেম ওরফে জয়নুদ্দীন হলেন আকবর নগর অর্থাৎ রাজমহলের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর একস্থানের ফৌজদার।

আলম চাঁদ, জগৎ শেঠ, ফতে চাঁদ, বলকৃষ্ণ, আলীবর্দী ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ শক্তিশালী ব্যক্তিরা এক একজন একাই যেখানে একশো আর এক একটা মহারথী, সেখানে এদেরই সমন্বয়ে নবাব সুজাউদ্দীন খান এক 'প্রশাসনিক পরিষদ' গঠন করে রাজ্য চালনার সার্বিক ক্ষমতা এঁদের উপরই অর্পণ করলেন। এঁদের এই সম্মিলিত শক্তিকে আর রুখেই বা কে এবং এঁদের ডিঙ্গিয়ে নবাবের নবাবীত্ব আর থাকেই বা কতটুকু? আরো যা তাজ্জব ব্যাপার তাহলো, নবাবের নবাবীত্ব নিয়ে খোদ নবাবই তেমনটি উদগ্রীব নন, যতটা উদগ্রীব তিনি অবসর ও বিলাসিতার মওকা নিয়ে। কার গোহালে কে দেয় ধোঁয়া।

নবাবের এই উদ্ভট পদক্ষেপ আর মনমানসিকতা নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে সেনানায়ক বিজয় সিংহ সখেদে বলে উঠলেন—আমি বুঝতে পারিনে, নবাবের এই কিসিমের দায়িত্বহীন আচরণ সত্ত্বেও অনেকেই জারজার কণ্ঠে বলেন, নবাব সুজাউদ্দীন খান একজন অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি। শাহজাদা সরফরাজ খানের চেয়ে তাঁর ওয়ালেদ একজন সুযোগ্য শাসনকর্তা সেরেফ মজাক করা ছাড়া এই উক্তির সার্থকতা কোথায়, তাতো আজ পর্যন্ত তালাশ করে পেলাম না?



www.amarboi.org

সেনানায়ক শমশির খান উদাস কণ্ঠে বললেন—তা বটে !

বিয়জ্জ সিংহ বললেন—অন্যেরা যে যা বলে বলুক, আপনারাও কেউ কেউ যখন বলেন, নবাব তাঁর বিচক্ষণতার জন্যেই মসনদে আসতে পেরেছেন, তাঁর আওলাদের মতো সহজ-সরল আর নরমদীলের মানুষ হলে পারতেন না, তখনই আমি তাজ্জব না হয়ে পারিনে। এটা আপনাদের দীলের কথা, না তামাসার কথা, এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

সেনানায়ক মীর কামাল বললেন—তামাসা হবে কেন ? তাঁর বিচক্ষণতার জন্যেই তো যাঁদের সাথে যোগ দিলে তিনি মসনদে আসতে পারবেন—অর্থাৎ জগৎ শেঠ, বলকৃষ্ণ, রঘুনন্দন প্রভৃতি মুর্শিদাবাদের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সাথে তিনি আগে থেকেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যা তাঁর আওলাদ সরফরাজ খান হতে পারেননি।

বিয়জ্জ সিংহ ফুঁশে উঠে বললেন—ব্যস্ ! স্বগোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে কোন মোরগের শেয়ালের সাথে সখ্যতা করাকে বিচক্ষণতা বলেন ?

ঃ কেন–কেন, একথা বলছেন কেন ?

ঃ কেন বলবো না ? এই গোষ্ঠীর সাথে সখ্যতা করে মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খান কি মাশুলটা দিলেন, তা কেন খেয়াল করছেন না ? এত পিরীত সত্ত্বেও কিভাবে মরহুমের ইচ্ছেটার তাঁরা ঘাড় মটকিয়ে দিলেন, এটাতো স্বচোক্ষেই দেখলেন সবাই। এঁরা ডেকে না আনলে আর এঁরা মদদ না দিলে সুজাউদ্দীন খান সাহেবের কি সাধ্য ছিল উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে মসনদ দখল করেন ? নিমক খেয়ে মরহুমের সাথে কি নিমক হারামই না করলেন তাঁরা ? তাঁর ইচ্ছেটাকে যেভাবে দু' পায়ে মাড়িয়ে গেলেন, সেটা কি কম আফসোসের কথা ?

গাঝাড়া দিয়ে উঠে সেনানায়ক গাউস খান সংগে সংগে বললেন—আপনিই বলুন সিং মশাই, একথাটা আপনিই বলুন। আমি বললে এঁরা বলবেন, ওসব বাপ-বেটা শ্বশুর-জামাইয়ের ব্যাপার, এ নিয়ে আমাদের এত আফসোস করার কি আছে ?

বিজয় সিংহ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আরে–আরে সেকি ! মরহুম নবাব আমাদের নকরী দিলেন, নূন খাওয়ালেন, কিসের জন্যে ? তাঁর ইচ্ছে-আদেশ পালন করবো আমরা, এই জন্যেই তো ? তাঁর সাথে বেঈমানী করবো আমরা এই জন্যেই কি তিনি আমাদের নূন খাওয়ালেন বসে বসে ?

মীর সিরাজউদ্দীন আফসোস করে বললেন—আমাদের বেঈমানীটা এখানে দেখলেন কোথায় সিংহ মহাশয় ? বেঈমানীই হোক আর ঈমানদারীই হোক, কোন কিছু করার কি কোন মওকা পেলাম আমরা কেউ ? না সে মওকা দেয়া হলো আমাদের ? নিজেরাই তাঁরা আপোষ করে নিলে আমরা করবো কি ?

ঃ করার কিছু ছিল না বলেই কি আমরা স্নান করে তামাম ঋণ ধুয়ে মুছে ফেলবো ? দীলে আমাদের আফসোস্টাও থাকবে না ?

গাউস খান আবার সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন—বলুন, আপনিই বলুন। এঁরা নাকি সবাই চোখা মগজের দানেশমান্দ আদমী। অথচ এই সহজ কথাটা এঁদের কাউকে সমঝে দিতে পারিনি। এঁরা বলবেন, ভুলে যান—ভুলে যান, অতীত ভুলে যান। বলুন দেখি সিং মশাই, এটা কি ভুলে যাওয়ার ব্যাপার ?



www.amarboi.org

ঃ কখ্খনো নয়, আলবত্ নয়। নবাব সুজাউদ্দীন খানের এখন নূন আমরা খাচ্ছি, তাঁর সাথে বেঈমানী কখনোও আমরা করবো না, এটাও যেমন ঠিক, তেমনই আমাদের আসল লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত কখনো হবো না, এটাও তার চেয়ে আরো বেশী ঠিক।

শমশির খান বললেন — আসল লক্ষ্য !

ঃ আলবত্ আসল লক্ষ্য। শাহজাদা সরফরাজ খানের বদলে তাঁর ওয়ালেদ এসে মসনদে বসেছেন বলেই আমরা চুপ্চাপ্ মেরে আছি — ভাল কথা। কিন্তু তাঁর পরেও যদি শাহজাদার মসনদ লাভে বিঘ্ন ঘটে, তবু আমরা চুপ্চাপ্ মেরে থাকবো, এই কি আপনারা ভাবেন ? না এইটেই আমাদের ঈমানদারী ? তাঁর মসনদ লাভের জন্যে অর্থাৎ মরহুম নবাবের ইচ্ছেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে লড়তে হবে না আমাদের ? আর সে জন্যে চোখ-কান খুলে রাখতে হবে না ? বিলকুল ভুলে থাকলে চলবে ?

মীর সিরাজউদ্দীন জোশ্ভরে বললেন — না-না, কখ্খনো তা চলবে না। জরুর না।

ঃ আমরা আগে শাহজাদার লোক, তার পরে তাঁর ওয়ালেদের।

ঃ একশো বার।

দিলওয়ার আলী এতক্ষণ চুপ্চাপ্ শুনছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন — সেই লড়বেনটা কার বিরুদ্ধে সিংহ মহাশয় ? নবাব সুজাউদ্দীন খান সাহেবের নবাবী খতম হলে তখন তো আর তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার গরজই কিছু থাকবে না।

বিজয় সিংহ বললেন — তাঁর বিরুদ্ধে কেন ? শাহজাদার মসনদ লাভে এরপরও যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে।

দিলওয়ার আলী কটাক্ষ্য করে বললেন — পারবেন তো ?

বিজয় সিংহ সবিস্ময়ে বললেন — তার মানে ?

ঃ এরপরও যদি মসনদের জন্যে কেউ শাহজাদার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তাহলে যাদের বলে সুজাউদ্দীন খান সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের বলেই দাঁড়াবেন। তখন আপনি পারবেন তো ?

ঃ বুঝলাম না। পারবো না কেন ?

ঃ তারা কিন্তু আপনাদের জাত-ধর্মের লোক।

ঃ আরে ব্যস্রে ! তাতে কি হয়েছে ? জাত-ধর্মের কেন, আমার নিজের ভাইই যদি বেঈমান হয়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমার সংকোচটা কোথায় ?

ঃ সংকোচটা এইখানে যে, ভাইয়ের সেই বেঈমানীটা যদি আপনাদের স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে হয়, তখন আপনার ভূমিকাটা কি হবে ? ভাইয়ের বিপক্ষে যাবেন, না তার পক্ষ নেবেন ?

ঃ আপনার ইঙ্গিতটা আঁচ করতে পারছি। কিন্তু খোলসা করে না বললে কোন মন্তব্য করতে পারছিনে।

ঃ দুর্বোধ্যও তো তেমন কিছু নয় সিংহ মহাশয় ? এই যে যারা মুনিবের নিমক খেয়ে নির্দ্বিধায় মুনিবের সাথে নিমকহারামী করেছে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুজাউদ্দীন খানকে মসনদে এনে বসিয়েছে, শাসন দণ্ডকে মজবুত হতে না দিয়ে যারা অন্তর্দ্বন্দ্ব



www.amarboi.org

জিয়িয়ে রাখছে, সোজা পথে না চালিয়ে প্রশাসনকে যারা অহরহ ঘোলাটে করে তুলছে, সেটা যে সেরেফ বিনা উদ্দেশ্যে নয়, এটা কি খুবই দুর্বোধ্য কিছু ?

বিজয় সিংহ বললেন—তা এটাকে এত জড়িয়ে পেঁচিয়ে বলছেন কেন নওজোয়ান ? তারা যা চায় তা কি আর কারো বোঝার বাঁকী আছে ? একমাত্র আমাদের এই নবাব ছাড়া, একটা পথের লোকও মন-মতলব ধরে ফেলেছে তাদের। কিন্তু তারা যেটা চায় সেটাতো নিতান্তই এক আত্মঘাতী ব্যাপার আর এ মুলুক আর মাটির সাথে নির্জলা বেঈমানী। বাংলার মসনদ দখল করার মুরোদও তাদের নেই, দখল করলেও তা ধরে রাখার হিম্মতও তাদের নেই। মাঝখান থেকে বানরের পিঠা ভাগ করার মতোই এ মুলুকটা তারা অন্যের মুখে তুলে দেবে, তাদের মুখে উঠবে না।

ঃ বলা কি যায় ? গড়ে পড়ে এসে তাদের মুখে উঠতেও তো পারে ? তাহলে তো আপনাদেরই তখন জয় জয়কার আর আপনার স্বজাতির পোয়াবারো।

ঃ আমি ধিক্কার দেই ঐ জয় জয়কারে।

ঃ কেন-কেন, আপনাদের রাজত্ব কায়েম হলে আপনি সেজন্যে ধিক্কার দেবেন কেন ? এ চেষ্টা তো একদিন আপনারও মানে রাজপুতেরাও কম করেননি ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ মুসলমান শাসন উৎখাত করার জন্যে আপনারা অর্থাৎ রাজপুতেরাও একদিন কম লড়েননি ?

ঃ জরুর কম লড়িনি। লড়ার মতো রুচিকর আর বীরোচিত পরিস্থিতি হলে আজও কম লড়বো না। কিন্তু বেঈমানী করা আর চুরি করা জয় নিয়ে যে যতই গৌরব করুক, এই বিজয় সিংহ সেটাকে ন্যক্কারজনকই মনে করে।

ঃ বলেন কি !

ঃ আরে ভাই, বুঝতে পারছেন না কেন ? সেই জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুর শাহ এ মুলুকে আসার পর থেকেই আমরা আপনাদের মুসলমান শাসন উৎখাত করার জন্যে দীর্ঘদিন যাবত প্রাণপণে লড়াই করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি হেরে গেছি। ব্যস্ ! মিটে গেছে।

ঃ মিটে গিয়ে কি থেকেছে কখনো ? আপনাদের রাজপুতেরা সামনা সামনি ক্ষান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু গোপনে কি তাদের তৎপরতা চলেই আসছে না সেই থেকে ?

ঃ অবশ্যই আসছে আর এখানেই আমার আপত্তি। এই সমস্ত রাজপুতদের নিয়ে আমি এক ফোঁটাও গৌরববোধ করিনে। তাদেরকে আমি রাজপুত জাতির কলংকই মনে করি।

ঃ তাজ্জব !

ঃ রাজপুত জাত বীরের জাত, চোরের জাত নয়। বেঈমানের জাতও নয়। ওরা রাজপুত জাতির মুখে থাবা থাবা কালী ছিটিয়ে দিয়েছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ সামনা সামনি লড়াই করে যখন পারলিনে, তখন হয় চুপ থাক, নয় লড়াই করে বীরের মতো মৃত্যু বরণ কর। এ দু'টোর কোনটাই না করে যাদের দুশমন ভাবলি তাদের সাথেই গিয়ে দোস্তী করে বস্‌লি। বোন-বেটি তাদের হাতে তুলে দিয়ে শালা-



www.amarboi.org

সম্বন্ধী-শ্বশুর হোলি, নকরী কবুল করলি। ব্যস্। করলি কর, দোস্ত হয়েই থাক। এ পর্যন্তও তেমন একটা দোষ ধরতে যাবো না। কিন্তু ইজ্জত দিয়ে যাদের সাথে আত্মীয়তা পাতালি, গোপনে আবার তাদের পিঠেই ছুরি মারার ষড়যন্ত্র করিস কোন্ পৌরষে? রাজপুত কি এতটাই কাপুরুষ জাত? দোস্তি হবে তো দোস্তি হবে, দুশমনী হবে তো দুশমনী হবে। এর মধ্যে নোংরামী কেন?

ঃ কিন্তু সিংহ মহাশয়, আপনাদের শাস্ত্রই নাকি বলে, "মারি অরি ছলেকি কৌশলে।" আরো নাকি বলে, রণে আর প্রেমে জালিয়তি করা জায়েজ।

ঃ শাস্ত্রে যাই বলুক, এটাতো সত্য যে, পায়খানা পায়খানাই। যে উপলক্ষেই ঐ মল গায়ে মাখুন না কেন, 'বদ্-বু' ওটা ছড়াবেই, আতরের মতো 'খোশবু' কখনো ছড়াবে না।

ঃ কিন্তু তবুতো আপনাদের শাস্ত্রকারেরা—

ঃ তাঁরা কি ভেবেছিলেন তা তাঁরাই জানেন। কিন্তু এটা বোধহয় তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবেননি যে, যে উদ্দেশ্যেই হোক, নোংরামীকে একবার আমদানী করলে আর প্রশ্রয় দিলে, ওটা ঐ রণ আর প্রেমের চত্বরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ক্রমেই ওটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করবে।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আপনারা আমাদের মহাভারত পড়েছেন কিনা জানিনে। কুরুক্ষেত্রের রণে কিঞ্চিৎ জালিয়তি বা অপকৌশল অবলম্বন করার দায়ে আমাদের ধর্ম-রাজ যধিষ্ঠির তো যধিষ্ঠির, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকেও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং হেনস্থা হতেও হয়েছে।

ঃ সিংহ বাবু!

ঃ থাক সে কথা। আমার কথা হলো, আপনাদের শাসন যদি কেড়ে নিতে চাই, তাহলে আপনাদের নকরী করবো কেন? নূন খাবো কেন? নকরীতে ইস্তফা দিয়ে গিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করবো এবং বাঘের মতো এসে আপনাদের ঘাড়ের উপর পড়বো। পারি পারবো না পারি মরবো। চুরি করার দক্ষতাকে কে কবে বাহবা দেয় আর চোরের বউয়ের ডাংগর গলার কে কবে তারিফ করে?

মুগ্ধ কণ্ঠে সকলেই এক সাথে বললেন—মারহাবা! মারহাবা!

বিজয় সিংহ বললেন—আমরা মরু অঞ্চলের লোক। ভাত খাইনে, রুটি খাই আর তাই আমাদের বুদ্ধি কম বলে আপনারা উপহাস করে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধি আমাদের যত কমই হোক, এটুকুই আমরা বুঝি যে, যার নূন খাবো তার খুন খাবো না। যার খুন খাইতে চাইবো, তার নূন কখনোও পেটে ঢুকতে দেবো না।

সবাই বললেন—সাব্বাস্।

ঃ শাহজাদার নানাজানের নূন খেয়েছি, আমার জান থাকতে শাহজাদার খুনতো কখনো খাবোই না, কেউ খাওয়ার কোশেশ করলে লড়াই করে খতম হয়ে যাবো, তবু জান থাকতে কাউকে তা খেতে কখনো দেবো না। তা বুদ্ধিমানেরা এটাকে যতই নির্বুদ্ধিতা মনে করুক।



www.amarboi.org

ঃ তোফা-তোফা !

ঃ আমি রাজপুত। আমার নাম বিজয় সিংহ। আমার প্রবৃত্তি সিংহের। শেয়ালের প্রবৃত্তি কোন খাঁটি রাজপুতের প্রবৃত্তি নয়। ও নিয়ে খাঁটি রাজপুতেরা গৌরব বোধও করে না।

সভাসদ হাজী কোরবান আলী প্রবীন ব্যক্তি। তিনি খুব কম কথা বলেন। তিনিও এবার খোশদীলে বললেন—শুকরিয়া সিং মশাই, আপনাকে আমি অশেষ মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিজয় সিংহ জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন—জি ?

হাজী কোরবান আলী বললেন—আপনি অমুসলমান। আল্লাহ, রাসূল (সা) আর আমাদের পবিত্র কিতাবের উপর আপনি ঈমান আনেননি। তবু আপনার এই মানসিকতাই আমাদের ঈমানদারদের মানসিকতা। কোন মুসলমানের মধ্যে যখন আপনার এই পবিত্র মানসিকতা স্থান পায়, তখনই তাঁকে ঈমানদার বলা হয়। ঈমানদারের মধ্যে কোন নোংরামীর আর কুটিলতার স্থান নেই। তাঁরা সত্যবাদী ও স্পষ্ট ভাষী। তাঁদের মুখ অন্তর এক।

ঃ জি-জি। এইসব লোককেই শ্রদ্ধা করি আমি। কাপুরুষ আর মতলবাজদের নয়।

গাউস খান গলা ঝেড়ে বললেন—আমরা বোধহয় আমাদের প্রসঙ্গ থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছি। তাহলে কি ধারণা আপনার ? মানে প্রশাসনিক পরিষদের মতিগতি কি অনুমান করছেন ?

বিজয় সিংহ বললেন—যা অনুমান করছি তা অনুমান হলেও সত্য থেকে খুব বেশী দূরে নয়। তাদের মতিগতি আর যা-ই হোক, শাহজাদাকে যে সহজে তারা মসনদে আসতে দেবে, এমনটি মনে হচ্ছে না।

গাউস খান বললেন—জি, সে ধারণা আমারও।

ঃ আসেনও যদি, তাদের অন্তর যে তিনি পাবেন না, এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ঃ সিং মশাই !

ঃ তারা যা চায়, তা তারা শাহজাদা সরফরাজ খানের কাছে পাবে না বলেই তাঁর ওয়ালেদকে টেনে এনেছে। এরপর যে আবার কাকে ধরে টানতে শুরু করে কে জানে।

ইতিমধ্যে সেনানায়ক শরাফউদ্দীন সাহেব এসে সরবে দহলীজে ঢুকে বললেন—আরে ! আপনারা সবাই এখানে ? ওদিকে যে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তার কি কোন খবর রাখেন ?

সকলেই বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তুলকালাম কাণ্ড !

শরাফউদ্দীন সাহেব বললেন—নবাব বাহাদুর খিতাব পেয়েছেন। বাদশাহর খিলাত। আগামীকাল সে জন্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসবের দিন ধার্য করেছেন নবাব বাহাদুর। তার আনযামটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।



www.amarboi.org

গাউস খান বললেন — বলেন কি !

ঃ নবাবের নির্দেশনামা আমাদের কাছে এখনই চলে আসবে। আমাদের সবাইকে ঐ উৎসবে প্রদর্শনী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতে হবে। খোদ নবাবের এই ইচ্ছে।

হাজী কোরবান আলী বললেন — শুনেছিলাম, নবাব বাহাদুর দিল্লীতে মোটা নজরানা পাঠিয়েছেন। এটা বোধহয় তারই বিনিময়।

ঃ জ্বি–জ্বি। ঠিক তাই। বিনিময়টাও বেশ উম্‌দা। বাদশাহ্‌ নামদার তাঁকে "মুতামান মুল্‌ক্‌ সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান বাহাদুর আসাদ জঙ্গ" — এই উপাধি প্রদান করা সহ একটি রত্ন খোচিত পাল্‌কি, সাতহাজারী মসনবদারী ও অন্যান্য আরো খিলাত পাঠিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কামান গর্জনের শব্দ হলো এবং দরবার এলাকার দিকে সশব্দে ডংকাধ্বনি শুরু হলো।

শারফউদ্দীন সাহেব পুনরায় ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন — ঐ শুনুন — । আসুন-আসুন, এখন আর ঘরে নয়। কি হচ্ছে একবার দেখবেন আসুন —

সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহে সমর্থন দিয়ে বললেন — চলুন-চলুন—

সকলেই দহলীজ থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

## ৪

একটা চলন্ত ঘোড়ার গুড়ী অকস্মাৎ উল্টে খাদে পড়ে গেল। দিলওয়ার আলী যে পথে ফিরছিলেন, সে পথ থেকে অনেকখানি দূরে সকলের অলক্ষ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

নবাবের খিলাত প্রাপ্তির উৎসবটা বাস্তবিকই খুব জমজমাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আমেজেই সরকারী চত্বরটা বেশ কিছুদিন গরম হয়ে থাকে। দিলওয়ার আলীকে এ উৎসবে অনেকখানি শ্রম দিতে হয়েছে। নবাবই নানা কাজে নিয়োগ করেন তাঁকে। এরপর নবাবের আর কোন বড় আদেশ তাঁর উপর আসেনি। নির্ধারিত প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তাঁর দিন কেটে যাচ্ছিল। অতপর আবার একদিন নবাবের হুকুম হলো — রাজমহলে যাও। রাজমহলের ফৌজদারের কিছু সামরিক মদদ জরুরত। তাঁকে কয়েকদিন মদদ দিয়ে এসো।

নবাবের আদেশে রাজমহলের ফৌজদারকে সামরিক মদদ দিয়ে দিলওয়ার আলী মুর্শিদাবাদে ফিরছিলেন। সঙ্গে তাঁর কয়েক শত অশ্বারোহী সেপাই। মুর্শিদাবাদের কাছে এসে তিনি এক প্রশস্ত সড়ক পথ ধরেছিলেন। প্রশস্ত কাঁচা পথ। এ পথটা অনেকখানি ঘুরে-বেঁকে মুর্শিদাবাদ শহরের মধ্যে গেছে। এই পথ থেকে আর একটা ছোট রাস্তা মুক্ত মাঠ ভেদ করে সোজাসুজি শহরে গিয়ে ঢুকেছে। এ পথে শহরের দূরত্ব অনেক কম। তাঁর গোটা বাহিনীর পথ সংকুলান না হওয়ার কারণে দিলওয়ার আলী ছোট রাস্তা পরিহার করে চওড়া পথেই শহরে ফিরে আসছিলেন।



www.amarboi.org

দুর্ঘটনা কবলিত ঐ ঘোড়ার গাড়ীটা এতক্ষণ এই চওড়া পথেই আসছিল। দিলওয়ার আলী তাঁর বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। অনেকখানি পেছন থেকে তিনি দেখলেন, একটা ঘোড়ার গাড়ী তাঁর আগে আগে দ্রুতবেগে ছুটছে। এই ছোট রাস্তার কাছে এসেই গাড়ীটা বড় রাস্তা থেকে নামলো এবং মুক্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে সোজা পথ ধরলো। দিলওয়ার আলী যখন এই ছোট রাস্তার কাছে এলেন, তখন ঘোড়ার গাড়ীটা মাঠের মধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে। ধু-ধু মাঠ। রৌদ্রঝরা দুপুর। তিনি লক্ষ্য করলেন, ফাঁকা পথ পেয়ে আর রোদের তাপ এড়াতে, গাড়োয়ান তার ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাহিনী নিয়ে নিজেও তিনি শ্রান্তক্লান্ত ছিলেন। তাই নজর ফিরিয়ে নিয়ে তিনিও সসৈন্যে তাঁর নিজের পথে ছুটতে লাগলেন। অল্প কিছু এগিয়েই আবার অলস কৌতুকে তিনি ঘাড়ভেঙ্গে মাঠের দিকে তাকালেন এবং তাকিয়েই অবাক হয়ে গেলেন। ঘোড়ার গাড়ীটা উধাও। মুক্ত মাঠ। গাছপালা আড়াল-আচ্ছাদন কিছুই নেই। বন্যার মাপে মাটি ফেলে উঁচু করে বাঁধা রাস্তা। বহুৎ দূর পর্যন্ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সবকিছু। অথচ গাড়ীটা গেল কোথায়? এমন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল মানে?

সঙ্গে সঙ্গে দিলওয়ার আলী অশ্বের লাগাম টানলেন এবং হাত তুলে তাঁর অনুগামী বাহিনীকে থামিয়ে দিলেন। সহকারী আসাদুল্লাহ তাঁর পেছনেই ছিল। হকচকিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করলো — কি হলো উস্তাদ?

মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে দিলওয়ার আলী বললেন — আমাদের সামনে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী মাঠের ঐ রাস্তা বরাবর নেমে গেল, দেখেছিলে?

ঃ জি উস্তাদ, দেখেছিলাম।

ঃ ঐ দেখো, যতদূর নজর যাচ্ছে, ও গাড়ীটা আর কোথাও নেই।

মাঠের দিকে চেয়ে আসাদুল্লাহ বিস্মিত কণ্ঠে বললো — তাইতো! সেকি উস্তাদ, এই দেখলাম — এই নেই! বোধহয় রাস্তার ওপাশে নেমে রাস্তার কোল ঘেঁষে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ঃ এই রোদের মধ্যে বিশ্রাম?

ঃ নইলে যাবে কোথায়?

ঃ রাস্তার ওপাশে উল্টে যেতেও পারে তো?

আসাদুল্লাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললো — হ্যাঁ, তাও পারে। যে খাড়া রাস্তা!

দিলওয়ার আলী ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — এতক্ষণ হয়ে গেল, তবু কাউকে দেখা যাচ্ছে না! কয়েকজন সেপাই নিয়ে শিগ্গির শিগ্গির এসোতো দেখি —

ঃ সেকি উস্তাদ!

ঃ দেখছো না, রাস্তাটা বিলকুল জনশূন্য? কোথাও কোন লোকজনের আসা-যাওয়া নেই? জলদি এসো —

বলেই অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দিলওয়ার আলী সেই দিকে ছুটলেন। বাহিনীকে দাঁড়িয়ে থাকার ইংগিত দিয়ে আসাদুল্লাহও অগত্যা ছ'সাতজন সেপাই সহ দিলওয়ার আলীকে অনুসরণ করলো। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র পীড়াদায়ক হলেও সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে গোটাবাহিনী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী এসে দেখলেন, তাঁর ধারণাই ঠিক। গাড়ীটা উল্টে গভীর এক খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। রোদে পোড়া কাঁকড়ফাটা খাদ। লোক মাত্র দুইজন। গাড়োয়ানটা ছিট্‌কে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার মাথার পাশেই মস্তবড় এক শুকনো কাঠের গুঁড়ি। বোধহয় মাথাটা তার ঐ কাঠের উপর পড়ায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এক্ষণে সে কিঞ্চিৎ কাত্‌রাচ্ছে।

যাত্রীটা পুরোপুরি গাড়ী চাপা পড়েছে। শাটপাট হয়ে না পড়ে গাড়ীটার একধার খাদের পাড়ের সাথে ঠেশ্ দিয়ে উঁচু হয়ে আছে আর একধার চাকা সমেত যাত্রীটাকে চেপে নিয়ে খাদের তলায় ঠেকেছে। এতে করে গাড়ীটার পুরো ভার যাত্রীটার বুকের উপর পড়েছে। হাত দুম্‌ড়ে পড়ে থাকা যাত্রীটা যে গাড়ীর চাপা থেকে বেরিয়ে আসার অনেক কসরত করেছে তা তার পিঠের তলের মাটির অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আরো বোঝা যাচ্ছে, একখানা হাত আর দুইখানা পা-ই নিদারুণভাবে বেকায়দায় থাকার কারণে যতই সে নড়েছে, গাড়ীর ভার ততই চেপে ধরেছে তাকে। এক্ষণে সে নিস্তেজ হয়ে এসেছে এবং হা করে শ্বাস টানছে। অবিলম্বে লোকজন এসে গাড়ীখানা জাগিয়ে না ধরলে, এভাবে মউত তার অবধারিত ছিল।

দেখামাত্রই দিলওয়ার আলী অশ্ব থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে গাড়ীটা সবলে কিঞ্চিৎ জাগিয়ে ধরলেন। ইতিমধ্যেই আসাদুল্লাহ ও তার সঙ্গীরা এসে শূন্যে শূন্যে গাড়ীখানা সরিয়ে নিলো। ভারমুক্ত হয়ে যাত্রীটা সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো এবং দিলওয়ার আলী তাঁকে কোলের উপর হেলান দিয়ে তুলে বসালে, সে চোখ মুজে কেবলই ধুঁকতে লাগলো।

যাত্রীটা বলিষ্ঠ ও সুঠাম এক নওজোয়ান। বেকায়দায় না পড়লে একটা ঘোড়ার গাড়ীর চাপা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সে এমনই বেকায়দাভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিলো যে, নওজোয়ানটি আরো অধিক পালোয়ান কিছু হলেও তার করার কিছুই ছিল না।

গাড়ীটা সরিয়ে দিয়েই আসাদুল্লাহও তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে গাড়োয়ানটাকে তুলে কাঁধের সাথে হেলান দিয়ে বসালো। গাড়োয়ানটা তখন আরো অধিক কাত্‌রাতে লাগলো ও মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।

এই মুহূর্তে পানির বড় প্রয়োজন। ইংগিত দিতেই সেপাইরা নিকটবর্তী এক খালের দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলো। দিলওয়ার আলী ও আসাদুল্লাহ শিরস্ত্রাণ খুলে দুই আহত ব্যক্তিকে বাতাস করতে লাগলেন। একটু পরেই সেপাইরা বস্ত্রখণ্ড ভিজিয়ে ভিজিয়ে পানি আনতে লাগলো। সেই পানি চিপে চিপে গাড়োয়ান ও যাত্রীটার মাথায় ও চোখে মুখে কিছুক্ষণ দেয়ার পর চোখ খুললো উভয়েই। কিন্তু তখনও তারা অত্যন্ত নিস্তেজ। গাড়োয়ানটা তবু নিজের বলে সোজা হয়ে বসলো, কিন্তু যাত্রীটা তখনও প্রায় সজ্ঞাহীন।

পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘোড়াটি জোত্ বা দড়ি ছিঁড়ে গাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়াটিও ঐ খাদের এক পাশে দাঁড়িয়েছিলো। দিলওয়ার আলীর নির্দেশে সেপাইরা এবার গাড়ীখানা রাস্তার উপর এনে ঘোড়াটাকে গাড়ীর সাথে জুড়লো।



www.amarboi.org

অতপর সেপাইরা আহত ব্যক্তিদ্বয়কে ধরাধরি করে তুলে এনে গাড়ীর উপর বসালো এবং দিলওয়ার আলী ও আসাদুল্লাহ গাড়ীতে উঠে বসে ঐ দুই ব্যক্তিকে ধরে রইলেন। আগে পিছে সেপাইরা ঘোড়া ও গাড়ীটাকে টেনেঠেলে নিয়ে ফের ঐ প্রশস্ত রাস্তার দিকে চললো।

বড় রাস্তায় পৌছে দিলওয়ার আলী গাড়ীটাকে নিকটবর্তী এক বনের ছায়ায় নিতে বললেন এবং তাঁর দণ্ডায়মান বাহিনীকে ছায়ায় এসে বসতে বললেন। ঘটনাটা বুঝতে পেরে বাহিনীর প্রায় তামাম সেপাই এসে আহতদের খেদমতে লেগে গেল। নিকটবর্তী এক সরোবর থেকে এবার অঢেল পানি বয়ে এনে আহতদের মাথায় ঢালা হলো। বাতাস করা অব্যাহত রেখে তাদের চোখ-মুখ ও হাত-পা ধুয়েমুছে দেয়া হলো।

পরিচর্যার এই আন্তরিক প্রক্রিয়ায় গাড়োয়ানটি অল্পক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কাঠের সাথে বাড়ি খেয়ে তার মাথার এক পাশ অনেকখানি ফুলে উঠেছিল। বেধড়ক পানি ঢালার ফলে ফুলাটা থাকলেও যন্ত্রণাটা বিপুলাংশে উপশম হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে উঠে এসে গাড়ীর কাছে দাঁড়ালো। যাত্রীটাও আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলো। সর্বাঙ্গে কিছুটা ব্যথাবোধ করলেও সে হাত-পা ঝেড়ে সুস্থ হয়ে বসলো।

যাত্রীটি অত্যন্ত সুদর্শন এক সম্ভ্রান্ত নওজোয়ান। তাঁর লেবাস ও চেহারায় খানদানীর ছাপ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সুস্থ হয়ে উঠেই তিনি এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। এরপর পেছন দিকে তাকিয়ে তাঁকে আগলে নিয়ে বসে থাকা দিলওয়ার আলীকে দেখেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে দুর্বল হাতে সালাম দিয়ে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন — একি ! জনাব আপনি !

দিলওয়ার আলী তাজ্জব হয়ে বললেন — আপনি আমাকে চেনেন ?

যাত্রীটি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — জি-জি। আপনি — মানে আপনারাই আমাকে বাঁচালেন ?

ঃ বাঁচানোর মালিক আল্লাহ। তবে আমরাই আপনাকে ঐ খাদ থেকে তুলে এনেছি।

ঃ আপনাদের অশেষ মেহেরবানী। আমাকে বাঁচানোর জন্যেই আল্লাহ তায়ালা খাস্ করে পাঠিয়েছিলেন আপনাদের।

যাত্রীটির কণ্ঠ শুকিয়ে এলো। পানির কথা বলতেই তাঁকে খাওয়ার পানি দেয়া হলো। পানি খেয়ে তিনি আরো সহজবোধ করতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী প্রশ্ন করলেন — বুকে কি খুব ব্যথা বোধ করছেন ?

জবাবে যাত্রীটি বললেন — জি, ব্যথা তো আছেই। তবে শুধু বুকে নয়, সারা গায়েই — মানে পেট কোমর উরু — সর্বত্রই ব্যথা বোধ করছি।

ঃ হ্যাঁ, তাতো হবেই। তবে বুকে কি খুব বেশী চাপ পড়েছে ?

ঃ হ্যাঁ, অপেক্ষাকৃত বেশীই পড়েছে। তবে চাকাটা আমার সর্বাঙ্গ চেপে নিয়ে ছিল বলে চাপটা এককভাবে বুকের উপর পড়েনি। তা পড়লে তো বুকের হাড় গোটা



www.amarboi.org

একখানাও থাকতো না। তামামগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটতো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দিলওয়ার আলী বললেন—সবই আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত্। তিনি চাননি, ঐভাবে মউত হোক আপনার।

ঃ জি–জি, সবই তাঁর রহম।

একটু থেমে দিলওয়ার আলী ফের প্রশ্ন করলেন—আপনার কি কথা বলতে তকলিফ হচ্ছে?

ঃ জিনা। সারা শরীরে খানিকটা ব্যথা অনুভব করছি—এই যা। কথা বলতে কোন রকম তকলিফ বোধ করছিনে।

ঃ তাহলে এবার বলুনতো, আপনি আমাকে কিভাবে চিনলেন?

কষ্টের মধ্যেও একটু ক্ষীণ হাসি হেসে যাত্রীটি বললেন—সরকারী এলাকায় তো বেশ আপনার নাম ডাক। খোদ নবাব আপনাকে জিয়াদা ইজ্জত দেন। তাই আমি একা নই, এই শহরের অনেকেই আপনাকে জানে। বিশেষ করে আমাদের মাদ্রাসার তালেবে এলেম উস্তাদ—সবাই আপনাকে এক ডাকে চেনে।

ঃ কি রকম?

ঃ আপনি সালার দিলওয়ার আলী সাহেব। কিছুদিন আগে আমাদের মাদ্রাসার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে শাহজাদা সরফরাজ খান বাহাদুর সাহেব প্রধান মেহমান ছিলেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানে তাঁর সাথে আপনিও আমাদের মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন আর তালেবে-এলেমদের উদ্দেশ্যে নীতি ও আদর্শের উপর আপনিও ভাষণদান করেছিলেন।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মহানুভব শাহজাদার নির্দেশে আমাকেও দু' কথা বলতে হয়েছিল। তিনি আমাকে খামাখাই খুব দানেশমান্দ্ মনে করেন কিনা—

দিলওয়ার আলী হাসতে লাগলেন। যাত্রীটি প্রতিবাদ করে বললেন—খামাখা হবে কেন? সেদিন আপনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা উপস্থিত সকলের দীলেই গভীর দাগ কেটেছিল। সকলেই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে এত জ্ঞানগর্ভ আর হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য অন্য কেউই রাখতে পারেননি।

ঃ তাই?

ঃ জি–জি। আমি ঐ মাদ্রাসারই এক নগণ্য শিক্ষক। ব্যক্তিগতভাবে আগে তো অনেকেই আমরা চিনতাম না আপনাকে? ঐ বক্তব্যের পর "কে এই লোক—কে এই লোক" এই প্রশ্ন সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। সকলেই এতটা উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন যে, শাহজাদা বাহাদুর ওখানে উপস্থিত না থাকলে, আমাদের তালেবে-এলেমদের সাথে উপস্থিত অনেকেই সেদিন আপনাকে কাঁধে নিয়ে নাচতো আপনাকে চিনতে আর বাঁকী থাকে কারো?

এক সাথে এত কথা বলার পর যাত্রীটি কিঞ্চিৎ হাঁপাতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী খোশদীলে বললেন—আচ্ছা! তা ভাই সাহেবের নামটা?



www.amarboi.org

: আমার নাম আফসারউদ্দীন

গাড়ীর কাছে দণ্ডায়মান গাড়োয়ানটা এই সময় ইতস্তত কণ্ঠে বললো—হুজুর, এখন আমি মোটামুটি ঠিকঠাক। গাড়ী চালাতে আর আমার কোন অসুবিধে নেই। আপনি কি আর যাবেন আমার গাড়ীতে?

আফসারউদ্দীন সাহেব নড়েচড়ে উঠে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, যেতে তো হবে জরুর। আর একটু থামো।

এরপর আফসারউদ্দীন সাহেব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে গেলেন। দিলওয়ার আলী হাত লাগিয়ে তাঁকে দাঁড় করে দিলেন। মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর টলতে টলতে হলেও আফসারউদ্দীন নিজের শক্তিতেই ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী বললেন—আপনি কি যেতে পারবেন এখন?

আফসারউদ্দীন দ্বিধার সাথে বললেন—পারবো বলেই মনে হচ্ছে। তবে একজন কেউ আমাকে ধরে থাকলে ভাল হয়।

: মকানটা কোথায় আপনার?

: এই মুর্শিদাবাদ শহরেই। সরকারী এলাকার অনেকটা কাছেই।

: বেশ তাহলে চলুন, আমিই আপনাকে ধরে থাকবো।

আফসারউদ্দীন সংকুচিত হয়ে বললেন—সেকি জনাব, খোদ আপনি? না-না, তা কি করে হয়? অনেক আপনি আমার জন্যে করেছেন। আপনার ঋণ আমি জিন্দেগীতেও শোধ করতে পারবো না। এখন খুব বেশী হলে মেহেরবানী করে একজন সেপাই আমার সাথে দিন। তাতেই—

: আরে না-না। সেপাই কেন? আমিও তো ঐদিকেই যাবো। চলুন, আপনার সাথে আমিই যাই। আপনাকে মকানে পৌঁছে দিয়ে আমি আমার দপ্তরে ফিরে যাবো।

: জনাব!

: গাড়ীটার অবস্থা কি জানিনে। তবু উপায় নেই। ঘোড়াতে চড়তে তো পারবেন না, ওতে চড়েই যেতে হবে।

অতপর আফসারউদ্দীন সাহেবকে আর আপত্তি করতে না দিয়ে দিলওয়ার আলী তাঁর সহকারী আসাদুল্লাহকে বাহিনী নিয়ে সামরিক ঘাঁটিতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং দুইজন অশ্বারোহী সেপাই ও আফসারউদ্দীনকে নিয়ে তিনি গাড়ীর দিকে এগুলেন তাঁর নিজের অশ্বটা এই দুইজন সেপাইয়ের হাওলায় দিয়ে আফসারউদ্দীন সহ তিনি গাড়ীতে এসে উঠলেন। গাড়োয়ানটি এবার এই চওড়া রাস্তা দিয়েই ধীরে ধীরে গাড়ী চালাতে লাগলো। তাঁর নিজের অশ্বটি সহকারে এই দুইজন সেপাই গাড়ীটা পাহারা দিয়ে নিয়ে গাড়ীর দুই পাশে চলতে লাগলো।

যতক্ষণ সকলে এক রাস্তায় এলেন, ততক্ষণ আসাদুল্লাহ বাহিনী নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে পেছনে এলো। শহরে প্রবেশ করে সে গাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাহিনীসহ শাহী এলাকায় চলে গেল। দিলওয়ার আলী ও আফসারউদ্দীন সারা পথ, কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো এবং কি ভেবে দিলওয়ার আলী ঘটনাস্থলে গেলেন, এসব কথা ও সেই সাথে মাদ্রাসায় প্রদত্ত দিলওয়ার আলীর ভাষণের কথা নিয়ে আলোচনা



www.amarboi.org

করতে করতে এলেন। এই আলোচনার মধ্যেই তাঁরা এক সময় আফসারউদ্দীন সাহেবের প্রাচীর ঘেরা মকানের ফটকে এসে হাজির হলেন।

আফসারউদ্দীনের নির্দেশে ঘোড়ার গাড়ীটা ফটকে এসে থামতেই দিলওয়ার আলী দেখলেন, তাঁরা এক সুরম্য মকানের সামনে উপস্থিত। মকানটি অতি বিশাল না হলেও, ক্ষুদ্রও নয়। মকানের আয়তনটি বেশ বড় এবং বাগ-বাগিচায় ঘেরা এক রুচিসম্পন্ন গৃহ। মাঝখানে একটি বড়োসড়ো দ্বিতল কক্ষ সহ সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট লম্বা এক একতলা ইমারত সর্বাগ্রে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মকানটির সামনের দিকে প্রশস্ত খোলা আঙ্গিনা, পেছন্ন দিকে ফল বাগান। আম-জাম-লীচু-কাঁঠাল, নানা জাতীয় বৃক্ষ। ফটক থেকেই দিলওয়ার আলী অনুমান করলেন, মকানটির চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

ফটকটি খোলাই ছিল। আফসারউদ্দীনের অনুরোধে আফসারউদ্দীনের সাথে দিলওয়ার আলী ফটক পেরিয়ে খোলা আঙ্গিনায় ঢুকতেই আঙ্গিনার একপাশে ফুল বাগানে কর্মরত যে লোকটি "একি-একি ! একি হালত্" বলে ছুটে এলো, তাকে দেখে দিলওয়ার আলী অবাক, দিলওয়ার আলীকে দেখে সে লোকটিও হতবাক। সে লোক কিতাবউদ্দীন। ফৌজীপুরের সেই মুনিব বাড়ীর নওকর কিতাবউদ্দীন।

লহমা খানেক হা করে তাকিয়ে থাকার পরই কিতাবউদ্দীন ফের দৌড় দিয়ে গৃহের দিকে গেল এবং চীৎকার করে বলতে লাগলো—আপা-আম্মা-হুজুর, শিগ্গির বেরিয়ে আসুন। দেখুন, ভাইজানের কি হাল্‌ত আর সাথে সেই সেপাই সাহেব !

কিতাবউদ্দীনের ডাক-হাঁকে অন্যান্য নওকর, আবিদ হোসেন সাহেব ও মকানের জেনানারা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন। আফসারউদ্দীনের সাথে অন্যলোক দেখে জেনানারা থমকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেলেন। নওকরদের সাথে আবিদ হোসেন সাহেব সরাসরি ছুটে এলেন এবং আফসারউদ্দীনের বিধ্বস্ত লেবাস আর লুণ্ঠিত চেহারা দেখেই আঁত্‌কে উঠে "হায়-হায় ! কি ঘটনা, কি ব্যাপার ?" বলে আহাজারী শুরু করলেন। ইতিমধ্যেই আহাজারী শুরু হলো বারান্দায় দণ্ডায়মান জেনানাদের মধ্যে। নওকরেরাও একই সাথে হা-হুতাশ জুড়ে দিলো। সব মিলে সৃষ্টি হলো এক নাজুক পরিস্থিতি।

আফসারউদ্দীন সাহেব শক্ত হলেন। তিনি শক্ত কণ্ঠে বললেন—আহ্‌হা, আপনারা সবাই থামুন তো ! মুসিবত একটা বড় রকমের গেছে ঠিকই, কিন্তু এখন আর আমার কোন অসুবিধে নেই। আমি বিলকুল ঠিকঠাক। আপনারা থামুন।

আবিদ হোসেন সাহেব তবু থতমত করে বললেন—কিন্তু একি চেহারা ! কি করে এটা হলো ?

ঃ সবই বলবো। আপনারা এখন থামুন। অযথা হৈচৈ করবেন না।

আবিদ হোসেন সাহেব থেমে গেলেন। অন্যান্যরাও থেমে গেল। কিন্তু উৎকণ্ঠা কারো গেল না। দিলওয়ার আলীর দিকে চেয়ে আবিদ হোসেন সাহেব ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—কিন্তু ইনি ? এই সেপাই সাহেব ? একে কোথায় পেলে ?

আফসারউদ্দীন জবাব দেয়ার আগেই দিলওয়ার আলী হাত তুলে সালাম দিলেন। সালাম নিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব অভিমান ভরে বললেন—আরে সেপাই সাহেব, এতদিন পরে মনে পড়লো আমাদের কথা ?



www.amarboi.org

আফসারউদ্দীন বিব্রত কণ্ঠে বললেন—আহ্‌হা ! কাকে কি বলছেন দাদু ? ইনি সেপাই হবেন কেন ? ইনি একজন নামকরা সালার। একটা মস্তবড় বাহিনীর ইনি সেনানায়ক।

আবিদ হোসেন সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন—তার মানে ? আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো ? এ হচ্ছে সেপাই দিলওয়ার আলী। আমাদের অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়জন। এসো ভাই, এসো-এসো। সালার না সেপাই ও নিয়ে আমাদের গরজ নেই। তুমি আমাদের দিলওয়ার আলী। সেপাই দিলওয়ার আলী। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

এবার আফসারউদ্দীনও তাজ্জব হলেন। বললেন—সেকি ! আপনি এঁকে চেনেন ?

কণ্ঠের তেজ বাড়িয়ে দিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—চিনি মানে ? সেরেফ আমি কেন ? তোমরা ক'জন ছাড়া, এ মকানের সবাই একে চেনে। তোমার আম্মা, বহিন, কিতাবউদ্দীন, সবাই।

ঃ তাজ্জব !

ঃ ফের তাজ্জব। তোমাকে বলিনি আমরা ? সেই যে এক সেপাই তীর বিদ্ধ হয়ে আমাদের ফৌজীপুরের মকানে ক'দিন ছিল, বলিনি সে কথা ?

ঃ সেকি ! ইনিই সেই লোক ?

ঃ হ্যাঁ, ইনিই সেই না-ফরমান বান্দা। পরকে পরইভাবে সবসময়। এসো-এসো, আগে শুনি সব—

ঃ হ্যাঁ-চলুন। কিন্তু তার আগে কাজ আছে—

বলেই আফসারউদ্দীন সাহেব নওকরদের ডেকে গাড়োয়ানকে বিদায় করার এবং দিলওয়ার আলীর সেপাইদ্বয়কে এনে দহলীজে বসানোর নির্দেশ দিলেন আর সেই সাথে ঘোড়া তিনটি ভেতরে এনে ওগুলোর যত্ন নিতে বললেন।

দিলওয়ার আলীর ভেতরে তখন ঝড় বইছে। সেরেফ ভদ্রতার খাতিরেই দিলওয়ার আলী এসবে কিঞ্চিৎ আপত্তি জানালেন। আফসারউদ্দীন সাহেব সে কথা কানেই তুললেন না। নওকরদের নির্দেশ দিয়েই তিনি "চলুন" বলে দিলওয়ার আলীকে ঠেলে নিয়ে ভেতরের দিকে চললেন।

দহলীজটি মূল দালানের সামনে এই খোলা আঙ্গিনার এক পাশে অবস্থিত। দেখা মাত্রই দিলওয়ার আলী বুঝতে পারলেন, এটিই দহলীজ। আফসারউদ্দীন তাঁকে যখন ঠেলে নিয়ে দহলীজটি পেরিয়ে যেতে লাগলেন, তখন তিনি আপত্তি তুলে বললেন—আরে-আরে ! কোথায় নিচ্ছেন আমাকে ? এই যে এটিই বোধহয় আপনাদের দহলীজ। এখানেই বসি।

আফসারউদ্দীন হেসে বললেন—দহলীজ এইটেই। কিন্তু আপনি কি দহলীজে বসার লোক ? দহলীজে বসে বাইরের লোক। আমার জান বাঁচানো ছাড়াও যা বুঝতে পারছি, তাতে আপনি আমাদের একান্ত আপন আর ঘনিষ্ঠ মানুষ। আপনি দহলীজে বসবেন মানে ? আপন লোকদের জন্যে আমাদের আর একটা বসার জায়গা আছে। আসুন—



www.amarboi.org

বেশ কয়েকটি কক্ষযুক্ত মূল দালানটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা। মূল দালানের উপরে বারান্দা বিশিষ্ট ঐ বড়ো সড়ো দ্বিতল কক্ষ। মূল দালানের সামনে অর্থাৎ পূর্বদিকে একটানা লম্বা এক বারান্দা। বারান্দার সামনে এই প্রশস্ত খোলা আঙ্গিনা। ফুল বাগান, দহলীজ, ওয়াক্তিয়া নামাযের জায়গা ও চাকর-নকরদের আবাসসহ অন্যান্য আবাস-আচ্ছাদন এই খোলা আঙ্গিনার চারপাশে। অনুরূপ আর একটা লম্বা বারান্দা মূল দালানের পশ্চিম দিকেও তামাম কক্ষের সামনে দিয়ে বিদ্যমান। মূল দালানের মাঝ দিয়ে অন্দরে যাবার পথ। দালানের পশ্চিম পার্শ্বে অন্দর মহল। পাকঘর, খাবার ঘর, গোছলখানা—সবই এদিকে। এরপরে অন্দরঘেরা সুউচ্চ দেয়াল। তারপর ফল বাগান ও সবশেষে চারদিকে সীমানা ঘেরা প্রাচীর। অনাড়ম্বর হলেও একটা গরীব রাজার রাজ্যপাট।

উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এই দালানটির দক্ষিণ দিকের সর্বশেষ কক্ষই এ বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন ও নিজস্ব মেহমানদের জন্যে সংরক্ষিত কক্ষ। আফসারউদ্দীন সাহেব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেও, তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যথা পূর্ববৎই ছিল। এক্ষণে আবার তিনি সর্বাঙ্গে তাপ অনুভব করতে লাগলেন। মনের জোরে এতক্ষণ স্বাচ্ছন্দভাব দেখালেও মূল দালানের বারান্দার উপর উঠতেই তিনি হাঁপিয়ে গেলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে ঈষৎ কাঁপতে লাগলেন। ফলে, নিজে আর না এগিয়ে দিলওয়ার আলীকে ঐ সংরক্ষিত কক্ষে নিয়ে যাওয়ার এবং তাঁর যত্ন আপ্যায়নের ভার আবিদ হোসেন সাহেবের উপর দিয়ে তিনি দিলওয়ার আলীকে এই মর্মে অনুরোধ জানালেন যে, নিজে তিনি সঙ্গ দিতে পারছেন না বলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে তাঁদের কিঞ্চিৎ মেহমানদারী কবুল না করে দিলওয়ার আলী এখান থেকে চলে গেলে, তিনি দীলে বড় চোট্ পাবেন। সেই সাথে দিলওয়ার আলীকে এই মকানে পুনরায় মেহমান হওয়ার অগ্রিম দাওয়াত জানিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেলেন।

জেনানাদের মধ্যে, বিশেষ করে আফসারউদ্দীনের আম্মা, বহিন ও নানীজানের মধ্যে বিপুল উৎকণ্ঠা ও অস্ফুট আহাজারী তখনও বিদ্যমান ছিল। দিলওয়ার আলীকে নিয়ে আফসারউদ্দীন সাহেবেরা এই বারান্দার দিকে এলে তাঁরা একটু আড়ালে সরে গিয়েছিলেন। আফসারউদ্দীন এবার অন্দরের দিকে এগুলে, তাঁরা আবার ছুটে এলেন এবং কেউ কেউ আপসারউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরে অনুচ্চ কণ্ঠে কান্না শুরু করলেন। যথাযথ সান্ত্বনা দিয়ে এঁদের শান্ত করতে আফসারউদ্দীনকে পুনরায় অনেকখানি বেগ পেতে হলো।

উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়েই আবিদ হোসেন সাহেব দিলওয়ার আলীকে এনে ঐ নির্দিষ্ট কক্ষে বসালেন। এরপর দিলওয়ার আলীর মুখে ঐ দুর্ঘটনার সারমর্মটুকু শুনেই অমনি আবার আঁত্কে উঠে তিনি অন্দরের দিকে ছুটলেন। যাবার আগে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—একটু বসো ভাই। বুকের হাঁড়গুলো তাহলে তামামই গেছে না ঠিক আছে, সেটা আগে দেখে আসি।

দিলওয়ার আলী একা একা বসে রইলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই মকানই তাহলে মাহমুদা খাতুনের নানাজানের মকান। এত তিনি খোঁজ করলেন আর করালেন



www.amarboi.org

তবু কোন হদিসই পেলেন না। অথচ আল্লাহ্ তায়ালার কি মহিমা, বিনা খোঁজে, বিনা আগ্রহে তিনি কেমন আপ্‌ছে আপ্‌ তার সে ঈপ্সিত মকানে এসে পৌঁছে গেলেন। মাহমুদা খাতুনের নানাজান হয়তো মকানে এখন নেই। থাকলে অবশ্যই তিনিও বেরিয়ে আসতেন।

মাহমুদা খাতুনের নানাজানের মকান দেখে তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। এঁরা যে বড়লোক এটা তিনি ফৌজীপুরে থাকতেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এতটা পরিসর আর বিস্তৃতি তিনি কল্পনা করেননি। সর্বোপরি, বিত্তের চেয়ে এদের আভিজাত্যটাই দিলওয়ার আলীকে অধিক আকৃষ্ট করলো। তিনি অনুমান করলেন, সাধারণ জোতদার নন, এঁরা তার চেয়েও উপর তলার মানুষ।

এ কারণেই দিলওয়ার আলী আরো বেশী ভাবতে লাগলেন, যে জন্যে এই মকানের প্রতি এতটা তাঁর টান, সে টানটা কতখানি যুক্তিসংগত ? উপকার তাঁরা করেছিলেন, স্নেহও তাঁকে করেন—এটা ঠিক। কিন্তু সেইটেই তো এই টানের মূল উৎস নয়। মূল উৎস যেটা, সে উৎসের জোর এখানে কতখানি ? সেই মাহমুদা খাতুন তাঁকে নিয়ে কতখানি ব্যস্ত ? মাহমুদা খাতুনের দীলে আদৌ কোন স্থান তাঁর টিকে আছে কিনা ? এই ঘরের মেয়ে একজন মামুলী সেপাইকে (যেহেতু এই পরিচয়ই জানেন তিনি) আদৌ কিছু মনে রেখেছেন কিনা ? অনুক্ষণের প্রশ্ন নেই, অবসরে-আলস্যে তাঁর স্মৃতি কিঞ্চিৎও মাহমুদা খাতুনের অন্তরে জাগরূক হয় কিনা ?

আঙ্গিনার মধ্যে থাকতেই বারান্দায় দণ্ডায়মানা নেকাব-আঁটা মাহমুদাকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন। মাহমুদা খাতুনও স্থির নয়নে তাঁদের দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর দুই নয়নের অকৃত্রিম কারুণ্য দিলওয়ার আলীর সন্ধানী নজর এড়ায়নি। ছলছল না হলেও, সে করুণ দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ দিলওয়ার আলীর অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু আফসারউদ্দীন সাহেব যে মাহমুদা খাতুনের ভাই, এঁদের কথাবার্তার মধ্যেই তা তিনি বুঝেছিলেন। সুতরাং মাহমুদা খাতুনের সেই করুণ দৃষ্টির কারণ একমাত্র আফসারউদ্দীন সাহেবের ঐ দুরবস্থাই কিনা, কে বলতে পারে ? ভাইয়ের এই হালত্ দেখে বহিনের যে ঐ অবস্থাই হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। দিলওয়ার আলীর সেখানে উপস্থিতি কতটুকু ? ঐ দৃষ্টির মাঝে দিলওয়ার আলীর অংশিদারিত্ব কতখানি ? আদৌ কিছু আছে, না একদমই শূন্য।

দিলওয়ার আলী একমনে ভাবছেন। ভাবছেন, তাঁর এই দীর্ঘদিনের সংশয়ের ফয়সালাটা আজকেই হয়ে যাবে। যদিও একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে সবাই এঁরা আছেন, তবু এরই মাঝে বোঝা যাবে, মাহমুদা খাতুনকে নিয়ে তাঁর খোয়াব দেখার আসলেই কোন ভিত্তি আছে কিনা। মাহমুদা খাতুনের আচরণই তা প্রমাণ করবে আজ। দিলওয়ার আলীকে নিয়ে তাঁর দীল যদি উষ্ণ কিছু থেকেই থাকে, একভাবে না একভাবে প্রকাশ তা পাবেই। বিঘ্ন যতই থাক, হৃদয়ের আকর্ষণ পাহাড়ের বুক ছিদ্র করে বেরিয়ে আসে। আর দীল যদি তাঁর ঠাণ্ডা থাকে, দিলওয়ার আলী তাঁর কাছে যদি এ দুনিয়ার আর পাঁচটা দিলওয়ার আলীই হয়, ভাইয়ের উপকারের কৃতজ্ঞতায় তিনি দশবার এসে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে গেলেও, দিলওয়ার আলীর কাছে মাহমুদা খাতুনও



www.amarboi.org

এ দুনিয়ার আর পাঁচটা মাহমুদা খাতুন, দিলওয়ার আলীর একান্ত কেউ নন, তাঁকে নিয়ে দিলওয়ার আলীর উদ্বেলিত হয়ে উঠার কারণও কিছু নেই।

দিলওয়ার আলীর দীলটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। রিক্ত হওয়ার ভয়ে তিনি কম্পিত হয়ে উঠলেন। মাহমুদা খাতুনের প্রাণের স্পর্শ না পাওয়া যাক, তাঁর অবহেলাটা না পেলেও দিলওয়ার আলী কোনমতে নিজেকে সামাল দিয়ে নিয়ে এখান থেকে বিদেয় হতে পারেন।

ছেদ পড়লো তাঁর চিন্তায়। হাতমুখ ধোয়ার পানি ও তোয়ালেসহ কিতাবউদ্দীন এই সময় দ্রুতপদে এই কক্ষে এসে ঢুকলো। সে দিলওয়ার আলীকে সালাম দিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—হুজুর, ভাইজানকে নিয়ে সবাই এখন ব্যস্ত আছেন বলে আপনার তদবিরে ত্রুটি হচ্ছে। আপা বললেন, এ জন্যে আপনি যেন আমাদের কোন কসুর নেবেন না।

চমকে উঠলেন দিলওয়ার আলী। "আপা" কথাটা কানে যেতেই তাঁর নেতিয়ে পড়া স্নায়ুগুলো শক্ত করে বাঁধা বীণার তারের মতো টনটনে হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো। সালামের জবাব দিয়েই তিনি কিতাবউদ্দীনকে প্রশ্ন করলেন—আপা বললেন মানে ? কোন্ আপা ?

কিতাবউদ্দীন বললো—আপা এখানে ঐ একটাই হুজুর। মাহমুদা আপা। তিনি আমাকে খুব করে আপনাকে অনুরোধ করতে বললেন। বললেন, আপনি যেন দীলে কোন তকলিফ না নেন। ফাঁক পেলেই তিনি আপনার সাথে কথা বলবেন।

দিলওয়ার আলী বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—এখন কোথায় আছেন তাঁরা সবাই ?

ঃ সবাই তো ঐ ভাইজানের ঘরে। ভাইজানের ঐ দুর্ঘটনার কথা সবাই দম বন্ধ করে শুনছেন। আপাই শুধু বাইরে এসে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। এই পানি আর তোঁয়ালে আপাই এনে আমার হাতে দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর এখনও শোনাই হয়নি কোন কথা।

দিলওয়ার আলীর দীল এক অনির্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত হয়ে গেল। এক সুবাসিত সুষমায় তাঁর আঁধার ঘেরা অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মাহমুদা খাতুন দিলওয়ার আলীকে ভুলেনি।

আবার তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়লো। কিতাবউদ্দীন পুনরায় ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে আরাম করে বসুন হুজুর। আপনি আপত্তি বা দেরী করলে আপা আমার উপর গোস্বা হবেন। ভাববেন, আমি আপনাকে ঠিকমতো অনুরোধ করতে পারিনি।

দিলওয়ার আলী উঠতে উঠতে বললেন—আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছি।

দিলওয়ার আলী বেরিয়ে এসে হাতমুখ ধুতে লাগলেন। তোঁয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থেকে কিতাবউদ্দীন ফের বললো—আমাকে আবার এখনই দহলীজে যেতে হবে। আপনার লোকদের ঠিকমতো তয়তদবির হচ্ছে কিনা, ওটাও আপা আমাকে দেখতে বললেন।



www.amarboi.org

জবাব দেয়ার ভাষা আর দিলওয়ার আলীর ছিল না। হাতমুখ ধুয়ে মুছে তিনি এসে আরাম করে বসলে পানির পাত্র ও তোঁয়ালে নিয়ে কিতাবউদ্দীন চলে গেল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। এরপরেই দিলওয়ার আলীর নীরব কক্ষ সরব হয়ে উঠলো। আফসারউদ্দীন সাহেবের বিরামের ব্যবস্থা করে দিয়েই সবাই এবার এদিকে ছুটে এলেন। ঝড় উঠলো দিলওয়ার আলীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের। পিছে পিছে আরো দু'তিনজন লোকসহ আবিদ হোসেন সাহেব দিলওয়ার আলীর কক্ষে এসে সরবে ঢুকলেন। পাশের কক্ষের সাথে সংযোগকারী ভেতরের দরজার পর্দার আড়ালে ভিড় করে এসে দাঁড়ালেন আফসারউদ্দীনের আম্মা ও নানীজান সহ বাড়ীর প্রায় তামাম মহিলা। নারী-পুরুষ সবাই দিলওয়ার আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। সবার আগে আবিদ হোসেন সাহেব আবেগ ভরে ভূমিকা করে শুরু করলেন— দেখো হে সেপাই, যারা প্রকৃত মানুষ, মানুষের প্রতি তাদের যে একটা স্বাভাবিক এহসান আর আন্তরিক দরদ থাকে, এটা এবার তুমি তোমার নিজেকে দিয়ে দেখো। তোমার জন্যে সেবার আমরা যে সামান্যটুকু করেছিলাম, সেটুকু করাকেই তুমি "তকলিফ-তকলিফ" বলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। অকারণেই তুমি আমাদের তকলিফ দিচ্ছো বলে মাথা কুটে মরছিলে। মানুষের মুসিবতে মানুষের স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার মধ্যে যে তকলিফ কিছু নেই, এটা তেমন স্বীকার করতেই চাওনি সেদিন। কিন্তু আজ? আজ তুমি কি এটা দেখালে?

আবিদ হোসেন সাহেবের এই প্রবল আবেগের মুখে দিলওয়ার আলী হীনবল হয়ে গেলেন। সংকুচিত হয়ে তিনি বললেন— না-না, এ আর এমন কি বিরাট ব্যাপার? এর জন্যে এতটা—

আগুনে খড় পড়লো। আবিদ হোসেন সাহেব দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস ভরে বললেন — এতটা মানে? বাপরে বাপ্! একি মহত্ব! একি দুর্লভ মনুষত্ব বোধ! নেহায়েতই চোখের সামনে পেয়েছিলাম বলেই আমরা না হয় তোমার জন্যে যৎসামান্য করেছিলাম। কিন্তু তুমি একি অনন্য মানবিক গুণ দেখালে? ইনসানীয়তির একি আসমানী ঐশর্য তুমি উদোম করে তুলে ধরলে?

দিলওয়ার আলী আবার একটু প্রতিবাদ করতে যেতেই তাঁকে সশব্দে থামিয়ে দিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব জড়ালো কণ্ঠে বললেন— তুমি একজন সেনানায়ক। একাও নও, আনন্দ ভ্রমণেও রত নও। দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে তুমি একটানা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসছো। মাথায় তোমার কত রকম চিন্তা-ভাবনা, সেপাইদের সুষ্ঠুভাবে গন্তব্যস্থানে পৌছানো নিয়ে কত রকম উদ্বেগ তোমার দীলে! সেই তুমি দেখলে, একটা ঘোড়ার গাড়ী মাঠের পথে যাচ্ছিল হঠাৎ সেটা নেই, আর অমনি তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলে? একটা ধাবমান বাহিনীকে অমনি তুমি থামিয়ে দিলে? অমনি তুমি ভাবলে, নিশ্চয়ই কোন মুসিবত হয়েছে তাদের? তাদের জন্যে অমনি তোমার কেঁদে উঠলো অন্তর? চেনা নেই জানা নেই, কাছে কোলেও নয়, হলোই বা কারো কোথাও কোন রকম মুসিবত, ঐ অবস্থায় কেউ



www.amarboi.org

কাউকে সাহায্য করতে এগোয় ? না এটা গণ্যের মধ্যে নেয় কেউ ? একি বিচিত্র দীলের পরিচয় দিলে তুমি !

দিশেহারা দিলওয়ার আলী কোন মতে বললেন— জনাব !

ঃ অথচ তোমার এই অতুলনীয় মানবতা আর পরের কষ্টের প্রতি তোমার এই অনুপম সহানুভূতির জন্যেই আমার আফসারউদ্দীন আজ জীবন ফিরে পেলো ! একটা অসহায় মরণোন্মুখ মানুষ নিশ্চিত মউতের হাত থেকে বেঁচে গেল !

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দিলওয়ার আলী এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন— না-না জনাব, এতটা বলবেন না। আফসারউদ্দীন সাহেবকে বাঁচিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা। আমি একটা সেরেফ উপলক্ষ্য মাত্র। এর জন্যে এতটা বলে আপনি আমাকে অনর্থক শরমিন্দা করবেন না।

আবেগের আধিক্যে বৃদ্ধ আবিদ হোসেন সাহেব হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি নিস্তেজ হয়ে এলেন এবং ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন— শরম দেয়ার কথা নয়রে ভাই ! তোমার ঐ আজব ইনসানিয়তী আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে, সেই কথা বলছি।

কক্ষটির ভেতরে ও বাইরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমর্থন সূচক গুঞ্জরণ তো ছিলই, আবিদ হোসেন সাহেব থামতেই কথা ধরলেন দরজার আড়ালে দণ্ডায়মানা জেনানাবৃন্দ। বাঁধভাঙ্গা কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশের সাথে তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে এনৃতার দিলওয়ার আলীর সার্বিক ভালাই কামনা করতে লাগলেন। আফসারউদ্দীনের আম্মা ও নানীজানের আকুতি আর বিহ্বলতার পরিসমাপ্তি ঘটতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো। এখানেও প্রতিবাদ সাকুল্যে অগ্রাহ্য হওয়ায়, দিলওয়ার আলী অসহায়ভাবে চুপচাপ বসে রইলেন। সবশেষে আফসারউদ্দীনের আম্মা আজিজুন নেছা বেগম যে কথাটি বললেন, সেইটেই দিলওয়ার আলীর দীলে গভীর দাগ কাটলো। দিলওয়ার আলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন— এযাবত তুমি আমার বেটার মতোই ছিলে বাপজান। আজ থেকে তুমি আমার একেবারেই বেটা হলে আর একটা। বিলকুল আপন বেটা— একথাটা কখনোও যেন ভুলে যেও না বাপ ! তোমার মতো এমন একটা বেটা পাওয়া বড়ই খোশ্ কিস্‌মতির ব্যাপার। এই কিস্‌মত থেকে আমাকে যেন বঞ্চিত করো না বাপজান !

উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসতেই আবিদ হোসেন সাহেব সবাইকে তাড়া দিয়ে বললেন— আরে একি-একি ! এমনভাবে সবাই তোমরা ভিড় জমালে কেন ? ভাগো-ভাগো ! লোকটাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দাও।

ভেতর বাইরের সকলেই সাথে সাথে নিষ্ক্রান্ত হলো। জেনানারাও এবার চুপচাপ মেরে গেলেন। আবিদ হোসেন সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে বললেন— তা বাপু, তোমরা কি সবাই এভাবে তারিফ করেই ছেলেটার পেট ভরাবে, না মুখে দেয়ার আনযাম কিছু করবে ?

সম্বিতে ফিরে এসেই আজিজুন নেছা বেগম সোচ্চার কণ্ঠে বললেন— ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, করছি-করছি, অবশ্যই করবো। আমার নয়া বেটা আমার মকান থেকে খালি মুখে



www.amarboi.org

ফিরে যাবে, এ কখনো হতে পারে ? না হতে দেবো আমি ? এখন তো তার মুখে দেয়ার ব্যবস্থা কিছু করবোই, রাতের খানাটাও খাইয়ে তবে আমি যেতে দেবো বাপজানকে। আপনি একটু তার সাথে গল্প করুন, নাস্তাটা আমি তৈয়ার করে নিয়ে এই অল্পক্ষণেই আসছি—

আবিদ হোসেন সাহেব আপত্তি করে বললেন—সেরেফ এখানে বসে গল্প করলেই কি চলবে আমার ? ভাইজান এখনও মসজিদ থেকে ফিরলেন না। দহলীজে আরো লোক আছে, তাদের দেখে কে ?

আজিজুন নেছা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তাহলে যান-যান, আপনি ওদিকে দেখুন। নাস্তাটা তৈয়ার করে নিয়েই আমি আসছি—

বলেই তিনি সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্য করে ফের বললেন—এই চলো-চলো, পাকঘরের দিকটা দেখি সবাই চলো। আম্মাজান, আপনিও আসুন। আফসারউদ্দীন একা আছে, আপনি গিয়ে তার কাছে একটু বসুন। আমরা গিয়ে নাস্তাপানি আর খানাপিনার আনযামটা দেখি—

জেনানারা সকলেই দ্রুতপদে চলে গেলেন। ও ঘর যে শূন্য হলো, দিলওয়ার আলী এ ঘরে বসেই তা অনুমান করতে পারলেন। খানাপিনার ব্যাপারে তিনি আপত্তি তোলার চেষ্টা করতেই আবিদ হোসেন সাহেব তা অগ্রাহ্য করে বললেন—আরে রাখোরে ভাই তোমার কথা। এতদিন পরে আজ এভাবে এলে। তোমার ওসব ওজর-আপত্তি আর শুনছে কে ? চুপ্‌চাপ্ বসে থাকো, এজন্যে নকরী তোমার যাবে না। আমি যাই, ওদিকটা দেখি—

বলতে বলতে আবিদ হোসেন সাহেবও তখনই বেরিয়ে গেলেন। দিলওয়ার আলী যে একা ছিলেন, তেমনই আবার একা একাই বসে রইলেন। চারদিক নীরব। কোথাও কেউ নেই। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্ কেটে গেল। দিলওয়ার আলী কি করবেন, বারান্দার দিকে বেরিয়ে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করবেন কিনা ভাবতেই, পর্দার ওপার থেকে একটা অনুচ্চ মন্তব্য এলো—তাহলে ভাই আমার বেড়ে গেল একটা ?

উৎকর্ণ হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী সেইদিকে তাকালেন। কণ্ঠস্বরটা মাহমুদা খাতুনের বলেই তাঁর মনে হলো। কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্য করলো সে, এটা নিশ্চিত হতে না পেরে দিলওয়ার আলী জবাব দিতে পারলেন না। তিনি উদগ্রীব হয়ে সে দিকে চেয়ে রইলেন।

আবার আওয়াজ এলো—কি ব্যাপার ! কথা বলছেন না যে ?

দিলওয়ার আলী ইতস্ততঃ করে বললেন—জি ? আমাকে বলছেন ?

ঃ হ্যাঁ, আপনাকেই। বুঝতে পারছেন না ?

ঃ জি–মানে আপনি কি—

ঃ মাহমুদা খাতুন। চিনতেও পারছেন না নাকি ?

দিলওয়ার আলী শশব্যস্তে বললেন—জি–জি, পারছি। কি যেন বললেন ?

ঃ বললাম, ভাই আমার আর একটা বেড়ে গেল তাহলে ?



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন — ও-হ্যাঁ, তাইতো গেল দেখছি।

মাহমুদা খাতুন অনাসক্ত কণ্ঠে বললো — ভাল। বাড়লে আর ঠেকাবে কে ?

ঃ সেকি ! আপনি এতে নাখোশ হলেন নাকি ?

ঃ না-খোশ না হলেও, খুশী হতে পারছিনে।

ঃ কেন–কেন ?

ঃ এমন ভাই একটা বাড়লেই কি ? দশটা বাড়লেই কি ?

ঃ তার মানে ?

ঃ কসম খাওয়ার মতো করে বলার পরও যে মানুষ বেমালুম সব ভুলে যায়, পরকে পর ছাড়া অন্যকিছু ভাবে না বা তাদের কোন খোঁজ খবর রাখে না, সে মানুষ ভাই হলেই বা কি আর অন্য কিছু হলেই বা কি ? চোখের আড়াল হলেই তো সব মিছে।

দিলওয়ার আলী প্রীত হলেন। মাহমুদা খাতুন সত্যিই মনে রেখেছেন তাঁর কথা, এটা বুঝে তিনি মনে মনে আনন্দিত হলেন। মনের ভাব গোপন করে বললেন — না-না, আপনার এ অভিযোগ কিন্তু সত্যি নয়।

মাহমুদা খাতুন শক্ত কণ্ঠে বললেন — সত্যি নয়। সেই যে সেবার এমন করে বললাম, "গিয়ে যেন ভুলে যাবেন না বিলকুল সেটা মানুষের কাজ হবে না।" কই, রেখেছেন আপনি সে কথা ?

দিলওয়ার আলী আমতা আমতা করে বললেন — তা মানে—

মাহমুদা খাতুন এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন — আমার নিঃসঙ্গ জীবনে আপনাকে ক'দিন পেয়ে কতই না বর্তে গিয়েছিলাম ! গলে গিয়েছিলাম আপনাকে তখন ভেবেছিলাম বড়ই ভাল মানুষ আপনি, কতই না আপন হয়ে গেলেন আপনি আমাদের ! ঐ একটা ধাঁধা–মানে মিথ্যা মোহে পড়ে কি পেরেশানীটাই না সেই থেকে আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে !

ঃ মিথ্যা মোহ !

ঃ মিথ্যা আশা। আপনি কি মনে রেখেছেন আমাদের, না খোঁজ নিয়েছেন কখনোও।

ঃ নেইনিই যে, সেটাই বা কি করে বুঝলেন ?

ঃ না বুঝার কি আছে ? খোঁজ নিলে তো আসতেন আপনি একবার। দেখা করতেন আমাদের সাথে ? সেই থেকে আপনার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। তবু আমি বুঝবো, আপনি মনে রেখেছেন আমাদের কথা ? খোঁজ নিয়েছেন আমাদের ?

দিলওয়ার আলীর মাথায় দুর্মতি চেপে গেল। হিতে যে আরো বিপরীত হতে পারে, সেটা তিনি ভাবলেন না। তিনি ঠেশ্ দিয়ে বললেন — খোঁজ নিয়েই বা কি করবো ? মুখোমুখী দেখা হলেও তো কথা বলেন না আপনি !

বুঝতে না পেরে মাহমুদা খাতুন বললো — কি রকম ?

ঃ একবার তো আপনাকে আমি মুখোমুখীই দেখলাম। কিন্তু আপনিই আমাকে দেখেও দেখলেন না, কথাও বললেন না।



www.amarboi.org

মাহমুদা খাতুন সবিস্ময়ে বললো— সেকি ! কোথায় ?

ঃ এই শহরের ঐ দক্ষিণ দিকে। গত মুহররমের সময় ওখানে এক বাড়ীর ছাদের উপর আপনাকে আমি দেখলাম। ঐ বাড়ীর সামনে কোথায় যেন মর্সিয়া হচ্ছিল। আপনারা অনেক কয়জন মেয়েছেলে ঐ সময় ঐ ছাদের উপর ছিলেন।

খেয়াল হতেই মাহমুদা খাতুন সরবে বলে উঠলেন— ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছিলাম-ছিলাম। ওটা আমার মক্তবের এক বান্ধবীর আত্মীয়ের বাড়ী। ঘটনাচক্রে সেদিন ওখানে গিয়েছিলাম আর ঐ ছাদের উপর বসে মর্সিয়া শুনছিলাম। আপনি কি করে জানলেন ?

ঃ আপনি কাশতে কাশতে এসে ঐ ছাদের পেছন দিকে থুথু ফেলে গেলেন। যেখানে থুথু ফেললেন, ওর একটু পাশেই আমি আমার ঘোড়ার পিঠে বসেছিলাম। আপনাকে আমি একদম সামনাসামনি দেখলাম। কিন্তু আপনি আমার দিকে মোটেই তাকালেন না।

ঃ কি তাজ্জব ! তাহলে কথা বলেননি কেন ?

ঃ কি করে বলবো ? আপনি যে আবার তখনই চলে গেলেন।

ঃ ডাক দেবেন। আমার নাম ধরে ডাক দেবেন। তবু শুনতে না পেলে, খুব জোরেশোরে ডাক দেবেন।

দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে বললেন —তাই কি দেয়া যায় ?

মাহমুদা খাতুন তাজ্জব হয়ে বললো —যায় না মানে ! কেন দেয়া যায় না ?

ঃ আপনি আবার কি মনে করেন ! ওভাবে ডাক দিলে নাখোশ-নারাজ হন কিনা —

মাহমুদা খাতুন আহত কণ্ঠে বললেন — নাখোশ-নারাজ হবো ! আপনি আমাকে ডাক দিলে আমি নাখোশ-নারাজ হবো ? এতদিন পরে খোঁজ পাওয়ার পরও আমি খুশী না হয়ে নাখোশ হবো — এইটেই আপনি ভাবলেন।

ঃ তাইতো ভাবলাম।

ঃ ঐ ভেবেই ডাক দিলেন না আপনি ? সামনাসামনি দেখেও ডাক দিলেন না আমাকে ?

ঃ মানে, সাহস পেলাম না।

মাহমুদা খাতুন আফসোস্ করে বললো — পারলেন ? আমাকে মুখোমুখী দেখতে পেয়েও আমার সাথে কথা না বলে আপনি চলে যেতে পারলেন ?

ঃ না পেরে যে উপায় কিছু ছিল না।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাহমুদা খাতুন গম্ভীর কণ্ঠে বললো— হুঁউ ! আপনি যে তা পারবেন, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝে নিয়েছি।

ঃ বুঝে নিয়েছেন ?

ঃ হ্যাঁ। আর সেই জন্যেই বলছি, আপনার মতো বান্ধব একটা বাড়লেই বা কি আর দশটা বাড়লেই বা কি ?

মাহমুদা খাতুন নীরব হলো। দিলওয়ার আলী বললেন — দেখুন, কথাটা কিন্তু আপনার —



www.amarboi.org

ফুঁশে উঠলো মাহমুদা খাতুন। বললো—কথা আমার যা-ই হোক, আপনার সম্বন্ধে ধারণা আমার একতিল ভুল নয়। কোন রকম ভরসা করার মতো লোক আপনি নন।

মাহমুদা খাতুন এ প্রসঙ্গে দিলওয়ার আলীকে যতই দোষারোপ করতে লাগলো, দিলওয়ার আলীর দীল তৃপ্তিতে ততই কানায় কানায় ভরে উঠতে লাগলো। তিনি পরম আনন্দের সাথে অনুভব করতে লাগলেন, কিঞ্চিৎ নয়, সামান্য নয়, এই একরোখা জেদী মেয়েটার হৃদয়ে অনেক বেশী স্থান তিনি দখল করে বসে আছেন। মাহমুদা খাতুন তাঁকে অবহেলা না করে একটু স্মরণে রাখলেই দিলওয়ার আলী যেখানে ধন্য হতেন, সেখানে স্মরণ রাখার এই বিপুল তুফান তরিয়ে উঠতে গিয়ে তিনি যেমন হিমশিম খেতে লাগলেন, তেমনই এই আশাতীত পাওনার খোশ-কিস্‌মতির জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে পুনঃপুনঃ শোকরগুজারী করতে লাগলেন। তিনি ভেবে গর্ববোধ করতে লাগলেন যে, মাহমুদাকে নিয়ে এযাবত তিনি আদৌ ছাইয়ের দড়ি পাকাননি।

দিলওয়ার আলীকে অনেকক্ষণ কথা বলতে না দেখে মাহমুদা খাতুন পুনরায় সরোষে বললো—নেহায়েত দায়ে পড়েই আজ আপনি এসেছেন এখানে, তাই নয়?

খেয়ালে এসেই দিলওয়ার আলী কপট অভিমানে বললেন—আচ্ছা, আপনার ভাইজানের কিছুটা উপকারে আসার জন্যে এই যে, এত লোক এত খুশী হলেন, আমার এত তারিফ করলেন, আর আপনি কেবলই গোস্বা হচ্ছেন আমার উপর? ঐ রকম তারিফ-প্রশংসা না করেন, সে কথা ভেবেও তো আমার উপর কিছুটা তুষ্ট হতে পারেন আপনি?

কণ্ঠে কোন পরিবর্তন না এনে মাহমুদা খাতুন বললো—তারিফ আপনার করবো না কেন, বা সে জন্যে অশেষ ধন্যবাদ দেবো না কেন? আপনার রহমের জন্যেই আমার একমাত্র ভাইকে আবার ফিরে পেলাম আমি। শুধু ধন্যবাদ নয়, এ জন্যে আপনি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার হকদার। গায়ের চামড়া কেটে দিলেও আপনার এ ঋণ আমার শোধ হবার নয়।

দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন—তওবা-তওবা! এতটা বলবেন না?

ঃ বেশী বললাম কি?

ঃ আমাকে আপনারা প্রীতির চোখে দেখেন বলেই অনেক বেশী করে বলছেন সবাই।

ঃ সবাই কি বলছেন সেটা সবাইরাই জানেন। আমার কথা সেটা নয়। এই এতবড় একটা উপকার আনোয়ার, মনোয়ার, আতোয়ার আলী—যে কেউ করলেও ঐ একই রকম কৃতজ্ঞতা সবাইকে আমি জানাতাম। দিলওয়ার আলী সাহেব করেছেন বলে কোন অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতা জানানোর আমার কোন কারণ নেই।

ঃ মানে?

ঃ আমার ভাই জেনেই তো ঐ উপকার আপনি করেননি। আপনি ওটা করেছেন আপনার বিরল ও মহৎ মানবিক গুণের কারণে। এই মাহমুদার ভাই না হয়ে আবিদা, জোবেদা, ফরিদা—যে কোন মেয়ের ভাই হলেও এই উপকার আপনি করতেন।



www.amarboi.org

মাহমুদার এখানে অতিরিক্তভাবে পুলকিত হওয়ার কি আছে ? ঐ আবিদা-জোবেদারাও যতটা কৃতজ্ঞ হতো আপনার কাছে, আমিও ঠিক ততটাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ঐ আবিদা-জোবেদা-ফরিদারাও গায়ের চামড়া কেটে দিলে তাদের ঋণ শোধ হতো না আপনার কাছে, আমিও তা দিলে শোধ হবে না ঋণ আমার। আধিক্যের কোন কারণ এখানে নেই।

মাহমুদা খাতুন কি বলতে চান, দিলওয়ার আলী তো বুঝলেন এবং সেই সাথে তিনি স্তম্ভিত হলেন আবিদ হোসেন সাহেবের ভাষায় এই "গাল-মন্দ করা" মেয়েটার অনুভূতির গভীরতা দেখে। দিলওয়ার আলী তাই রসিকতা করে বললেন—বাপ্‌রে ! একেবারে নিক্তি মাপা কৃতজ্ঞতা আপনার ? কোন ফাও-টাও নেই ?

ঃ কি করে থাকবে ? ফাও দেয়ার জন্যে দাতার মধ্যে যে অতিরিক্ত উৎসাহ পয়দা করার দরকার, তেমন কোন উৎসাহ কি আপনি পয়দা করেছেন আমার মধ্যে যে আমি বিগলিত হয়ে আপনার প্রাপ্যের অধিক আপনাকে দিতে যাবো ?

ঃ আচ্ছা। তা এই বদনসীব দিলওয়ার আলী আপনার মধ্যে সেই উৎসাহটা পয়দা করতে ব্যর্থ হলো কি কারণে ? আপনাদের কোন খবর করেনি সে, এই কারণে ?

মাহমুদা খাতুন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললো—সেটা আপনিই বিবেচনা করে দেখুন। এত অনুরোধ করে বলার পরও আপনি যে পর সেই পরই রয়ে গেলেন, আমাদের কথা খেয়ালেও রাখলেন না, খবরও নিলেন না। আপনার প্রতি অতিরিক্ত প্রীত হওয়ার কি আমার থাকতে পারে, বলুন ?

ঃ বটে !

ঃ এই এলেন—এই এলেন করে আমি গোপন প্রতিক্ষায় দিনের পর দিন আপনার পথ চেয়ে রইলাম, আর আপনি—

চাপা আফসোসে মাহমুদা খাতুন ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। রসিকতা পরিহার করে দিলওয়ার আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খোঁজ-খবর যে আমি করিনি, এ সম্বন্ধে আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কি করে ?

মাহমুদা খাতুন সচকিত হলো। উদগ্রীব কণ্ঠে বললো—করেছিলেন ?

ঃ অনেক করেছি। করেছি এবং করিয়েছি। আপনাদের ঠিকানাটা যদিও আমার জানা ছিল না, তবুও খোঁজ করতে কম করিনি আমি। অন্ধকারে ও আন্দাজে অনেক হাতড়ানো হাতড়িয়েছি।

মাহমুদা খাতুন প্রসন্ন কণ্ঠে বললো—তাই নাকি ! সত্যিই ?

ঃ আপনাকে ঐ ছাদের উপর দেখার পরই আমি লোক পাঠিয়েছি সেখানে। সে লোক ঐ গোটা মহল্লাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে। কিন্তু আপনাদের কোন হদিস করতে পারেনি।

ঃ ওমা—সেকি ! সে কথাটা তাহলে বলবেন তো আগে ?

ঃ এরপর আমিও সুযোগ পেলেই খোঁজ করেছি অনেক স্থানে। আপনার নানাজান এখানের একজন ইমাম—এইটুকুই স্মরণ আছে আমার। তাঁর নামটা কেউ আপনারা



www.amarboi.org

বলেছিলেন কিনা, সেটা আমার খেয়াল নেই। তবু তিনি যে একজন ইমাম, এইটুকু জেনেই অন্য কত ইমামকে যে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলাম, সে হিসেব আর দেবো কি?

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে মাহমুদা খাতুন বললো—সেকি ! কি তাজ্জব ! এতটাই করেছেন আপনি ? আমি ভেবে বসে আছি, আপনি একদম ভুলেই আছেন আমাদের ! ইশ্ ! সেই রাগে কতই না বদজবান বলে ফেলেছি আপনাকে। আমার কসুর হয়ে গেছে—জব্বোর কসুর হয়ে গেছে। আপনি আমাকে মাফ করে দিন—

বলেই চললেন দিলওয়ার আলী—এইটুকুই শেষ নয়। কোথাও কোন হদিস করতে না পেরে অবশেষে ঠিক করলাম, ঐ ফৌজীপুরে গিয়ে আপনাদের ঠিকানাটা আমি যোগাড় করে আনবো। একদিন বেরোতেও গেলাম। কিন্তু নবাব বাহাদুর তলব দেয়ায় বেরুতে আর পারলাম না। এরপর একটার পর একটা সরকারী কাজ ঘাড়ে এসে চাপতে লাগলো। ফাঁক আর পেলাম না। সরকারী কাজ থেকে কয়দিনের ছুটি নিয়ে আপনাদের খোঁজে বেরোবো—এক্ষণে এই রকম চিন্তা-ভাবনা করতেই আল্লাহর রহমে আজ এই হঠাৎ করেই সাক্ষাত পেলাম আপনাদের।

মাহমুদা খাতুন এ খবরে আরো অধিক বিহ্বল হয়ে উঠতেই নাস্তাপানি সহকারে আবিদ হোসেন সাহেব, আজিজুন নেছা বেগম, কিতাবউদ্দীন ও আরো কয়েকজন সশব্দে কক্ষে এসে ঢুকলেন। মাহমুদা খাতুন নীরব হলো। দিলওয়ার আলীও নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আজিজুন নেছা বেগম অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে নাস্তা পানির তদারকি করতে লাগলেন।

বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় দিলওয়ার আলী এবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নাস্তায় বসে তাই তিনি প্রশ্ন করলেন—আফসারউদ্দীন ভাই সাহেবের এখন হালত্ কি আম্মাজান ?

আজিজুন নেছা বললেন—মোটামুটি ভাল বাপজান। আল্লাহ তায়ালার রহমে ব্যথা-বেদনা আর বাড়েনি। তবে গায়ে একটু জ্বর উঠেছে।

ঃ সেতো হবেই। যে ধকলটা গেল ! তা দাওয়াই-টাওয়াই কি—

ঃ সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে। জ্বর আরো বাড়লে হেকিম সাহেব নিজে আসবেন বলেছেন।

ঃ আচ্ছা। উনি কি জেগে আছেন ?

ঃ না বাপজান। এই একটু আগে ঘুমিয়ে গেছে।

দিলওয়ার আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—একটু আগে ঘুমিয়ে গেলেন ? তাহলে আজ আর তাঁর সাথে দেখা করা হলো না।

আবিদ হোসেন সাহেব সবিস্ময়ে বললেন—হলো না মানে ?

দিলওয়ার আলী বললেন—এ অবস্থায় তাঁকে তো ঘুম থেকে জাগানো ঠিক হবে না।

ঃ জাগাবে কেন ? ঘুম ভাঙ্গলে দেখা করবে।

দিলওয়ার আলী ম্লান হেসে বললেন—জিনা দাদু, আপনি বুঝতে না চাইলেও, আর অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখনই আমাকে যেতে হবে।



www.amarboi.org

আজিজুন নেছা বেগম শশব্যস্তে বললেন—সেকি বাপজান, সেকি ! রাতে তোমার খাওয়ার জন্যে আনযাম শুরু করে দিয়েছি—

অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দিলওয়ার আলী বললেন—মেহেরবানী করে সেটা স্থগিত করুন আম্মাজান। আল্লাহ্ তায়ালা চাহেন তো অন্যদিন এসে খেয়ে যাবো।

আবিদ হোসেন সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কি গজব ! তার মানে ?

দিলওয়ার আলী ঐ একইভাবে বললেন—নারাজ হবেন না দাদু। আমার অবস্থাটা একটু বুঝার কোশেশ করুন। যে অবস্থায় আমি এখানে এসেছি, তাতে এই যে এত সময় থাকলাম এখানে, এইটেই আমার ঠিক হয়নি। একটা পথশ্রান্ত বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আমি রাজধানীতে ফিরে আসছি। বাহিনীটা নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে ঠিক ঠিকভাবে পৌছানোর আগে ফৌজ থেকে সেনানায়কের বিচ্ছিন্ন হওয়া বিধিসম্মত নয়। যে কারণেই হোক, আমি তা হয়েছি। নিজে উপস্থিত না থাকলে, ঘাঁটিতে পৌছার পর সেপাইদের মাঝে একটা বিশৃঙ্খলা পয়দা হতে পারে। আর তাহলে, আমার বড় বদনামী হবে। এছাড়া যতক্ষণ আমি না ফিরছি, নানাবিধ প্রয়োজনে ততক্ষণ অনেকেই তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে। সুতরাং আজ যাই, দুই একদিনের মধ্যেই আমি আবার আসবো ইনশআল্লাহ্।

তবু তাঁরা কিছুক্ষণ টানাটানি করলেন। কিন্তু দিলওয়ার আলীর বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে তাঁরা শেষ পর্যন্ত হার মানলেন।

নাস্তা অন্তে দিলওয়ার আলী বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। চারদিকে সতর্ক নজর রাখার পরও তিনি মাহমুদা খাতুনের আর কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। ফটকের কাছে এসে আবার তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। এবার দেখলেন, তাঁর দিকে চেয়ে মাহমুদা খাতুন দ্বিতল কক্ষের বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে।

## ৫

দুই-একদিনের মধ্যেই তাঁদের মকানে আবার আসবেন—এই মর্মে আবিদ হোসেন সাহেব আর আজিজুন নেছা বেগমকে কথা দিয়ে এলেও, দিলওয়ার আলী ঠিক ঠিক কথা রাখতে পারলেন না। এক হপ্তার অধিককাল ধরে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারী কাজে আটকে রইলেন। কাজগুলো অবশ্য তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ নয়, উৎসব-আমোদের কাজ।

নবাব সুজাউদ্দীন খানের বড় আগ্রহ বিলাসিতায়। আগ্রহ নয়, আসক্তি। তাঁর বিচক্ষণতা তামামই এখানে এসে মার খেয়েছে নির্মমভাবে। আনন্দ-উৎসব আর আমোদ-প্রমোদের প্রতি যতটা তার টান, এর অর্ধেকটাও যে প্রশাসনিক কাজের প্রতি তাঁর আছে, এ বিশ্বাস তিনি অনেকের মনেই পয়দা করতে পারেননি। বিশেষ করে মসনদে আসার পর থেকেই প্রশাসনিক কাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আবদ্ধ থাকার



www.amarboi.org

মানসিকতা তাঁর নিদারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। নেহাতই যেটুকু না করলেই নয়, দুইহ-াতে ঠেলে সেটুকু করার পরই তিনি মহলে ফিরে গিয়ে আমোদের আনযাম করেন। এর মাঝে সরকারীভাবে উৎসব — অনুষ্ঠান করার ছোটবড় কোন একটা কারণ দেখা দিলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন ঐ নিয়েই মেতে থাকেন। এখানে তিনি ক্লান্তি — বোধ করেন না।

এমনই একটা মওকা তিনি পেয়েছেন তাঁর জামাতা, ঢাকার সহকারী সুবাদার দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেছেন। এই বিজয়ের কৃতিত্বটা অবশ্য অধিকটাই মীর হাবিবের। মীর হাবিব এক অনন্য পুরুষ। নিরক্ষর হলেও সর্ববিষয়ে বিস্ময়কর দক্ষতার তিনি অধিকারী। রণে, প্রশাসনে ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও পারদর্শিতা ঈর্ষণীয়। পারস্যের সিরাজ নগর থেকে বাংলা মুলুকে তিনি ব্যবসায় করতে আসেন। এই অবস্থায় দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর সাথে পরিচয় ঘটে তাঁর। মীর হাবিবের বিরল বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হন নাবাব জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী। মীর হাবিবকে তিনি তাঁর সহচর করে নেন। সহকারী সুবাদার হয়ে ঢাকায় যওয়ার কালে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী মীর হাবিবকে তাঁর উপদেষ্টা করে নিয়ে যান। মীর হাবিবও ঈমানদারীর সাথে মুর্শিদকুলীর এই প্রীতির ইজ্জত দিতে থাকেন। অক্লান্ত শ্রম, বুদ্ধি ও লাগসই বাণিজ্যনীতির দ্বারা তিনি ঢাকার সমৃদ্ধি ও দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর প্রশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এ কারণে তাঁরা উভয়েই নবাব সুজাউদ্দীন খানের অকুণ্ঠ তারিফের হকদার হন।

এই সময়ই ঘটনাটা ঘটে। ত্রিপুরার এক অংশের এক রাজপুত্র তার চাচার দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ঢাকায় এসে ঢাকার সহকারী সুবাদারের শরনাপন্ন হয় এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে মদদ প্রার্থনা করে। দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী মীর হাবিবের পরামর্শ চাই-লে, মীর হাবিব তৎক্ষণাৎ এই রাজপুত্রকে সাহায্য করার পরামর্শ দেন এবং লড়াইয়ের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। আকা সাদিক নামক এক জঙ্গী জমিদারকে নিয়ে মীর হাবিব ত্রিপুরা অভিযানে রওনা হন এবং ঐ রাজপুত্রকে পথপ্রদর্শক করে নিজের বুদ্ধি ও রণকৌশলের মাধ্যমে তিনি ঐ জবরদখলকারী রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ওয়াদামাফিক ঐ রাজপুত্রকে তার রাজ্যে বসিয়ে দেয়ার পর ঐ রাজপুত্রের সহযোগিতায় আকা সাদিক সহ মীর হাবিব তাঁর অভিযান অব্যাহত রাখেন। অতপর জানবাজী রেখে তিনি ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরার অবশিষ্ট সমুদয় অংশ জয় করেন এবং ঐ রাজপুত্রের রাজ্যবাদে গোটা ত্রিপুরারাজ্য বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত করেন। সব শেষে আকা সাদিককে ঐ বিজিত ভূখণ্ডের ফৌজদার নিযুক্ত করে প্রচুর ধনরত্ন ও বিপুল সংখ্যক ত্রিপুরার হাতীসহ মীর হাবিব ঢাকায় ফিরে আসেন। দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী এই ধনরত্ন ও হাতীর অধিকাংশই নজরানা হিসেবে শ্বশুর অর্থাৎ নবাব সুজাউদ্দীন খানের কাছে প্রেরণ করেন।

এই হলো নবাব সুজাউদ্দীন খানের সেই মওকা। এর জন্যে সাড়ম্বর উৎসবের তেমন জরুরত ছিল না। কিন্তু এই বিজয়ে ও বিপুল ধনরত্ন লাভে নবাব সুজাউদ্দীন উল্লাসিত হয়ে উঠলেন এবং দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী ও মীর হাবিবের সৌজন্যে বিপুল এক



www.amarboi.org

উৎসবের আয়োজন করলেন। এই উৎসবে তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীকে "বাহাদুর" এবং মীর হাবিবকে "খান" উপাধি দান করলেন। দুই তিন দিন ধরে এই উৎসব চললো। কাজের লোক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নবাব এই উৎসবের অনেক কাজে দিলওয়ার আলীকে লাগালেন। ফলে, উৎসবের আয়োজন থেকে শুরু করে সমাপনী পর্যন্ত নানা কাজের মধ্যে দিলওয়ার আলী এক হপ্তার অধিককাল আটকে রইলেন।

উৎসবের ঝুট্ঝামেলা শেষ হলে হাতে বেশ সময় নিয়ে দিলওয়ার আলী আবার মাহমুদা খাতুনের নানাজানের মকানের দিকে রওনা হলেন। তাঁদের ফটকের কাছে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন আসরের ওয়াক্ত প্রায় আসন্ন। কিন্তু বিপুল উৎসাহ নিয়ে এসে তিনি ফটকের সামনে আটকে গেলেন। ফটকটা ভেতর থেকে বন্ধ। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে ফটকে তিনি বার কয়েক মৃদু কড়াঘাত করলেন। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। তিনি দমে গেলেন। কি করবেন, ভাবতে লাগলেন। ফটকের বাইরে কোন লোকজন কাছে কোলে নেই। ভেতরেও কাছে কোলে কেউ আছে বলে মনে করতে পারলেন না। ডাকহাঁক করলে, উচ্চৈস্বরে করতে হবে। দরজায় কড়াঘাত করলে, সবলে করতে হবে। এ দু'টোর কোনটাতেই তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর তাঁর সায় দিলো না। ভদ্রতায় বাধলো। কি করবেন স্থির করতে না পেরে, লহমা কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর কিঞ্চিৎ সরে এসে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন।

অবশেষে ফটকে আরো জোরেশোরে কড়াঘাত করার ইরাদা নিয়ে আবার তিনি ফটকের কাছে এলেন। দ্বিধাজনিত কারণে আবার তিনি নিমেষ কয়েক ফটকের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময় হঠাৎ ফটকটি সশব্দে খুলে গেল।

সচকিত হয়ে চোখ তুলেই তিনি হকচকিয়ে গেলেন। চাকর-নফর নয় বা কোন চেনা লোকও নয়। তাঁর সামনে দণ্ডায়মান সৌম্যদর্শন এক আকর্ষণীয় প্রবীণ। সফেদ শিরস্ত্রাণ, শুভ্র শ্মশ্রু, আচকান-আবরণ-চোখের ভ্রূ — তামামই দুগ্ধবৎ ধপধপে। লম্বা-চওড়া গুরুগম্ভীর এক মানুষ। গায়ের রং জিয়াদা উজ্জ্বল, চোখে-মুখে আভিজাত্যের ঝিলিক, বয়স সত্তরের ওপারে।

ফটক খুলে লাঠি হাতে ফটকের উপর পা দিতেই এই প্রবীণ ভদ্রোলোকটি দিলওয়ার আলীর একদম মুখোমুখী হয়ে গেলেন। একজন ফৌজী লোককে এভাবে ফটকের উপর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। কোনরকম সাড়াশব্দ ছাড়াই একজনের ফটকের উপর কেউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা তিনি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। আগন্তুকের মতলব ও ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খাটো হলো। তাই তিনি কিছুটা বিরূপ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন — কাকে চাই?

মুরুব্বীটির প্রশ্নে দিলওয়ার আলীর চমক ভাঙ্গলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিয়ে বললেন — জ্বি-মানে, আফসারউদ্দীন সাহেবকে।

সালামের জবাব দিয়ে মুরুব্বী ফের প্রশ্ন করলেন — আপনি আফসারউদ্দীনের সাথে মোলাকাত করতে চান?

ঃ জ্বি-জ্বি।

ঃ সে মকানে নেই। এখনও মাদ্রাসা থেকে ফেরেনি।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী উৎসাহ ভরে বললেন—উনি মাদ্রাসায় গেছেন ?

ভদ্রলোকে বিব্রত হলেন। জবাবে বললেন—কেন, এটাতো নতুন কিছু নয় ? মাদ্রাসাতেই কাজ তার। সে তো মাদ্রাসায় যাবেই। হররোজ যায়।

ঃ ও-হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো যাবেনই। তবে—

ঃ সে এখনও ফেরেনি। তার সাথে মোলাকাত করতে হলে পরে আসতে হবে বা অন্যদিন আসতে হবে।

ঃ এ্যাঁ ! মানে—

ঃ খুবই জরুরী হলে তার মাদ্রাসাতেও যেতে পারেন।

দিলওয়ার আলী ফাঁপড়ে পড়লেন। নিজের পরিচয়টা দিতে চেয়েও, কে এই মুরুব্বী, কোন আগন্তুক কিনা,—এসব কথা ভেবে সরাসরি পরিচয়টা তুলে ধরতে পারলেন না। আমতা আমতা করে বললেন—না, মানে আমি বলছিলাম—

ঃ বলুন ?

ঃ আমি গিয়ে দহলীজে একটু বসি। ছুটি হলে তো সরাসরি মকানেই ফিরে আসবেন উনি ?

ঃ নাও আসতে পারে। অন্য কোথাও গেলে হয়তো মাগরিবের আগে আসবে না।

ঃ তাই ? তাহলে—

ঃ এছাড়া, চাকর-নফর ছাড়া এ মকানে আর কোন পুরুষ মানুষ নেই এখন। একজন মুরুব্বী সবসময়ই থাকে। সেও আজ বাইরে গেছে। আমারও তাড়া আছে। দহলীজে আপনি একা একা বসে বসে করবেন কি ?

ঃ আমি—মানে আমার আসার কথা ছিল।

ঃ বেশ তো, পরে আসবেন।

ঃ পরে আসবো ?

ঃ এছাড়া আর করবেন কি ? আমার হাতেও সময় নেই যে আমিই আপনাকে সঙ্গ দেবো কিছুক্ষণ। বড় অসময়ে এসেছেন আপনি।

ঃ ও আচ্ছা। বলছিলাম কি ? আমি—

দিলওয়ার আলী এবার নিজের পরিচয়টা দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর কথার মাঝেই মুরুব্বীটি তখনই আবার ঝুট্‌মুট্‌ বলে ফেললেন—আজ আপনি যান। যদিও এভাবে বলাটা ভদ্রতার বরখেলাফ। তবু এছাড়া আর কোন উপায় আমি দেখছিনে। কোন কসুর নেবেন না। মেহেরবানী করে আপনি অন্যদিন আসুন বা পরে এসে খোঁজ নিন। আমি যাই, আমার অসময় হয়ে যাচ্ছে—.

বলেই দিলওয়ার আলীকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি পেছন ফিরে ডাক দিলেন—কিতাবউদ্দীন, ফটকটা বন্ধ করে দাও—

ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। দিলওয়ার আলী হতবাক। পরিচয় দেয়ার কোন মওকাই তিনি পেলেন না। তিনিও ঘুরে দাঁড়ালেন। হাঁক শুনে কিতাবউদ্দীন ফটকের কাছে ছুটে এলো। কিতাবউদ্দীনের নামটা কানে যাওয়ায় দিলওয়ার আলী তৎক্ষণাৎ রওনা না হয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। বিমর্ষ দিলওয়ার আলীকে দেখেই



www.amarboi.org

কিতাবউদ্দীন বিপুল উল্লাসে বলে উঠলেন—আরে-আরে আপনি ! সেকি হুজুর ! আপনি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে ?

কিতাবউদ্দীনের উচ্ছ্বাসে মুরুব্বীটি ঘুরে দাঁড়ালেন। মুরুব্বীকে লক্ষ্য করে কিতাবউদ্দীন ফের শশব্যস্তে বললেন—ইনিই হুজুর, ইনিই—ইনিই।

বুঝতে না পেরে মুরুব্বীট বললেন—ইনিই মানে ?

ঃ ইনিই সেই লোক।

ঃ সেই লোক !

ঃ সেই জব্বোর লোক—সেই আজব লোক।

ঃ আজব লোক !

ঃ সেই ফৌজী লোক, সেই বিশাল দীলের ইনসান, মানে সেই—

মুরুব্বী বিরক্ত হলেন। ধমক দিয়ে বললেন—থামো ! কি বলতে চাও, খোলাসা করে বলো।

ঃ ইনিই সেই লোক হুজুর, গাড়ী চাপা থেকে ভাইজানকে যিনি বাঁচালেন, ইনিই সেই লোক।

মুরুব্বীটি চমকে উঠে বললেন—এ্যাঁ !

ঃ ইনি না এলে ভাইজান তো বাঁচতেন না। যার কথা এখন সবসময় আপনারা বলছেন, এই তো সেই লোক।

অপরিসীম বিস্ময়ে মুরুব্বীটি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন—সেকি-সেকি। আপনিই সালার দিলওয়ার আলী সাহেব ?

দিলওয়ার আলী ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—জি-হ্যাঁ।

ঃ হায়-হায় ! সেকি কথা ! আপনাকেই আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি ফটক থেকে ? কি গজব ! বি বিভ্রান্তি !

বলতে বলতে ভদ্রলোক দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন দিলওয়ার আলীকে এবং ঐ একই রকম আবেগভরে বলতে লাগলেন—ওরে ভাই, চিনতে না পেরে বহুৎ কসুর—বহুৎ না-ফরমানী আপনার সাথে করে ফেলেছি আমি। মাফ করে দিন ভাই, বদনসীব এই বুঢ়াকে মেহেরবানী করে মাফ করে দিন।

বৃদ্ধের আকুতি দেখে দিলওয়ার আলী প্রসন্ন হলেন। খোশ কণ্ঠে বললেন—জিনা-জিনা। কোন কসুর হয়নি।

জড়িয়ে নিয়ে থেকেই দিলওয়ার আলীকে ঠেলতে ঠেলতে মুরুব্বীটি বললেন—আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন। আপনার অনেক তারিফ শুনেছি। কিন্তু চিনিনে বলেই ভাবলাম, অন্যকোন লোক আপনি। আপনিই যে আমাদের সেই পরম উপকারী দোস্ত সালার দিলওয়ার আলী, তা কি জানি ? তা জানলে তো মকানে কেউ থাকুক আর না থাকুক, তখনই আমি আপনাকে ভেতরে নিয়ে বসাতাম। কি আচানক বিভ্রাট! আসুন-আসুন—

প্রায় ঠেলেই তিনি দিলওয়ার আলীকে ফটক পেরিয়ে কিছুটা ভেতর দিকে নিয়ে এলেন। দিলওয়ার আলী সহাস্যে বললেন—তা জনাবের পরিচয়টা—



www.amarboi.org

থমকে গিয়ে মুরুব্বী এবার সোল্লাসে বলে উঠলেন—হাফিজুল্লাহ। ইমাম হাফিজুল্লাহ। এই নামেই সবাই আমাকে জানেন। এই শহরের বড় মসজিদের ইমাম আর আফসারউদ্দীনের নানাজান।

ঃ সোবহান আল্লাহ্ ! আপনিই সেই নানাজান ?

ঃ হ্যাঁ আমিই তার নানাজান। আসুন-আসুন—

ইমাম হাফিজুল্লাহ্ সাহেব ফের টানতে লাগলেন। এক কদমও না নড়ে দিলওয়ার আলী বললেন—তাহলে তো আমারও নানাজান। আপনার বেটির যে আমি আর এক বেটা।

হো হো করে হেসে উঠে ইমাম সাহেব বললেন—জরুর-জরুর। সে কথা আমি শুনেছি। জরুর আপনারও আমি নানাজান।

ঃ তাহলে যে জরুর আপনাকে ঐ "আপনি-আপনি" ছাড়তে হবে নানাজান ?

ঃ এ্যাঁ !

ঃ আফসারউদ্দীন সাহেবকে আপনি জরুর "আপনি-আপনি" করেন না, তুমি বলেন। আমাকেও জরুর ঐ তুমি বলতেই হবে যে ?

ঃ সাব্বাস ! জুরুর তাই হবে। তুমিও জরুর আমার নাতী।

উভয়েই হেসে উঠলেন। এরপর রসিকতা পরিহার করে দিলওয়ার আলী তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—আলহামদুলিল্লাহ। আপনার মোলাকাত পাবার উম্মিদে সেদিন আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম।

ঃ জালসা ছিল, জালসা। মসজিদে সেদিন একটা মস্তবড় জালসা ছিল। আসরের আগে বেরিয়ে গিয়ে একদম এশার নামায আদায় করে ফিরেছি। মকানে ফিরেই তোমার কথা শুনলাম।

ইতিমধ্যেই আসর নামাযের আযান শুরু হলো। আযান ধ্বনী কানে পড়তেই ইমাম সাহেব চমকে উঠে বললেন—এইরে ! নামাযের সময় হয়ে গেছে। আর তো আমি দাঁড়াতে পারছিনে ভাই। দেরী হলে জামাত ধরতে পারবো না। আমি জামাতের ইমাম। আমার দেরী হলে কিছুতেই চলবে না। যাই ভাই, ফিরে এসে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ—

বলেই ফের অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে কিতাবউদ্দীনকে বললেন—ভাইকে নিয়ে গিয়ে ভেতরের ঘরে বসাও। তার যত্ন-তদবির করো। জামাত শেষ হলেই আমি ফিরে আসছি—

ইমাম হাফিজুল্লাহ্ সাহেব হন্তদন্তভাবে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ফাঁক পেয়ে দিলওয়ার আলী মকানের দিকে চাইতেই দেখলেন, সেদিনের সেই একই জায়গায় দ্বিতল কক্ষের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদা খাতুন। তাঁদের দিকে চেয়ে থেকে নেকাব ঢাকা মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে সে হাসির বেগ চাপছে।

কিতাবউদ্দীনের সাথে দিলওয়ার আলী এসে সেদিনের ঐ নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকতেই খোশদীলে ছুটে এলেন আজিজুন নেছা বেগম। আরো যেন কে কে দ্রুতপদে এসে দুই কক্ষের মাঝের ঐ দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। আজিজুন নেছা এসেই অভিযোগ করে বললেন—এই বুঝি বাপজানের দু' একদিন পরে আসা ?



www.amarboi.org

সালাম দিয়ে দিলওয়ার আলী বিনম্র কণ্ঠে বললেন—বেকায়দায় পড়ে গেলাম আম্মাজান। জিয়াদা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কথা রাখতে পারলাম না।

সালামের জবাব দিয়ে আজিজুন নেছা শংকিত কণ্ঠে বললেন—বেকায়দা। কোন মুসিবত কি ?

ঃ জিনা–জিনা। গোলামীর জিঞ্জির। পরের যে নকরী করে তার নিজের বলে কোন সময় থাকে না। সরকারী কাজে নবাব বাহাদুর আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখলেন আমাকে।

ঃ ও, তাই বলো। আমি ভাবলাম, না জানি আবার কিনা কি ঘটলো।

ঃ অন্যকিছু নয় আম্মাজান। সে যাক, আফসারউদ্দীন ভাই সাহেব তাহলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ?

ঃ জি বাপজান ! দু' তিনদিন ঘরে আটক ছিল। এরপর আল্লাহর রহমে আর কোন অসুবিধে হয়নি। এখন সে হররোজ মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করছে।

ঃ আলহামদুল্লিাহ। তাঁকে নিয়ে আমার বড় দুশ্চিন্তা ছিল। তা আম্মাজান আসরের ওয়াক্ত বয়ে যাচ্ছে। ঐ নামাযের ঘরে গিয়ে আমি নামাযটা আদায় করে আসি।

ঃ আচ্ছা বাপজান, আচ্ছা—

নামাযের আনযাম করে দেয়ার জন্যে কিতাবউদ্দীনকে নির্দেশ দিয়ে আজিজুন নেছা বেগম অন্দরে চলে গেলেন।

নামায অন্তে দিলওয়ার আলী ফিরে এসে বসতেই নাস্তা এলো। চাকর-নফর সহকারে আজিজুন নেছা বেগম নাস্তা নিয়ে এলেন এবং অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে দিলওয়ার আলীকে নাস্তা-পানি খাওয়ালেন। নাস্তার পর বললেন—আজ কিন্তু রাতের খানা না খেয়ে তুমি যেতে পারবে না বাপজান। তুমি এখন শুয়ে শুয়ে আরাম করো, আমরা পাকের আনযাম দেখি।

সৌজন্যের খাতিরেই দিলওয়ার আলী মৃদু আপত্তি তুলে বললেন—খানাপিনাতে কি আছে আম্মাজান ? খামাখা ব্যস্ত হবেন কেন ? আপনার স্নেহটাই তো বড়।

আজিজুন নেছা প্রতিবাদ করে বললেন—না বাপজান, আজ আর তোমার কোন আপত্তি রাখতে পারবো না। তুমি শুয়ে পড়ো। এখন সবাই বাইরে আছেন। তাঁরা ফিরে না আসাতক্ শুয়ে শুয়ে বিরাম নাও।

আজিজুন নেছা চলে গেলেন। নাস্তার বাটি-বর্তন নিয়ে চাকরেরাও বিদেয় হলো। কিছু করার-বলার না থাকায় নিঃসঙ্গ দিলওয়ার আলী টান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ কান কোনটাই তাঁর বিরামের সাথে সহযোগিতা করলো না। তারা সজাগ হয়ে রইলো। তাদের এ প্রতিক্ষা বিফলে গেল না। একটু পরেই পাশের কক্ষের পর্দার ওপার থেকে মাহমুদা খাতুন বললো—ঘুমিয়ে গেলেন নাকি ?

ধড়মড় করে উঠে বসে দিলওয়ার আলী বললেন—এ্যাঁ ? না–না, জেগেই আছি।

ঃ কথা বলার কেউ নেই, তবুও জেগেই আছেন ?

ঃ জি। এই অবেলায় কি ঘুম সহজে আসে চোখে ?



www.amarboi.org

ঃ তাহলে আমি কথা বললে তো অসুবিধে নেই কিছু ?

ঃ না–না, তা থাকবে কেন ? কিন্তু —

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ এভাবে যে আমার সাথে কথা বলছেন আপনি, এটা আপনার আম্মাজান বা অন্য কেউ দেখলে—

ঃ তেড়ে আসবেন কি লাঠি নিয়ে ?

মাহমুদা খাতুন ঠোঁট টিপে হাসলেন। দিলওয়ার আলী বললেন—না, মানে আমি বলছিলাম—

ঃ সাহস সঞ্চয় করুন সাহেব। শুধু লড়াইয়ের মাঠেই নয়, সর্বত্রই পুরুষ মানুষের কিছুটা সাহস থাকতে হয়। কাপুরুষের এ দুনিয়ায় ভাত নেই।

ইতিমধ্যেই আজিজুন নেছা বেগম কি এক কাজে এই ঘরে এলেন এবং মাহমুদাকে বললেন—কি হলোরে ? কাকে এসব বলছিস্ ?

ঃ আপনার ঐ নয়া পুত্রকে আম্মাজান। ঐ সালার সাহেবকে। তাঁর হাল-হকিকতের দু' এক কথা জিজ্ঞেস্ করতেই উনি মাটির সাথে মিশে যাচ্ছেন। যেন এ জিন্দেগীতে কোন মেয়েছেলের সাথে কথা বলেননি উনি।

ঃ হবেই তো। তোর মতো তো মুখরা আর দজ্জাল সবাই নয় ? ছেলের আমার আদব-স্বভাব বরাবরই খুব ভাল। মাসুম বাচ্চার মতো। খামাখা তাকে জ্বালাস্‌নে।

আজিজুন নেছা চলে গেলেন। দিলওয়ার আলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাহমুদা খাতুন স্বগতোক্তি করলো—যা-ব্বাবা ! আমি একাই সেরেফ নই। জীবটা যে আসলেই নিতান্ত নীরিহ, চোখ এখনোও ফোটেনি, আণ্ডা থেকে পুরোপুরি বেরোয়নি, এটা দেখছি সবাই জেনে গেছেন ?

দিলওয়ার আলী ভ্রূকুটি করে বললেন—কথাটা তাহলে কার উদ্দেশ্যে বলা হলো ?

মাহমুদা খাতুন বললো—যাঁরা এখনও আণ্ডার মধ্যেই চোখ মুজে বসে আছেন, আমার মতো দজ্জাল-ডাইনি নন, তাঁদের উদ্দেশ্যে।

ঃ গালি দিচ্ছেন নাকি ?

ঃ জিনা। বলছি, কথাটা আম্মাজান বেঠিক বলেননি।

ঃ জিনা–জিনা, উনি ঠিকই বলেছেন।

ঃ তার মানে ! আপনি সত্যিই তাহলে কোন আণ্ডা বাচ্চা নাকি ?

ঃ আমি কি তা জানিনে। তবে আপনি যে খুব একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে নন, এটা উনি ঠিক বলেছেন।

ঃ তার অর্থটা কি হলো ? আমি দজ্জাল ?

ঃ না, অতটা ঠিক নয়। তবে অস্থির, এটা ঠিক।

ঃ অস্থির !

ঃ একটু হাড়ে টক্।

ঃ কি রকম ?

ঃ নইলে একজন মেহমানের দুর্দশা কি কেউ ঐভাবে উপভোগ করে ?



www.amarboi.org

ঃ উপভোগ করলাম ? কোথায় ?

ঃ ঐ দোতলার বারান্দার উপর থেকে। নানাজানের সাথে যখন আমার ধ্বস্তাধ্বস্তি-হচ্ছিল, তখন।

খেয়াল হতেই মাহমুদা খাতুন হাসি মুখে বললো—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, করছিলামই তো।

ঃ মনে হলো হাসছিলেনও ?

ঃ শুধুই কি হাসছিলাম ? মুখে কাপড় চেপেও হাসির বেগ চাপা দিতে পারছিলাম না। যে নাটকখানা দেখালেন !

ঃ নাটক !

ঃ আপনার আক্কেল গুণেই ঐ ঘটনা ঘটলো। নিজেও কিছু দেখলাম, শুনলামও পরে সব। নানাজান যে ভাগ্নিস্ লাঠি হাতে তাড়া করেননি আপনাকে, এই তো ঢের।

ঃ তা আমার দোষটা হলো কি ?

ঃ হলো না ? আসি বলে যাবেন, আর আসবেন না। যদি এর মধ্যে আরো দু' একবার আসতেন-যেতেন, তাহলে সবার সাথেই চেনা-জানাটা হয়ে যেতো, ঐ বিভ্রাটটা ঘটতো না। কিন্তু আপনার তো সে অভ্যেস্ নেই।

ঃ বটে ! কিন্তু কেন নেই, সে খোঁজ তো রাখবেন না ?

ঃ মানে ?

ঃ এই যে এত আমাকে দোষ দিচ্ছেন, আপনাদের খবর রাখিনে বলে এত কথা বলছেন, সরকারী এলাকার এত কাছে থেকেও, কই, আপনি বা আপনারা তো একটুও খোঁজ নেননি আমার ?

মাহমুদা খাতুন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনার খোঁজ নেইনি ?

ঃ কই নিলেন ? লোকটা কোথায় থাকে, কি হালে থাকে, কেন তার অবসর নেই,—চাকর-নফরের মাধ্যমেও যে কেউ কোন খোঁজ নিয়েছে কখনো, এমন তো মনে হয় না।

ঃ কেউ কি করেছেন না করেছেন, সেটা আমি জানিনে। কিন্তু আমি কি করেছি, সেটা তো আমি জানি।

ঃ আপনি করেছেন !

দিলওয়ার আলী আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মাহমুদা খাতুন ক্ষোভের সাথে বললো—করিনি ? সেই থেকে কি যে আমার হলো, ঘুরে ফিরে বারবার কেবল আপনার কথাই মনে পড়তে লাগলো। ফৌজীপুর থেকে আসার পর প্রতিদিনই ভাবতে লাগলাম, এত কাছে এসেছি যখন, নিশ্চয়ই উনি শিগ্গিরই এসে পড়বেন একদিন। কিন্তু 'এই এলেন এই এলেন' করে যখন হতাশ হয়ে পড়লাম, তখন তো বাধ্য হয়েই আমাকে খোঁজ নিতে হলো আপনার ?

ঃ বলেন কি, আপনি খোঁজ নিলেন ?

ঃ কি করবো ? কাউকে কি আমি বলবো যে, আমার কিছু ভাল্ লাগছে না, লোকটা আসছে না কেন, গিয়ে তাঁর খোঁজ নিয়ে আসুন ?



www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা ! তা কি করলেন ?

ঃ কিতাবউদ্দীনকে গোপনে পাঠিয়ে দিলাম।

ঃ কোথায় পাঠালেন ?

ঃ আপনাদের ঐ সেনানিবাস, না সামরিক ঘাঁটি, কি একটা আছে ? সেখানে।

ঃ সাব্বাস ! কি বলে পাঠালেন ? আমাকে আসতে বললেন ?

ঃ যা বলার তা চিঠিতেই লিখে দিলাম। সেসব কথা চাকর-নফরদের বলা যায় ?

ঃ ও, তারপর কি হলো ?

ঃ আমার মাথা কাটা গেল।

ঃ মানে ?

ঃ যা হলো তা মনে হলে, আজও আমি নিজের কাছেই নিজে মুখ লুকাই শরমে।

ঃ কি রকম–কি রকম ?

ঃ রকম আবার কি ? আপনার মিথ্যাচারের জন্যেই তো এই দুর্গতি হলো আমার। কিতাবউদ্দীনের সামনেও আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে এখন পারিনে।

ঃ আমার মিথ্যাচার !

ঃ আপনার প্রতারণা। আপনি একজন সালার, সেনানায়ক। অথচ কিভাবে আপনি আমাদের কাছে হল্‌ফিল্‌ পরিচয় দিলেন—আপনি একজন মামুলী সেপাই ? জিহ্বায় আপনার আটকালো না ?

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন—ও এই কথা ? তা এটা আর মিথ্যা হলো কি ? সালার ফৌজদার যা-ই হই, আসলে তো সবাই আমরা সেপাই। এক গোত্র-এক পদার্থ।

ঃ এক পদার্থ ? আমাকে শিশু বোঝানো বোঝাচ্ছেন ? একজন সালার আর একজন মামুলী সেপাইয়ের ওজন, পদমর্যাদা, অবস্থান—এসব কি এক ?

ঃ তা–মানে—

ইতিমধ্যে আজিজুন নেছা বেগমের ডাকে মাহমুদা খাতুন তখনই উঠে পাকঘরের দিকে গেলো। দিলওয়ার আলী অশান্ত আগ্রহ নিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। এরই মাঝে কিতাবউদ্দীন এলো। সে এসে দিলওয়ার আলীকে বললো—হুজুর, নানা হুজুর খবর পাঠিয়েছেন, নেহায়েত বেকায়দা হওয়ায় মাগরিবের জামাত শেষ না করে উনি আসতে পারছেন না। আপনাকে উনি সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ করেছেন।

দিলওয়ার আলী সে জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। অল্প কথায় সম্মতি জানিয়ে তিনি কিতাবউদ্দীনকে বিদায় করলেন। অকস্মাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় তাঁর মনটা বিষণ্ন হলো। তিনি বসে বসে উস্‌খুস করতে লাগলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁকে প্রতিক্ষা করতে হলো না। মায়ের ফরমায়েশ খেটে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাহমুদা খাতুন ফিরে এসে আবার নিজের জায়গায় বসলো। মুহূর্তখানেক নীরব থেকে পূর্ববৎ ক্ষোভের সাথে বললো—আমি বুঝতে পারিনে, এ দুনিয়ার প্রায় সবাই যেখানে নিজেকে বড় করে তুলে ধরতে চায়, আসলে যেটুকু তার চেয়েও কেউ কেউ নিজের সম্বন্ধে বেশী করে বলে, আপনি সেখানে নিজেকে এভাবে ছোট রাখতে চান কেন ?



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী আবার ঈষৎ হেসে বললেন—তা এটা আবার এমন কি ব্যাপার হলো ?

ঃ ব্যাপার যা-ই হোক, আপনি তা চান কেন ? আপনি একজন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ব্যক্তি, এইটেই মানুষকে বোঝাতে চান কেন ?

ঃ কেন ?

ঃ হ্যাঁ। উদ্দেশ্য কি আপনার ?

দিলওয়ার আলী গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তা যদি বলেন, তাইলে উদ্দেশ্য তো আছেই একটা।

ঃ কি সেটা ? কি কারণে নিজেকে আপনি ঢেকে রাখতে চান ?

ঃ প্রতারিত না হওয়ার জন্যে। মানুষের সত্যিকারের দরদ আর আন্তরিক ভাল-বাসা পাওয়ার জন্যে।

ঃ তার মানে ?

ঃ দেখুন, তেলে মাথায় তেল দিতে এ দুনিয়ার প্রায় সবাই এগিয়ে আসে। বিত্তবান ও কিছুটা পদস্থ লোকদের প্রতি মানুষের ভালবাসা আপ্‌ছে আপ্‌ উৎলে উঠে। এসব ভালবাসা আসল নয়, মেকী। অন্তরের স্পর্শ এখানে প্রায় থাকেই না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর অধমজন জেনেও যদি কেউ তাকে দরদ করে, বিত্তপদের হিসেব না কষে সেরেফ যদি মনুষত্বের মূল্য দিয়েই কেউ তুচ্ছজনকে ভালবাসে—মমতা করে, তাহলে সেই প্রীতি আর সেই মমতাই খাঁটি বস্তু—আসমানী সম্পদ। ঐ সম্পদ চাই আমি। পেলে, ঐ পবিত্র ভালবাসাটাই পেতে চাই। প্রতারিত হতে চাইনে।

ঃ বটে ! চাইলেই তা পাবেন কোথায় ? ওসব তো কিতাব-কাব্যের কথা। ভাল মানুষ হলেও তুচ্ছ লোকের প্রতি প্রেম বিলাতে যায় ক'জন ? ওটি তো দুর্লভ।

ঃ দুর্লভ বলেই আমার নজর ঐদিকে। ওটিই আমার কাম্য। সহজ-সুলব-সস্তার প্রতি আদৌ কোন টান আকর্ষণ নেই আমার।

তাজ্জব হওয়ার ভান করে মাহমুদা খাতুন বললো—বাব্বা ! তলে তলে এত ?

ঃ কি বললেন ?

ঃ জিন্দেগীতেও ওটা কখনো পাবেন, না পেয়েছেন কোনদিন ?

দিলওয়ার আলী ঠোঁট দিয়ে হাসি চেপে বললেন—এতদিন পাইনি। তবে এখন মনে হচ্ছে, পেয়েই বোধহয় গেলাম।

উৎকর্ণ হয়ে উঠে মাহমুদা খাতুন বললো—কি রকম ?

দিলওয়ার আলী পুনরায় হাসি চেপে বললেন—জানিনে।

মাহমুদা খাতুন শিহরিত হয়ে উঠলো। বললো—জানিনে মানে ?

ঃ জানিনে মানে–জানিনে।

মাহমুদা খাতুন জিদ ধরলো—তবু বলতে হবে।

দিলওয়ার আলী সমস্যায় পড়লেন। একটু চিন্তা করে বললেন বলতেই হলে ?

ঃ জি এড়িয়ে গেলে শুনছিনে।



www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা,বলতে হয় পরে বলছি। তার আগে আপনি বলুনতো এতবড় একটা খানদান ঘরের মেয়ে আপনি। আমি একটা মামুলী সেপাই। একটা মামুলী সেপাইয়ের খবর করতে এতটা আপনি আগ্রহী হলেন কেন ?

ঃ আরে ! একটা ভাল মানুষের খবর করতে আগ্রহ হবে না আমার ?

ঃ সেই আগ্রহটা হলো কেন ? এমন ভাল মানুষ বলে তো আরো অনেকেই আমাকে জানেন। কই এমন আগ্রহ তাদের তো কারো হয়নি। আপনার হলো কেন ? আপনি কেন লোক পাঠালেন ?

ঃ আমার ইচ্ছে।

ঃ সেই ইচ্ছেটা হলো কেন ?

ঃ আমি জানিনে।

ঃ জানিনে মানে ?

মাহমুদা খাতুন কপট রোষে বললো — বটে ! শোধ নেয়া হচ্ছে ? দিলওয়ার আলী হেসে উঠলেন। বললেন — কি করবো ? নিজেকে তো প্যাঁচ থেকে মুক্ত করতে হবে !

ঃ ওরে বাপ্‌রে। কি সেয়ান ঘুঘু। ঠিক আছে বাবা, আমি আর পেঁচাবো না।

ঃ সাব্বাস ! এবার তাহলে আসল কথায় আসুন —

ঃ জ্বি বলুন —

ঃ আপনার কিতাবউদ্দীন গিয়ে কি করলো ?

ঃ সেপাই দিলওয়ার আলীর খোঁজ করলো।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর তাড়া খেলো।

ঃ কেমন ?

ঃ ঘাঁটিতে সে প্রবেশ করতে পারলো না। ফটকে এক খোট্টার সাথে তার দেখা। সে নাকি সেপাইদের বাবুর্চি। তাকে জিজ্ঞেস করায় সে তেড়ে এলো।

দিলওয়ার আলীর মনের কোণে একটা সন্দেহ ইতিমধ্যেই উঁকিঝুঁকি পাড়ছিল। এবার তিনি সচকিত হয়ে উঠে বললেন — বাবুর্চিটার নাম কি, কিতাবউদ্দীন। তা শুনেছে ?

ঃ কি জানি, ভূজন না ভজন সিং — এই রকম একটা নাম।

দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন — ভজন সিং ?

ঃ জ্বি। ঐ নামই তো কিতাবউদ্দীন বললো। দিলওয়ার আলী নামের কোন সেপাইকে ভজন সিং চেনে না। পরে খুঁজে দেখবে বলে ভজন সিং সেই চিঠিটা চাইলো। একটা মেয়েছেলের চিঠি তাকে দেবে কেন বলে কিতাবউদ্দীন চিঠি দিতে অস্বীকার করলে, ঐ ভজন সিং ক্ষেপে গিয়ে যেসব কথা বলেছিল, তা মনে হলে আজও আমার কর্ণমূল গরম হয়ে উঠে।

বিপুল আগ্রহে দিলওয়ার আলী বললেন — কি বলেছিল ?

ঃ যা বলেছিলো, তা মুখফুটে বলা কঠিন।

ঃ তবু বলুন না একটু।



www.amarboi.org

ঃ বলেছিলো, যে সেপাই তার বউয়ের খবর রাখে না, সে বউ আবার তার কাছে মুহাব্বতের চিঠি লেখে, সে চিঠি অন্যকে দেয়া যায় না। চিঠি দিবি নাতো ভাগ্ শিগ্গির” —

ঃ এ্যাঁ।

ঃ দেখুন দেখি কি শরমের কথা। বেয়াকুফটার মাথায় যে এমন খেয়াল কোথা থেকে এলো —

অপরিসীম বিস্ময়ে দিলওয়ার আলী আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলেন না। তা দেখে মাহমুদা ফের বললো — কি হলো, নীরব হয়ে গেলেন যে ?

বিস্ময়ে ঘোর কাটতেই দিলওয়ার আলী সশব্দে বলে উঠলেন — কি তাজ্জব ! ঐ ঘটনাতো জানি আমি।

মাহমুদা খাতুনও বিস্মিত হলেন। বললো — জানেন !

ঃ হ্যাঁ। একটু পরে ভজন সিংএর কাছেই সব শুনলাম। বললো — দিলওয়াল আলী সেপাইকে কে একজন লোক খোঁজ করছে।

ঃ তা শুনে আপনি খোঁজ করলেন না সে লোকের ?

ঃ কি করে করবো ? ভজন সিং যে ঐভাবেই গুলিয়ে ফেলেছে সব, তা কি আমি জানি ?

ঃ মানে ?

ঃ ভজন সিং বললো, দিলওয়ার আলী সেপাইয়ের বউ দিলওয়ার আলী সেপাইকে খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছে। আমাকে খুঁজতে সে লোক এসেছে, তা বুঝবো কি করে ? আমার কি বউ আছে ?

ঃ তা না থাক। আমাদের কাছে তো নিজেকে দিলওয়ার আলী সেপাই বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। কাজেই, আমরাও কেউ বা আমিও যে লোক পাঠাতে পারি, সেটা একটুও ভাবলেন না ?

ঃ আপনি ? তা-মানে —

ঃ হ্যাঁ, আমি। আমার কথাটা একটুও খেয়াল করতে পারলেন না ? এ অবস্থাতেও আমার কথা মনে হয় না আপনার ?

ঃ হ্যাঁ, তাতো একটু হয়েছিলই।

ঃ তাহলে ?

ঃ তাতেই বা কি করে বুঝবো ? আপনি কি আমার বউ ?

মাহমুদা খাতুন চমকে উঠলো। শরমে জড়িয়ে গিয়ে বললো — ছিঃ !

দিলওয়ার আলী কথাটা ঝোঁকের উপর বললেন। খেয়াল হতেই তিনিও সংকুচিত হয়ে গেলেন। বাইরের দিকের বারান্দায় আবিদ হোসেন সাহেব ও আফসারউদ্দীনের গলা শোনা গেল। তাঁরা উভয়েই এক সাথে ফিরে এলেন। কিতাবউদ্দীনের মুখে খবর শুনেই তাঁরা কলরবে দিলওয়ার আলীর কক্ষে এসে ঢুকলেন। বেলা তখন শেষ। সালাম বিনিময় খোশ প্রকাশ ও পরস্পর পরস্পরের শরীর-স্বাস্থ্যের খবরাখবর করতেই



www.amarboi.org

মাগরিবের সময় হলো। দিলওয়ার আলী সহকারে সবাই আবার তখনই মাগরিবের নামায আদায় করতে বেরুলেন।

মাগরিব নামাযের পর আবিদ হোসেন সাহেব ও আফসারউদ্দীন লেবাস পাল্টিয়ে পাতলা হয়ে এলেন এবং দিলওয়ার আলীর সাথে বসে গল্প-গুজব শুরু করলেন। খানিক পরে ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেবও ফিরে এসে এই বৈঠকে যোগ দিলেন। খোশ প্রকাশের নামে দুই নাতীকে নিয়ে ইমাম সাহেব একাই বেশ কিছুক্ষণ আসরটা গরম করে রাখলেন। এরই মাঝে এক সময় খবর এলো, খানা তৈয়ার, বিলম্বে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অন্দরের তাড়ায় বৈঠক মুলতবী করে রেখে সবাই গিয়ে খানা পিনায় বসলেন। আহারান্তে এশার জামাত ধরার জন্যে ইমাম সাহেব মসজিদে চলে গেলেন এবং আবিদ হোসেন ও আফসারউদ্দীন দিলওয়ার আলীর কক্ষে এসে আবার আসর জমানোর চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ পর জরুরী এক কাজের জন্যে আফসারউদ্দীন উঠে পড়তেই দিলওয়ার আলীও গা-মোড়া দিয়ে বললেন— আমিও আজ তাহলে উঠি।

আফসারউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন— আরে সেকি ! এখনই উঠবেন কি ? বলা যায় সবে তো সন্ধ্যে এখন।

দিলওয়ার আলী আমতা আমতা করে বললেন— না, বলছিলাম— খানাপিনা তো হয়েই গেল, খামাখা আর—

ঃ তাতে কি হয়েছে ? আপনার জন্যেই তো এত সকাল সকাল রাতের খানা খেলাম আমরা। নইলে এশার নামাযের অনেক পরে আমরা রাতের খানা খাই। বসুন-বসুন, দাদুর সাথে গল্প করুন। একটু পরেই আমি আসছি—

একটু পরেই আফসারউদ্দীন ফিরে এলেন। কিন্তু ভেঙ্গে যাওয়া আসর আর জমলো না। ছুটির দিন দেখে আবার একদিন আসবেন বলে কিছুক্ষণ পরে দিলওয়ার আলী বিদায় নিলেন।

## ৬

কয়েকদিন পরের ঘটনা। উপর ওয়ালাদের হুকুম-নির্দেশ তামিল করার আবর্তে দিলওয়ার আলী অকস্মাৎ এক ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। কিছু অযাচিত নসিহত আর অনর্থক এক হুমকির সম্মুখীন হলেন। আখেরের উপর হুমকি। ভাগ্যিস্ মেঘটা কানা মেঘ, তাই রক্ষে !

প্রশাসনিক পরিষদে হাজী আহম্মদ সাহেব এখন সবচেয়ে বলিষ্ঠ ব্যক্তি। পরিষদের পরাক্রমশালী সদস্যেরা সবাই তাঁকে দৃঢ়ভাবে প্রীতির বাঁধনে বেঁধে নিয়েছেন। জগৎ শেঠ, ফতেচাঁদ, রায় রায়ান, আলম চাঁদ ও তাঁদের অনুসারীরা লা-খরচা প্রেমদানে বরাবরই অভ্যস্ত। মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খান আর বর্তমান নবাব সুজাউদ্দীন খানকে তাঁরা অনেক প্রেম বিলিয়েছেন। হাজী আহম্মদ ভাগ্যান্বেষী



www.amarboi.org

মানুষ। কিস্‌মতও তাঁর তাগ্‌ড়া। তাই হাত বাড়াতেই তিনি তাঁদের প্রীতিটা নগ্‌দা-নগ্‌দী পেয়েছেন। প্রশাসনিক পরিষদের এই বাঘ-সিংহ সদস্যেরা প্রেমদানে তাঁর দিকে স্বগরজেই এগিয়েছেন। নবাব সুজাউদ্দীনের গরজ তাঁদের ফুরিয়ে আসছে দিন দিন। তাঁকে নিয়ে শেষ হয়েছে খেলা তাঁদের। নবাবকে তুষ্ট রেখে ইষ্ট কামাই করার অধিক একমাত্র তাঁকেই একনিষ্ঠ প্রেমদানের জরুরত আর নেই। কারণ অতি স্পষ্ট। মঞ্জিলে-মকসুদ তাঁদের এখনও দৃষ্টির অনেক দূরে। এক মাঝিই হালধরে কিস্তি তাঁদের অতদূরে পৌঁছে দিতে পারবে না। মাঝে আরো অনেক বারই বদল হবে হালের মাঝি। প্রতি মাঝিই হতে হবে তাঁদের অতি অনুগত। একটার পর একটা পোষমানা মাঝি এনে হালে বসাতে পারলে, তবেই তাঁদের কিস্তি একদিন পৌঁছে যাবে মঞ্জিলে।

এতো গেল তাঁদের সেই সনাতন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এর সাথে বর্তমানের দিকটাও খাটো করে দেখার তাঁদের মওকা নেই। তাঁদের এই সুযোগ-সুবিধে, এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেও বাংলার মসনদে বারবারই চাই তাঁদের হাতে গড়া মানুষ, তাঁদের খাঁচায় পোষা পাখী।

কাজেই, সুজাউদ্দীন খানই শেষ মানুষ নন। সামনে তাঁদের আবার সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যত। আবার সেই শূন্য তখ্‌ত পূরণ করার ভাবনা। অতপর কে আসবেন মসনদে, কে তাঁদের বাঞ্ছিতজন, এই চিন্তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা এখন তাঁদের। এর সামনে সুজাউদ্দীন খান এখন অনেক গৌণ। মসনদ লাভের সম্ভাবনা সামনে এখন দুই ব্যক্তির—শাহজাদা সরফরাজ খান ও শাহজাদা তকী খান—এই দুইজনের। শাহজাদা সরফরাজ খানের সম্ভাবনাই এই দুইয়ের মধ্যে অধিক। অধিক নয়, অত্যধিক। অথচ সরফরাজ খান আদৌ তাঁদের কাম্যজন নন। স্বভাবে ও সম্পর্কে ঢের ঢের বৈরী তিনি। শাহজাদা তকী খানই তাদের সেই কাম্যলোক। একান্তই বাঞ্ছিতজন।

কিন্তু মসনদ পাওয়ার সম্ভাবনা শাহজাদা তকী খানের নিতান্তই ক্ষীণ। মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খানের তিনি কোন বংশধর নন। মুর্শিদকুলী খানের তখ্‌ত্‌-তাজ দাবী করার কোন এক্তিয়ার তকী খানের নেই। এখন সে তখ্‌ত্‌-তাজ তাঁর ওয়ালেদ সুজাউদ্দীনের হলেও, সাকুল্যে সুজাউদ্দীনের নয়। সরফরাজ খানের মাতা জিনাতুন নেছার প্রভাব এখানে বিস্তর। মৌখিকভাবে হলেও, সুজাউদ্দীন খান এই জিনাতুন নেছারই প্রতিনিধি। তদুপরি, মাতাপুত্র সহকারে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথেও জিনাতুন নেছার যোগসূত্র সুনিবিড়। প্রতিপত্তি প্রভূত। সভাসদ ও সেপাই-সেনারও অনেক অংশই তাঁদের পেছনে মজবুত। নবাব সুজাউদ্দীন খান আছেন নিজের ভাবে বিভোর। সেরেফ তকী খানের নন, তিনি সরফরাজ খানেরও ওয়ালেদ। তাই সেরেফ তকী খানের একার জন্যে বিশেষ কোন ভূমিকা এখনও তাঁর নেই। তৈরী করে না দিলে, ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় তকী খানের এখানে কব্জে পাওয়ার সম্ভাবনা কচুর পাতার পানির মতোই অলীক।

অথচ এই অলীককেই বাস্তবরূপ দান করার সংগ্রাম এখন এই শক্তিশালী সভাসদদের সামনে। বিকল্প কিছু নেই। এ সংগ্রামে জয়ী তাঁদের হতেই হবে। তৈরীও



www.amarboi.org

তাঁদের হতে হবে পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকতেই। এ জন্যে বুদ্ধি চাই আর চাই বল। বুদ্ধি তাঁদের আছে। বল আছে হাজী আহম্মদের হাতে। জনবল, অস্ত্রবল–সকল দিক দিয়েই সভাসদদের মাঝে হাজী আহম্মদই সবার অধিক বলীয়ান। এ কারণেই হাজী আহম্মদ এই প্রশাসনের এখন এক শক্তিশালী খুঁটি। এ খুঁটি সবার আগেই হাত করেছেন তাঁরা। বেহাত হয়ে বিপক্ষে যাওয়ার ফুরসুৎ মোটেই রাখেননি। হাজী আহম্মদ সামনে আসুক, প্রয়োজনের ওয়াক্তে সক্রীয় ভূমিকাটা হাজী আহম্মদ গ্রহণ করুক, এই তাঁদের ইরাদা। বুদ্ধির জন্যে তাঁরা আছেন। নির্দেশ-নির্দেশনা তাঁরাই দান করবেন। নিয়ন্ত্রণের বাঁশীটাও তাঁদের মুখেই থাকবে। কুস্তি লড়ায় নিজেরা তাঁরা দক্ষ কেউ নন। হাজী আহম্মদ সপরিবারে পালোয়ান। সবার সামনে কুস্তিটা হাজী আহম্মদই সপরিবারে লড়ুক।

বিভিন্ন বিবেচনায়, তাঁর সাথে শক্ত করে প্রেমের গাঁটছড়া বেঁধে নিয়েছেন প্রেমিকেরা। প্রশাসনিক পরিষদের সবাই এখন হাজী আহম্মদের দোস্ত। একান্ত সুহৃদ। এক প্রাণ, একমন, একমত। এমনিতেই হাজী আহম্মদ একাই একশো' তার উপর সকলের নিরঙ্কুশ প্রেম পেছনে থাকায় হাজী আহম্মদের অবস্থান এখন ইস্পাতের ন্যায় মজবুত। প্রশাসনিক পরিষদের তিনি এখন এক তেজোময় জ্যোতিষ্ক। এই পরিষদে তাঁর প্রতাপ এখন তুঙ্গে।

এই প্রতাপেরই কিছু তাপ দিলওয়ার আলীর গায়ে এসে লাগলো। কারণ, এই প্রতাপের কিয়দংশ ইতিমধ্যেই জাহির হওয়া শুরু হয়েছে। হাজী আহম্মদের পরিবারেরই কেউ কেউ এই প্রতাপ প্রদর্শন করতে ময়দানে নেমে গেছেন। তাঁরা হাত-পা ছুঁড়ছেন এবং হুমকি ধমক দিচ্ছেন।

অবশ্য এরা কেউ এই পরিবারের বাঘ-সিংহ নয়। প্রায় তামামই এরা ফেউ। হাজী আহম্মদ ভারী লোক। গুরু গম্ভীর মানুষ। তাঁর ভাই আলীবর্দী খানও দানাদার ইনসান, পাত্‌লা লোক নন। পুত্র পরিজন সহকারে মোটামুটি সবাই তাঁরা শরীফ আদমী। সংযত ও ধীরস্থির। আর না হোক, প্রকাশ্যে কোন হাম্‌বড়ি ভাব তাঁদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। গাছের চেয়ে আগাছার তেজ বেশী। হাজী আহম্মদের পরিবার আকারে বিশাল। বেশুমার সদস্য। সকলেই তাঁর স্ববংশজাত ভাই-ভাতিজে পুত্র-পৌত্র নন। ধানের সাথে চিটের মতো প্রাসঙ্গিক ও আনুসঙ্গিক আরো অনেক লোক আছে তাঁর পরিবারে। পরিবারের আয়তনটা তারাই ফুলিয়ে ফাঁফিয়ে তুলেছে। সবাই এরা শরীফ নয়। দায়িত্ব ও ওজনবোধ সবারই এদের সমান নয়। জ্ঞানবুদ্ধি আর আত্মসম্মান বোধটাও অনেকের এদের নিম্নমানের। কিন্তু এই পরিবারের একজন হওয়ার সুবাদে প্রতাপের বোধটা এদের অনেকেরই উগ্র। প্রতাপের উত্তাপটা এদের মধ্যেই বেশী।

হায়াতউল্লাহ বা হায়াত খান হাজী আহম্মদের পরিবারের এমনই এক আনুসঙ্গিক সদস্য। হাজী আহম্মদের জামাতা আতাউল্লাহ খানের তিনি এক দূর সম্পর্কের রিস্তেদার। এক সাধারণ ঘরের সন্তান। আতাউল্লাহ খানই হায়াত খানকে এনে এই পরিবারভুক্ত করেছেন। পুরোদস্তুর শরীফ আদমী হলেও, আতাউল্লাহ খান নিজে



www.amarboi.org

কিছুটা রগচটা ও অভিমানী ব্যক্তি। যেহেতু হায়াত খান আতাউল্লাহ খানের একজন গরীব রিস্তেদার, সেই হেতু এই পরিবারে হায়াত খানের অনাদর বা অসম্মান কিছু হলেই, সেই অসম্মানটা পক্ষান্তরে তাঁকে করা হলো বোধে আতাউল্লাহ খান খুব ক্ষুব্ধ রুষ্ট হন। ফলে, জামাইকে তুষ্ট রাখার তাকিদেই এই পরিবারের সদস্যেরা হায়াত খানকে খাতির করে চলেন, সমীহ্ সমাদর করেন। এই একইমাত্র কারণে খোদ হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দী খানও যথাসম্ভব তাঁকে রুষ্ট করতে চান না। শিকড়হীন হলেও তাই হায়াত খান এই পরিবারের বিশিষ্ট একজন।

শুধু ভেতরেই নয়, এই পরিবারের বাইরেও হায়াত খানের অনেক দাম। অন্যেরা তো বটেনই, খোদ প্রশাসনিক পরিষদের ঐ রথী মহারথীরাও জিয়াদা কদর দেন হায়াত খানকে। হাযাত খান তাঁদের একখান বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয় হাত। হাজী আহম্মদের পরিবারবর্গের সাথে অনুক্ষণ যোগাযোগ রাখার সহজ মাধ্যম হায়াত খান। বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে ঐ পরিবারের পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে হায়াত খানকেই সক্রীয়ভাবে পান তাঁরা। আত্মসম্মানবোধটা তাঁর অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা হওয়ায়, উস্কানী, কান-ভাঙ্গানী, মায় গোয়েন্দাগিরির কাজেও হায়াত খানকে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। হায়াত খানকে কদর তারা দেবেন না-ই বা কেন ? সব মিলে অবস্থান তাঁর যা-ই হোক, প্রতাপটা হায়াত খানের প্রখর।

এই প্রখর প্রতাপেরই কিঞ্চিৎ পরশ দিলওয়ার আলী পেলেন। শাহজাদা সরফরাজ খানের তলব পেয়ে দিলওয়ার আলী তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং শাহজাদার কিছু কাজে সেখানেই আটকে থাকেন। শাহজাদার কাজ শেষে শেষবেলায় এসে প্রশাসনিক চত্বরে ঢুকতেই, বাঘ এসে ছাগের উপর হামলা করার মতো তাঁর উপর চড়াও হলেন হায়াত খান। তিনি দিলওয়ার আলীর পথ আগলে বললেন— এই যে সালার সাহেব, আজকাল কি সেরেফ আসমানেই থাকেন, না জমিনের সাথে সম্পর্ক কিছু আছে ?

হায়াত খানকে দিলওয়ার আলী চেনেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ও আদব-আক্কেলের সব খবরই রাখেন। প্রভাবশালী মহলের লোক বলে তাঁর অসংলগ্ন আচরণ অনেকেই গায়ে মাখতে যান না। দিলওয়ার আলীও মাখেন না। ভারসাম্যহীন ভূঁইফোড়দের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে অনর্থক ফ্যাসাদে পড়তে যায় কে ? দিলওয়ার আলীও যান না। পারতপক্ষে এদের তিনি এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আজ আর তা পারলেন না। নেহায়েত পথ আগলে দাঁড়ানোর ফলে তাঁকেও দাঁড়িয়ে যেতে হলো এবং হায়াত খানের প্রশ্নের কিছু জবাবদিহিও করতে হলো। হায়াত খানের আচানক আক্রমণে তিনি থমকে গিয়ে বললেন— জি ?

হায়াত খান বললেন— নবাবের শুকনো কিছু তারিফেও কারো পাখা গজানো অসম্ভব নয়। কিন্তু আসলেই স্থান যার জমিনে, সে আসমানে ঘুরে বেড়াবে কতক্ষণ ?

ক্ষুণ্ন হলেও দিলওয়ার আলী সংযত কণ্ঠে বললেন— মতলব ?

ঃ আরে সাহেব, তিন তিনবার তলব দিয়েও পাত্তা পাওয়া যায় না আপনার, একদম ডুমুরের ফুল ! ব্যাপার কি ?



www.amarboi.org

ঃ ও, এই কথা ?

ঃ শুনি, খুবই নাকি করিৎকর্মা লোক আপনি। কিন্তু কাজে এসে সেটাতো প্রমাণ করবেন একবার ? তলব দিয়েও পাওয়া যায় না, কাজের সময় হাওয়া হয়ে যান কোথায় ?

দিলওয়ার আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—নবাব বাহাদুর আমাকে কি তলব দিয়েছিলেন ?

হায়াত খান ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—নবাব বাহাদুর ! খোদ নবাব বাহাদুরের তলব চাই আপনার ? এত উপরের লোক আপনি ?

ঃ না, বলছিলাম—

ঃ সব কাজেই খোদ নবাব যখন তলব দেবেন আপনাকে, একমাত্র তখনই আপনি যাবেন ? অন্যের তলবের কোন পরোয়াই আপনি করেন না ?

ঃ আপনি অনর্থক ক্ষিপ্ত হচ্ছেন।

ঃ অনর্থক ! প্রশাসনিক পরিষদের নির্দেশ আপনি পাননি ? আপনাদের সামরিক ডেরায় সে নির্দেশ পৌঁছেনি ? একথা বলা হয়নি যে, আজ সকাল থেকেই আপনাদের সবাইকে তৈয়ার থাকতে হবে ? খোদ হাজী আহম্মদ সাহেব, রায় বাবু, শেঠ বাবু বা পরিষদের অন্য যে কেউ আপনাদের যে কাউকে তলব দেয়া মাত্রই সেখানে গিয়ে হাজির হতে হবে আপনাদের ?

ঃ হ্যাঁ, সে খবরটা শুনেছিলাম।

ঃ তবু আপনার দপ্তরে আপনি থাকলেন না ? এতবড় একটা ব্যাপারের উপর কোন গুরুত্বই আপনি দিলেন না ?

ঃ তা দেই কি করে ? মানে—

ঃ দেই কি করে ! খোদ হাজী আহম্মদ সাহেবও ফালতু লোক আপনার কাছে ? তাকেও অমান্য করার সাহস করেন ?

ঃ তা করবো কেন ? তবে—

ঃ ব্যাপারটা আসলে কি ছিল এখানে, সেটাও বুঝি তলিয়ে দেখার গরজ হয়নি আপনার ? পূরো খবরটা জেনে নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি ?

ঃ মানে ?

ঃ তা করলে তা আপনার মতো চালাক লোক এ ব্যাপারে এত উদাসীন থাকতেন না ? এর গুরুত্বটা জরুর আপনি হৃদয়ঙ্গম করতেন !

হৃদয়ঙ্গম দিলওয়ার আলী খবরটা শুনার পরই করেছেন। সুদূর উড়িষ্যা থেকে শাহজাদা তকী খানকে আমন্ত্রণ করে আনার এবং তাঁর সম্মানে এই মধ্যাহ্ন ভোজের আনযাম করার জরুরতটা যে প্রশাসনিক পরিষদের কি, তা দিলওয়ার আলীর মতো একজন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন লোকের হৃদয়ঙ্গম না করার কিছু নেই। পুত্র তকী খানকে নিয়ে নবাব সুজাউদ্দীন খানের চিন্তা-ভাবনায় জোয়ার-ভাটা থাকলেও, হাজী আহম্মদ সহ এই প্রশাসনিক পরিষদের ঐসব তা-বড়ো তা-বড়ো সদস্যদের কাছে কেবলই জোয়ার ছাড়া ভাটা বলে কোন পদার্থ নেই। রায় বাবু—শেঠ বাবুদের সাথে হাজী আহম্মদেরও স্বার্থ এখন এক ও অভিন্ন। হাজী আহম্মদ সাহেবও বুঝেছেন, হুকুমাতের ক্ষমতাটা এই পরিষদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখতে পারলে, প্রতিপত্তির সাথে ফায়দা হাসিলের



www.amarboi.org

মওকা অবারিত। আরো বুঝেছেন, এই কুক্ষিগত করে রাখতে হলে তকী খানকে মসনদে আনার বিকল্প নেই। এতে করে, শাহজাদা তকী খান প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে সুপরিচিত হোন, সবার সাথে তাঁর একটা হাম্‌দরদী ভাব গড়ে উঠুক, তাঁর সমর্থন বাড়ুক এবং সর্বোপরি, তাঁর ঘুমন্ত ওয়ালেদের অনুভূতিটা জাগ্রত হোক, পরিষদের ঐ হোমরা-চোমরাদের এ আগ্রহ দুর্নিবার।

শাহজাদা সরফরাজ খানের সাথে শাহজাদা তকী খানের বিরোধটা শেঠ বাবুদের অনেক আগের সৃষ্ট বিরোধ। এই বিরোধের স্বরূপ আর পরিণামটা নবাব সুজাউদ্দীন খানকে উলঙ্গ করে সমঝে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ভোজের আনযামটা মধ্যাহ্নে করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ শহরে শাহজাদা তকী খানের তিলপরিমাণ নিরাপত্তাও নেই! দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তকী খান উড়িষ্যায় ওয়াপস্ যেতে না পারলে, তাঁর জানের উপর কখন কোন্ হামলা হয়, কে জানে? একই পিতার সন্তান হয়ে একজনকে যে এমন নিরাপত্তাহীন হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, এ হালত্ করুণ! নবাবের অভাবে এ হালত্ তাঁর করুণতম হবে। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নবাবের আর উদাসীন থাকলে চলবে না। তাঁকে নিয়ে কার্যকরী চিন্তা-ভাবনা নবাবকে সময় থাকতেই করতে হবে।

অবশ্য তামামই এসব ভেতরের কথা। বাইরের কথা এটা নয়। বাইরের কথা হলো, সুদূর উড়িষ্যা থেকে তস্‌রীফ আনছেন এদেশেরই আর একজন শাহজাদা। তাঁকে খোশ আমদেদ জানানো আর তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এদেশের আমীর-উমরাহ্, কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং সচেতন নাগরিকবৃন্দের এক পবিত্র কর্তব্য।

এমন তসরীফ শাহজাদা তকী খান অতীতেও বারকয়েক এনেছেন। ভবিষ্যতেও আনতে থাকবেন এবং এই পবিত্র কর্তব্য পালনের খোশ-কিস্‌মতি সকলের আরো অনেকবারই হবে—এ 'কিয়াস্' দিলওয়ার আলীর আটপৌরে 'কিয়াস্'। প্রশাসনিক পরিষদ সহকারে পাত্র-মিত্র, আমীর-আমলা, দেশবাসী—অর্থাৎ 'সবার' কাছে যে শাহজাদা তকী খানই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, সরফরাজ খান নন, নবাব সুজাউদ্দীন খান সহ এ ধারণা ঐ 'সবার' কাছে প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অপরিসীম। এক কথায়, তকী খানের পক্ষে জনমত তৈরী করাই এই কিসিমের আনযামের একমাত্র উদ্দেশ্য।

যদিও প্রচারটা রেখে ঢেকে করা হয়েছে, তবু এ আনযামের পূর্ণ খবর, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিলওয়ার আলী জানেন। জানেন তিনি এ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কর্মসূচী—প্রথমাংশে খোশ আমদেদ জানানো, মধ্যাহ্নে ভোজসভা, ভোজের পর বিনোদন এবং সবশেষে শাহজাদাকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন। দিলওয়ার আলীর অজানা কিছু নেই। সরকারী ও বেসরকারী মহলের মোটামুটি মাথা মরুব্বী সবাইকে এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়েছে। শাহজাদা সরফরাজ খানও এ দাওয়াত পেয়েছেন। কোন সরকারী ব্যাপার নয় এটা। উৎসাহীদের আগ্রহে সরকারী চত্বরে এটা এক বেসরকারী আনযাম।

হায়াত খানের কথার প্রেক্ষিতে দিলওয়ার আলী বললেন—দেখুন, আমরা নকরী করি। সবরকম খবরাখবর আমাদের বুঝে নিতে হয়, আর তার গুরুত্বও আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হয়।



www.amarboi.org

কৈফিয়ত তলব করে হায়াত খান ফের বললেন—তাহলে আপনাকে পাওয়া গেল না কেন ? সবাই এসে হুকুম নির্দেশ পালন করলো, আপনি এ হুকুম অমান্য করলেন কেন ?

দিলওয়ার আলী নির্বিকার কণ্ঠে বললেন—কারণ, হুকুম একাধিক হলে, যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেইটিই আগে পালন করতে হয়।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ পরিষদের সদস্যদের নির্দেশ আর শাহজাদা সরফরাজ খান সাহেবের হুকুম এক সাথে এসে পৌছলো। পালনটা তো এক সাথে করা যায় না। আগ্-পিছ্ করে করতে হয়। একটা শেষ করে তাই আর একটার খবর করতে আসছি।

হায়াত খান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তার মানে ! আপনি তাহলে শাহজাদা সরফরাজ খানের হুকুম পালনে ছুটেছিলেন ? আপনার কাছে তাঁর হুকুমটাই বড় হলো?

ঃ তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক।

ঃ তাহলে পরিষদের সদস্যেরা আপনার কাছে কিছু নন ? একেবারে তুচ্ছ গণ্য করেন ?

ঃ তুচ্ছ-বৃহৎ যা-ই হোক, আমি শাহজাদাকে শাহজাদাই গণ্য করি, সদস্যদের সদস্যই গণ্য করি। সমান মনে করিনে।

ঃ কি রকম ?

ঃ মুনিব পক্ষ আর তাঁদের অধীনস্তেরা সমান হয় কি করে ?

ঃ তার মানে ! সদস্যেরা নওকর আর শাহজাদা সরফরাজ খান তাঁদের মুনিব ?

তিনি তাঁদের মুনিব কিনা জানিনে, তবে তিনি তাঁদের অধীনস্ত নন বা কোন কর্মচারী কখনো শাহজাদার মুনিব নন।

ঃ কর্মচারী ! হাজী আহম্মদ সাহেব, রায় রায়ান সাহেব, জগৎ শেঠ বাবু—এঁরা কর্মচারী ?

ঃ কাজ করে বিনিময় নিলে তাকে কি বলে সে ব্যাখ্যায় যাবো না। তবে তাঁরা আর যা-ই এবং যতবড়ই হোন, শাহজাদার উপরে নন।

হায়াত খান কটাক্ষ্য করে বললেন—ও, আপনি তাহলে ঐ দলে ?

ঃ ঐ দলে মানে ?

ঃ মানে শাহজাদা সরফরাজ খানের দলে ?

ঃ আমি একজন নগণ্য কর্মচারী। আমার কোন দল নেই। উপর ওয়ালারা যখন যিনি তলব দেন, তখন তাঁর খেদমতে হাজির হই।

ঃ তাহলে শাহজাদা তকী খানের খেদমতে আপনি হাজির হলেন না কেন ? তাঁর খেদমতের জন্যেও তো আপনাকে তলব দেয়া হয়েছিল ?

ঃ কোন্‌টা আগে পালন করবো, বলুন ? একজন ঘরের ভেতরের মুনিব, একজন ঘরের বাইরের মুনিব। ঘর সামলাবো আগে, না বাহির সামলাবো আগে ?

ঃ বটে ! তাই সরফরাজ খানের খেদমতে সারাদিন পড়ে রইলেন ?



www.amarboi.org

ঃ তাইতো রইলাম।

ঃ শাহজাদা তকী খানের খেদমত করা প্রয়োজন মনে করলেন না?

ঃ সময় পেলাম কই?

ঃ শাহজাদা সরফরাজ খান দাওয়াতে এলেন না, তাই আপনিও এলেন না?

ঃ ছুটি পেলে তো আসবো?

ঃ সাব্বাস্‌! একেই বলে, কানাচোর ঘর চেনে না, ঘর রেখে সারারাত পগাড়ে সিনকাটে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনাকে আমি বুদ্ধিমান বলেই মনে করতাম। কিন্তু আপনি যে এতটা নির্বোধ তা আগে কখনো বুঝিনি।

ঃ তাই? তা জ্ঞানী হলেই বুঝতে পারতেন, কে নির্বোধ কে বুদ্ধিমান। এতদিন অন্ধকারে থাকতেন না।

ঃ মানে?

ঃ ঠিক ঠিক বুঝতে পারতেন।

ঃ আমার বুঝে কাজ নেই। আপনি যে নিজের ভালাইটাও বুঝেন না, তা দেখে তাজ্জব হচ্ছি।

ঃ নিজের ভালাই!

ঃ তকী খানকে ছেড়ে আপনি সরফরাজ খানকে নিয়ে পড়ে আছেন? ঠ্যাং রেখে লাঠি ধরে টানাটানি করছেন? সত্যিই আপনার জন্যে আমার বড় করুণা হয়।

ঃ আপনার দয়ার শরীর। তবে আমার ব্যাপারটা আলাদা।

ঃ কি রকম?

ঃ যারা নিজের গরজে ধরে, তারা হিসেব কষে ঠ্যাং-লাঠি এসেই ধরে। আমরা তো নিজ গরজে ধরিনে। ধরার হুকুম হলে ধরি। ওটা দেখার আমাদের কি দরকার?

ঃ আজ বাদে কাল তকী খান নবাব হলে তখন কি করবেন?

ঃ তখনও হুকুম পালন করেই যাবো।

ঃ তাতে কি ফায়দা হবে? যে গোলাম সেই গোলাম হয়েই থাকবেন। যথাসময়ে ঠ্যাং-লাঠি না চিনলে, উপরে উঠতে পারবেন না?

ঃ নীচে থাকবে কে?

ঃ নীচে!

ঃ সবাই উপরে উঠলে, উপর নীচের ফারাগ আর থাকবে না। নীচে থাকারও লোক তো কিছু চাই?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনারা যারা সময় মতো ঠ্যাং চেনেন, তাঁরা উপরে উঠুন—ওতেই আমরা খুশী। আমরা চিরকালই নীচের মানুষ। হঠাৎ করে উপরে উঠার খাহেশ হলে পড়ে গিয়ে হাত-পা-ই শুধু ভাঙ্গবো, উপরে উঠতে পারবো না।

হায়াত খান বিরক্ত হয়ে বললো—নাঃ! সেপাই হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে মগজটা আপনারা ফউৎ করে দিয়েছেন। কিচ্ছু হবে না আপনাদের দিয়ে।



www.amarboi.org

ঃ এবার ভাই সাহেবকে বাহবা দেয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। ঠিক বুঝটা এতক্ষণে বুঝেছেন।

ঃ তবু একটা কথা খেয়াল রাখবেন, আখেরে কাজ দেবে।

ঃ কি কথা ?

ঃ নিজে উপরে না উঠতে চান, না উঠুন। কিন্তু আমাদের পথে কখনোও যেন কাঁটা ছড়াতে আসবেন না। আমরা উপরে গেলে নকরী নিয়ে আপনি তাহলে নীচে থাকতেও পারবেন না।

ঃ কোথায় যাবো ?

ঃ জমিনের তলে সেঁদিয়ে দেয়া হবে আপনাদের।

ঃ তাহলে কি করতে বলেন ?

হায়াত খান খুশী হলেন। খুশী হয়ে বললেন—এইতো, এই কথাটাই তো এতক্ষণ আপনার কাছে চাচ্ছিলাম। ভুল যা করেছেন, করেছেন। এবার লাঠি ছেড়ে ঠ্যাং এর দিকে আসুন। আমাদের সাথে হাত মেলান। সবসময় পরিষদের মুরুব্বীদের মন যুগিয়ে চলুন। আপনার আখের মজবুত।

ঃ তারপর ?

ঃ মুরুব্বীরা বলেছেন, আপনি আর আপনার ভাই যদি শাহজাদা সরফরাজ খানের পক্ষ না নেন, তাহলে অন্য কোন সেপাই-সালারই আর ওপক্ষে যাবে না। সেপাইদের মাঝে আপনাদের নাকি খুবই প্রতিপত্তি ?

ঃ আচ্ছা !

ঃ নবাবের দেখাদেখি আমাদের মুরুব্বীরাও আপনাকে গুরুত্ব দেয়া ধরেছেন। এ মওকা হারাবেন না।

ঃ তাতে লাভ ?

ঃ মোটা বকশিশ্ পাবেন। জিন্দেগীভর বসে বসে খেতে পারবেন।

ঃ কে দেবে সেই বকশিশ্টা ?

ঃ তা ধরুন, আমিই দেবো। আমার কাছ থেকেই তা আদায় করে নেবেন।

ঃ তখন যদি অস্বীকার করেন আপনি ?

ঃ তওবা-তওবা ! আমি মোনাফেক নই। সুদিনে আপনাকে আমি ভুলবো না।

ঃ অগ্রিম কিছু না পেলে তা বিশ্বাস করি কি করে ? বায়নাটা তো দেবেন। কিছু যা হোক ?

ঃ বায়না ? তা-মানে-খানদানী লোক আমরা। উপর তলার মানুষ। আমার মুখের কথা বিশ্বাস হয় না আপনার।

ঃ জাররা মাত্র না।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ আমি গোলাম। সরাসরি নবাবের গোলামী করি। আপনি তো তাও নন। আপনি গোলামের গোলাম। আমার মতো নবাবের যারা গোলাম, আপনি করেন তাদের গোলামী। গোলামের যে গোলাম, তার মুখের কথার দাম কি ?

হায়াত খান লাফিয়ে উঠে বললেন—খবরদার !

দিলওয়ার আলী সংযত কণ্ঠে বললেন—চটে গেলেন যে ?



www.amarboi.org

ঃ আপনার এতবড় দুঃসাহস ? আমি খোদ হাজী আহম্মদ সাহেবের লোক। তাঁর জামাই তুল্য মানুষ। আমাকে অপমান করেন আপনি ?

ঃ মানই যার নেই, তাকে আর অপমান করবো কি ?

ঃ কি ! আমাকে পরোয়াই আপনি করেন না ?

ঃ এতক্ষণ যে সহ্য করেছি, এইতো ঢের।

ঃ হুঁশিয়ার—

ঃ চীৎকার করবেন না। আপনারা খানদানী লোক, উপর তলার মানুষ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভারে চীৎকার করলে আপনাদের মান যায় না। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ। অল্প মান। আমি দেউলিয়া হয়ে যাবো। আপনি সরুন—

হায়াত খানের পাশ কাটিয়ে দিলওয়ার আলী সামনের দিকে এগুলেন। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে হায়াত খান গোস্বায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন এবং চীৎকার করে বলতে লাগলেন—এতদূর-এতদূর ! আজকের এই কথাটা খেয়াল থাকে যেন ! আখেরে এটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবো। আখেরে বুঝতে পারবে, এই হায়াত খান কোন্ চীজ্ !

চীৎকার শুনে গাউস খান দ্রুতপদে এদিকে এলেন। দিলওয়ার আলীকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার ! উনি ওভাবে চীৎকার করছেন কেন ?

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন—চীৎকার করছেন না চাচা, আমার আখেরের হিসেব-নিকেশ কষছেন।

গাউস খান সবিস্ময়ে বললেন—মানে ?

ঃ এদিকের কাজ কি শেষ হয়েছে আপনার ?

ঃ হ্যাঁ, এদিকের তামাম কারবার চুকে গেছে। আমি মকানে ফিরে যাচ্ছি।

ঃ তাহলে চলুন, মকানে গিয়েই সব আপনাকে বলছি—

## ৭

ছুটির দিন দেখে আবার একদিন আসবেন বলে ইমাম সাহেবের মকানে দিলওয়ার আলী যে কথা দিয়ে এসেছিলেন, সে কথা দিলওয়ার আলী ভুলেননি। আবার একটু বিলম্বে হলেও তিনি কথা রাখলেন। জুম্মাবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। নানা কিসিমের ঝুট-ঝামেলার মধ্য দিয়ে এক শুক্রবার গেল। তিনি পরের শুক্রবার গেলেন।

গেলেনও অসময়ে। জুম্মার নামায আদায় করে এসে বেরোই বেরোই করতে করতে আসরের ওয়াক্ত হলো। আসরের নামায আদায় করে যখন তিনি বেরুলেন, আসমানে তখন মেঘ জমতে শুরু করেছে। ঘন কালো মেঘ আকাশটা ক্রমেই ছেয়ে নিচ্ছে। মেঘ দেখে না বেরুলে আবার তাঁকে আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে আর তার ফলশ্রুতিতে অনেকের অনেক রকম মিঠে-কড়া কথা শুনতে হবে। অন্যদিনে আফসারউদ্দীনের মোলাকাত পাওয়া ভার। মাদ্রাসায় তাঁর কাজের এখন



www.amarboi.org

অনেক ভিড়। প্রায়দিনই মাগরিবের আগে ফিরে আসতে পারেন না। ইমাম বাড়ীর আকর্ষণ আর যাঁরা বা যিনিই হোন, আফসারউদ্দীন সাহেবই তার যোগসূত্র। তাঁর সাথে মোলাকাত করাটাই প্রধান উপলক্ষ্য। অতীতের সম্পর্কটা একাধিকবার নবায়ন করা হয়েছে। এখন আফসারউদ্দীন সাহেবই নতুন উপসর্গ। সেই আফসারউদ্দীনের অবর্তমানে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়াটা অনেকখানি গা-কাটা হয়ে যায়। অন্তত এইটেই দিলওয়ার আলীর ব্যক্তিগত অনুভূতি।

তাই মেঘ আকাশে দেখেও দিলওয়ার আলী বেরুলেন। কয়দিন ধরেই মেঘের এমন আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঝড়বৃষ্টি নেই। এই কয়দিনের একদিনও হয়নি। আজকে যে হবেই, এমন কি কথা ! দিলওয়ার আলী নিরুদ্বেগে বেরুলেন।

কিন্তু ইমাম সাহেবের মকানের কিছু কাছাকাছি আসতেই কড়-কড়-কড়াৎ ! বুলন্দ কণ্ঠে জানান দিয়ে বিপুল বেগে ধেয়ে এলো মেঘ। ধূলোবালি উড়িয়ে এলো ঝড়ো হাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। দিলওয়ার আলী ইমাম সাহেবের ফটকের খানিক দূরে থাকতেই মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে শুরু হলো ঝড়ের মাতম। নিকটে কোন আশ্রয় আচ্ছাদন না থাকায় দিলওয়ার আলী দৌড়ের উপর এলেন। নসীব তাঁর ভাল। যে কারণেই হোক, ফটকটা সেদিনের মতো ভেতর থেকে অর্গল আঁটা ছিল না। ফটক উদোম করে দুই পাল্লা দুইদিকে শক্ত করে আটকে রাখা ছিল। হয়তো বা ঝড়-তুফানে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীর কেউ এসে ফটকে আটকে না যায়, এই জন্যেই এই ব্যবস্থা করে রাখা।

দিলওয়ার আলী দৌড়ে এসে ফটকের উপর দাঁড়ালেন। কিন্তু ফল কিছু হলো না। ভেতর-বাহির—দুইদিক থেকেই ঝড়ের ঝাপটা আর বৃষ্টির ছিঁটা এসে তাঁকে অস্থির করে তুললো। ভিজে তিনি ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গিয়েছিলেন। চুলের পানি টপ্ টপ্ করে ঘাড়ে ঝরে পড়ছিল। মরা কাকের চরকে কি ভয়। ফটকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠায় তিনি উর্ধশ্বাসে দহলীজের দিকে দৌড় দিলেন। বাহির আঙ্গিনা পেরিয়ে তিনি দহলীজের বারান্দায় উঠে দেখলেন, গোসল তাঁর সমাপ্ত। ফারাগ শুধু, এ গোসলে ধূলোবালির আস্তরণটা ধূয়ে যায়নি, শরীরে আর লেবাসে আঠার মতো আটকে গেছে।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। ঝড়ের বেগ কমলেও বাতাসের বেগ কমেনি। উল্টে-পাল্টে পাক খাচ্ছে বাতাস। দিলওয়ার আলী শীত অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। মালিক-মুনিব, চাকর-নফর যে যার ঘরে খিল এঁটে দিয়েছে। দহলীজের দুয়ারেও শিকল তুলে দেয়া। মূল দালানটি দহলীজ থেকে অনেকখানি ফাঁকে। তবে দেখা যাচ্ছে স্পষ্টই। উপর-নীচ সব তলার সবক'টি কক্ষেরই দরজা-জানালা বন্ধ।

দিলওয়ার আলী সংকুচিত হয়ে গেলেন। এ রকম অপ্রস্তুত তিনি আর কখনো হননি। বিশেষ করে, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এসে এমন চুপানী খাওয়া ছাগল চেহারা নিয়ে তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। স্থির করলেন, এখান থেকেই ওয়াপস্ যাবেন তিনি। কেউ যখন দেখতে পায়নি, বৃষ্টি একটু ধরে এলেই তিনি সরে পড়বেন এখান থেকে। এই হালত নিয়ে আর এগুবেন না।



www.amarboi.org

সে মওকা তিনি পেলেন না। চিন্তা করে না সারতেই মূল দালানের বারান্দা থেকে ছাতি হাতে লাফিয়ে পড়লো কিতাবউদ্দীন। প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে সে 'হায়-হায়' রবে ছুটে এলো দহলীজের দিকে। বারান্দার কাছে এসেই সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলতে লাগলো — কি মুসিবত ! কি মুসিবত ! আসুন হুজুর-আসুন। এ হালতে এখানে আর এক লহমাও নয়। জলদি জলদি এসে পোশাক-আশাক বদল করে ফেলুন। বিমার-উমার হলো বলে !

বাক হারিয়ে দিলওয়ার আলী পলকখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। কিতাবউদ্দীন ঐ একইভাবে আকুতি-মিনতি করতে লাগলো। চমক ভাঙ্গতেই দিলওয়ার আলী সবিস্ময়ে বললেন — কি ব্যাপার ! তুমি কোথেকে দেখতে পেলে ?

কিতাবউদ্দীন একইভাবে বললো — আমি দেখতে পাইনি। দেখতে পেয়েছেন আপামনি — মানে মাহমুদা খাতুন আপামনি।

ঃ সেকি ! তিনি কি করে দেখতে পেলেন ?

ঃ জানালা খুলে দেখলেন। আপনার আজ আসার কথা। ঝড়-বাদলে পড়লেন কিনা — এই ভেবে জানালা খুলে দেখতে পেলেন আপনাকে।

ঃ আজ আমার আসার কথা মানে ?

ঃ ইশ্‌রে ! আপনি নাকি শুক্রবারে আসবেন বলে গিয়েছিলেন ? গত তারিখে আসেননি। আজ আর না এসে পারেন ?

ঃ তাই ?

ঃ আপনার কথার দাম নেই ? না এলে যে ওজন থাকে না আপনার !

ঃ আচ্ছা !

ঃ সেই দুপুর থেকেই আমাকে নিয়ে আপা ঐ ফুল বাগানে ছিলেন। মেঘ আসতে দেখেই তো সরে গেলাম আমরা।

ঃ বলো কি ?

ঃ ফটক বন্ধ থাকলে আগের মতো আটকে যাবেন বলে ফটকটা — ঐভাবে খুলে রেখে গেলাম।

ঃ তাজ্জব ! এতটা তোমাদের বিশ্বাস ?

ঃ জি ?

ঃ আমি আসবোই, এ সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত হলে তুমি ?

ঃ আমি নই, ঐ আপামনি।

ঃ ও আচ্ছা।

কিতাবউদ্দীন পুনরায় অস্থির হয়ে উঠে বললো — আসুন-আসুন। দেরী হলে আমাকেই ধমক খেতে হবে।

পালাবার পথ নেই। আপত্তি নিতান্তই অর্থহীন দেখে দিলওয়ার আলী এগুলেন। ছাতা মাথায় আসার নামে দুইজনেই সমানে ভিজে দালান ঘরের বারান্দায় এসে উঠলেন।

খবরটা জানাজানি হয়ে যেতেই খটাখট খুলে গেল দরজা জানালা। আফসারউদ্দীন ও আবিদ হোসেন সাহেব মকানেই ছিলেন। তাঁরা সরবে ও দ্রুতপদে



www.amarboi.org

বেরিয়ে এলেন। তাদের সাথে বেরিয়ে এলেন আজ্জিজুন নেছা বেগম। বেরিয়ে এসেই সকলে অভিযোগ তুলে বললেন— একি-একি ! এর মধ্যে বেরিয়েছেন কেন ?

দিলওয়ার আলী সলজ্জ কণ্ঠে বললেন— জ্বিনা, এর মধ্যে বেরোইনি। পথে আমাকে ঝড়-বৃষ্টিতে ধরেছে।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন— তাহলে মেঘটা দেখে বেরুবে ?

দিলওয়ার আলী হাসিমুখে বললেন— ওটা দেখতে গেলে বেরোনোই হতো না। আজ আসা না হলে, আবার ঐ আর এক জুম্মাবার আসার আমার ফুরসৎ খুবই কম। তবু এভাবে বারবার কথা রাখতে না পারলে, মকানে ঢুকতে দিতেন আপনারা ?

আজ্জিজুন নেছা খোশ কণ্ঠে বললেন— ওম্মা ! ছেলের আমার কত সুন্দর বিবেচনা! বেশ করেছো বাপজান। ঝড়-বাদল যা-ই হোক, জরুর তুমি আসবে। তোমার কিছু তকলিফ হলো। কিন্তু আমাদের প্রতি তোমার টানটা যে কত মজবুত, আজকে তা প্রমাণ হয়ে গেল।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে আফসারউদ্দীন বললেন— আহ্হা ! রাখুন না এখন ওসব কথা ! লোকটার অসুখ-বিসুখ একটা কিছু না বাধালেই নয়। আসুন-আসুন। আগে গোসল, লেবাস বদল, তারপর অন্য কথা।

— দিলওয়ার আলীকে তিনি ঠেলতে ঠেলতে গোসলখানায় নিয়ে গেলেন।

গোসল অন্তে আফসারউদ্দীন সাহেবের এক প্রস্থ্ পোশাক পরে দিলওয়ার আলী এলেন এবং বরাবরের মতো ঐ নির্দিষ্ট বসার ঘরে বসলেন। ঝড়টা আগেই থেমেছিল। বৃষ্টিটাও অনেকখানি ঝিমিয়ে এলো। তবে থেমে যাওয়ার তেমন কোন আলামত বোঝা গেল না। ঝুপ্‌ঝুপ্ করে ঝরতেই লাগলো এক লয়ে।

আফসারউদ্দীন ও আবিদ হোসেন সাহেবও সাথে সাথেই এলেন। দিলওয়ার আলী এসে বসতেই আজ্জিজুন নেছা বেগম একপাত্র ঈষদোষ্ণ দুধ নিয়ে হাজির হলেন এবং দিলওয়ার আলীর আপত্তিতে কান না দিয়ে জোর করেই খাইয়ে দিয়ে গেলেন। অতপর শুরু হলো গল্পালাপ। দিলওয়ার আলী কি করে এই মুসিবতে পড়লেন, কোথায় তাঁকে ঝড়-বৃষ্টিতে ধরলো, কাছেকোলে আশ্রয় কিছু ছিল কিনা—এসব নিয়ে কথাবার্তা চলার মধ্যে পাশের কক্ষ থেকে মাহমুদা খাতুন মন্তব্য করে বসলো —আসলে এই রকমই হয় ভাইজান। উনার যা পাওনা তাতো উনাকে পেতেই হবে।

সকলেই থেমে গেলেন। আফসারউদ্দীন সেদিকে চেয়ে বললেন—তার মানে ?

মাহমুদা খাতুন বললো—ওয়াদাখেলাপকারীর উপর যে গজব নাযেল হয়, এটাতো মিথ্যে নয়।

ঃ ওয়াদা খেলাপকারী ! কে ওয়াদা খেলাপ করলো ?

ঃ আপনার ঐ মেহমান। মানে আপনার ঐ ভাই। ছুটির দিনে আসার কথা। গত জুম্মাবার ছুটির দিন গেল, উনি এলেন না। এলেন এই আজ। ওয়াদা ভঙ্গ হলো না ?

আফসারউদ্দীন টিপ্পনী কেটে বললেন— ওরে এলেমদার ! তাতে কি হয়েছে ?

ঃ কি আবার হবে ? সেদিন এলে তো এই মুসিবতে পড়তেন না। আজ আসার জন্যেই এই মুসিবতে পড়েছেন।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব সশব্দে হেসে উঠে বললেন—মারহাবা ! মারহাবা ! দাও হে সালার, এর জবাব কি দেবে এবার দাও দেখি।

দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে বললেন—কথাটা উনার একদিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু কোন চূড়ান্ত কথা নয়।

মাহমুদা খাতুন প্রতিবাদ করে বললো—কেন নয় ?

দিলওয়ার আলী সসংকোচে বললেন—ওয়াদা ভঙ্গের পাপেই যে এই মুসিবতে পড়েছি আমি, একথা ঠিক নয়। মানুষ ইচ্ছে করেই সবসময় ওয়াদা ভঙ্গ করে না, অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়। বিশেষ করে, যারা পরের গোলামী করে তাদের পক্ষে কথা রাখা বড়ই মুস্কিল।

ঃ মানে ?

ঃ যারা স্বাধীন, তারা সবকিছুই নিজের ইচ্ছেয় করতে পারে। কোথাও যাওয়া-না-যাওয়া বা কিছু করা-না-করা সবই তাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু যারা পরের অধীন, তাদের কি সেই স্বাধীনতা থাকে ?

ঃ কেন থাকে না ?

ঃ এটা বোঝাতে পারবো না। পরের অধীন হননি তো কোনদিন। হলে নিজেই আপনি বুঝতে পারতেন, কেন তা থাকে না।

আবিদ হোসেন সাহেব আবার হেসে উঠে বললেন—ঠিক-ঠিক ! সালার সাহেব ঠিক কথা বলেছেন।

মাহমুদা খাতুন আপত্তি তুলে বললো—ঠিক কথা বলেছেন ? তাহলে কি দরকার ঐ পরের অধীন হওয়ার ? অমন অধীন না হলেই কি নয় ?

জবাবে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—না, ইচ্ছে করলেই মানুষ মুক্তডানা পাখীর মতো সবসময়ই স্বাধীন থাকতে পারে না। গরজ বড় বালাই। একভাবে না একভাবে অন্যের কিছুটা অধীন হতেই হয় তাকে।

ঃ কি রকম ?

ঃ আবার কি রকম ! এই যে আজ স্বাধীন হয়ে আছো, এভাবে স্বাধীন হয়েই থাকতে পারবে চিরদিন ? একদিন না একদিন তোমাকেও তো কিছুটা পরের অধীন হতে হবে।

ঃ কেন, আমি তা হতে যাবো কেন ?

আফসারউদ্দীন ক্ষিপ্ত হলেন। বিরক্তিভরে বললেন—ওরে কচি খুকীরে ! হতে যাবো কেন ? দাঁড়াও, এতদিন ব্যস্ত ছিলাম বলে এদিকে কেউ নজর দিতে পারিনি। এবার এই বছরখানেকের মধ্যেই তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে, পরের অধীন হতে যাবে কেন ?

ঃ ভাইজান !

ঃ অধীন না হলেও স্বাধীন চলাফেরায় কিছুটা বাধা পড়ে কিনা আর অন্যের কিছু তোয়াক্কা রাখতে হয় কিনা, সেটা বুঝিয়ে দেয়া হবে।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব সপুলকে বললেন—ঠিক-ঠিক। আমি বলি, আবার বছরখানেক কেন ? বয়সটা তো কম হয়নি বহিনের তোমার ! তুমি আছো, এই সালার সাহেব আছে, একটা তাগড়া-তাজা যোগাড় করে এনে ফেলো না শিগ্গির ! দাও না শিগ্গির ছুঁড়িটাকে তার সাথে গেঁথে। কবে মরি, কবে বাঁচি, ধুমধামটা দেখে যাই আর ছুঁড়িটাও বুঝুক, তাকে কিছুটা পরের তোয়াক্কা করতে হয় কিনা ?

মাহমুদা খাতুন ক্রোধভরে বললো—তবেরে ! ভাল হচ্ছে না দাদু !

আফসারউদ্দীন ধমক দিয়ে বললেন—চুপ্ কর ! বক্ বক্ করিস্‌নে, আমাদের কথা বলতে দে।

থেমে গেল মাহমুদা খাতুন। এরপর কিছুক্ষণ গল্প আলাপ করে আফসারউদ্দীন ও আবিদ হোসেন সাহেব উঠে একটু এদিক ওদিক গেলেন। দিলওয়ার আলীকে একা পেয়ে মাহমুদা খাতুন আবার বললো—আজ আর আপনার উপায় নেই সালার সাহেব। আজ আপনি বন্দি।

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন—হওয়াই স্বাভাবিক। বন্দি করার উদ্দেশ্যেই যেখানে ফটকটা খুলে রাখা হয়েছিল, তখন আর সেটা বিচিত্র কি ?

ঃ তার অর্থ ?

ঃ আর লুকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিতাবউদ্দীনের কাছে সব আমি শুনেছি।

ঃ যেমন ?

ঃ সারাবেলা ফটক পাহারা দেয়া আর অবশেষে ফটকটা খোলা রাখার সব বৃত্তান্ত শুনেছি।

ঃ ওম্মা ! ইতিমধ্যেই ?

ঃ জি। এবার বলুন, বন্দি হলেম কিসে ?

ঃ যাবেন কি করে ? বৃষ্টি আজ ছাড়বে না।

ঃ ছাড়বে না ?

ঃ সে সম্ভাবনা কম।

ঃ ছাতি মাথায় দিয়ে যাবো।

ঃ কিন্তু লেবাস ? ওগুলো তো ধুয়ে দেয়া হয়েছে। না শুকালে যাবেন আপনি কি করে ?

ঃ এই লেবাসেই যাবো। কাল আমার লোক এসে লেবাস পাল্টে নিয়ে যাবে।

মাহমুদা খাতুন হতাশ কণ্ঠে বললেন—বাস্‌রে ! যাওয়া তবু চাই-ই ? এতই জরুরী ?

ঃ জরুরী না হোক, খামাখা থেকে করবো কি ?

ঃ গল্প করবেন। এতদিন পরে এসে দু' এক কথা বলেই চলে যেতে চান কেন ?

ঃ অধিক বলা কি ভাল ?

ঃ তা জানিনে। তবে আমি বড় একা। ছোট ভাইবোন কেউ নেই। বোবা হয়ে থাকি। আপনি এলে তবু কিছুক্ষণ ফাঁপড়টা কাটে।



www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা।

ঃ অর্থহীন স্বপন দেখেই কাল কাটাতে হয় না। তখন কিছুটা আশার আলো দেখতে পাই।

ঃ এ্যাঁ!

ঃ কেন যে ফৌজীপুরে এসে ঐভাবে জুটে গেলেন আপনি! আমার জিন্দেগীর মোড়টাই পাল্টে গেল। তামাম ধ্যান-ধারণা এক জায়গায় এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল।

দিলওয়ার আলী আবেগ ভরে বললেন — মাহমুদা খাতুন।

দিলওয়ার আলীর মুখে নিজের নাম শুনে মাহমুদা খাতুন শিহরিত হয়ে উঠলো। সেও আবেগ ভরে বললো — এখন আপনিও আসতে চান না, আমিও পথের দিকে চেয়ে না থেকে পারিনে।

মাহমুদা খাতুনের কণ্ঠস্বর ভারী হলো। শিহরিত হয়ে উঠলেন দিলওয়ার আলী নিজেও।

দিলওয়ার আলী সত্যিই সে রাতে আটকে গেলেন। মাঝখানে কিছুক্ষণ স্তিমিত হয়ে এলেও সন্ধ্যে যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, বৃষ্টির বেগও ততই বাড়তে লাগলো এবং শেষ অবধি আবার মুষলধারে শুরু হয়ে প্রায় অর্ধেকটা রাত ঐ একইভাবে চললো। আঙ্গিনে-উঠোন, পথ-প্রান্তর বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে গেল। মানুষজন তো নয়ই, অর্ধেক রাত পর্যন্ত কোন জীবজন্তু বাইরে বেরিয়ে এলো না। অতিরিক্ত ছাতা সহ নওকরেরা গিয়ে ইমাম সাহেবকে মসজিদ থেকে আনলো বটে, কিন্তু গোসলের আর কিছুই কারো অবশিষ্ট রইলো না।

বাধ্য হয়েই দিলওয়ার আলীকে এ রাতে এই মকানেই থাকতে হলো। এতে তাঁর বেজায় কোন অসুবিধে হলো কিনা, একথা জানতে চাওয়া হলে দিলওয়ার আলী জানালেন, অন্য কোন অসুবিধে নেই, তবে নামদার খাঁর আহার-নিদ্রা তামামই গোটা রাত বন্ধ থাকবে।

প্রশস্ত অবসর। সবাই বসে অনেকক্ষণ অনেক বিষয় নিয়ে অনেক কিসিমের গল্প-আলাপ করলেন। ইমাম সাহেব, মাহমুদা খাতুন, কিতাবউদ্দীন এদের কথাও বাদ গেল না। ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেব যে মসজিদ আর ইমামতীর বাইরে ঘর-সংসার বোঝে না — আবিদ হোসেন সাহেবকেই সব দেখাশুনা করতে হয়, এসব কথাও হলো। কথা হলো, নীতিদর্শন, মক্তব-মাদ্রাসা নিয়েও।

আহার অন্তে আবিদ হোসেন সাহেব এসে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দিলওয়ার আলীর সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন। প্রশাসনের হালচাল, নবাবের মানসিকতা ও দেশের ভবিষ্যত নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে দু' এক কথার পরই আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — নবাবের শুনি মোটেই নজর নেই প্রশাসনের দিকে। তাহলে প্রশাসনের কাজগুলো কিভাবে চলছে?



www.amarboi.org

জবাবে দিলওয়ার আলী নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন—ঠিক মতো কি চলছে ? কোন মতে গড়িয়ে যাচ্ছে, এই যা। কখন যে আটকে যাবে, কে জানে ?

ঃ আটকে যাবে ?

ঃ না, ঠিক আটকে যাবে না। আটকে তো এ দুনিয়ায় কিছুই থাকে না। তবে যেভাবে চলার কথা সেভাবে না চলে হয়তো যা বাঞ্ছনীয় নয়, সেই দিকে ঘুরে যাবে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই রকমই অনেকে বলাবলি করছে। বলছে, মুসিবতের আলামতটা এ আমলেও কিছুমাত্র কমলো না।

ঃ কমবে কি ? আরো যে কত বেড়ে যাবে, কে বলতে পারে ? প্রশাসনটা যাঁরা প্রকৃতপক্ষে চালাচ্ছেন, তাঁদের যে আহামরি মানসিকতা আর মন-মতলব !

ঃ মানে ?

ঃ তাঁরা আছেন তাঁদের কোলের ভাত ঝোল দিয়ে ভেজানোর তালে। দেশের ভালাই নিয়ে থোড়াই ভাবনা আছে তাঁদের।

আবিদ হোসেন সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সবই নসীব ! তাহলে নবাব সুজাউদ্দীন খানও ঐ গেঁড়াকলে শক্তভাবেই আটকে গেলেন ?

ঃ গেঁড়াকল !

ঃ মানে ঐ ধুরন্ধর চাটুকারদের জালে শ্বশুরের মতো উনিও জড়িয়ে গেলেন ?

দিলওয়ার আলী ম্লান হেসে বললেন—এ আর নতুন কি ? উনিতো ক্ষমতায় এসেছেনই ঐ জালে জড়িয়ে। এ থেকে কি বেরিয়ে আসা সহজ ?

ঃ তা-বটে !

ঃ কোন হুঁশের লোক হলে হয়তো কিছুটা আশা ছিল। কিন্তু ইনিতো মসনদে বসেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

আবিদ হোসেন সাহেব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—আর দেশটা শাসন করছে তারাই,হুকুমাত আর কওমের কল্যাণে যাদেরকেই শক্তভাবে শাসনে রাখা উচিত ছিল !

ঃ জি। মানে—

ঃ এভাবে যতবারই এই অপশক্তি এসে এ মুলুকের শাসনদণ্ডে হাত লাগিয়েছে, ততবারই একটা মস্তবড় উলট্‌পালট্‌ হয়ে গেছে।

ঃ জনাব !

ঃ শক্ত একটা লাথি খেয়েছে উদাসীন এই মুসলমান শাসকগোষ্ঠী আর এই মুসলমান কওমের নসীব নিলামে উঠেছে।

ঃ জি-জি। এ ইতিহাস আর জানে না কে ?

ঃ সবাই জানে। জানে না শুধু এই মুলুকের স্বার্থপর ও দায়িত্বহীন শাসকগোষ্ঠী। এরা বড় কমজোর মুসলমান। স্বার্থের মোহে আর নির্বুদ্ধিতার কারণে কওমের কথা তো এরা ভাবেই না, নিজেদের অতি আসন্ন করুণ পরিণতিটাও চিন্তা করে দেখে না। দীর্ঘকাল স্থায়ী মুসলমান হুকুমাতের এই ঐতিহ্যবাহী কিস্তিটা ডুবেই গেল শেষ পর্যন্ত।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব আবার সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। দিলওয়ার আলী জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন— জনাব !

ঃ মাঝে মাঝে কিছুটা টাল মাটাল হলেও, অন্যেরা তবু কিস্তিটা এ পর্যন্ত শক্তভাবেই চালিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু এই নবাব মুর্শিদকুলী খান এসে এটাকে একদম ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে গেলেন।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মুসলমান হুকুমাত উচ্ছেদের ব্যর্থ চেষ্টা করে যে বিপক্ষশক্তি মাটির মধ্যে সেঁদিয়ে গিয়েছিল, নবাব মুর্শিদকুলী খান মাটি খুঁড়ে সেই বিরুদ্ধ শক্তিকে তুলে এনে সমাদরে ঘাড়ের উপর বসিয়ে নিলেন। এ সুযোগ আর ছাড়ে তারা ? এখন ঘাড় তো তারা মটকাবেই।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, কিছুটা বুঝতে পারছি ঠিকই। কিন্তু কথাটা তেমন পরিষ্কার হলো না জনাব। মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খান কোন্ কসুরটা করলেন ?

ঃ কোন্ কসুর ? তার আগে তুমি বলো দেখি, এই মুলুকে এখন সর্বাধিক শক্তির মালিক কে বা কারা ? নবাব বাহাদুর ? না তাঁকে ঘিরে নিয়ে থাকা ঐ বিশেষ পারিষদেরা ?

একটু চিন্তা করে দিলওয়ার আলী বললেন— তা সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ঐ বিশেষ পারিষদেরাই। তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছুই হতে পারে না।

ঃ কেন হতে পারে না ?

ঃ তাদের বিরুদ্ধে গেলে তো নবাবীটাও তাঁর যেতে পারে।

ঃ অর্থাৎ, মসনদে অন্য নবাবও আসতে পারে ?

ঃ অসম্ভব কি ? যারা তাঁকে এনেছে তারা আবার তাঁকে সরিয়ে দিতে কতক্ষণ ?

ঃ এক কথায়, দেশের এখন নবাব নির্মাতা তারাই।

ঃ জ্বি–জ্বি। চোখের উপর যা দেখলাম তা আর অস্বীকার করি কি করে ?

ঃ যেমন ?

ঃ শাহজাদা সরফরাজ খান নবাব হবেন, ধরাবাঁধা কথা। কিন্তু তারা তা চায়নি বলেই তো অন্যজন এলেন। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এবং পরিকল্পনা যা চলছে, তাতে তারা যাকে চাইবে, এ দেশের নবাব একমাত্র তারই হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অন্যের হওয়া কঠিন আর হলেও টিকে থাকা কঠিন।

ঃ তাহলে এই নবাব নির্মাতা শক্তিটা হঠাৎ করে কোথা থেকে গজালো ? এতদিন তো ছিল না ?

ঃ তা–মানে —

ঃ হাজী আহম্মদের পরিবারটা না হয় ইদানিং এসে যোগ হয়েছে। কিন্তু সেটাতো মূলশক্তি নয়। এই মূলশক্তিটার আবাদ করলে কে ? জগৎ শেঠ, আলম চাঁদ, বলকিষেণ, রঘুনন্দন— এদের ইংগিত ছাড়া বাংলার যে অধিকাংশ রাজা-জমিদার আজ নবাবের পক্ষে একটা আঙ্গুল তুলতেও রাজী নয়— অথচ তামাম বাংলার শক্তি আজ এইসব রাজা-জমিদারদের হাতে — এই রাজা-জমিদার তৈয়ার করলেন কে ?

ঃ জনাব !



www.amarboi.org

ঃ কেন তাঁরা ঐ আলম চাঁদ আর জগৎ শেঠদের অনুগত ? নবাবের নয় কেন ?

ঃ তারা যে প্রায় সবাই এক জাতি।

ঃ মুসলমানেরা গেল কোথায় ? এর আগেতো রাজা বলো আর জমিদার জায়গীরদার বলো, তারা প্রায় সবাইতো মুসলমান ছিল ? মুসলমান শাসন বিপন্ন হতে দেখলে সবাই তো তারা আপন গরজেই সজাগ হয়ে উঠতো ? আজ তারা গেল কোথায় ? তাদের জায়গীরদারী জমিদারী গেল কোথায় ? অন্যের ইংগিত ছাড়া যারা নবাবের পক্ষ নেয় না এসব রাজা-জমিদার তৈয়ার করলেন কোন নবাব ?

ঃ জি–জি, সেটা তো অবশ্যই একটা প্রশ্ন।

ঃ কেন এসব রাজা-জমিদারদের মন পাওয়ার জন্যে নবাবকে আজ জগৎ শেঠ-আলম চাঁদদের মন যুগিয়ে চলতে হয় ? প্রশাসনের বড় বড় আর গুরুত্বপূর্ণ প্রায় পদেই যেখানে মুসলমানেরা নিয়োজিত ছিল, সেই সব মুসলমান সভাসদ ও কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ করলে কে ? সেইসব পদে এমন লোকদেরকে এনে বসালে, যারা মুসলমান হুকুমাতের শক্তিবৃদ্ধি না করে এই হুকুমাতের বিরুদ্ধে আজ বিরাট এক হুমকি ? কেন এদের মর্জির উপর আজ চলতে হয় নবাবকে ?

ঃ জনাব !

ঃ কোন্ স্বার্থে এই অপকর্মগুলো করা হয়েছে ? একমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়া, এখানে আমাদের কওমের, আমাদের হুকুমাতের আর দেশের স্বার্থ কোথায় ?

নিদারুণ ক্ষোভে আবিদ হোসেন সাহেব জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী তাজ্জব হয়ে পরিমাপ করতে লাগলেন আবিদ হোসেন সাহেবের উপলব্ধির গভীরতা। ভেবে তিনি সারা হতে লাগলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনের একেবারেই বাইরের এক বৃদ্ধের মধ্যে এই অভিজ্ঞান আর দূরদর্শিতা কোথা থেকে এলো ? আবিদ হোসেন সাহেব থামতেই দিলওয়ার আলী বিপুল বিস্ময়ে বললেন— সেকি জনাব ! রাজনীতির এত খুঁটিনাটি বিষয় আপনি কি করে জানলেন ? এর এত গভীরে কেমন করেই বা গেলেন আর এ ব্যাপারে এত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি কি করেই বা হলো আপনার ?

আবিদ হোসেন সাহেব ম্লান হেসে বললেন— কি করে হলো ?

ঃ জি–জি। আপনি তো প্রশাসনের কেউ নন। রাজনীতির সাথে কোনই সম্পর্ক নেই আপনার। অথচ এ অভিজ্ঞান— মানে এত তত্ত্ব এত তথ্য কোথায় পেলেন আপনি ?

ঃ দুঃখের পাঠাগারে।

ঃ জনাব।

ঃ বড় দাগা খেয়ে পেয়েছিরে ভাই। আমরা যে ঘরপোড়া গরু। আসমানে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই এসব কথা মনে হয় আমাদের।

দিলওয়ার আলী আরো অধিক বিস্মিত হয়ে বললেন— তার মানে ! এ আপনি কি বলছেন জনাব ?

আবিদ হোসেন সাহেব অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বললেন— তুমি ফৌজীপুরে



www.amarboi.org

থাকতে নবাব মুর্শিদকুলী খানের ইন্তেকালের খবর আমরা তোমার কাছেই পেলাম, মনে আছে?

ঃ জ্বি-জ্বি, আছে।

ঃ কিছুটা দুঃখ অনুভব করলেও, সেই শোকে কেউ আমরা জার জার হয়ে যাইনি, খেয়াল করেছো?

ঃ জ্বি-জ্বি, সেটা আমি সেইদিনই লক্ষ্য করেছি।

ঃ অথচ দেশের একজন নবাব মারা গেলেন, আমরা সবাই সচেতন নাগরিক, আমাদের মধ্যে তো এ নিয়ে বেশ কিছুটা প্রতিক্রিয়া মানে—হা-হুতাশ ও হৈচৈ হওয়ার কথা ছিল?

ঃ জনাব!

ঃ আমরা তা করিনি। কারণ, ওটা আমাদের অন্তর ফুটে বেরোয়নি। লোক দেখানো হৈচৈ করার লোকও আমরা নই, সে গরজও আমাদের ছিল না।

ঃ কেন জনাব, কেন-কেন?

ঃ তুমি আমাদের একজন জোতদার হিসেবে দেখছো। ভাবছো, মোটামুটি বেশ বড়লোকই আমরা। কিন্তু কয়েক বিঘের ঐ জোতদারী যে কিছুই নয় আমাদের কাছে, আমরা যে পথে এসে বসেছি, এটা তোমার জানা নেই।

ঃ জনাব!

ঃ ঐ মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খানই আমাদের পথে এনে বসিয়েছেন। মুর্দার উপর অভিযোগ কিছু নেই। মরার পরই আমরা তাঁকে অন্তর থেকে মাফ করে দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। কিন্তু আমাদের এই সর্বনাশ থেকে শুরু করে একে একে এই জাতির পূরো সর্বনাশটা তিনিই সাধন করেছেন।

দিলওয়ার আলীর খেয়াল হলো। খেয়াল হতেই তিনি বললেন—ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সেদিনও আপনি এই রকমই কিছু কথা বলেছিলেন। তা আপনাদের সর্বানশ মানে?

ঃ আমাদের জমিদারীটা কেড়ে নিয়ে উনি আমাদের পথে নামিয়ে দিলেন। আমাদের পরিবারের কিছু অংশ উড়িষ্যায় চলে গেল। নিরুপায় হয়ে আমরাও উড়িষ্যায় যাওয়ার পথে হঠাৎ ঐ ফৌজীপুরে থেমে গেলাম। হাতে যা সামান্য কিছু ছিল তার সাথে বিবি-বেটির জেওর-পত্র বিক্রি করে ঐ কয়েক বিঘে কিনলাম এবং আমরা ওখানেই রয়ে গেলাম। আমরা হলেম জোতদার। লক্ষ লক্ষ বিঘের জমিদারী হারিয়ে আমরা হলেম কয়েক বিঘের জোতদার।

ঃ কি তাজ্জব-কি তাজ্জব! তাহলে কোথাকার জমিদার ছিলেন আপনারা জনাব? কোন্ জমিদারী আপনাদের?

ঃ বলতে পারো, নাটোর জমিদারীটা প্রায় গোটাই আমাদের।

ঃ জনাব!

ঃ আমরা ঐ বিশাল মাহমুদপুর পরগণার জমিদার। ওখানে ছোট ছোট আরো কয়েকজন জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের জমিদারীটাই ঐ পরগণার মূল জমিদারী। মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খান আমাদের ঐ জমিদারী কেড়েনিয়ে রঘুনন্দনের



www.amarboi.org

ভাই নাটোরের রামজীবনকে দিলেন। এরপর যদিও রামজীবনকে আরো কিছু ভূখণ্ড মুর্শিদকুলী খান দিয়েছেন, তবু নাটোর জমিদারীর মূল বা সার ভাগটাই আমাদের। আমাদেরটুকু বাদ দিলে নাটোর রাজ একজন জোতদারের বড় একটা বেশী কিছু থাকেন না।

ঃ কেন–কেন, উনি কেড়ে নিলেন কেন ?

ঃ আমার ইচ্ছে, আমি নেবো। অনেকটা, "তুই ঘোলাস্‌নি তোর বাপ ঘুলিয়েছে, আমি তোকে খাবো," এই রকম ব্যাপার। এর আবার অজুহাত কি ?

ঃ কি আশ্চর্য !

ঃ ঐ পরগণার দু' একজন ছোট জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে ছোটর সাথে বড়টাও কেড়ে নিলেন উনি। বড় কারণ যদি বলো, তাহলে স্বজাতীয় বড় জমিদারের অস্তিত্ব তাঁর কাছে স্বস্তির বস্তু ছিল না — এইটেই আমরা বুঝেছি।

ঃ বলেন কি ? এও কি সম্ভব ?

ঃ কেন নয় ? এই বাংলা মুলুকের প্রায় তামাম মুসলমান জায়গীরদার জমিদারদের জায়গীরদারী–জমিদারী যে একটার পর একটা কেড়ে নিলেন উনি, এদের সবারই কি খাজনা বাঁকী পড়েছিল, না উনার মাথায় সবাই লাঠি মারতে গিয়েছিল ? আসলে উনার প্রয়োজন ছিল, তাই উনি নিয়েছেন। অজুহাত যা হোক কিছু খাড়া করলেই হলো।

ঃ সেকি ! তাহলে তো এসব জবর দখল ? অন্যায় ?

ঃ অন্যায় আর কি ? নিজের প্রতিষ্ঠায় যতটুকু প্রয়োজন, তা উনি করেছেন। অধিক ন্যায়-অন্যায় দেখতে গেলে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় ?

দিলওয়ার আলীর দ্বন্দ্ব তবু ঘুঁচলো না। তিনি আমতা আমতা করে বললেন— কিন্তু উনিতো একজন ঈমানদার আর পরহেজ্‌গার মুসলমান ছিলেন ?

ঃ গোলমালটা বেধেছে অনেকের এখানেই। ঈমানদারী-পরহেজ্‌গারী আর ক্ষমতালিপ্সা-আত্মপ্রতিষ্ঠা, সবকিছুই এক সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন অনেকে। অথচ এসব এক বস্তু নয়, পৃথক বিষয়, পৃথক বস্তু।

ঃ জনাব।

ঃ এ প্রসঙ্গ মস্তবড় প্রসঙ্গ। শুরু করলে শেষ হতে সময় লাগবে। তবু প্রসঙ্গ যখন উঠলো, সবই তোমাকে শুনাবো। তুমি একজন ঈমানদার সালার। আমাদের কওমের এক ভবিষ্যত। বিষয়টা তোমার পরিষ্কারভাবে জানা থাকা উচিত।

—বলেই আবিদ হোসেন সাহেব উঠে গিয়ে নিজেই সুরাহী গড়িয়ে একপাত্র পানি পান করলেন। এরপর ফিরে এসে বসে বলতে শুরু করলেন ঃ

কোন ঈমানদার কখনো কোন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লালসা পোষণ করেন না। প্রতিপত্তির আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আওয়ারা হয়ে উঠেন না। সৎপথে থেকে সৎ চেষ্টার মাধ্যমে যতটুকু অর্জন করেন, তাঁরা তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকেন এবং তারই জন্যে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন। এই সৎপথে ও সৎ চেষ্টায় যদি



www.amarboi.org

কোন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আল্লাহ তায়ালার রহমত হিসেবে তাঁদের হাতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঐ রহমতের আমানতদার হয়ে যান, নিজের ভোগে ব্যবহার করার পথ আর তাঁদের থাকে না। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এই ইজ্জতের সদ্ব্যবহার করতে পারেন কিনা, এই ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে উঠেন এবং আল্লাহ তায়ালার তুষ্টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। নিজের সুবিধে ও স্বার্থের চিন্তা এখানে বিলকুলই অনুপস্থিত থাকে।

অপরপক্ষে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা নিয়েই যারা বিভোর হয়ে থাকে, ক্ষমতার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, সৎপথ ও সৎ-চিন্তার প্রসঙ্গ সেখানে উহ্য হয়ে যায়, ঈমানী চেতনা নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। ঘোলাটে পরিবেশ আর দাঁও-মওকাই তাদের ক্ষমতালাভের সহায়ক শক্তি হয় এবং ক্ষমতা ও স্বার্থ হাসিলের সমর্থনে একাধিক অজুহাত জন্মলাভ করে। কৃতকার্য হলে, কৃতিত্বের সুবাস এরা পায়। কিন্তু কৃতকর্মের দুর্গন্ধও এদের গা থেকে যায় না।

বিশেষ করে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ সত্যের ব্যত্যয় নেই। "যেনতেন প্রকারে" কৃতকার্য হওয়ার নীতি বা কোন চানক্যনীতি মুসলমানদের জন্যে অনুসরণীয় নয়। ঈমানদারী আর লিপ্সা হাত ধরাধরি করে এক সাথে চলে না। একটা জোরদার হলে আর একটা আপ্‌ছে আপ্‌ মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে। আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্মপ্রসাদই লক্ষ্যবস্তু যাদের, আল্লাহ তায়ালার তুষ্টি, কওমের স্বার্থ ও স্বদেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাদের মগজে প্রবেশ করতে পারে না।

নবাব মুর্শিদকুলী খানের মগজেও তাঁর জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেসব চিন্তা প্রবেশ করতে পারেনি। ব্যক্তিগত জীবনে ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর নিষ্ঠা, বিশেষ করে পরবর্তী জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইসলামের নীতি আদর্শ পালনে তাঁর অকৃত্রিম আত্মনিয়োগ, মুসলমানদের জন্যে একটা অনুসরণীয় নজীর হয়ে থাকলেও, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সম্পাদিত তাঁর অতীত জীবনের কার্যাবলী কোন মুসলমানের জন্যে তো অনুসরণীয় নয়ই, প্রশংসনীয়ও নয়। নিজে একা জাগতে গিয়ে তিনি তাঁর স্বজাতিকে গোটাই ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন।

দাক্ষিণাত্যে লড়াই চলছে বিশ বছর যাবৎ। বাদশাহ আওরঙ্গজেব অর্থ সংকটে পড়েছেন। রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত রাজস্বের পরিমাণ কমে যাচ্ছে দিন দিন। সম্রাট লড়াই নিয়ে নিদারুণভাবে ব্যস্ত থাকায় প্রাদেশিক প্রশাসন ঢিলে হয়ে গেছে। সুবে বাংলা প্রাচ্যের স্বর্ণখনি। সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সম্পদশালী প্রদেশ। সেখান থেকেও প্রেরিত রাজস্বের পরিমাণ করুণভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সুবাদারদের অযোগ্যতা, বিশেষ করে সুবাদার শাহজাদা আজিম উশ-শানের অর্থ লিপ্সা, বাংলা থেকে রাজস্ব প্রেরণের ধারাকে নিদাঘের নদীর মতোই শুষ্ক করে দিয়েছে। তলানী চুইয়ে যা কিছু আসছে তা নিতান্তই অপ্রতুল।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব শংকিত হয়ে উঠলেন। তিনি হায়দারাবাদের দেওয়ানকে 'করতলব খান' উপাধি দিয়ে বাংলার দেওয়ান করে পাঠালেন। রাজস্ব ও শাসন বিভাগে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে পারস্যের এক বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারের সন্তান



www.amarboi.org

মুহাম্মদ হাদী, এক্ষণে করতলব খান, আগেই সম্রাটের সুনজরে পড়েন। রাজস্ব উন্নয়নে পারদর্শী করতলব খান, সম্রাটের এই অতিরিক্ত প্রীতিকে মূলধন বানালেন এবং এই প্রীতির উপর সওয়ার হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক নিগূঢ় বাসনা নিয়ে বাংলা মুলুকে এলেন। লক্ষ্য তার, বাদশাহকে চমৎকৃত করার মতো অর্থ সংগ্রহ করা।

লক্ষ্যে তিনি অবিচল রইলেন। রাজস্ব সংস্কার কাজে বিরল দক্ষতা তাঁর ছিলই। সেই সাথে বাদশাহর শক্ত সমর্থন পেছনে থাকায় তিনি মজবুতভাবে সংস্কার কাজে লেগে গেলেন। প্রায় জোর করেই তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবাদারদের এক চেটিয়া কারবার বন্ধ করে দিয়ে, বাংলা থেকে জায়গীরদারদের বিতাড়িত করে এবং সর্বোপরি, নতুন ইজারাদার বা ঠিকাদারদের কাছে অগ্রিম অর্থে রাজস্ব আদায় বন্দোবস্ত দিয়ে, প্রথম বছরেই এক কোটি টাকা, রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে প্রেরণ করলেন।

করতলব খানের পদক্ষেপ লক্ষ্য ভেদ করলো। এই অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ পেয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব করতলব খানের উপর শুধু যারপরনেই খুশীই হলেন না, দুর্ভেদ্য বর্মের মতো করতলব খানকে তিনি আবৃত করে রাখলেন। ফলে, শাহজাদা আজিমুশান ও পরবর্তীতে অন্যান্যদের সংগত অসংগত কোন প্রকার দুশমনীই করতলব খানের কোন রকম ক্ষতি সাধন বা তাঁর ক্ষমতার উর্ধগতি রোধ করতে সমর্থ হলো না। করতলব খান একের পর এক বাদশাহকে আশাতীত অর্থ যোগান দিতে লাগলেন, বাদশাহ তাঁকে 'মুর্শিদকুলী খান' উপাধিসহ বাংলার দেওয়ান থেকে কালক্রমে এক সাথে উড়িষ্যার সুবাদার, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান ও কয়েকটি জেলার ফৌজদার পদে উন্নীত করলেন। মকসুদাবাদে স্বাধীনভাবে দপ্তর খোলার অনুমতি দিয়ে বাদশাহ নিজেই মুর্শিদকুলীর নাম অনুসারে মকসুদাবাদের নাম রাখলেন মুর্শিদাবাদ।

সরকারী কোষাগারে এই বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রেরণের তথা বাদশাহর সুনজর হাসিলের স্বার্থেই মুর্শিদকুলী খান মুসলমানদের সর্বনাশ সাধন শুরু করেন এবং শেষ করলেন বাংলার মসনদে বসার জন্যে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বি মুক্ত করতে গিয়ে।

রাজস্ব সংস্কার করতে নেমেই তিনি হিন্দুদের প্রেমে পড়ে গেলেন। হিন্দুদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করা এবং তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া অপেক্ষাকৃত সহজ দেখে তিনি এঁদের দিকে আকৃষ্ট হলেন। সুযোগ বুঝে এঁরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন এবং আনুগত্য, ভক্তি ও তোয়াজের তুফান তুলে এঁরা মুর্শিদকুলী খানের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলেন। এই তুফানে তলিয়ে গেলেন মুর্শিদকুলী খান। মুসলমানদের মধ্যে কিছু পরিমাণ থাকলেও, এদের মতো এত অধিক প্রেম, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা কোন মুসলমানের মধ্যে নেই, এই ধারণাই তাঁর বদ্ধমূল হলো। তাঁর এ ধারণার পেছনে প্রাথমিকভাবে কিছুটা বাস্তবতাও ছিল। যে কোন প্রশাসনের কাছেই হিন্দুরা বাহ্যিকভাবে অপেক্ষাকৃত নমনীয়, মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত অনমনীয়। অতিরিক্ত প্রেম প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত অনুদার।



www.amarboi.org

মুর্শিদকুলী অর্থ চান। নির্ঝঞ্ঝাটে আশাতীত রাজস্ব আদায় হওয়াটাই তাঁর লক্ষ্য। স্বজাতি ও বিজাতির শুভাশুভ নিয়ে চিন্তা করার জন্যে তিনি বাংলার দেওয়ান হয়ে আসেননি। হিন্দুদের দ্বারা তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক দেখে, তিনি আকড়ে ধরলেন হিন্দুদের, ত্যাগ করলেন মুসলমানদের।

বাংলা মুলুকে তখন অধিকাংশ জমিদারী ও জায়গীরদারী মুসলমানদের দখলে ছিল। বড় বড় জমিদার ও জায়গীরদার প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। পাশাপাশি ছিলেন আরো অনেক ছোট ছোট মুসলমান জমিদার। সরকারী আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মুর্শিদকুলী খান পরিকল্পিতভাবে এদের বিলোপ সাধনে মনোযোগী হলেন। অজুহাত তাঁর মোটামুটি দুইটি। পয়লা অজুহাত, জায়গীরদারদের দখল থেকে বাংলার উর্বর মাটি সরকারের হাতে ফিরিয়ে আনা। দুসরা অজুহাত-রাজস্ব প্রদানে অনিয়ম, উদাসীনতা এবং মুসলমান জমিদারদের স্থিতিশীল মনোভাব অর্থাৎ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে তাঁদের মধ্যে অহেতুক আধিক্যের অভাব যা অনমনীয় মনোভাব রূপে বিবেচিত। পরবর্তীতে ঢালাওভাবে এই শেষের অজুহাটাই কাজে লাগান তিনি।

প্রথমেই তিনি মুসলমান জায়গীরদারদের জায়গীর কেড়ে নেন। বাংলার উর্বর জায়গীর সরকারের হাতে নিয়ে বিনিময়ে তিনি এসব জায়গীরদারদের অনুর্বর উড়িষ্যায় জায়গীর প্রদান করেন এবং সেখানে তাঁদের পাঠিয়ে দেন। অতপর এই দখলীকৃত জায়গীরগুলো তামামই হিন্দু ইজারাদার বা ঠিকাদারদের কাছে খাজনা আদায়ের জন্যে ইজারা দিয়ে দেন। কালক্রমে এই ইজারাদারগণই এই সমস্ত ভূখণ্ডের জমিদারে পরিণত হন।

এরপর রাজস্ব বাঁকীর দায়ে বা রাজস্ব প্রদানে অনিয়মের অজুহাতে মুর্শিদকুলী খান একের পর এক মুসলমানদের জমিদারী কেড়ে নিতে থাকেন এবং এই সমস্ত জমিদারী হিন্দুদের প্রদান করেন। অবাধ্যতা, অশোভনীয় আচরণ ও অন্য আরো নানাবিধ অভিযোগ এনেও তিনি মুসলমানদের অনেক জমিদারী কেড়ে নেন এবং হিন্দুদের কাছে বন্দোবস্ত দেন। শেষে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, মুর্শিদকুলী খান কারো জমিদারী বাজেয়াপ্ত করলে, অবধারিতভাবে যে ব্যক্তি মুসলমান এবং কাউকে জমিদারী বন্দোবস্ত দিলে, অবধারিতভাবে সে ব্যক্তি একজন হিন্দু। যুক্তি ঐ একটাই —হিন্দুদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করা খুব সহজ।

পরবর্তীকালে এই এক কারণেই তিনি মুসলমান জমিদারীর বিলোপ সাধন করেন না, সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বির বিলোপ সাধন করাই পরবর্তীকালে তাঁর মূল কারণ হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর যখন তাঁর বংশধরগণ–পুত্র পৌত্র সবাই–দিল্লীর মসনদ নিয়ে নিদারুণভাবে উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েন, বাংলা মুলুকের দিকে নজর দেয়ার তাঁদের কোনই অবকাশ থাকে না, তখন মুর্শিদকুলী খানই বাংলার সর্বেসর্বা হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। দিল্লীর মুনিব গোষ্ঠীর কেউ কেউ মুর্শিদকুলী খানের উপর মাঝে মাঝে হুমকি ধমক চালালেও, নিরন্তরভাবে বাংলার প্রতি নজর রাখার ফুরসুৎ তাঁরা পান না এবং সে ক্ষমতা জাহির করার অধিকারও তাঁদের অনেকের অধিকক্ষণ থাকে না। মসনদ হাত বদল হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের



www.amarboi.org

সে অধিকারও বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুর্শিদকুলী খান এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের অবস্থান মজবুত করতে থাকেন এবং সুবে বাংলার মসনদে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার কাজে সক্রীয় হয়ে উঠেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে বড় বড় মুসলমান জমিদারদের তিনি প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন। ঘটনাচক্রে দু' একজন মুসলমান জমিদার ও দু' চারজন সরকারী কর্মকর্তাও এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুগলীর ফৌজদার ও জমিদার জিয়াউদ্দীন খান। তিনি ছিলেন দিল্লীর দরবারের বিশেষ এক সভাসদ। মুর্শিদকুলী খানকে তিনি অমান্য করে বসলেন এবং তাঁর সাথে রণলিপ্ত হলেন। আরো দু' চারজন জমিদার ও অমাত্য মুর্শিদকুলী খানের এই পক্ষপাতিত্বের অর্থাৎ হিন্দুপ্রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

ফলে, মুর্শিদকুলী খান সতর্ক হয়ে গেলেন। কলে বলে কৌশলে একের পাপে দশকে শাস্তি দিয়ে বাংলার বড় বড় তামাম মুসলমান জমিদারদের তিনি উচ্ছেদ করলেন এবং সেখানে হিন্দু জমিদার বসালেন। মসনদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এই নব্য হিন্দু জমিদার সম্প্রদায়কে একান্তই তাঁর আপন ও পক্ষের লোক বিবেচনায়, মুর্শিদকুলী খান এদের উপরই নির্ভরশীল হলেন।

এই রূপে লোপ পেলো হুগলীর জিয়াউদ্দীনের জমিদারী। সেখানে নতুন হিন্দু জমিদার এলেন। জমিদারী হারালেন টাঁকী সরূপপুরের জমিদার সুজাত খান ও নজাবত খান। মাহমুদপুরের মুসলমান জমিদারী (নদীয়া-যশোহর) ও জালালপুর পরগণার কয়েকটি মুসলমান জমিদারী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা (রঘুনন্দনের ভাই) রামজীবনকে দেয়া হলো। সোনার গাঁয়ের ঈশা খানের বংশধরগণও কয়েকটি মূল্যবান পরগণা হারালেন। তাঁদের জমিদারীর আলপশাহী ও মোমেনশাহী দুইটি পরগণায় দুইজন প্রভাবশালী হিন্দু জমিদারের উৎপত্তি হলো। মুক্তাগাছার জমিদারী লাভ করলেন, বর্তমানে ময়মনসিংহের মহারাজা নামে খ্যাত, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী কৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী। দিনাজপুর, নদীয়া ও বর্ধমানের মুসলমান জমিদারীগুলোও নতুন সৃষ্ট হিন্দু জমিদারের জমিদারীতে পরিণত হলো।

পর্যায়ক্রমে বাংলা মুলুকের প্রায় তামাম মুসলমান জমিদারীগুলোই মুর্শিদকুলী খান হিন্দুদের হাতে পার করে দিয়ে তামাম বাংলা জুড়ে এক নব্য জমিদার সম্প্রদায়ের পয়দা করলেন এবং এই নব্য হিন্দু রাজা জমিদারগণই বাংলার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলমান হুকুমাত বিপন্ন হলে "আহা" বলে এই হুকমাতের পার্শে এসে দাঁড়ানোর মতো আর কোন মুসলমান জায়গীরদার বা শক্তিশালী জমিদার বাংলার বুকে অবশিষ্ট রইলো না।

এ কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। জমিদারদের মতো মুসলমান আমির-উমরাহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপরও নেমে এলো বিপর্যয়। প্রধান প্রধান পদগুলো থেকে মুসলমানদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে তিনি নিয়োগ করলেন হিন্দুদের। বিশেষ করে, তাঁর এক্তিয়ারাধীন রাজস্ব বিভাগের পদগুলো তামামই তিনি হিন্দুদের দিয়ে পূরণ করলেন। যুক্তি ঐ একই যুক্তি–মুর্শিদকুলী খানের একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত ও আপন লোক চাই, আর সে লোক মুসলমান নয়, হিন্দু। ভবিষ্যতে বিদ্রোহ, বিরুদ্ধাচরণ,



www.amarboi.org

বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, এমন লোক প্রশাসন থেকে সরিয়ে দিতে চাই এবং সে লোক হিন্দু নয়, মুসলমান। ফলে, তিনি একচেটিয়াভাবে ভূপৎ রায়, দর্পণারায়ন, রঘুনন্দন, কিংকর রায়, জয়নারায়ন, লাহারীমল, ছিলপৎ সিংহ, হাজারীমল ও আরো অনেক হিন্দুকে দেওয়ান ও অন্যান্য উচ্চপদে নিযুক্ত করলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন খানও আলম চাঁদ, জগত শেঠ, যশোবন্ত রায়, রাজ বল্লভ, নন্দলাল ও আরো অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দায়িত্বপূর্ণ পদে, উচ্চক্ষমতায় ও উচ্চ আসনে রেখেছেন।

এভাবে বাংলার মুসলিম শক্তি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল আর এই নবজাগ্রত হিন্দু শক্তি বাংলার সর্বেসর্বা ও বাংলার নবাব নির্মাতা শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। এদের নজরের বাইরে দিয়ে আর কোন কিছুই হওয়ার বা ঘটার সাধ্য নেই। এরপর আব মুসলমান হুকুমাতের টিকে থাকার প্রাণশক্তি থাকে কোথায়? মুসলমানদের এ কিস্তি এখন যে কোন সময় সশব্দে তলিয়ে যাবে, এইটেরই অপেক্ষা।

—এই পর্যন্ত একটানা বলে আবিদ হোসেন সাহেব থামলেন এবং দম নিতে লাগলেন। অখণ্ড বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে বসে থাকার পর, দিলওয়ার আলী সাবেগে বলে উঠলেন—কি বিস্ময়! কি বিস্ময়! এত কথা এত খবর জানেন আপনি জনাব?

আবিদ হোসেন সাহেব করুণ কণ্ঠে বললেন—ঐযেরে ভাই বললাম, আমরা ঘরপোড়া গরু? এসব কথা আমাদের দীলের সাথে গেঁথে আছে। নবাব মুর্শিদকুলী খান সেরেফ আমাদের পরিবারকেই পথে বসিয়ে যাননি, আমাদের হুকুমাত আর কওমকেও উনি পথে বসিয়ে গেছেন।

আবিদ হোসেন সাহেব পুনরায় দম নিতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী স্তম্ভিত হয়ে সার্বিক বিষয় উপলব্ধি করতে করতে অবশেষে এঁদের ব্যাপারে এসে ভাবতে লাগলেন—এঁরা কোন মামুলী জোতদার নন, মস্তবড় জমিদার মানুষ এঁরা। রাজা মানুষ। এঁরা জোতদারের উপরে কিছু, এটা আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এতটা কিছু, এটা তিনি ভাবেননি। নিজের অজান্তেই তিনি মাহমুদা খাতুনের ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতাটা যাচাই করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব ফের বললেন—এই নবাব নির্মাতা শক্তিটার আসলে যে মানসিকতা কি, নবাব মুর্শিদকুলী খান একটুও যাচাই করে দেখার চেষ্টা করলেন না। তিনি একবারও ভাবলেন না, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আপন যারা হলো না, রাতারাতি তারা আবার আপন হয় কি করে?

ঃ জনাব!

ঃ প্রজা হিসেবে এদের সাথে তিনি সদাচরণ করলে এবং মানুষের কাছে মানুষের যে ইজ্জত প্রাপ্য সে ইজ্জত এদের দিলে, তাঁর আমি তারিফই করতাম। কারণ, মুসলমানের নিকট থেকে অন্য কোন জাতিই অসৎ আচরণ বা অশ্রদ্ধা পেতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এদের হাতে জান-মাল সর্বস্ব সঁপে দিয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুবেন, এটা ভাবতেও তাজ্জব লাগে।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী আফসোস করে বললেন—তাজ্জব আর কি জনাব? তাঁর জামাতাও তো তাই দিয়ে বসে আছেন! তিনিও তো ভাবছেন না, তিনি ভুল করছেন কিছু!

ঃ ভাবছেন না কারণ, তাঁরা কেবল নিজের নগদ সুবিধেটাই দেখেন, কওম বা দেশের কথা একবারও ভাবেন না। এঁরা বড় কমজোর ঈমানের লোক।

ঃ সে যা-ই হোন, একজন ভুল করলেন বলে ইনিও তাই করবেন? বিশেষ করে, ঐ দলের বেঈমানীর বহর সরজমিনে জরিপ করে দেখেও তাই করবেন?

ঃ জরুর করবেন।

ঃ কেন জনাব?

ঃ ওদের চিন্তা-ভাবনা একেবারেই আত্মকেন্দ্রীক এবং একই সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামনেরটুকু ছাড়া এরা পেছনেরটুকু দেখে না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ "হামভি পাঠান, উওভি পাঠান"–এরা এই জাতের লোক।

ঃ জনাব!

ঃ ঐ দুই পাঠানের গল্প জানো?

ঃ কি রকম?

ঃ এক পাঠান একদিন এক চোর ধরে তার শুধু পা'দু'টোই বেঁধে রেখে নগর কতোয়ালের কাছে খবর দিতে গেল। শুনে নগর কতোয়াল প্রশ্ন করলেন—"সেরেফ পা' দু'টোই বেঁধে রেখেছো? হাত দু'টো বাঁধোনি?" জবাবে পাঠানটি জানালো যে, তার হাত সে বাঁধেনি, হাত দু'টো খোলাই আছে। নগর কতোয়াল বিস্মিত হয়ে বললেন—"তাহলে তো পায়ের বাঁধন খুলে সে পালিয়ে যাবে।" একটু চিন্তা করে পাঠানটি সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলো—"নেহি হুজুর, এ কভ্‌ভি নেহি হো সাক্‌তা। হাম্‌ভি পাঠান হ্যায়, উও ভি পাঠান হ্যায়। আমার মগজে এ চিন্তা যখন খেলেনি, তখন জরুর ওর মগজেও খেলবে না।" অতপর নগর কতোয়াল ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, পাঠানটির কথাই ঠিক। চোরটি মলিন মুখে ঐভাবেই বসে আছে।

দিলওয়ার আলী বিপুল শব্দ করে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কক্ষ থেকে ধমকে উঠলো মাহমুদা খাতুন—কি মুসিবত! আপনারা কি আজ ঘুমাবেন না?

চমকে উঠলেন দুইজনই। দিলওয়ার আলী শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—আমি বড়ই দুঃখিত। আপনি যে এই পাশের কক্ষেই ঘুমিয়ে আছেন, তা জানিনে। জানলে—

মাহমুদা খাতুন বাধা দিয়ে বললো—জিনা, রাতে আমি এ কক্ষে ঘুমাইনে। আমি আমার আম্মার সাথেই ঘুমাই।

ঃ জি?

ঃ অনেক কোশেশ করেও এখন পর্যন্ত ঘুম চোখে এলো না। তাই এখনই আমি দুয়ার খুলে একটু বাইরে এলাম আর এসেই আপনাদের আলাপ শুনতে পেলাম। এ আপনারা করছেন কি? রাত কি আর বাঁকী আছে? এভাবে রাত জাগলে অসুখ-বিসুখ করবে না?



www.amarboi.org

একটু থেমে দিলওয়ার আলী ঈষৎ হেসে বললেন — তা অবশ্যই করতে পারে। তবে কথা কি, অসুখ তো আপন পর চেনে না। আপনিও এই যে জেগে আছেন, ওটা আপনারাও তো করতে পারে?

তৎক্ষণাৎ সমর্থন দিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — ঠিক-ঠিক, বিলকুল ঠিক। পরের কসুর দেখছো, আর নিজের কসুরটা দেখছো না?

মাহমুদা খাতুন বললো — আমার কসুর! আপনাদের মতো আমি কি ইচ্ছে করে রাত জাগছি? ঘুমানোর কতো চেষ্টা করছি, তবু ঘুম চোখে আসছে না। কি সব খামাখা চিন্তা মগজে এসে ভিড় করছে।

আবিদ হোসেন সাহেব এবার মস্কারা করে বললেন — তাই নাকি? তাহলে তো জরুর চিন্তার বিষয়! খামাখা চিন্তা তো খামাখাই এসে কারো উপর ভর করে না। জরুর তাহলে দীলে কোন বিমার-উমার ঢুকেছে!

মাহমুদা খাতুন শরম পেয়ে বললো — দাদু—

ঃ কিছু রং লেগেছে হয়তো বা, কিংবা কোন লাগা রং ধুয়ে মুছে যাচ্ছে!

মাহমুদা খাতুন সক্রোধে বললো — ছিঃ! হুঁশবুদ্ধিটা বিলকুলই লোপ পেয়েছে আপনার—

দুমদাম পা ফেলে মাহমুদা খাতুন তখনই সরে গেল। আবিদ হোসেন সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। এই সময় অদূরে মোরগ ডেকে উঠলো। মোরগের ডাক কানে পড়তেই হাসি থামিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — এই রে! ঠিকই তো! রাত তো আর বেশী নেই। নাও হে সালার, জলদি জলদি শুয়ে পড়ো। আমিও যাই, শুয়ে পড়িগে—

## ৮

নিজ মকানে ফিরে এসে দিলওয়ার আলী দো-তরফা হামলায় পড়ে গেলেন। একদিকে নামদার খাঁ, অন্যদিকে আসাদুল্লাহ। নামদার খাঁ-ই হামলা করলো আগে। হাতের উপর গাল রেখে নামদার খাঁর বিষণ্ন বদনে দুয়ারের উপর বসেছিল। গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। উস্কোখুস্কো চেহারা। দুই চোখ লাল। দেখলেই বোঝা যায়, রাতে সে একটুও ঘুমায়নি। দিলওয়ার আলী এসে দুয়ারের সামনে দাঁড়াতেই সে ধড়মড় উঠে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো — আলহামদুলিল্লাহ! আপ আসি গৈল্ হজৌর?

দিলওয়ার আলী এই ভয়ই করছিলেন। নামদার খাঁ যে তাঁর চিন্তায় বেজায় পেরেশান আছে, এটা তিনি আগেই ধরে নিয়েছিলেন। তাই ঝামেলা এড়াতে গিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিলেন — হ্যাঁ, এলাম।

কিন্তু ঝামেলা এড়াতে পারলেন না। দিলওয়ার আলী নীরবে কক্ষের মধ্যে যেতেই নামদার খাঁ কাছে এসে ক্ষোভের সাথে বললো — এ আপ্‌কো কেয়া খাসিলত



www.amarboi.org

হো গৈল্ হজৌর। ঝুটমুট লা-পাত্তা ! হামি আভি কাঁহা ঢুঁড়িবেক, কৌন্‌কো পুছিবেক, মালুম না হৈ।

দিলওয়ার আলী বললেন — কেন, ঢুঁড়বে কেন ?

নামদার খাঁ আকুল কণ্ঠে বললো — হাইরে বা ! গজব হো গৈল্, তুফান হো গৈল্, ঝড়-বাদলীর তুফান। ! আপ বাহার হো গৈল্ তো ব্যস্-বেখবর। আভি হামার কেত্তা দিগদারী ? আপ্‌কো ঠাঁই কাঁহা, খানা কাঁহা, নিদ্-ঘুম-বিরাম কাঁহা, হালত্ ভি কেয়া, জিন্দা না মুর্দা—হামারে কৌন বাতাই দিবেক ?

দিলওয়ার আলীর হাসি পেলো। তিনি স্মিতহাস্যে বললেন — মুর্দা ! হঠাৎ মুর্দা হওয়ার কি দেখলে ?

নামদার খাঁ অসহায় কণ্ঠে বললো — হায়-আল্লাহ্ ! খতরনাক্ তুফান ! জব্বোর ঝড় ! বিজলী আওর বরিষণ ! বাজ্ পড়িবেক্, দেরাখ ভাঙ্গি পড়িবেক, মকান-উকান উড়িবেক ! কুয়ী তো কুয়ী আপ্‌কো মাথায় পড়িবেক জরুর ?

নামদার খাঁর আশংকার আধিক্যে দিলওয়ার আলী বিদ্রূপ করে বললেন — বটে ! আল্লাহ্ তায়ালার এতবড় দুনিয়ায় জায়গা বলতে কি সেরেফ আমার এই মাথাটা যে,আর কোথাও না পড়ে আমার মাথায় এসে পড়বে ?

ঃ নাউজুবিল্লাহ ! গজব কা বাত বিলকুল দুস্‌রা বাত। কুয়ী ইনসান উহারে জরীপ করিতে পারিবেক কেনে ?

দিলওয়ার আলী হা'ল ছাড়লেন। বললেন — তা বটে !

নামদার খাঁ বললো — আউর বাত আছে !

ঃ আউর বাত্ !

ঃ হজৌরের ইধার উধার হাজার দুশমন। কৌন্ ছালে লোগ্ তুফান দেখি মওকা খিঁচিয়ে লিবেক আউর বিচ্‌বিচ্ ধাওয়া করি বল্লম ছোড়ি মারবেক, হিছাব উহার কি ?

ঃ কোন হিসেব নেই। তুফানেও মারতে পারে, রাত বিরাতেও পেছনে পেছনে ধাওয়া করে মারতে পারে।

ঃ কেয়া গজব ! তব্ হজৌর লাপাত্তা হইবেক কেনে ?

ঃ হবে। কারণ, এইটেই তোমার হুজুরের খাসিলত। এ আর বদল হবার নয়।

ঃ তব্ হামি কি করিবেক ?

ঃ কিচ্ছু করবে না। আমাকে সেরেফ আল্লাহর উঁপর হাওলা করে দেবে। ব্যস্ ! তোমার কাজ খতম।

নামদার খাঁ বিষণ্ন কণ্ঠে বললো — হাইরে বা ! হামি পারিবেক নাই।

ঃ পারিবেক নাই !

ঃ এত্তা ঝুট্‌ঝামেলা হামি একেলা আর ছামাল দিতে পারিবেক নাই।

ঃ ঝুট্‌ঝামেলা !

ঃ হজৌর কা খাসিলত। একেলা একেলা সোচ্ করি হাম ফউত্ হো গৈল্। একেলা হামি আর পারিবেক নাই।

দিলওয়ার আলী সহাস্যে বললেন — তাহলে সোচ্ করার জন্যে দোক্‌লা চাই তোমার ?



www.amarboi.org

ঃ হজৌর —

ঃ আমাকে নিয়ে ভাবনাটা ভাগাভাগি করে ভাবতে চাও ?

ঃ হুঁ-হুঁ, ওহি বাত হজৌর, ওহি বাত।

ঃ তাহলে আর কয়জন নওকর চাই ? কলিমউদ্দীন কোন কাজে লাগছে না ?

ঃ নেই হুজুর। উ ছালে আদমী তো দেদার খাইছে আর ভোঁস্ ভোঁস্ নিদ্ বাগাই লইছে। উহার কুচু ভাবনা নাই।

ঃ তাহলে আরো নওকর চাই ?

ঃ নওকর ! কেয়া মুসিবত ! ওহি কামতো নওকরের কাম না আছে।

ঃ তবে !

ঃ মকানে একঠো 'বহু' আসুক, জরুর আসুক। দোনো আদমী বসিয়া বসিয়া সোচ্ করিলে হামার জব্বোর বিরাম হবে।

ঃ বহু মানে বউ ?

ঃ হারে বা ! ওহি বাত তো এক বাত !

ঃ তার মানে ! আবার তুমি শাদি করবে ? আবার শাদি করে দোক্লা হতে চাও তুমি ?

চমকে উঠে নামদার খাঁর দুই হাতে দুই কান ধরে বললো — তওবা-তওবা ! হামি বুঢ্ঢা আদমী। আজ বাদ কাল গোরে চলিয়া যাইবেক জরুর। হামার শাদির কৌন্ জরুরত আছে হজৌর ?

ঃ তাহলে মকানে 'বহু' আসবে কিভাবে ?

ঃ হজৌর শাদি করবেক তো বহু আসি যাইবেক।

ঃ আমি শাদি করবো ?

ঃ নাই করবেক কেনে হজৌর ? উ কাম তো হজৌরের আভি ফরজ কাম হো গৈল্।

ঃ আচ্ছা !

ঃ জিয়াদা আগারী উকাম ফরয হো গৈল্। হজৌর আখুন জরুর শাদি করিবেক বটে।

ঃ জরুর করিবেক ?

ঃ করিবেক-করিবেক। বড়া হজৌরকা মর্জি হইল তো ছোটা হজৌর কিয়া করিবেক-বাতাইয়ে ?

ঃ বড়া হজৌর !

ঃ হজৌরকা বেরাদর, বড়া ভাই। সবেরে আসি হাজির হো গৈল্।

দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন — সেকি ! ভাইজান এসেছিলেন ?

ঃ হুঁ-হুঁ, ঠিকঠাক আসি গৈলেন।

ঃ কখন এসেছিলেন ?

ঃ ফজরের নামায খতম হো গৈল্, ওহি ওয়াক্তের থোড়া বাদ।

ঃ কি তাজ্জব ! উনি কি কিছু বলে গেছেন ?



www.amarboi.org

আনন্দে দুলতে দুলতে নামদার খাঁ হাসিমুখে বললো—হঁ-হঁ, জব্বোর খবর বুলিয়া দিছে বটে।

ঃ জব্বোর খবর !

ঃ হজৌরের পাত্তা নাই। উহা দেখি বড়া হজৌর গোস্বা হো গৈলেন। কহিলেন তুম্‌হারা হজৌর খন্নাস হো গৈল্ বিলকুল। জলদি-জলদি উহার শাদি হোনা চাহিয়ে। মকানে ওয়াপস্ আসিলে তুম্ উহারে হামারে কাছে ভেজিয়া দিবেক জরুর।

ঃ তারপর ?

ঃ ওয়াপস্ চলি গৈলেন। একদম ওহি একবাত, দুস্‌রা কুছু বাত নাই।

খুশীর আমেজে নামদার খাঁ ঝুমতে লাগলো। দিলওয়ার আলী নীরব হয়ে গেলেন।

মীর দিলীর আলী। দিলওয়ার আলীর বড় ভাই। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মীর দিলীর আলী শাহজাদা সরফরাজ খানের অতি বিশ্বস্ত সহচর ও সুহৃদ। শাহজাদার বাস-ভবনের হেফাজতকারী। শাহজাদার নিরাপত্তা বাহিনীরও অন্যতম অধিনায়ক এই মীর দিলীর আলী। বৈমাত্রেয় ভাই হলেও দিলওয়ার আলীকে যথার্থই ভালবাসেন মীর দিলীর আলী। বেয়াড়া বিবি বাচ্চার জন্যেই দিলওয়ার আলীকে মকানে রাখার তিনি পক্ষপাতি নন বা মকানে যাওয়ার জন্যেও দিলওয়ার আলীকে পীড়াপীড়ি করেন না। তবে দিলওয়ার আলীর উপর নজর আছে দিলীর আলীর। চাকর-নফরদের মাধ্যমে খবর রাখেন সবসময়। খুব ব্যস্ত লোক তিনি। দিলওয়ার আলীর মকানে তিনি নিজে আসার সময় পান না। কিছুটা রাশভারী লোক। বাক্যালাপে সংযত। আন্তরিকতা প্রদর্শনে দিলওয়ার আলীর সাথে তিনি লৌকিকতা করেন না।

এই ভাই অকস্মাৎ কি কারণে মকানে তাঁর এলেন, দিলওয়ার আলী এর কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না। বরং রাতে তাঁকে মকানে অনুপস্থিত থাকতে দেখে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর বড় ভাই যে ধারণা নিয়ে গেলেন, নামদার খাঁর মুখে তার কিছুটা ইংগিত পেয়ে তিনি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর দিলওয়ার আলী ফের প্রশ্ন করলেন—আর কেউ আমার তালাশে এসেছিলেন ?

নামদার খাঁ বললো—আসাদুল্লাহ সাহাব দোনোবার আসি গৈলেন বটে।

ঃ কিছু বলে গেছে ?

ঃ তিস্‌রাবার আসিবেক, বুলিয়া দিছে।

ঃ আচ্ছা, তুমি যাও—

ঃ বড়া হজৌরকা হুকুম জরুর—

ঃ আমার খেয়াল আছে। তুমি যাও—

ইতিমধ্যে আসাদুল্লাহ এসে মকানের বাইরে থেকে হাঁক দিলো। নামদার খাঁ, আরে ও নামদার খাঁ—

উৎকর্ণ হয়ে উঠে নামদার খাঁ বললো—ওহি ওহি, ফিন্ আ-গৈল্।

আসাদুল্লাহ পুনরায় হাঁক দিয়ে বললো—নামদার খাঁ, তোমার হুজুর কি ফিরেছেন ?



www.amarboi.org

ঃ হঁ-হঁ, আসি গৈলেন বটে —

উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিয়ে নামদার খাঁ দ্রুতপদে সেদিকে এগুলো আসাদুল্লাহ আওয়াজ দিলো — সাব্বাস্ !

নামদার খাঁ এসে আসাদুল্লাহকে দহলীজে নিয়ে বসালো। পোশাক-আশাক বদল করে দিলওয়ার আলী দহলীজে এসে হাজির হলে, আসাদুল্লাহ তাঁকে সালাম দিয়েই সরাসরি আক্রমণ করে বসলো। বললো — কি ঘটনা উস্তাদ ? এটাকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না ?

সালামের জবাব দিয়ে দিলওয়ার আলী সহজ কণ্ঠে বললেন — কি ঘটনা মানে ?

ঃ মানে ইদানিং আপনি মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যান ! কোন সরকারী কাজে নয়, অমনি অমনি সারাবেলা লা-পাত্তা। অথচ কোথায় গেলেন, কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না।

ঃ ও, আচ্ছা।

ঃ এখন দেখছি, সেরেফ সারাবেলাই নয়, রাতেও আপনি মকানে ফিরা ছেড়ে দিলেন। এটাতো মোটেই আর মামুলী ব্যাপার নয় ? রীতিমতো চিন্তার বিষয় !

ঃ তাই ?

ঃ এর মাহাত্মটা কি ? কি আছে এর পেছনে ?

ঃ এর পেছনে ! কার পেছনে ?

ঃ কোথায় ছিলেন উস্তাদ ? কোথায় ছিলেন গতরাতে ?

ঃ কোথায় ছিলাম ? তা মানে, ছিলাম একখানে।

ঃ না উস্তাদ, এড়িয়ে গেলে শুনছিনে। এসব জানা এখন আমার কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আমি আপনার কাছের লোক। কিছুই জানিনে বললে আমার চলবে কেন ?

ঃ বটে !

ঃ আপনার ব্যাপারটা এখন একটা রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় যান এভাবে আপনি ?

দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে বললেন — তা ধরতে পারো, শ্বশুর বাড়ী।

আসাদুল্লাহ নাখোশ কণ্ঠে বললো — ফের মস্করা করছেন উস্তাদ ?

ঃ মস্করা করবো কেন ? মানুষ কি শ্বশুর বাড়ীতে যায় না ?

আসাদুল্লাহ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো — যায়। তাদের শ্বশুর বাড়ী আছে, তারা যায়। আপনি কোথায় যান ? আপনি কোথায় শ্বশুর বাড়ী পেলেন ?

ঃ তালাশ করলেই পাওয়া যায়। তালাশ করে পেলাম।

ঃ তালাশ করে ! তালাশ করলেই শ্বশুর বাড়ী পাওয়া যায় ?

ঃ আলবত পাওয়া যায়। তালাশের মতো তালাশ করলে নাকি পরমজনকে পাওয়া যায়, আর এতো একটু মামুলী শ্বশুর বাড়ী !

ঃ ফের হেঁয়ালী ? শ্বশুর বাড়ী কি রাস্তা পথের জিনিস যে, তালাশ করলেন আর পেলেন ?



www.amarboi.org

ঃ তাইতো পেলাম। আসলে নিজের তালাশ নিজে না করলে হয় না। পরের কাজ দায়সারা।

ঃ তার মানে ?

ঃ তোমাকেও তো তালাশ করতে নামিয়ে দিলাম একবার ? কি ফায়দা হলো তাতে ?

আসাদুল্লাহ বিস্মিত হয়ে বললো—আমাকেও নামিয়ে দিলেন কৈ, কোথায়, কখন ?

ঃ গেলে না তুমি একবার এই শহরের ঐ দক্ষিণ দিকে তালাশ করতে ? ঐযে মুহররমের মর্সিয়া হলো, সেই মহল্লায় ?

খেয়াল হতেই আসাদুল্লাহ বললো—ও হ্যাঁ, সে তো গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম ফৌজীপুরে যাঁরা আপনার জান বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের হদিস্ করতে। আপনার শ্বশুর বাড়ী কি তালাশ করতে গেলাম ?

ঃ তুমি তো তাই বলেছিলে। বলেছিলে, এতই যখন মনে ধরেছে উস্তাদ, শাদিটা ওখানেই করে ফেলুন। তোমার কথা রাখলে, ঐ মকানটা কি দাঁড়ায় ? আমার শ্বশুর বাড়ী হয় না ?

ঃ ও, আপনি স্বপনে গাঁজা খাচ্ছেন ?

ঃ স্বপনে ! গাঁজা আর এমন কি দুর্লভ বস্তু যে, স্বপনে খেতে হবে ? ইচ্ছে করলে তো জেগে থেকেও খাওয়া যায়।

ঃ তো খান না দেখি, হিম্মত কেমন উস্তাদের ? কোথায় গাঁজা, কোথায় কল্‌কে —এসবের কোন হদিসই যিনি জানেন না, তিনি আবার গাঁজা খাবেন ?

ঃ জানিনে মানে ? জানিনে তো প্রায়দিনই যাচ্ছি কোথায় ?

উৎসুক হয়ে উঠে আসাদুল্লাহ বললো—কি রকম ? ওঁদের তাহলে হদিস্ কিছু পেয়েছেন নাকি উস্তাদ ?

ঃ তো কি আর অম্‌নি অম্‌নি এত কথা বলছি ?

আসাদুল্লাহ লাফিয়ে উঠে বললো—মার কিস্তি ! বলেন কি উস্তাদ ? কিভাবে হদিস্‌টা পেলেন ?

ঃ ছাপ্পড় ফেড়ে পেয়ে গেলাম। একদম না চাইতেই বৃষ্টি।

ঃ আর ভূমিকা নয় উস্তাদ, সোজা করে বলুন তো শুনি ?

ঃ ঐ যে মনে আছে, একটা ঘোড়ার গাড়ী উল্টে গেলো ?

ঃ জি-জি, আছে।

ঃ ঐ ঘোড়ার গাড়ীই আমাকে সেই বাড়ীতে নিয়ে গেল।

ঃ সেই বাড়ীতে মানে ? কোন্ বাড়ীতে ?

ঃ তোমার হিসেবে ধরলে, আমার সেই শ্বশুর বাড়ীতে।

ঃ সোবহান আল্লাহ ! সেকি উস্তাদ ? ব্যাপারটা জলদি জলদি খুলে বলুন তো ?

অধীর আগ্রহে আসাদুল্লাহ ছটফট করতে লাগলো। দিলওয়ার আলী ঠাণ্ডা কণ্ঠে বললেন—খুলে আর কি বলবো ? তুমি খামাখাই ঘুরে ঘুরে হয়রান হলে, আমি আপ্‌ছে আপ্ পেয়ে গেলাম মকানটা।



www.amarboi.org

ঃ তারপর ?

ঃ তার আবার পর কি ? পেয়ে গেলাম, এইটেই তো আসল কথা।

অসহিষ্ণু হয়ে আসাদুল্লাহ বললো—দোহাই উস্তাদ, আমি কিন্তু সত্যিই আর ধৈর্য রাখতে পারছিনে ! একি খেলাতে লাগলেন খামাখা ?

ঃ এ্যাঁ।

ঃ একটা কথার উপরও যদি সোজা করে না দেন তো থাক, আমি আর কিছু জানতে চাইনে।

মুখ গোমড়া করে আসাদুল্লাহ অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালো। দিলওয়ার আলী হুঁশে এসে বললেন—ওরে বাপরে ! আচ্ছা-আচ্ছা বলছি—

এরপর দিলওয়ার আলী আগাগোড়া ঘটনাটা আসাদুল্লাহকে শুনালেন। সেখানে গিয়ে তিনি কারো বেটা হলেন, কারো নাতী হলেন, ভাই হলেন এবং কারো কিছুটা আসামী হলেন, আকারে-ইংগিতে এসব কথাও কিছু কিছু বললেন। সব কথা শুনার পর আসাদুল্লাহ খুশীতে ডগমগ হয়ে গেল। সে সংগে সংগে অভিযোগ তুলে বললো—সেকি উস্তাদ ! এতবড় ঘটনা, তবু আমাকে কিছুই এ যাবত জানালেন না ? তাজ্জব লোক আপনি তো !

দিলওয়ার আলী পুনরায় কৌতুক করে বললেন—কেন, খামাখা কতোয়াল ডেকে এনে আমি ডাণ্ডা খেতে যাবো কেন ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ তোমার যা পাত্‌লা দীল ! আগেই তোমাকে বললে, হৈচৈ করে রাখতে তুমি কিছু, না আমি এমন নিরাপদে যেতে পারতাম ওখানে ?

আসাদুল্লাহ এবার ভারিক্কী চালে বললো—আচ্ছা, এই মতলব ? তা এর মধ্যে ক'বার উস্তাদের যাওয়া হলো সেখানে ?

ঃ কমছে কম বার তিনেক।

ঃ তিন তিন বার ! সাব্বাস ! এই তিন তিন বারই তাঁরা আপনাকে খাতির সম্মান দেখালেন ?

ঃ বহুৎ বহুৎ।

ঃ সাবই আপনাকে যত্ন-আদর করলেন ?

ঃ সবাই সবাই।

ঃ উনিও আগের মতোই যত্ন নিলেন আপনার ?

ঃ উনিও মানে ?

ঃ মানে ঐ মেয়েটা ? যাঁকে আপনার মনে ধরেছিল খুব !

ঃ বটে !

ঃ বলুন না উস্তাদ, উনার কি আগের মতোই টান আছে আপনার উপর ?

ঃ খুব-খুব। বেজায় টান আছে।

ঃ আপনার ? আপনার টানটা কি আগের মতোই আছে ?

ঃ জরুর-জরুর।



www.amarboi.org

ঃ তাহলে তো মুহাব্বতটা আপনাদের পাকাপাকি হয়ে গেছে উস্তাদ ? মানে, ইতিমধ্যে দুইজন দুইজনের খুব কাছাকাছি—

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে দিলওয়ার আলী বললেন—আসাদ মিয়া, আর কি এগুনো তোমার ঠিক হবে ?

ঃ উস্তাদ !

ঃ এতটা ভেতরে যাওয়ার খাহেশ কেন ? মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছো নাকি ?

আসাদুল্লাহ দ্বিগুণ উৎসাহে বললো—যেতেই হবে-যেতেই হবে। তাবৎ আমার জানা চাই।

ঃ তোমার জানা চাই ?

ঃ জি-জি। কোথাও কোন ফাঁক থাকলে চলবে না।

ঃ অর্থাৎ আঁটি ভেঙ্গে শাঁস্ নিতে চাও তুমি ?

ঃ নিতেই তো হবে। সবকিছু ভাল করে না জেনে কোন একটা বেয়াকুফী করে ফেলাতো ঠিক হবে না।

সন্দেহাকুলচিত্তে দিলওয়ার আলী বললেন—তার মানে ? মনে হচ্ছে, এক্ষুণি তুমি ঘটকালীতে বেরিয়ে পড়বে ?

ঃ জিনা-জিনা, আগেই বেরুবো না। ঠিক ঠিক হদিস্‌টা আগে আসল জায়গায় পৌছাতে হবে। তারপর হুকুম হলে বেরুবো।

আসাদুল্লাহ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। দিলওয়ার আলী সবিস্ময়ে বললেন—আসল জায়গা ! কার কাছে পৌছাতে হবে ?

ঃ বড় সাহেব, মানে আপনার ভাই মীর দিলীর আলী সাহেবের কাছে পৌছাতে হবে।

আবার চমকে উঠলেন দিলওয়ার আলী। পরম বিস্ময়ে বললেন—ভাইজানের কাছে মানে ?

ঃ উনি যে হুকুম করেছেন আমাকে। আপনার জন্যে জলদি জলদি একটা পাত্রী খুঁজতে বলেছেন।

ঃ সেকি ! কবে ?

ঃ আজ সবেরে।

ঃ সবেরে !

ঃ জি, এই সকালের দিকে। বড় সাহেবের সাথে হঠাৎ করেই মোলাকাত। উনি আপনার মকানেই এসেছিলেন। পথে আমাকে পেয়ে উনি যারপরনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ আমার উপর বিরাট তাঁর অভিযোগ। আপনি যে দিন দিন পয়মাল হয়ে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও কেন আমি সেসব খবর রাখিনে, আর কেন তাঁকে এযাবত এসব কথা বলিনি—এই মর্মে আমার উপর জিয়াদা গোস্বা হলেন উনি।

ঃ বলো কি !



www.amarboi.org

ঃ আপনি আজ সারারাত মকানের বাইরে আছেন জেনে উনার দীলে বড় চোট লেগেছে। যারা বয়ে যায়, রাতে ঘরে থাকে না তারাই— এই তাঁর ধারণা।

ঃ আসাদ মিয়া !

ঃ জলদি-জলদি এখন আপনার শাদি হোক, এইটেই উনি চান আর এ জন্যেই ঐ হুকুম উনি আমার উপর করেছেন।

ঃ অর্থাৎ পাত্রী দেখতে বলেছেন ?

ঃ জি–জি। উনিও দেখবেন, তবে আমার উপরই এ ব্যাপারে অধিক দায়িত্ব দিয়েছেন।

ঃ অধিক দায়িত্ব !

ঃ সবেরা-শাম্ আপনার আমি সাথে সাথে আছি। তাই কেমন মেয়ে পছন্দ হবে আপনার এটা আমিই বেশী বুঝবো বলে, আমাকেই উনি এ ব্যাপারে অধিকতর তৎপর হতে বলেছেন। দু' একদিনের মধ্যেই উনি খবর কিছু পেতে চান।

ঃ এতদূর !

ঃ কেন হবে না উস্তাদ ? উনি আপনার মুরুব্বী। আপনার চাল-চলনে কোন ফাঁক চোখে পড়লে, পেরেশান তো হবেনই উনি। আপনাদের খানদানে কোন কালির দাগ লাগুক, এটা উনি—

কপালে করাঘাত করে দিলওয়ার আলী বললেন— উঃ ! কম্ম একদম কাবার !

পাশের একটা আসনের উপর দিলওয়ার আলী থপ্ করে বসে পড়লেন। আসাদুল্লাহ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো— উস্তাদ !

ঃ এই একটা রাতের জন্যেই সবাই মিলে তোমরা আমাকে দেউলিয়া বানিয়ে দিলে।

ঃ না–না, দেউলিয়া হওয়ার কি আছে উস্তাদ ? আসলে ধারণা তো ভুল সবার। এরপর শাদিটা হয়ে গেলে সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

ঝড়ের বেগে ছুটে এলো কলিমউদ্দীন। নওকর কলিমউদ্দীন। দিলওয়ার আলীর মকানের তৃতীয় ব্যক্তি। সে বাজার করতে বেরিয়েছিল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে ছুটে এসে বললো— গজব হয়ে গেছে হুজুর। সেরেফ গজব হয়ে গেছে। হায় হায়, একি কাণ্ড !

কলিমউদ্দীন ভিন্ন ধরনের মানুষ। আবেগ-উত্তাপহীন একদম গোবেচারা লোক। নিজের কাজ আর নিজেকে ছাড়া এ দুনিয়ার কোন কিছুর সাথেই তার কোন সম্পর্ক নেই। কোন সাত-পাঁচেও সে কখনো থাকে না। সেই কলিমউদ্দীনের মধ্যে এতটা অস্থিরতা দেখে দিলওয়ার আলী ও আসাদুল্লাহ উভয়েই হকচকিয়ে গিয়ে বললেন— গজব হয়ে গেছে মানে ?

কলিমউদ্দীন একইভাবে বললো— বাজ পড়েছে হুজুর। নবাব মহলের উপর বজ্রপাত হয়েছে। বিনে মেঘে বজ্রপাত !

দিলওয়ার আলী রুদ্ধশ্বাসে বললেন— কি রকম ?

ঃ শাহজাদা তকী খান ইন্তেকাল করেছেন।



www.amarboi.org

বিপুল বেগে চমকে উঠলেন উভয়েই। এক সাথে বললেন—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইন্তেকাল করেছেন?

ঃ জি হুজুর। গতরাতে ইন্তেকাল করেছেন। এই মাত্র খবর এসে পৌঁছেছে।

বিমূঢ় অবস্থায় দিলওয়ার আলী পুনরায় প্রশ্ন করলেন—সেকি ! শাহজাদা তকী খান ইন্তেকাল করেছেন?

ঃ জি–জি। দরবার-এলাকার দিকে হায় হায় করছে সবাই।

ঃ এ কি করে সম্ভব ! তুমি ঠিক শুনেছো তো?

ঃ সবাই ঐ একই কথা বলছে হুজুর, আমার ভুল হবে কেন?

আসাদুল্লাহ বললো—কি তাজ্জব ! কিভাবে উনি ইন্তেকাল করলেন?

জবাবে কলিমউদ্দীন বললো—আমি তা বলতে পারবো না হুজুর। উনি ইন্তেকাল করেছেন, এইটুকুই শুনে এলাম।

ঐটুকুই সত্যি। দিলওয়ার আলী ও আসাদুল্লাহ তখনই বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসে জানতে পারলেন, কলিমউদ্দীনের খবর সঠিক। শাহজাদা তকী খান গতরাতে ইন্তেকাল করেছেন। তবে অপমৃত্যু বা হত্যা-খুন নয়। স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু ঘটেছে শাহজাদার। আগে থেকেই তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। দুইতিন দিন আগে সেই অসুখটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায় আর এতে করেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

কিন্তু কারণটা যা-ই হোক, শাহজাদার মৃত্যুটা কোন মামুলী ব্যাপার নয়, মারাত্মক এক ঘটনা। এ ঘটনার প্রভাবটাও তাই মারাত্মকভাবেই রাজধানীর উপর পড়েছে। সামরিক ঘাঁটির বাইরে এসে দিলওয়ার আলী দেখলেন, নবাব মহল, দরবার ও প্রশাসনিক চত্বরের সর্বত্রই হাহাকার পড়ে গেছে। বিস্ময়াহত লোকেরা ছুটোছুটির সাথে হায় হায় করে ফিরছে। যাকে যে সামনে পাচ্ছে তাকেই সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। দপ্তর-ময়দান-অলিগলি-সবস্থানেই জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা এই আলাপই করছে আর বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে আহাজারীর আওয়াজ দিচ্ছে।

নিদারুণ দুঃসংবাদের আকস্মিক ধাক্কায় নবাব সুজাউদ্দীন খান নীরব হয়ে গেছেন। বাক-হারিয়ে তিনি নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। মর্মান্তিক হলেও শোকে তিনি অস্থির হয়ে উঠেননি। হাত-পাত ছুড়তে লাগেননি। নীরবে বসে বসে পুত্র শোক সম্বরণ করার চেষ্টা করছেন।

হাত-পা ছুড়তে শুরু করেছেন প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান প্রধান সদস্যেরা। এই সংবাদে তাঁদের একদম পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। বিশেষ করে, শীর্ষস্থানীয় সদস্যত্রয়ী অর্থাৎ পরিষদের প্রধান তিন ব্যক্তির (হাজী আহম্মদ, আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠের) মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়েছে। মাথায় হাত দিয়ে তাঁরা জমিনের উপর বসে গেছেন। এক অব্যক্তব্য যন্ত্রণায় মূর্ছা যাওয়ার সীমান্তে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। এ ব্যাপারে তাঁদের এত মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখে চারপাশের লোকজন বোবা বনে গেছেন। কেউ কেউ আবেগভরে বলছেন, "আহা ! একেই বলে দরদ ! নবাব



www.amarboi.org

পরিবারের প্রতি এঁদের ভক্তি আর ভালবাসা কি গভীর! নবাব কি আর অম্‌নি অম্‌নি এত তাঁদের পেয়ার করেন?" বেরসিকেরা বলছেন—"ব্যাপার কি! মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ এত বেশী, কেমন যেন আলগা আলগা লাগছে!" মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনেরা যথার্থই অনুধাবন করছেন, এঁদের এই আহাজারী একবিন্দুও লোক দেখানো নয়, এটা বিলকুলই এঁদের অন্তর ফুটে বেরুচ্ছে। তবে এদের এই বেদনার পরবর্তী পদক্ষেপ চিন্তা করে বিদগ্ধজনেরা সঙ্গে সঙ্গেই শংকিত হয়ে উঠেছেন।

শংকিত হয়ে উঠলেন দিলওয়ার আলী, গাউস্ খান ও তাঁদের সমমনা ব্যক্তিবর্গ। এই দুর্ঘটনাজনিত ব্যস্ততার পেছনে অর্থাৎ এই সম্পর্কিত আদেশ-ফরমায়েশ তামিল করার পেছনে সারাদিন অতিবাহিত করে তারা রাতে এসে প্রবীণ সেনানায়ক গাউস্ খানের দহলীজে সমবেত হলেন। কোন নির্ধারিত বৈঠক নয়। নিজ নিজ খেয়ালেই চিন্তাকুল চিত্তে একে একে অনেকেই এসে হাজির হলেন সেখানে। হাজির হলেন দিলওয়ার আলী, শমশির খান, শরাফউদ্দীন, মীর কামাল, মীর সিরাজউদ্দীন, মীর গাদাই, হাজী কোরবান আলী ও আরো কয়েকজন। রাজপুত বিজয় সিংহও অল্পক্ষণ পরেই এসে হাজির হলেন। শাহজাদার মৃত্যু নিয়ে এলোমেলো কিছু আলাপ ও দুঃখ প্রকাশের পর, দিলওয়ার আলী বিষণ্নকণ্ঠে বললেন—ব্যাপারটা দুঃখজনক বটে! তবে এই সাথে এটা যে মস্ত আর এক চিন্তার বিষয়, এটা কি কেউ বুঝতে পেরেছেন আপনারা?

জবাবে গাউস খান বললেন—বুঝতে তো পেরেছি দুঃসংবাদটা পাওয়ার সাথেই। তুমি এখন কোন্ প্রেক্ষিতে কথাটা বলছো—

দিলওয়ার আলী বললেন—আমি বলছি, শাহজাদা তকী খান মরেও গেলেন, সেই সাথে অনেককে মেরেও গেলেন।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ কাউকে মারলেন তাদের তামাম পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে, আর কাউকে মারলেন তালকানা করে?

ঃ তালকানা?

ঃ এতদিন তবু একটু নিশানা-নজীর ছিল যে, মসনদের উপর বালা-মুসিবত কিছু যদি আসেই, তাহলে এই দিক দিয়েই আসবে। কিন্তু এখন আর কোন নিশানাই রইলো না। কোন দিক দিয়ে কোন্ আকারে আসবে তা আর আন্দাজ করার কোন উপায়ই থাকলো না। মসনদের হকদারের সাথে আমরাও বিলকুল তালকানা হয়ে গেলাম।

গাউস্ খান ও অন্যান্যেরা সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইটেই তো মস্তবড় ভাবনা এখন আমাদের। সেই থেকে এই কথাইতো অবিরাম ভাবছি আমরা।

দিলওয়ার আলী বললেন—যদিও এককভাবে শাহজাদার মৃত্যু নিয়েই আমাদের এখন দুঃখিত থাকা উচিত, অন্য কোন চিন্তা এখানে এখনই আসা ঠিক নয়, তবু বিষয়টা এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, শাহজাদা তকী খানের মৃত্যুর কথা ভাবতে গেলেই এই প্রসঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে এসে যায়।



www.amarboi.org

শমশির খান ও শরাফউদ্দীন বললেন—সেতো বটেই সেতো বটেই। এই ঘটনার সাথে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারেই উলট পালট হয়ে গেল।

গাউস্ খান উদাস কণ্ঠে বললেন—ব্যাপারটা এমনই ঘোলাটে হয়ে গেল যে, অতপর কোন্ খেলা শুরু হবে, কে জানে।

মীর কামাল কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—আমার কিন্তু ধারণা একটু অন্য রকম।

অনেকেই উন্মুখ হয়ে বললেন—কি রকম ?

মীর কামাল বললেন—আমার মনে হয়, তামাম খেলার কবর রচনা এই সাথেই হয়ে গেল।

হাজী কোরবান আলী বললেন—কি করে বুঝলেন ?

ঃ প্রথমত, খেলার মতো আর কোন গুটিই সামনে এখন দেখছিনে। দ্বিতীয়ত, যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন খেলোয়াড়রা, তাতে মনে হয় সে খাহেশও আর তাঁদের হবে না।

ঃ এটা মোটেই কোন পোক্ত কথা হলো না। খেলোয়াড়রা খেলা দেখিয়ে খায়। পুতুল নাচের খেলা। এইটেই তাদের মূলধন। একটা পুতুল ভেঙ্গে গেল মানেই কি খেল্ তাদের খতম হয়ে গেল ?

মীর কামাল আমতা আমতা করে বললেন—না মানে বলছিলাম, পুতুল বানানোর মতো তেমন কোন কাউকে তো আপাতত দেখছিনে—

লাফিয়ে উঠলেন বিজয় সিংহ। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন—কি বলেন পুতুল কাউকে দেখছেন না ? অভাব আছে পুতুলের ?

ঃ এ্যাঁ ! না, বলছিলাম—

ঃ এই আমাকেই যদি বলে, সিংহ মহাশয়, আপনি একজন রাজপুত। আপনি একজন বীর আর অনেক সেপাই আপনার হাতে। আপনিই এগিয়ে আসুন। বাংলার মসনদে আপনাকেই বসিয়ে দেই আমরা। তখন ?

ঃ বলেন কি !

ঃ যদি বলে, বিশেষ কিছুই করতে হবে না আপনাকে। পথ-ঘাট আমরাই সব বাঁধবো, দিল্লী থেকে সনদটাও আমরাই আনিয়ে দেবো। আপনি সেরেফ তরবারিটা উঁচিয়ে নিয়ে মসনদে উঠে বসবেন। তখন আমার মাথাটা ঘুরতে শুরু করবে কিনা, বলুন ?

ঃ সেকি ! অমনি আপনি রাজী হয়ে যাবেন ?

ঃ আমি না হই, আপনি তো রাজী হয়ে যেতে পারেন ? লোভ সম্বরণ করার হিম্মত সবার কি সমান ? বিশেষ করে, মসনদের লোভ বলে লোভ !

উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বললেন—ঠিক ঠিক। সিংহ মহাশয়ের এ উপলব্ধি একদম সঠিক আর পরিষ্কার।

বলেই চললেন বিজয় সিংহ—শাহজাদা সরফরাজ খানের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে তারা। শাহজাদা সরফরাজ খান মসনদে আসা মানেই যেখানে তাদের অস্তিত্ব মিস্‌মার হয়ে যাওয়া সেখানে জেনেশুনে কে চাইবে চুপচাপ বসে থেকে মিস্‌মার হয়ে যেতে ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ কি চেষ্টা তারা করবে না ?



www.amarboi.org

পুনরায় অনেকে একবাক্যে বললেন—একশোবার করবে, হাজার বার করবে।

দিলওয়ার আলী বললেন—হ্যাঁ, চেষ্টা তারা করবে, এটা ঠিক। তবে শাহজাদা সরফরাজ খান মসনদে এলেই যে তারা সব মিস্‌মার হয়ে যাবে, এটা আমি এখনই নির্দ্বিধায় ঠিক মনে করিনে।

গাউস্ খান বললেন—কেমন?

দিলওয়ার আলী বললেন—বর্তমান নবাব তাদের যেভাবে মজবুত করে বসিয়ে দিয়েছেন আর পেছনে তাদের যতশক্তি আছে, তাতে তারা কেউ মোটেই ভাসমান পানা নয় যে, শাহজাদা সরফরাজ খান মসনদে এসে বসলেই তারা মিস্‌মার হয়ে যাবে বা এক পলকেই স্রোতে ভেসে যাবে। তাছাড়া, তাদের মতো এমন একটা শক্তিকে মিস্‌মার করতে হলে যে পণ আর মনোবল দরকার, শাহজাদা সরফরাজ খানের মধ্যে তা ষোল আনাই আছে, এটাও আমি এই মুহূর্তে চোখ মুজে মেনে নিতে পারিনে।

গাউস্ খান ও বিজয় সিংহ সহকারে সবাই আবার মুষড়ে পড়ে বললেন—তা বটে তা বটে!

আশা-নিরাশা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুটা রাত করেই এ বৈঠক শেষ হলো।

মুকুট যাঁর মাথায়, সুখ-দুঃখ কোন অবস্থায়, অধিকক্ষণ তাঁর নিশ্চল হয়ে বসে থাকার মওকা নেই। পুত্র শোকেও নয়, পুত্র লাভেও নয়। সচল তাঁকে হতেই হবে, তা যত ক্ষীণ মাত্রায় হোক। ঘানীর জোয়ালটা ঘাড়ে যার বিদ্যমান, ঘানীর চারপাশে ঘুরতেই হবে তাকে, তা গতিটা তার যত মন্থরই হোক।

উড়িষ্যা একাই এক রাজ্য। সহকারী সুবাদার হিসেবে মরহুম শাহজাদা তকী খান ছিলেন সেই রাজ্যের রাজা। রাজা যাবে রাজা আসবে, মসনদ ঠিকই থাকবে। এক রাজার মৃত্যু ঘটলে মসনদটা চিরকাল ফাঁকা পড়ে থাকবে না। ফাঁকা থাকলে চলে না। তাই অচিরেই উড়িষ্যায় একজন সহকারী সুবাদার নিয়োগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো এবং শোকতাপ ঝেড়ে ফেলে নবাব সুজাউদ্দীন খানকে সে কাজে মনোনিয়োগ করতে হলো। নানাবিধ বিবেচনায়, বিশেষ করে দক্ষতার বিচারে, নবাব সুজাউদ্দীন খান আপন জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীকে ঢাকা থেকে ডেকে নিলেন এবং তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদারের পদ দিয়ে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দিলেন। এবারও দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী একা একাই গেলেন না, তাঁর দক্ষ ও বিশস্ত সহচর মীর হাবিবকে সঙ্গে নিয়েই উড়িষ্যায় গেলেন।

খালি হলো ঢাকার সহকারী সুবাদারের আসন। সুজাউদ্দীন এবার তাঁর আওলাদ শাহজাদা সরফরাজ খানকে ঢাকার সহকারী সুবাদার নিয়োগ করলেন। বাংলার দেওয়ানের পদ তাঁর উপর ছিলই, সেই সাথে আবার এই নয়াদায়িত্ব শাহজাদা সরফরাজ খানের উপর অর্পণ করা হলো। দায়িত্ব নিতে শাহজাদা অস্বীকার তেমন করলেন না, কিন্তু তিনি স্থানত্যাগ করতে মোটেই রাজী হলেন না। অর্থাৎ, মুর্শিদাবাদ ছেড়ে তিনি ঢাকায় যেতে চাইলেন না। পুত্রের অনীহার কারণে নবাব সুজাউদ্দীন



www.amarboi.org

খানও পীড়াপীড়ি করলেন না। মুর্শিদাবাদে থেকেই এ দায়িত্ব পালন করার এযাজত তাঁকে দিলেন।

শাহজাদা সরফরাজ খান এ এযাজতের অমর্যাদা করলেন না। তাঁর দায়িত্ব তিনি শক্তভাবে গ্রহণ করলেন। মুর্শিদাবাদে থেকেই যাতে করে ঢাকার প্রশাসন সুষ্ঠ ও সুচারু রূপে পরিচালিত হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রতিনিধি করে গালিব আলী খান নামক সুদক্ষ এক ব্যক্তিকে ঢাকায় প্রেরণ করলেন। গালিব খানকে সহায়তা করার জন্যে তিনি যশোবন্ত রায় নামের আর একজন বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারীকে গালিব খানের সাথে দিলেন। রাজস্ব বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করে যশোবন্ত রায় নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঢাকায় এসে তিনি এই অভিজ্ঞতা সার্থকভাবে কাজে লাগাতে লাগলেন। গালিব আলী খানও ছিলেন একজন বিশিষ্ট 'সৈয়দ'। পারস্যের শাহী বংশের লোক। জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। ঢাকার প্রশাসনকে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনিও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

এইটুকুই নয়। শাহজাদা সরফরাজ খান ঢাকার 'নাওয়ারা'র (নৌবহরের) দারোগা (পরিদর্শক) করে তাঁর নিজ জামাতা মুরাদ খানকেও এঁদের সাথে পাঠালেন। শুধু ধর্ম পরায়নই নন, শাহজাদা সরফরাজ খান কর্তব্য পরায়নও ছিলেন। চতুরতার অভাব তাঁর থাকলেও, পিতার মতো কর্তব্যের প্রতি তিনি কখনো উদাসীন ছিলেন না।

## ৯

শাহজাদা তকী খানের মৃত্যুর হুটপিট্ নিয়ে দিন দুয়েক গেল। মীর দিলীর আলী, দিলওয়ার আলী, আসাদুল্লাহ—সকলেই এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। তৃতীয় দিন দিলওয়ার আলী তাঁর বড় ভাই মীর দিলীর আলীর দপ্তরে এলেন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে। কি কারণে ভাই তাঁকে জরুরী তলব দিলেন, এ নিয়ে একটা উদ্বিগ্নভাব দিলওয়ার আলীর দীলে অনুক্ষণই ছিল। কিন্তু দপ্তরে এসে দেখলেন, ভাই দপ্তরে নেই। রাজধানীর বাইরে আছেন এবং ঐদিনই ফিরবেন না, পরের দিন ফিরবেন। দিলওয়ার আলী ফিরে এলেন। ভাই দিলীর আলী ফিরে আসার পরের দিন আবার আসবেন, এই ইরাদা নিলেন।

কিন্তু সেই পরের দিনও যাওয়া আর তাঁর হলো না। মীর দিলীর আলীই বারণ করে পাঠালেন। মীর দিলীর আলী ফিরে এসেই দিলওয়ার আলীর দপ্তরে আসার খবর পেলেন এবং নওকর মারফত দিলওয়ার আলীকে জানালেন, এখন নয়, হপ্তাকাল পরে যেন সে আসে।

দিলওয়ার আলী ধাঁধায় পড়ে গেলেন। জরুরী তলব দেয়ার পরও ভাই আবার কেন তাঁকে এক হপ্তা দেরী করতে বললেন, এর কারণ খুঁজে পেলেন না।

আসাদুল্লাহ সেই থেকেই অস্থির। মাহমুদা খাতুনের ইতিবৃত্ত জানার পর পাত্রী হিসেবে মাহমুদা খাতুনের প্রসঙ্গটা দিলীর আলীকে জানাতে যাওয়ার জন্যে



www.amarboi.org

আসাদুল্লাহর মধ্যে এক দুর্বার আগ্রহ পয়দা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে তকী খানের ঐ দুর্ঘটনার কারণে সে কয়েকটা দিন খামুশ হয়েছিল। এক্ষণে সে আবার অধীর হয়ে উঠলো এবং অবিলম্বে দিলীর আলীর দপ্তরে এসে হাজির হলো। কিন্তু মীর দিলীর আলীর কাছে এ প্রসঙ্গে কথা তুলতেই, "তোমার খবরটা আপাতত থাক, দরকার হলে পরে ওটা জেনে নেবো," বলে মীর দিলীর আলী ঝুট্‌মুট্‌ এক কথায় আসাদুল্লাহকে বিদায় করে দিলেন।

শূন্য মশকের মতো চুপ্‌সে গিয়ে আসাদুল্লাহ ফিরে এলো। ব্যাপারটার মাথামুণ্ড সেও বুঝতে পারলো না।

হপ্তাকাল পরে দিলওয়ার আলী আবার মীর দিলীর আলীর দপ্তর কক্ষে এলে, মীর দিলীর আলী তাঁকে ডেকে সামনের আসনে বসালেন। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে দু' চারটে কথা বলার পর মীর দিলীর আলী থামলেন এবং একটু পরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমি কিছুটা দায়ে পড়েই সেদিন তোমার ওখানে গিয়েছিলাম। তোমাকে মকানে পেলে কথাটা ওখানেই শেষ করে আসতে পারতাম।

দিলওয়ার আলী অতিশয় সংকুচিত হয়ে গেলেন। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—জি ?

ঃ শাহরিয়ার খান সাহেবকে তো চেনোই। কোম্‌ড়ার অস্ত্রাগারের দারোগা। শাহজাদা সরফরাজ খানের খুব অনুগত লোক। ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের হাত এড়াতে না পেরেই আমাকে যেতে হলো তোমার ওখানে।

দিলওয়ার আলী উৎসুক হয়ে বললেন—কেন ভাইজান ? কি বলেন উনি ?

ঃ বলছি। শাহজাদা তকী খানের মৃত্যুর খবরে আমরা সবাই খুব ব্যস্ত থাকায়, ব্যাপারটার ভেতরে তেমন ঢোকার মওকা পেলাম না। পরে শাহজাদা বাহাদুরকে কথাটা বলতেই উনি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলেন—আর এ ব্যাপারে আমাকে খুব তৎপর হতে বললেন।

ঃ ভাইজান !

ঃ এ কারণেই তোমাকে একটু পরে আসতে বললাম। নিজে সবকিছু ভালভাবে জেনে নেয়ার আগে, তোমার সাথে এ নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে না। বুঝে আমি একটু সময় নিলাম।

দিলওয়ার আলী সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন। মীর দিলীর আলী দেরাজ খুলে একটা লেফাফা বের করলেন এবং লেফাফা খুলে একটা তস্‌বীর দিলওয়ার আলীর হাতে দিয়ে বললেন—এই এটি হলো ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের মেয়ে সাবিহা খানম। খুব গুণবতী মেয়ে। এলেম-আদব, জ্ঞান-বুদ্ধি, শুনলাম, সবই বেশ উম্‌দা। পয়গামটা আমাদেরই এক শুভাকাঙ্ক্ষী উনাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। এ নিয়ে এখন তোমার সাথে আলাপ হওয়া দরকার। আমাদের ঘর জেনে আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে উনারাই খুব আগ্রহী।

তস্‌বীরটা হাতে দেয়ার সাথে সাথে দিলওয়ার আলীর হাতখানা ঈষৎ কেঁপে উঠলো। দিলওয়ার আলী অতিশয় সংকুচিত হয়ে গেলেন। হাতের তসবীর হাতেই তাঁর রইলো। শরমে তাঁর নত মাথা আরো অধিক নীচু হয়ে এলো। এতদৃশ্যে মীর



www.amarboi.org

দিলীর আলী ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—না-না, এখানে এত শরম পাওয়ার কিছু নেই। তুমি সাবালক। একজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন দায়িত্বশীল সালার। তোমার সাথে এ আলাপটা খোলাখুলিভাবে হোক, এইটেই আমার ইচ্ছে।

ঃ জি?

ঃ এখনই কোন মন্তব্য করতে তোমাকে আমি বলবো না। তস্‌বীরটা তুমি নিয়ে যাও। নিজে আরো খোঁজ-খবর নিয়ে দেখো। যদি তোমার আপত্তি কিছু না থাকে, তাহলে শাদিটা তোমার এখানেই হোক, এটা আমি চাইবো।

দিলওয়ার আলী কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু—

ঃ বললামই তো, তোমার অমতে কিছুই হবে না। তবে শাহজাদা বাহাদুরের খুবই ইচ্ছে, তোমার শাদিটা এখানেই হোক। শাহরিয়ার খান সাহেবের সাথে আমাদের সবার একটা একাত্মতা গড়ে উঠুক, এ ব্যাপারে শাহজাদা খুবই আগ্রহী। একবার তো তিনি বলেই ফেললেন—"দিলওয়ার আলী সাহেবের সাথে আলাপটা না হয় আমিই করি—"।

ঃ ভাইজান!

ঃ তবে জোর করে কোন কিছু করার তিনিও পক্ষপাতী নন। তোমার স্বতস্ফূর্ত সমর্থনে কাজটা সুসম্পন্ন হলে তিনি খুবই খুশী হবেন, এই আর কি!

কথা না বলে দিলওয়ার আলী আর পারলেন না। তিনি অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু শাহজাদা বাহাদুরের এ ধারণা কি ঠিক?

দিলীর আলী বললেন—কোন্ ধারণা?

ঃ শাহরিয়ার খান সাহেবের সাথে আমাদের আত্মীয়তা হলেই যে তিনি আমাদের লোক হয়ে যাবেন, মানে শাহজাদার জন্যে তিনি জান-প্রাণ করবেন, এটা কি ঠিক?

মীর দিলীর আলী প্রত্যয়ের সাথে বললেন—কেন নয়? এমনিতেই তো শাহজাদার প্রতি তিনি খুবই অনুরক্ত। এর উপর এই সম্পর্কটা হয়ে গেলে এই শক্তিটাকে নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের পক্ষে পাই। শাহজাদা বাহাদুরের মসনদে আসার ব্যাপারটাতো এখনও নিরাপদ বা নির্বিঘ্ন কিছু নয়?

ঃ ভাইজান!

ঃ যদিও ন্যায়ত ধর্মত এই শাহজাদারই এই মসনদ প্রাপ্য আর আমাদের হুকুমাত ও কওমের স্বার্থে এই শাহজাদাই বর্তমানে আমাদের কাম্যব্যক্তি, তবু অশুভ চক্রান্তের কাছে ন্যায় ধর্মের কি মূল্য আছে কিছু? শক্তি পেছনে না থাকলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কি নির্বিঘ্নে হতে দেবে অশুভের সেবকেরা!

ঃ সেতো ঠিকই। কিন্তু আমি বলছিলাম হাজী আহম্মদ সাহেবের কথা। যে হাজী আহম্মদ সাহেবেরা শাহজাদার মসনদে আসার বিরোধিতা আগে থেকেই করে আসছেন, এই শাহরিয়ার সাহেব তো সেই হাজী আহম্মদ সাহেবেরই বেশ কিছুটা নিকট আত্মীয়।



www.amarboi.org

ঃ তাতে কি হয়েছে ? বেশ কিছুটা কেন ? একেবারেই নিকট আত্মীয় যাঁরা তাদেরও তো অনেকেই শাহজাদার দাবীটাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এঁদের কারো কারো সাথে আবার আত্মীয়তাও আছে শাহজাদা সরফরাজ খান বাহাদুরের। একজন তো তাঁর জামাইও।

দিলওয়ার আলী ইতস্তত করে বললেন—এঁদের সেই আন্তরিকতা কতখানি মজবুত তা যখন সঠিকভাবে জানিনে, এ নিয়ে কোন মন্তব্য করবো না। কিন্তু এ লোকের আন্তরিকতাটা তো আমার কাছে সফেদ বলে মনে হয় না।

মীর দিলীর আলী সংযত লোক। স্বল্পভাষী ও গম্ভীর মানুষ। কিন্তু একথায় তিনি অতি সহজেই হেসে ফেললেন। হাসিমুখে বললেন—না-না, এ তোমার ভুল ধারণা। ঐ চত্বরের অনেকের সীমাহীন গাদ্দারী দেখে দেখেই এই ধারণা পয়দা হয়েছে দীলে তোমার। আসলে, কোন মানুষ সম্বন্ধে এক নজরেই কোন কায়েমী ধারণা গড়ে নেয়া ঠিক নয়।

ঃ ভাইজান !

ঃ তাছাড়া ফাঁক যদি কিছু থেকেও থাকে, আমাদের আত্মীয় হয়ে গেলে, আমাদের সংস্পর্শেই সে ফাঁকটা ইনশাআল্লাহ্ পূরণ হয়ে যাবে।

ঃ কিন্তু—

ঃ আহ্হা ! এত ভাবছো কেন ? হুট্ করেই তো কোন আত্মীয়তা করে বসছিনে আমরা ? তসবীরটা নিয়ে যাও। দেখো। খোঁজ-খবর নাও। মেয়েটার চেহারাটাতো খুব উম্‌দাই। বড় ধরনের কোন অন্তরায় না থাকলে, তোমারও তো না-পছন্দ হওয়ার কোন কারণ দেখিনে।

কথা আর না বাড়িয়ে মীর দিলীর আলী তাঁর ভাই দিলওয়ার আলীকে অতপর হাসিমুখে বিদায় করে দিলেন। মত-অমত কোনকিছুই ব্যক্ত করতে না পেরে দিলওয়ার আলী যখন বিভ্রান্ত অবস্থায় পথে এসে নামলেন, তাঁর দীলে তখন কেবলই পাক খেয়ে ফিরতে লাগলো মাহমুদা খাতুনের মুখচ্ছবি !

যোগাযোগের পরিহাস ! মকানে ফিরে এসেই দিলওয়ার আলী সবিস্ময়ে দেখলেন, কিতাবউদ্দীন তাঁর মকানে বসে। মাহমুদা খাতুনের লেফাফাবদ্ধ খত হাতে এসে সে খোশদীলে দিলওয়ার আলীর এন্তেজারে আছে। লেফাফা খুলে তৎক্ষণাৎ খতটা বের করলেন দিলওয়ার আলী। সংক্ষিপ্ত চিঠি মাহমুদা খাতুন লিখেছে ঃ

*সালার সাহেব,*

*আপনার কেরামতি শাবাস্ ! অনিশ্চিয়তার অন্ধকারে আর আমাকে অধিককাল ফেলে রাখতে পারলেন না। আমাদের মকানের যা হাওয়া এখন, তা আমার আপনার সম্পর্কে ভজন সিংয়ের ধারণাটাই বলবত করার হাওয়া। সাদামাটা নয়, হাওয়াটা খুবই উত্তপ্ত। কাজেই, এবার বেরিয়ে আসবে থলের বিড়াল আপনার। কি আছে আপনার থলেতে, আর কিসের জাল বুনছি আমি সেই থেকে, এইটেই দেখার জন্যে এখন দম বন্ধ করে বসে আছি আমি। সাহস থাকলে, সত্বর একবার আসুন।*

*মাহমুদা খাতুন*



www.amarboi.org

পরপর বার দুয়েক পত্রখানা পাঠ করে দিলওয়ার আলী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর কিতাবউদ্দীনকে বিদায় করে দিয়ে তিনি ঘরে গিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর একহাতে সাবিহা খানমের তসবীর অন্য হাতে মাহমুদা খাতুনের খত। একদিকে সাবিহা খানম, অন্যদিকে মাহমুদা খাতুন। মাঝখানে দিলওয়ার আলী। সাবিহা খানমের তসবীরটা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। খুব একটা বাড়িয়ে বলেননি তাঁর বড় ভাই মীর দিলীর আলী। চেহারা তার খাশাই বলা যায়। যদিও মাহমুদা খাতুনের পাশে সাবিহা খানম দীপের পাশে জোনাকী, তবু সাবিহা খানমের চেহারাটা একেবারেই উপেক্ষা করার চেহারা নয়। মাহমুদা পাশে না থাকলে, সাবিহাই শাহজাদী।

দিলওয়ার আলীর হাসি পেলো। সাবিহা যদি সত্যি সত্যিও শাহজাদী হতো, তাতেই বা কি এসে যেতো ? মাহমুদা খাতুনের চেয়ে শতগুণে সুন্দরী কেউ মাঝে এসে দাঁড়ালেও, সেই সুন্দরীর ঠাঁই কোথায় দিলওয়ার আলীর কাছে ? অস্তিত্বই বা দিলওয়ার আলীর কোথায় সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য মূল্যায়নে ? দিলওয়ার আলীর দিল মাহমুদা খাতুনের দীলের সাথে ইতিমধ্যেই মিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে, দু'টোকে আর ফারাগ করার উপায় নেই। ফারাগ করে নিলেও আর সনাক্ত করার উপায় নেই। তিস্‌রাজনের আমন্ত্রণ আর গ্রহণ করবে কে, তা সে তিস্‌রাজন যত রূপসীই হোক !

ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেবের মকানে সত্যি সত্যিই এখন একটা খোশ প্রবাহ বইছে। অন্তত মাহমুদা খাতুনের যারপর নেই খুশী হওয়ার মতো উপযুক্ত গুঞ্জরণই শুরু হয়েছে সেখানে। মাহমুদা খাতুনের আম্মা আজিজুন নেছা বেগমই প্রসঙ্গটির সূত্রপাত করলেন। কথায় কথায় একদিন আবিদ হোসেন সাহেবকে তিনি বললেন— চিন্তা-ভাবনা আদৌ কি কিছু করছেন চাচাজান, না হা'লটা একদম ছেড়ে দিয়েই বসে আছেন ?

তাঁকে অনুধাবন করতে না পেরে আবিদ হোসেন সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন— চিন্তা-ভাবনা মানে ?

আজিজুন নেছা বললেন— আমি মাহমুদা খাতুনের কথা বলছি। বয়সটা তো কম হলো না মেয়ের ? এখনও যদি সবাই আপনারা নীরব হয়ে থাকেন, তাহলে আর চলবে কেন ?

খেয়াল হতেই আবিদ হোসেন সাহেব বললেন— ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে-তা বটে !

ঃ আব্বাজান তো আছেন তাঁর ইমামতী আর জালসা জামাত নিয়ে। তাঁর তরফ থেকে কোন কিছু আশা করার নেই। আপনারাও যদি এভাবে নীরব হয়ে বসে থাকেন—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন— না-না, তা থাকবো কেন ? অবশ্যই তা থাকবো না। বলো, কি করতে বলছো তুমি ?

ঃ বলছি, একটু নড়াচড়া করুন। আপনি আছেন, আফসারউদ্দীন আছে, এখন থেকেই আপনারা একটু তৎপরতা শুরু করুন। এঁর-ওঁর কাছে কথাটা একটু না



www.amarboi.org

তুললে, লোকে জানবেই বা কি করে আর মেয়ের আমার শাদির পয়গাম আসবেই বা কোত্থেকে ?

ঃ তা ঠিক–তা ঠিক। তবে কথা হলো, এ নিয়ে এত ব্যস্ত হবার কি আছে ? মাহমুদা খাতুনের শাদির পয়গাম জানান দিয়ে আনতে হবে না। একটু 'হা' করলেই হাজার জন হন্যে হয়ে ছুটে আসবে।

ঃ সেই 'হা'টাই তো করবেন আপনারা ! এতটা বয়স হলো মেয়ের, তবু পছন্দ মতো একটা পয়গামও এ পর্যন্ত এলো না !

আবিদ হোসেন সাহেব জোর দিয়ে বললেন—আসবে না মানে ? আফসার-উদ্দীনকে বললে, অমন দশটা পয়গাম একদিনেই সে এনে হাজির করে দিতে পারে। কত জায়গায় তার যাতায়াত আর কতজনের সাথে তার চেনাজানা !

ঃ আফসারউদ্দীনকে তাহলে সে কথা বলুন আর নিজেও আপনি হাত-পা একটু নাড়ুন !

ঃ আর বলতে হবে না। নিজে তো আমি নাড়বোই, এর উপর আফসারউদ্দীনকে এখনই ডেকে বলছি। সে আজই মাদ্রাসায় গিয়ে তার সহকর্মীদের সাথে এ নিয়ে আলাপ-সালাপ শুরু করুক। একটু তাদের বললে, তার সহকর্মীরাই চারদিক থেকে পয়গাম এনে হাজির করবে। পয়গাম আসবে না মানে ?

ঃ সেরেফ পয়গাম এলেই তো হবে না চাচা ? মাহমুদা খাতুনের সাথে ঠিক ঠিক মানায় এমন পাত্র চাই আমার। ঘরটাও ফের একেবারে মামুলী হলে চলবে না।

ঃ আরে না–না, মামুলী হবে কেন ? আমরা তো আছিই, সেই সাথে তাহলে ঐ সালার ভাইকেও লাগিয়ে দেই। ও একটু হাত লাগালে ঐ শাহী এলাকা থেকেও অনেক খাশা পয়গাম চলে আসবে।

ঃ সালার মানে ? দিলওয়ার আলী ?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, বড় চৌকষ ছেলে। যেমনই জ্ঞান-বুদ্ধি, তেমনই তার প্রতিপত্তি। ওকে বললে সে একাই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী করতে পারবে।

ঃ চাচাজান !

ঃ এমন ছেলে হয় না। আগাগোড়াই ইস্পাতে তৈরী। ওদিকে আবার 'হাঁ' ছাড়া 'না' কথা মুখে নেই। পরোপকারে সে বাঘের মুখেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আজিজুন নেছা বেগম উদাস কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তা সে পারে !

আরো উৎসাহিত হয়ে উঠে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—যেমনই মহৎ, কাজেও তেমনি একনিষ্ঠ। তাকে একবার বললে আর কাউকেই কিছু ভাবতে হবে না। এছাড়া রুচিও তার চমৎকার, কর্তব্যজ্ঞানও টনটনে। ব্যস্, আর কি চাই ? এমন বর সে খুঁজে বের করে আনবে যে, দেখে সবার চমক লেগে যাবে।

ঃ চাচাজান !

ঃ ঘর দেখলেও লোকে বলবে 'বাহবা', বর দেখলেও লোকে বলবে তোফা'। বরের চেহারার দিকে নজর দিয়ে নজর আর কেউ ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

ঃ বরের চেহারা ?



www.amarboi.org

ঃ তার আগে ঐ সালারটার চেহারাই দেখো না। বিলকুল আসমানী নওজোয়ান। শিল্পীর হৃদয় ঢেলে খোদাই করা চেহারা। যার নিজের চেহারা এমন, সে কি কখনো কোন কম্‌তি চেহারার বরের পয়গাম আনতে পারে? কমছে কম, তার নিজের চেহারার কাছাকাছি তো হবেই।

আজিজুন নেছা বেগম পূর্ববৎ উদাস কণ্ঠে বললেন — কাছাকাছি?

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — হ্যাঁ কাছাকাছি। তার চেহারার সমকক্ষ ছেলে তো তেমন একটা দেখিনে। আর না হোক, ঐ কাছাকাছি চেহারার বর না হলে দিলওয়ার আলী সে পয়গামই আনবে না।

ঃ কাছাকাছি কেন চাচা? ওর সমান সমান হয় না? নিজের মেয়ে বলেই বলছিনে, সবাই তো আপনারা দেখছেন? আমার মাহমুদার যা খুব সুরাত তাতে ঐ দিলওয়ার আলীর চেহারার মতো চেহারা হলে, তবেই একটা মন ভোলানো জুটি হয়। কাছাকাছিতে যাবো কেন আমরা?

ঃ আরে, পেলে কি আর কম করবে সে? জরুর সে খুঁজে পেতে ঐ রকমই আনবে।

আজিজুন নেছা বেগম নিজের খেয়ালেই বলে ফেললেন — তা খোঁজাখুঁজির গরজ কি? সে নিজে শাদি করলেই তো আর খোঁজাখুঁজিতে যেতে হয় না?

আবিদ হোসেন সাহেব সচকিত হয়ে উঠে বললেন — আম্মাজান!

আজিজুন নেছা ঐভাবেই বললেন — সে আমাদের হাতে থাকতে, এত ভাবতে যাচ্ছি কেন আমরা? সে নিজেই শাদি করুক।

লাফিয়ে উঠলেন আবিদ হোসেন সাহেব। খুশীতে আত্মহারা হয়ে তিনি বললেন — কেয়া খোশ্‌-কেয়া খোশ্‌! ওহ্‌! তাইতো! এদিকটা খেয়াল করেই দেখিনি। তা তুমি রাজী আছো আম্মাজান? দিলওয়ার আলীকে জামাই বলে মেনে নিতে তুমি রাজী আছো?

ঃ সেকি! আমি গররাজী হবো কেন? খোশদীলে যাকে আমি বেটা করে নিলাম, তাকে জামাই করে নিতে আমার আপত্তি থাকবে কেন? বরং সে এতে রাজী হলে আমি তো হাতে বিলকুল আসমান পেয়ে যাই।

ঃ মারহাবা-মারহাবা! ওহ্‌! বড় জব্বোর কথা খেয়াল করেছো তুমি আম্মাজান। এদের দু'জনকে যা মানাবে, তা কল্পনা করা যায় না।

ঃ সেই কথাই তো বলছি।

ঃ কি তাজ্জব! তাইতো লোকে বলে, আলোর নীচেই অন্ধকার। দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছি আর নিজের হাতের দিকে তাকাচ্ছিনে। তোফা-তোফা!

ঃ চাচাজান!

ঃ আর দুস্‌রা কোন বাত্‌ নেই। গোটা দুনিয়া আমার বিপক্ষে দাঁড়ালেও এ জুটি আমি হাতছাড়া করবো না। দু'জনকে এক করে দিয়ে সবাইকে আমি বলবো, দেখো-দেখো, জুটি কাকে বলে আর মনির সাথে কাঞ্চন যোগ কেমন করে হয়, সবাই একবার নয়নভরে দেখো!

আবিদ হোসেন সাহেব খুশীতে দুলতে লাগলেন। আজিজুন নেছা বেগম যোগ



www.amarboi.org

দিয়ে বললেন—সেরেফ কাঞ্চন যোগই নয় চাচাজান, একজন নামকরা সালার তো বটেই, তার উপর ঘরটাও ফাল্‌তু নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই কথা ধরে আবিদ হোসেন সাহেব্ বললেন—খানদান-খানদান। নামকরা মীর বংশের ছেলে। ওর বড় ভাই মীর দিলীর আলী তো শুনি খোদ শাহজাদা সরফরাজ খান সাহেবের পরম দোস্ত, গলায় গলায় পিরীত। এক কথায়, ঘর বর যেদিক দিয়েই দেখো, প্রায় শাহানশাহী কারবার।

ঃ জ্বি-জ্বি। তাইতো আমি বলছি।

ঃ শুকরিয়া আদায় করো আম্মাজান। এমন এক দুর্লভ সম্ভাবনা যে আপ্‌ছে আপ্‌ হাতের মধ্যে এসে আছে, এর জন্যে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করো।

ঃ চাচাজান !

ঃ সেই সাথে তোমাকেও আমি বাহবা না দিয়ে পারছিনে আম্মাজান। সেরেফ একজন সুহৃদ, মানে আর একটা নাতী পাওয়ার আনন্দেই আমি বুঁদ হয়ে আছি। একে যে নাতজামাইও করে নেয়া যায় আর সেইটেই যে সবচেয়ে উম্‌দা কাজ হয়, একথাটা ভুলেও আমি ভাবিনি। তুমি হঠাৎ কি করে এটা ভাবলে ?

ঃ না চাচাজান, হঠাৎ করেই তো ভাবিনি। এটা ভেবেছি আমি ছেলেটাকে পয়লা যখন দেখি, সেইদিন থেকেই। ফৌজীপুরেই এমন একটা খেয়াল আমার মনে জাগে। এরপর এখানে সে আবার যখন এলো, এ উম্মিদটা দীলে আমার জোরদার হয়ে উঠলো আরো। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ এতবেশী লোভ করতে পারিনি। এক কথায় যাকে আর একটা বেটা হিসেবে পেলাম, তাকে আবার জামাই হিসেবেও পেতে চাইবো, এতটা লোভ করতে সাহস পাইনি চাচাজান। কিন্তু এখন দেখছি, অনর্থক এক দ্বিধাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে এমন একটা খোশ্‌-কিস্‌মতি উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

ঃ কখ্‌খনো না-কখ্‌খনো না। এটা আমরা কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারিনে।

ঃ জ্বি-জ্বি। দিলওয়ার আলী রাজী থাকলে, এই সম্পর্কটাই গড়ে তুলুন। অন্যদিকে হাতড়িয়ে আর কাজ নেই।

ঃ না-না, আর কি হাত্‌ড়াতে যাই ? আল্লাহ চাহে তো অচিরেই এই সম্পর্ক কায়েমী করে ফেলবো আমি।

আজিজুন নেছা বেগম তৃপ্তির আমেজে বললেন—আমিন ! এখন দিলওয়ার আলী আগ্রহী থাকলে হয়। আবিদ হোসেন সাহেব দৃঢ় বিশ্বাসে বললেন—আগ্রহী থাকবে না মানে ? মাহমুদার মতো এমন মেয়ে মাথা কুটলেও পাবে সে আর কোথাও? এছাড়া, দু'জনের মধ্যে মিলটাও তো কম দেখিনে ? এতদিন ও নিয়ে ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে, একটা দুর্বলতাই জরুর পয়দা হয়েছে ওদের মধ্যে।

ঃ হলেই ভাল। আপনি এখন এ নিয়ে আফসারউদ্দীনের সাথে আলাপটা সেরে নিন। বলা যায় না, তার আবার কোন আপত্তি থাকতে পারে তো ?

ঃ আরে না, তা থাকবে কেন ? এমন একটা সুসম্পর্কের ব্যাপারে কি তার কোন আপত্তি থাকতে পারে ? দাঁড়াও তাকে এখানেই ডেকে নিচ্ছি—



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব তখনই আফসারউদ্দীনকে সেখানে ডেকে নিলেন এবং বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করে তাঁর মতামত চাইলেন। শুনে আফসারউদ্দীন সাহেবও খুব খুশী হলেন। তিনি আগ্রহভরে বললেন — সেকি! আমার আপত্তি থাকবে মানে? এমন চিন্তা কি আমার মনেও আসেনি? আমিও তো এ নিয়ে অনেকবারই ভেবেছি।

আজিজুন নেছা বেগম খুশী হয়ে বললেন— ওমা তাই নাকি? কই, এমন কথা তো আকারে-ইংগিতেও আমাকে তুমি বলোনি?

আফসারউদ্দীন ক্ষোভের সাথে বললেন— কি করে বলবো? আপনার মেয়েকে কি আমি চিনিনে? হাজারটা তার খেয়াল। তার মতি-গতির তাল পায় সাধ্য কার? তার মনোভাবটা ভাল করে বুঝে উঠার আগেই এমন কথা তুলে কি একটা ফ্যাসাদ পয়দা করবো?

ঃ ফ্যাসাদ!

ঃ একথা শুনেই সে যদি সরবে বেঁকে বসে আর সে কথা যদি কোনভাবে দিলওয়ার আলী সাহেবের কানে যায়, তাহলে অবস্থাটা চিন্তা করুন? তাঁর সাথে আমাদের এই বিদ্যমান সৌহার্দের মধ্যে একটা ফাটল ধরে যাবে না?

আবিদ হোসেন সাহেব মৃদু আপত্তি তুলে বললেন— না হে, এতটা মনে হয় না আমার। দিলওয়ার আলীকে মাহমুদা কখনো অপছন্দ করবে না।

ঃ না করলেই ভাল। সেটা আগে সুকৌশলে জেনে নিন।

ঃ সুকৌশলে!

ঃ আপনি তার নানাজান। ঠাট্টাচ্ছলে একদিন একটু টোকা দিয়ে দেখুন নাকি আওয়াজ আসে সেখান থেকে?

ঃ ঠিক-ঠিক। তা আমি দেখবো। কিন্তু দিলওয়ার আলী সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সেকি মাহমুদাকে অপছন্দ করতে পারে?

ঃ স্বাভাবিকভাবে করার কথা নয়। তবু মানুষেরই তো মন! বড় রকমের অন্তরায় কিছু থাকলে, অপছন্দ না করুন, শাদি করতে আপত্তি তো করবেনই।

ঃ তাহলে?

ঃ তাঁকেও ঐভাবে বাজিয়ে একটু দেখুন। কথাটা পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়ার আগে উভয়ের মনোভাবটা আঁচ করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঃ বিলকুল-বিলকুল। তাহলে দু' একদিনের মধ্যেই দিলওয়ার আলীকে ডেকে পাঠাই, না কি বলো?

আফসারউদ্দীন সাহেব আপত্তি তুলে বললেন — না-না, এত তাড়াহুড়া করবেন না। ওদিকে এখন এক মস্তবড় অস্থিরতা বিরাজ করছে। শাহজাদা তকী খানের মৃত্যুতে শুধু শোক-তাপই নয়, যতদূর অনুমান করি, একটা রাজনৈতিক অস্বস্তিও বিরাজ করার কথা। এ অবস্থায় এখন তাঁকে না ডাকাই ভাল। উনি যখন আপন ইচ্ছেয় আসবেন, তখনই আলাপটা করে দেখবেন। তবে সাবধান, আগেই যেন হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবেন না। আপনি আবার যে ভাবপ্রবণ মানুষ।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব সহাস্যে বললেন—আরে না-না, আমি জাতে মাতাল, কিন্তু তালে ঠিক।

উভয়েই হাসতে লাগলেন। আজ্জিজুন নেছা বেগম সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপনভাবে বললেন—তাহলে তাই করুন চাচাজান। আগে ছেলেটার সাথেই কথা বলে দেখুন। সে রাজী থাকলে আর কোন সমস্যা নেই। মাহমুদাকে নিয়ে আমি বেশী ভাবিনে।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—তাই?

আজ্জিজুন নেছা বললেন—আমি সেরেফ তার আম্মাই নই চাচাজান, আমিও একজন আউরাত। মাহমুদা খাতুনের ভেতরে অন্য কোন জটিলতা থাকলে আমার চোখ এড়াতো না। ফালতু কিছু ওজর-আপত্তি সে যদি তোলেই, আমরা তা গায়ে মাখতে যাবো কেন? শাদি হতে কি হবে না তার? সে অবস্থায় আমি তাকে চুল ধরেই রাজী করিয়ে ছাড়বো। সে ছেলে মানুষী করবেই বা কেন, আর তার অর্থহীন ছেলেমানুষী আমরা মেনেই বা নেবো কেন?

ঃ আম্মাজান!

ঃ তার সাথেও আলাপ করে দেখতে পারেন আপনি। বড় কোন গলদ যদি বেরিয়েই পড়ে, তাহলে আর দিলওয়ার আলীর সাথে কথা বলে কাজ নেই। তা না হলে, আমার কথা ঐ এক কথা। তার কোন ফালতু আপত্তি কিছুতেই আমি মানবো না। শুভ কাজটি অতি সত্বর সম্পন্ন করে ফেলবো।

যে কক্ষে বসে তাঁরা এসব আলাপ করলেন, তার পাশের কক্ষে দাঁড়িয়ে মাহমুদা খাতুন এই আলাপের আদ্য-অন্ত তামাম কথা শুনলো। আলাপ যখন শেষ হলো, সে তখন আবেগে ও খুশীতে আওয়ারা।

আনন্দের আধিক্য সে সামাল দিতে পারলো না। তখনই সে বসে ঐ সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা লিখে ফেললো এবং চিঠি সহ কিতাবউদ্দীনকে দিলওয়ার আলীর বাসভবনে পাঠিয়ে দিলো। তর সইছে না মাহমুদার। এঁদের এই আগ্রহটা তপ্ত থাকতে থাকতেই তার জিন্দেগীর ঐ পরমতম উম্মিদের একটা সুরাহা হয়ে যাক, এই বাসনাই মাহমুদা খাতুনের দীলে তখন উদগ্র।

মাহমুদা খাতুনের খত পাওয়ার পর দিলওয়ার আলী ইচ্ছে করেই কয়েকটা দিন গড়িমসি করলেন। অতপর একদিন সাহস করেই তিনি মাহমুদা খাতুনের আহ্বানে সাড়া দিতে বেরুলেন। মাঝখানে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেতেন তিনি এর মধ্যেই। কিন্তু মাহমুদা খাতুনের খতটা এসেই একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ খত তাঁর দুই পায়ে সংকোচের বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। মাহমুদা খাতুনের ইংগিতটা সুস্পষ্ট। তার বক্তব্যের কোন কথাই দিলওয়ার আলীর না বোঝার বিষয় নয়। এ কারণে ইমাম সাহেবের মকানের দিকে যাওয়ার কথা ভাবতেই শরমে তাঁর দুই পা ভারী হয়ে উঠেছে। তাঁদের দুইজনকে ঘিরে ইমাম সাহেবের মকানে যেসব আলাপ হচ্ছে বা হয়েছে, তা আন্দাজ করতে অন্তর তার যত উৎফুল্লই হোক,



www.amarboi.org

তাঁর ভেতরের স্বাচ্ছন্দভাব উধাও হয়ে গেছে। এক অদৃশ্য জড়তা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরছে তাঁকে।

এমনই এক অবস্থা নিয়ে দিলওয়ার আলী বেরুলেন এবং সংকোচ ও শরমের বেড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে ইমাম সাহেবের ফটকে এসে হাজির হলেন।

ফটক ভেজিয়ে দেয়াছিল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল ফটক। দিলওয়ার আলীর ভেতরে ঢুকে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। ঢনঢন করছে ইমাম বাড়ীর প্রশস্ত বাহির আঙ্গিনা। অন্যদিন চাকর-নফরদের কেউ না কেউ হেথা হোথা থাকেই। আজ তাদের কাউকে দেখা গেল না। ব্যাপারটা গায়ে না মেখে দিলওয়ার আলী এগুলেন। কিন্তু দহলীজ পেরিয়ে মূল দালানের কাছাকাছি এসেও তিনি কারো কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। তিনি খেয়াল করে দেখলেন, যে কিতাবউদ্দীনের চোখ সবসময়ই সবদিকে থাকে, তারও আজ পাত্তা নেই। আরো যা তাজ্জব হয়ে খেয়াল করলেন তিনি তাহলো, তামাম কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ। অন্তত কোন কক্ষের এই বাইরের দিকের দরজা-জানালা একটাও খোলা নেই। অন্দর মহলে যাতায়াতের পথেও কপাট লাগিয়ে দেয়া।

দিলওয়ার আলী থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সামনেই মূল দালানের একটানা সেই লম্বা বারান্দা। আট দশ গজ ব্যবধান। বিস্ময়ের তাঁর অবধি রইলো না। তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে খেয়াল করলেন, অন্দর মহলে জেনানা কিছু আছে। তাদের অনুচ্চ কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে কেউ নেই। থাকলেও, কাছে কোলে কেউ নেই। কি করবেন ভাবতে লাগলেন। পলক কয়েক কাটতেই বাগানের মালীটা দহলীজের পেছন থেকে লাঠি হাতে ছুটে এলো। দূরে থেকেই সে আওয়াজ দিলো— কে? কে ওখানে?

দিলওয়ার আলী ঘুরে দাঁড়াতেই সে কাছে এসে সালাম দিয়ে বললো— একি! হুজুর আপনি?

সালামের জবাব দিয়ে দিলওয়ার আলী বললেন— কি ব্যাপার! কাউকে দেখছি না যে? কোথায় ছিলে তুমি?

মালীটা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো— ঐতো হুজুর, দহলীজের ঐ পেছনে একটু গিয়েছিলাম। নিমেষ কয়েকও হয়নি।

ঃ আর সবাই কোথায়? মানে বাইরের আর লোকেরা?

ঃ ঐ দিকেই হুজুর। সবাই ঐদিকে। দহলীজের পেছন দিকে প্রাচীরের একদম ঐ কোণে অনেক আগাছা জন্মেছে। একটা সাপ বেরিয়েছিল। সাপটা মেরে সবাই এখন ওখানের ঐ আগাছা সাফ করছে।

বন্ধ দরজা-জানালার দিকে ইংগিত করে দিলওয়ার আলী প্রশ্ন করলেন— আর ইনারা? সব বন্ধ দেখি যে?

ঃ কেউ নেই তো। হুজুরাইন-হুজেরেরা সবাই বাইরে গেছেন।

ঃ বাইরে গেছেন! বাইরে কোথায়?

ঃ এই মহল্লাতেই হুজুর। আমাদের এই মকানের কয়েকটা মকান পরেই। ওঁদের মেয়ের আজ শাদিতো! নাছোড়া বান্দা দাওয়াত। তাই সবাই দাওয়াতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী চুপ্‌সে গেলেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন—তাই নাকি ? দাওয়াতে গেছেন ?

ঃ জ্বি হুজুর।

ঃ কিতাবউদ্দীন ? কিতাবউদ্দীন কোথায় ?

ঃ সেও হুজুরদের সাথে গেছে।

ঃ ও-আচ্ছা !

ঃ সেরেফ কয়েকজন ঝি-চাকরাণীই এখন অন্দর মহলে আছে হুজুর।

ঃ আর কেউ নেই ?

ঃ আপামনিও আছেন, তবে তাঁর থাকাটা না থাকারই সামিল।

দিলওয়ার আলী সবিস্ময়ে বললেন—তার মানে ?

ঃ তিনি অসুস্থ। তাঁর ভয়ানক মাথা ধরেছে। ঐ শাদির বাড়ীর লোকেরা অনেক সাধাসাধি করেও তাঁকে নিয়ে যেতে পারেননি।

ঃ বলো কি !

ঃ সেই থেকেই তিনি ঘরের ভেতরে শুয়ে আছেন। এক লহমার জন্যেও বাইরে বেরিয়ে আসেননি।

ঃ তাই ? খুব দুঃখের কথা তো !

দিলওয়ার আলী ভাবতে লাগলেন। ওয়াপস্‌ যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর দেখলেন না। মালী তাঁকে প্রশ্ন করলো—কি করবেন হুজুর ? বসবেন ? বসলে ঐ দহলীজে গিয়ে বসতে হবে। এদিকের তো কোন কামরা খোলা নেই।

দিলওয়ার আলী ভগ্ন কণ্ঠে বললেন—না, বসে আর কি করবো ? কেউ যখন নেই—

ঃ জ্বি হুজুর। ফিরবেনও অনেক পরে। সেই রাতের বেলা। তবু যদি অপেক্ষা করতে চান, আসুন হুজুর, দহলীজে এসে বসুন—

দিলওয়ার আলী শক্ত হলেন। মনস্থির করে বললেন-না, আজ তাহলে চলি। পরে আর একদিন আসবো—

তিনি রওনা হতে গেলেন। তাঁর মাথার উপর থেকে তখনই আওয়াজ এলো—দাঁড়ান !

চমকে উঠে দিলওয়ার আলী উপর দিকে চোখ তুললেন। দেখলেন, তাঁর একদম সামনেই দ্বিতল কক্ষের বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদা খাতুন। আল্‌তোভাবে মুখে একটা নেকাব আঁটা থাকলেও, তার দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করছে খুশীর আভাস।

দিলওয়ার আলী বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—আরে আপনি !

মাহমুদা খাতুন বললো—আসুন, দুয়ার খুলে দিচ্ছি।

দিলওয়ার আলী থতমত করে বললেন—এ্যাঁ ! তা-মানে—

মাহমুদা খাতুন হাসিমুখে বললো—মানে খুঁজে কাজ নেই। আপনি ঐ কামরার দিকে যান, আমি এক্ষুণি নেমে আসছি—



www.amarboi.org

নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে ইংগিত করেই মাহমুদা খাতুন দ্রুতপদে বারান্দা থেকে সরে গেল। হতবুদ্ধি অবস্থায় লহমাখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর দিলওয়ার আলী ধীরে ধীরে যে কামরায় তিনি বরাবর এসে উঠেন, সেই কামরার দিকে এগুলেন।

একটু পরেই খুলে গেল দুয়ার। দিলওয়ার আলী দুয়ারের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। দুয়ার খুলে দিয়ে দিলওয়ার আলীর খোঁজে মাহমুদা খাতুন ঝোঁকের মাথায় বাইরে ছুটে আসতেই সে একদম দিলওয়ার আলীর মুখোমুখী হয়ে গেল। একদম সামনাসামনি। দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব হাতখানেকের বেশী নয়।

সম্বিতহীন অবস্থায় নিমেষ খানেক উভয়ে ঐভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্বিত ফিরে পেতেই ঠোঁটটিপে হেসে মাহমুদা খাতুন কিঞ্চিৎ পিছিয়ে এলো এবং মুখের নেকাব ঠিক করতে করতে সলজ্জ কণ্ঠে বললো—আসুন—

দিলওয়ার আলীর ধারণা ছিল, কোন ঝি-চাকরাণী এসে দুয়ার খুলে দেবে। মাহমুদা খাতুন নিজে এসে দুয়ার খুলে দেয়ায় আর ঐভাবে একদম তাঁর বুকের কাছে আসায়, তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেকে সামলে নিতে পারলেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ঐভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মাহমুদা খাতুন মৃদু তাকিদ দিয়ে বললো—কি হলো, আসুন—

সংশয়াকুল চিত্তে দিলওয়ার আলী বললেন—আসবো?

মাহমুদা খাতুন পুনরায় মুখটিপে হাসলো। বললো—আসবেন না? ঐভাবেই কি দাঁড়িয়ে থাকবেন?

ঃ না, মানে লোকজন কেউ নেই—

ঃ নেই? আমি তাহলে কি? অশরীরী কিছু, না অন্যজীব?

ঃ না বলছি, বাড়ীতে কেউ নেই—

ঃ কে বললে নেই? ভেতরে ঝি-চাকরাণী আছে, বাইরে নওকর-নফর আছে, এখানে আমি আছি, নেই মানে? আসুন—

অগত্যা দিলওয়ার আলী দুয়ার পেরিয়ে কামরাটার অল্প কিছু ভেতরে এলেন। মাহমুদা খাতুন বন্ধ করা জানালাগুলো খুলে দিতে লাগলো। তা দেখে দিলওয়ার আলী আপত্তি তুলে বললেন—থাক-থাক। আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াবো না।

ঃ দাঁড়াবেন কেন? বসবেন। বসুন—

ঃ বসবো? কিন্তু আপনি এ ঘরে থাকলে—

ঃ বসতে পারছেন না?

ঃ জ্বি। ব্যাপারটা হলো, আপনি তো এ ঘরে কখনো আসেন না, তাই—

ঈষৎ আঁড়চোখে চেয়ে মাহমুদা খাতুন হেসে বললো—শরম পাচ্ছেন?

ঃ তা কিছুটা—মানে সেরেফ আপনি আর আমি—

ঃ ফৌজীপুরে থাকতে কিন্তু এত শরম পাননি।

ঃ ফৌজীপুরে!

মেঝের দিকে নজর নামিয়ে মাহমুদা খাতুন মৃদু কণ্ঠে বললো—তখন আপনি আমাকে দিয়ে পানি আনিয়ে নিয়েছেন, আমার হাত থেকে পানি নিয়ে খেয়েছেন, শূন্য



www.amarboi.org

পাত্র আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখনও আপনি-আমি ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না।

খেয়াল হতেই দিলওয়ার আলী আরো একটু সংকুচিত হলেন। শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—না, কথা হলো, সেটা তো আলাদা ব্যাপার। নেহায়েতই দায়ে পড়ে—

ঃ এটাও তাই।

ঃ জি ?

মাহমুদা খাতুন অপেক্ষাকৃত শক্ত কণ্ঠে বললো—এবারও আপনি ইচ্ছে করেই এ অবস্থায় পড়েননি। আমিও দায়ে পড়েই এই কামরায় এসেছি। নিন, বসুন। আমি ঐ ঘরে গিয়ে বসছি। কথা আছে।

মাহমুদা খাতুন পাশের কক্ষে চলে গেল এবং কুরসী টেনে নিয়ে পর্দার আড়ালে বসলো। দিলওয়ার আলী না বসে তখনও ইতস্তত করছিলেন। তা দেখে মাহমুদা খাতুন বিগড়ে গেল। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি ?

ঃ এ্যাঁ !

ঃ বসবেন না তো এলেন কেন ?

ঃ না, আর কেউ নেই কিনা, তাই—

মাহমুদা খাতুন আরো বেশী ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন—আর কেউ কি ডেকে পাঠিয়েছেন আপনাকে, না আমি ডেকে পাঠিয়েছি ?

ঃ জি ?

ঃ খত পাননি আমার ? কিতাবউদ্দীন দেয়নি আপনাকে খত ?

ঃ জি–জি, দিয়েছে।

ঃ ওখানে তো লিখেই দিয়েছি, যদি সাহস না থাকে আসবেন না। এলেন তো এমন করছেন কেন ?

দিলওয়ার আলী বসতে বসতে বললেন—না, মানে—

ঃ শরমের মাথা খেয়ে একা আমাকেই এত কথা বলতে হবে ? আপনার কি কিছুই বলার নেই ? এমন একটা খবর পাওয়ার পরও এতটাই আপনি নির্লিপ্ত ? উঃ ! তাহলে খামাখাই আমি এ কোন্ মরিচিকার পেছনে ছুটছি !

মাহমুদা খাতুনের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হলো। দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন—না–না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি এই পরিস্থিতির কথা। তাছাড়া আপনিও অসুস্থ !

ঃ অসুস্থ !

ঃ আপনার নাকি খুব মাথা ধরেছে ?

ঃ ধরেছেই তো। আমার মতো এত উদ্বিগ্ন যদি আপনিও হতেন, তাহলে এমন মাথা আপনারও ধরতো। কিন্তু আপনার তো কোন মাথা ব্যথাই নেই।

ঃ ঠিক বুঝলাম না।

ঃ আমি আপনাকে খত লিখে ডেকেছি। "এলেন–এলেন" করে কয়েকটা দিন গেল। আপনাকে যে আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারিনে ! তাই ভাবলাম, যে



www.amarboi.org

কোন সময় এসেই পড়বেন আপনি। আমি ওখানে ঐ শাদির দাওয়াতে, মানে বাড়ীর আর সবাই যেখানে গেছেন সেখানে, গেলে কি দেখা হতো আপনার সাথে ? আপনি কি ফিরে চলে যেতেন না ?

ঃ সেকি ! তাহলে—

ঃ মাথা ধরার ভান করেই ঐ দায়টা কাটিয়ে দিয়ে পথ চেয়ে বসে আছি। অনেক কয়দিন চলে গেছে। আজ কালের মধ্যেই আপনি আসবেন, এই বিশ্বাস নিয়েই তো পুড়ে মরছি আমি।

আবার মাহমুদা খাতুনের কণ্ঠস্বর ঘন হলো। দিলওয়ার আলী বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—মাহমুদা খাতুন !

মাহমুদা খাতুন নীরব হয়ে গেল। দিলওয়ার আলী ফের বললেন—সত্যিই আপনার তুলনা হয় না মাহমুদা খাতুন। আপনি অনন্যা। আপনার এই অনুপম আকুলতার সমমর্মিতা কিভাবে আমি জানাবো, সে জবান খুঁজে পাচ্ছিনে। এই মুহূর্তে শুধু এইটুকুই জানাই, আমি সত্যিই বড় ধন্য মাহমুদা !

মাহমুদা খাতুন ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—ধন্য ?

দিলওয়ার আলী বললেন—এছাড়া কি আর এখন বলি ? কি করে আমি বোঝাবো, আপনার দীলটা এত আপন করে পাওয়ার উল্লাস আমি প্রথম থেকেই সম্বরণ করতে পারছিনে। কেমন করে বললে আপনি বুঝবেন, আপনার ঐ খত পাওয়ার পর আনন্দের আধিক্যে আমি বাক হারিয়ে ফেলেছি ?

দিলওয়ার আলী থামলেন। মাহমুদা খাতুন তৃপ্ত হলো। মুহূর্তখানেক নীরব। মৃদু কণ্ঠে চাপ দিয়ে মাহমুদা খাতুন বললো—বলুন—

দিলওয়ার আলী বললেন—আপনি মেয়েছেলে হয়ে যেভাবে নিজেকে আপনি উপস্থাপন করে যাচ্ছেন বরাবর, পুরুষ মানুষ হয়ে আমি আমার নিজেকে তার অর্ধেকটাও আপনার কাছে তুলে ধরতে পারিনি, এটা ঠিক। কিন্তু—

দিলওয়ার আলী আবার একটু থামতেই মাহমুদা খাতুন উৎসুক কণ্ঠে বললো—কিন্তু ? কিন্তু কি বলুন—

দিলওয়ার আলী উত্তাপের সাথে বললেন—আকুলতা আপনার চেয়ে আমার মধ্যেও কম নেই মাহমুদা খাতুন ! উম্মিদে আকিঞ্চনে জাররামাত্র ঘাটতি নেই। বিনিদ্র রজনী আপনার খোয়াব আমিও কম দেখিনে প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই ! ফারাগটা শুধু, সেটা সঠিকভাবে তুলে ধরার যোগ্যতাটা নেই আমার।

মাহমুদা খাতুন আপ্লুত কণ্ঠে বললো—সত্যিই !

ঃ এই যে ঘুরে ঘুরে আসি আমি এখানে, ঝড়-বৃষ্টিও মানিনে, সেটা কি কেবলই লৌকিকতার খাতিরে, কেন এভাবে আসি, সেটা কিছুটা বোঝার কোশেশ করলেও, আমার দীলের খবর অনেকখানি পেতে পারতেন আপনি।

মাহমুদা খাতুন তৃপ্ত কণ্ঠে বললো—কে বললে, সেটা কিছুই বুঝিনে ?

ঃ বুঝলেও গভীরভাবে অনুধাবন করেন না। তা করলে আমার আন্তরিকতার এত অবমূল্যায়ন করতেন না আপনি।



www.amarboi.org

ঃ অবমূল্যায়ন করলাম।

ঃ আপনার চিঠিতেই তা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। আমাকে আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি।

মাহমুদা খাতুন ঈষৎ হেসে বললেন— এই বুঝলেন শেষে?

ঃ কেমন?

ঃ ওটাতো আমার অভিমান। ও থেকে কি সত্যিই অবিশ্বাস করা বুঝায়?

ঃ আমার তো তাই মনে হলো।

মাহমুদা খাতুন আবার আক্রমণ করে বললো— তাই যদি মনে হয়, তাহলে আমিও বলবো, নিতান্তই মনের জোর ছাড়া, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারাটা কি সহজ?

ঃ কি রকম?

ঃ আপনার সাড়াটা বরাবরই যে রকম অস্পষ্ট, তাতে করে কি সহজেই আপনার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে কেউ? এই যে এই খত পাওয়ার পরও এত দেরী করে এলেন, এ জন্যেও তো আপনাকে নিয়ে অনেকখানি ভাবতে হয়েছে আমাকে?

ঃ তাই? কিন্তু কেন দেরী করলাম, এটা ভেবে দেখবেন না?

ঃ তার মানে?

ঃ এখানে কোন্ ধরনের হাওয়া বইছে সেটা আমি প্রত্যক্ষ না করলেও, আপনার চিঠিতে যা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কি সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে আসতে পারি আমি? এতটা নির্লজ্জ হওয়া সবার পক্ষেই কি সম্ভব?

ইতিমধ্যে এক ঝি মাহমুদা খাতুনের কক্ষে এসে বললো— নাস্তা-পানির কি আনযাম করবো আপা?

খেই হারিয়ে মাহমুদা খাতুন বললো— আনযাম!

ঃ এ মকানে এসে এ মেহমান কোনদিনই খালি মুখে যাননি। আজ তা গেলে শেষে কসুর হবে না তো আমাদের?

ঝিয়ের কথা শুনতে পেয়েই দিলওয়ার আলী জোর আপত্তি তুলে বললেন— না-না, ওসবের কোন দরকার নেই। বেশীক্ষণ আমি থাকবো না।

মাহমুদা খাতুন ঝিকে চিন্তিত কণ্ঠে বললো— আচ্ছা, এখন যাও। দরকার হলে পরে আমি জানাবো।

ঝি চলে গেল। মাহমুদা খাতুন দিলওয়ার আলীকে প্রশ্ন করলো— থাকবেন না বেশীক্ষণ?

ঃ আপনিই বিবেচনা করুন, তা কি থাকা যায়? মুরুব্বী কেউ মকানে নেই জেনেও আমি এসে বসে থাকবো, এটা কি খারাপ দেখায় না? ফিরে এসে দেখলে, উনারাই বা কি ভাববেন?

মাহমুদা খাতুন আমতা আমতা করে বললো— তা কথা হলো—

ঃ এর উপর আপনাকে আমাকে নিয়ে যে হাওয়া বইছে এখানে, সে অবস্থায়—



www.amarboi.org

জোর হারিয়ে ফেলে মাহমুদা খাতুন বললো—হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা যাবেন যান। আপনাকে কিন্তু তাহলে শিগ্গিরই আবার আসতে হবে।

ঃ আসতে বললে আসবো। কিন্তু এসে আমাকে কি করতে হবে?

মাহমুদা খাতুন মাথাটা নীচু করলো এবং সলজ্জ কণ্ঠে বললো—মতামত দেবেন।

না বুঝার ভান করে দিলওয়ার আলী বললেন—মতামত।

ঃ আমার ভাবটা ধরে ফেলেছেন আমার মুরুব্বীরা। এবার আপনার মনোভাবটা জানতে পারলেই—

দিলওয়ার আলী রসিকতা করে বললেন—ভজন সিং জিন্দাবাদ!

ঃ মানে?

ঃ ভজন সিং এর ধারণাটাই বলবত করে দেবেন তাঁরা, এইতো?

ঃ আমি জানিনে।

ঃ না জানলেই কি রেহাই আছে? আপনি তখন নির্ঘাত সেপাই দিলওয়ার আলীর বউ!

ঃ যাঃ!

পর্দার আড়ালে থেকেই শরমে দুই হাতে মুখ ঢাকলো মাহমুদা খাতুন। দিলওয়ার আলী বললেন—আচ্ছা, রসিকতা থাক। কাজের কথা বলি, শুনুন। আমার মতামতটা আপনার অভিভাবকদের জানাতে কিছুটা দেরী হবে কিন্তু।

ঃ কেন–কেন?

ঃ একটা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। আমার বড় ভাই একটা ফ্যাসাদ পয়দা করতে যাচ্ছেন। তাঁকে সামলাতে আমার সময় লাগবে।

মাহমুদা খাতুন উৎকণ্ঠার সাথে বললো—সেকি!

দিলওয়ার আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—পরে আপনাকে সব জানাবো। এখন শুধু এইটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত থাকুন যে, দিলওয়ার আলীর জিন্দেগীটা অনেক আগেই মাহমুদা খাতুনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছে। এ বাঁধন খোলার নয়।

মাহমুদা খাতুন কিছু বলার চেষ্টা করতেই তিন চারজন তরুণী কলরব তুলে এসে অন্দর মহলের প্রবেশদ্বারে করাঘাত করতে লাগলো এবং উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো—কৈ মাহমুদা, কি রকম মাথা ধরেছে দেখি? এত করে বলার পরও এক লহমার জন্যেও তুমি যাবে না মানে? আমাদের বহিনের শাদিতে যদি না যাও, তোমার শাদিতে আসবো আমরা কেউ, না আসতে দেবো কাউকে? কই গো, এ মকানের তোমরা কে কোথায় আছো, দুয়ারটা খোলোই না?

এর মধ্যে তাদের একজন বলে উঠলো—ঐযে—ঐযে, ঐ কামরার দুয়ারটা খোলা দেখছি। এসো–এসো, ঐদিক দিয়েই ঢুকি—

কোলাহলটা এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মাহমুদা খাতুন যারপরনেই বিরক্তির সাথে বললো—উঃ! আবার সেই জ্বালাতন!

অবস্থা বুঝে দিলওয়ার আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি তাহলে আসি—

মাহমুদা খাতুন অসহায় কণ্ঠে বললো—কি বলবো, সবই আমার নসীব! আপনি



www.amarboi.org

আসুন, আমিও পালাই। যে রকম বেলেহাজ, এ অবস্থায় ওরা আমাদের দেখলে কেলেংকারী রটাতে কম করবে না কেউ। খোদা হাফেজ—

মাহমুদা খাতুন উঠে অন্দরের দিকে দৌড় দিল। জবাবে দিলওয়ার আলী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আল্লাহ্ হাফেজুন।

## ১০

মাহমুদা খাতুনের মকান থেকে দিলওয়ার আলী চিন্তিত দীলে ফিরে এলেন। তাঁর ভাইকে তিনি কি করে সামলাবেন, এই চিন্তাই এখন তাঁর বড় চিন্তা হলো। ভাই দিলীর আলীর ইচ্ছে, তাঁর শাদিটা ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের মেয়ের সাথেই হোক। শাহজাদা সরফরাজ খান সাহেবেরও এ আগ্রহ জোরদার। অথচ এটি হবার নয়। হতে কখনো পারে না।

দিলওয়ার আলী অনুভব করলেন, তাঁকে মুখ খুলতে হবে। নিজের অপারগতা সরাসরি তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে। বিনয়ে কাজ না হলে, তাঁকে শক্ত হতে হবে এবং শক্ত হয়ে চরম কথা শুনিয়ে দিতে হবে, পরিস্থিতি এতে করে যা হয় তা হোক।

দিলওয়ার আলী আশাবাদী। ভাই তাঁর বিবেচক লোক। শাহজাদাও বিজ্ঞজন। নিজের মনোভাবটা সঠিকভাবে তাঁদের কাছে তুলে ধরতে পারলে, জরুর তাঁরা এ ব্যাপারে জোর খাটাতে যাবেন না। কারো ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির ব্যাপারে কখনোই তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না। সুতরাং দিলওয়ার আলী স্থির করলেন, মানসিক প্রফুল্লতা বুঝে, শান্ত ও মনোরম পরিবেশে তাঁর ভাই ও প্রয়োজনে শাহাজাদার সাথে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কথা বলবেন এ নিয়ে।

কিন্তু সেই অল্পদিন আর অল্পদিনে এলো না। চলমান রাজনৈতিক চাল-চক্করের কারণে শান্ত ও মনোরম পরিবেশ নামক পদার্থটি মুর্শিদাবাদ শাহী অঙ্গনে এখন একান্তই দুর্লভ। অশুভ চক্রান্তের বর্জ্য বাষ্পে এ অঙ্গন তপ্ত থাকে বার মাস। তাপমাত্রা নিয়তই উর্ধমুখী। কদাচিত কখনো নিম্নগামী হলেও, তার স্থিতিকাল এতটাই ক্ষীণ যে, বুক ভরে শ্বাস টানার অবকাশটাও থাকে না। দম ফেলে দম নিতেই বাতাস আবার গরম হয়ে উঠে। জ্বালা ধরে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ায়, হারিয়ে যায় হৃদয়ের সদ্যাগত প্রফুল্লতা। বিশেষ করে, এই অশুভ চক্রান্তের প্রত্যক্ষ শিকার যারা, বসন্তের বাতাস তাদের দীলে কালেভদ্রে বয়। বাদবাঁকী তাবৎ সময় তাদের দীলে বিরাজ করে তপ্ত মরুর লু-হাওয়া।

শাহজাদা সরফরাজ খানের ক্ষণিকের শান্ত হৃদয় কালো মেঘের ঘনঘটায় আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। পয়দা হলো সেখানে উৎকণ্ঠার উর্মী। বিশ্বস্ত সঙ্গী মীর দিলীর আলীর দীলও সেই অশান্তির পরশে বিবর্ণ হয়ে গেল। হারিয়ে গেল মীর দিলীর আলীর



www.amarboi.org

মানসিক প্রশান্তি। দিলওয়ার আলী এ অবস্থায় তাঁর মনোভাব পেশ করার কোন মওকা পেলেন না। তৎক্ষণাৎ তো নয়ই, অল্পদিনের মধ্যেও সে মওকা তাঁর এলো না।

প্রবীণ সেনানায়ক গাউস খান ঠিকই সেদিন বলেছিলেন, "অতপর কোন্ খেলা শুরু হবে কে জানে"। তাঁর কথাই ফললো। শাহজাদা তকী খানের ইন্তেকালের পর নামমাত্র কয়েকটা দিন চক্রান্তের চাকাটা স্থির হয়ে ছিল। এরপরেই পুনরায় ঘুরে উঠলো চাকা এবং শুরু হলো নয়া খেল্। তকী খানকে হারিয়ে প্রশাসনিক পরিষদের সুচতুর সদস্যেরা চাল বদল করলেন। "পাত্র ডাকিস পরে, আগে পাত্রী বাগে আন,"–এই খেল শুরু করলেন। অর্থাৎ মসনদে বসানোর জন্যে লোক খোঁজার আগে তারা মসনদটা বাগে আনার অভিপ্রায়ে মসনদের একমাত্র ওয়ারিশ শাহজাদা সরফরাজ খানের আশা-ভরসা মিস্‌মার করতে ব্রতী হলেন। দাঁওটাও পেয়ে গেলেন টাটকা তাজা। মসনদে উঠা নিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা অদৃশ্য ক্ষত বরাবরই বিদ্যমান ছিল। পিতার স্নেহ ও পুত্রের শ্রদ্ধা ক্ষতটাকে অনেকখানি শুকিয়ে-আঁটিয়ে আনলেও, দাগটা পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে পারেনি। সেই দাগের উপর হাত রাখলেন খেলোয়াররা। নবাব সুজাউদ্দীন খানকে নানা রকম প্ররোচনা দিয়ে এবং শাহজাদা সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে নানাবিধ বিরূপ পরিবেশ পয়দা করে, তাঁরা সেই দাগটাকে পুনরায় দগ্‌দগে ক্ষত করে তোলার কাজে হাত দিলেন। অন্য কথায়, শাহজাদা সরফরাজ খান ও তকী খানের মধ্যে যে বিরোধ পয়দা করে দুই ভাইকে দুই অচিন দ্বীপ বানিয়ে ছিলেন, পিতা-পুত্রের মধ্যে সেই বিরোধ পয়দা করতে তৎপর হলেন তাঁরা। উদ্দেশ্য সনাতন শাহজাদা সরফরাজ খানের মসনদে আসার পথ রুদ্ধ করে দেয়া। নবাব সুজাউদ্দীন খান যেন ভুলেও সরফরাজ খানকে মসনদ দেয়ার চিন্তা-ভাবনা না করেন বা সরফরাজ খানের মসনদ পাওয়ার কোন ফাঁক-মওকা না রাখেন। সরফরাজ খানকে ফতুর করতে পারলেই, বাংলার তখ্‌ত্ বাগে আসবে তাঁদের। বসার লোকের অভাব কি?

অবশ্য দোষটা পুরোপুরি একদিকে গড়িয়ে দেয়া যায় না। ঘরের দোর খোলা পেলে চোর চুরি করবেই। রূপের পসরা বিছিয়ে রাখলে সাধুর মনও টলবেই। দোষের ভাগী এখানে ঐ কুচক্রীরা একাই নন, সুজাউদ্দীন খান সৃষ্ট তাঁর পারিবারিক কোন্দলও তুল্যাংশে দায়ী। দুই নৌকায় দুই পা রেখে নবাব সুজাউদ্দীন খান সেই যে সংসার জীবন শুরু করলেন, দুই পরিবার দুই স্থানে জুদা করে রেখে পারিবারিক সম্প্রীতি গড়ে উঠার পথে যে অন্তরায় ঘটালেন, মুর্শিদকুলী খানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর মসনদ দখল করে এবং সবশেষে প্রশাসনের প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব অন্যের হাতে তুলে দিয়ে যে অসন্তোষের জন্ম দিলেন, এগুলোর প্রভাবও পারিবারিক কোন্দল তথা পিতা-পুত্রের মধ্যে ঐ বিভেদের আগুনটা ধিকিধিকি জ্বালিয়ে রাখতে কম সহায়তা করেনি। "জো পেলে জোলায় বুনোয়।" চক্রান্তকারীদের একার দোষ কি? তাঁরা এই অবস্থার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং এন্‌তার বাতাস দিয়ে ধিকিধিকি আগুনটা সর্বগ্রাসী করে তুলতে সর্বোতভাবে সচেষ্ট হলেন।



www.amarboi.org

থাক একথা। যা বলার কথা তাহলো, খেলোয়াড়রা সেরেফ এই এক কিসিমের চা'ল নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকলেন না, দুস্‌রা চা'লও চাললেন। বিভেদের আগুনটা জ্বালিয়ে তোলার তৎপরতা অব্যাহত রেখে, তারা শাহজাদা সরফরাজ খানকে শক্তিহীন করার কাজেও লিপ্ত হলেন একসাথে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি, হাজী আহম্মদ সাহেব, রায় রায়ান ও শেঠ বাবু— এই সদস্যত্রয় তাঁদের চাম্‌চেদেরও লাগিয়ে দিলেন লোভ-টোপ আর কান ভাঙ্গানীর মাধ্যমে শাহজাদার সমর্থকদের নবাবের তথা তাঁদের নিজেদের দলে টেনে আনতে। সভাসদ ও সেনানায়কদের মধ্যে আগে থেকেই একটা অদৃশ্য ভাগাভাগি বিদ্যমান ছিল। এর কারণও ছিল। শাহজাদা সরফরাজ খানের চরিত্র তাঁর পিতার মতো বল্‌গাহীন ছিল না। তিনি ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, সংযমী ও শরীয়াতপন্থী মুসলমান। ফলে, দেশ ও কওমী স্বার্থের সমর্থকরা শাহজাদার পক্ষে এবং আপন স্বার্থের সমর্থকরা নবাবের তথা প্রশাসনিক পরিষদের পক্ষে মানসিকভাবে আপ্‌ছে আপ্‌ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এর বাইরে দোদুল্যমান দলও একটা ছিল। দোদুল্যমান দলকে তো বটেই, সদস্যত্রয় এবার শাহজাদার ভাগ ধরেও টানাটানি শুরু করলেন। জমে উঠলো জঙ্গ। এ পক্ষের টানাটানি উদোম হয়ে গেলে ও পক্ষও সজাগ হয়ে গেল। শাহজাদার পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন শাহজাদার আম্মা জিনাতুন নেছা বেগম। উভয় পক্ষের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার তিনি এক অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। পরিণামে এ পদক্ষেপ যদিও ভুলের মাত্রাই বাড়িয়ে ছিল, তবু প্রচেষ্টা হিসেবে এটা খানিক প্রশংসারই ছিল বই কি !

এ উদ্যোগ নিলেন তিনি উদ্ভূত এক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পর, দিল্লীর তৎকালীন দুর্বল দরবারে খান-ই-দুররান বা দৌরান ছিলেন সর্বাধিক শক্তিশালী সভাসদ। এই ব্যক্তির কোপ নজরে পড়লেন বিহার প্রদেশের সুবাদার ফখরুদ্দৌলাহ। ফলে, ফখরুদ্দৌলাহ সুবাদারী হারালেন এবং খান-ই-দৌরানের মন্ত্রণায় দিল্লীর দুর্বল বাদশাহ বিহারের স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করে বিহারকে সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করলেন। বিহারের শাসনভার বাংলার নবাব সুজাউদ্দীন খানের উপর ন্যস্ত হলো এবং এরূপে বাংলার নবাব এক সাথে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা — এই তিন প্রদেশের অধিপতি হলেন।

জিনাতুন নেছার পদক্ষেপটা এই বিহারের সাথে সম্পৃক্ত। শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে বিহারে একজন সহকারী সুবাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন হলো। বিহার একটি স্বাধীন প্রদেশ ছিল। বাংলার নবাব বা সুবাদারের সমমর্যাদা সম্পন্ন একজন সুবাদার বিহার প্রদেশ শাসন করতেন। ফলে, বিহারের সহকারী সুবাদারের পদ একটি অত্যন্ত সম্মানজনক ও মর্যাদাসম্পন্ন পদ ছিল। বিরোধটা যা-ই থাক, সুজাউদ্দীন খান এই মর্যাদা সম্পন্ন পদটি তাঁর আওলাদ সরফরাজ খানকে দেবেন বলে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন।

শুরু হলো রাজনীতি এবং সেটি একটি গল্পের মতো। এক গৃহস্তের দুই বিবি। ছোট বিবি খুব দজ্জাল ও অসৎ। বড় বিবিকে ছোট বিবি সর্বদাই বিষ নজরে দেখে। তার ছায়াও ছোট বিবি মাড়ায় না বা ভুলেও তার সাথে সদাচরণ করে না। বড় বিবি



www.amarboi.org

আগে থেকেই দক্ষিণ দুয়ারী বড় ঘরে থাকে। পরে এসে ছোট বিবি অন্যদিকে ছোট ঘর পেয়েছে। বড় ঘরের দখল সে পায়নি। এই বিষে ছোট বিবি জ্বলে-পুড়ে মরে। কি করে সে বড়ঘর দখল করবে, এই ফন্দিই হর-হামেশা আঁটে। এমনই অবস্থায় বড় বিবির পিত্রালয় থেকে লোক এলো বড় বিবিকে নাইওরে নিয়ে যেতে। নাইওরে যেতে দেবেন কিনা, গৃহস্তটি ভাবতে লাগলেন। খবর শুনেই ছুটে এলো ছোট বিবি। বড় বিবির প্রতি দরদের তুফান তুলে সে খসমকে বললো— আহা, বহিনের আমার কত কষ্ট। এক দণ্ডের জন্যেও তার বিরাম নেই। সংসারে খাটতে খাটতে হাড়মাস তার কালো হয়ে গেল ! দোহাই তোমার ! তুমি আবার 'না' করো না যেন গো ! গড়িমসি না করে এই বেলাতেই বহিনকে আমার নাইওরে পাঠিয়ে দাও। বহিন আমার দুইদিন একটু আরামের মুখ দেখুক।

বলেই সে ছুটে গিয়ে বড় বিবিকে টেনে এনে সোহাগ ভরে বড় বিবির চুল বাঁধতে বসলো। এ দৃশ্য দেখে গৃহস্তটি খুশীতে জ্বার জ্বার। তিনি ভাবতে লাগলেন, আহা ! তাঁর ছোট বিবি আসলেই কি ভাল মানুষ ! বড় বিবির প্রতি কি গভীর তার দরদ !

এখানেও এই ঘটনাই ঘটলো। বিহার প্রদেশের জন্যে নবাব একজন সহকারী সুবাদার নিয়োগ করছেন শুনেই, নবাবের কাছে ছুটে এলেন পরিষদের ঐ সদস্যত্রয়। এসেই তাঁরা শাহজাদা সরফরাজ খানের প্রতি দরদে উথলে উঠলেন এবং এই পদ শাহাজাদাকে দেয়া হোক বলে তোড়জোড়ে সুপারিশ করতে লাগলেন। যুক্তি হিসেবে নবাবকে তাঁরা বললেন, একমাত্র শাহজাদা ছাড়া এতবড় একটা সম্মানজনকপদে আর কাউকে মানায় না। এমন একটা দুর্লভ সম্মান শাহজাদাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিলে শাহজাদার প্রতি নবাব বাহাদুর ঘোরতর অবিচার করবেন এবং এ মুলুকের একমাত্র শাহজাদা তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও হক থেকে বঞ্চিত হলে, তাঁরা (এই সদস্যেরা) দীলে বড় চোট্ পাবেন।

শাহজাদার প্রতি এঁদের এই দরদ দেখে, ঐ গৃহস্তের মতোই নবাবও খুব খুশী হলেন এবং এঁদের বিশ্বস্ততায় আরো বেশী বিশ্বাসী হলেন। নবাবের নিজের ইচ্ছে ছিলই। এঁদের এই সুপারিশে তিনি শাহজাদা সরফরাজ খানকে বিহারের সহকারী সুবাদার নিয়োগ করে তাঁকে বিহারে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন।

নবাব ধরতে না পারলেও, ঐ সদস্যদের কেন এত দরদ, তা সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেললেন শাহজাদার শুভাকাঙক্ষীরা। বিশেষ করে, খবরটি পাওয়া মাত্রই আঁতকে উঠলেন শাহজাদার আম্মা জিনাতুন নেছা বেগম। শাহজাদা রাজধানীতে বিদ্যমান থাকতেই যেখানে তার প্রাপ্য মসনদে অন্যে এসে বসে, সেখানে শাহজাদা রাজধানী ছেড়ে ঐ সুদূর বিহারে গিয়ে থাকলে তো আর কথাই নেই। গোটা ময়দান নিরঙ্কুশভাবে চক্রান্তকারীদের দখলে এসে যাবে। ফাঁক পেলেই তারা তুড়ি মেরে তাদের ইচ্ছে মতো যে কাউকে বাংলার তখ্‌তে বসিয়ে দেবে এবং নির্বিঘ্নে রাজধানী ও রাজ্য কব্জা করে ফেলবে। শাহজাদা সরফরাজ খান তখন মুর্শিদাবাদের ত্রিসীমানায় ভিড়তেই আর পারবেন না।



www.amarboi.org

এছাড়াও প্রশ্ন আছে। রাজধানীতে শাহজাদা একটা শক্ত নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করছেন। তাঁর এক পাল শুভাকাঙক্ষীদের এক সাথে শুইয়ে দিতে না পারলে শাহজাদার অঙ্গ স্পর্শ করার সাধ্য রাজধানীতে কারো নেই। রাজধানী আর এই নিরাপত্তা ত্যাগ করে শাহজাদার বিহারে গিয়ে থাকা মানেই জানের উপর মস্তবড় ঝুঁকি নেয়া। গুপ্তঘাতকের হাতে সেখানে তাঁর জান যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। বরং বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই আশংকাই সর্বাধিক।

বেঁকে বসলেন সকলেই। জিনাতুন নেছা বেগমই এর ঘোরতর বিরোধিতা করলেন। সন্তানকে কিছুতেই তিনি রাজধানীর বাইরে যেতে দিতে রাজী হলেন না। শাহজাদা নিজেও নারাজ ছিলেন। পিতার এ নিয়োগ তিনি প্রত্যাখ্যান করে পাঠালেন।

জিনাতুন নেছা বেগম এখানেই সেই পদক্ষেপটা নিলেন। শাহজাদা না গেলে বিহারের শূন্যপদ শূন্য পড়ে থাকবে না। ঐ লোভনীয় পদের জন্যে অনেকেই জান কবুল করবে। জিনাতুন নেছা বেগম দুই পক্ষের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার এখানেই এক নয়া উদ্যোগ নিলেন। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন, হাজী আহম্মদ পরিবারের শক্তি এখন এতটাই অপ্রতিরোধ্য যে, রাজনৈতিক কামিয়াবীর ক্ষেত্রে এ শক্তিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। এটিকে জয় করতে না পারলেও, একে কিছুটা খণ্ডিত বা নাজুক করে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি এই প্রয়াসই পেলেন।

হাজী আহম্মদ পুরোপুরিই মুসলমান শাসনের বুনিয়াদী বিরোধী শক্তির সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁকে আর সেখান থেকে ফারাগ করার উপায় নেই। ফাঁকে আছেন তাঁর ভাই আলীবর্দী খান। শাহজাদার বিপক্ষ দলের সাথে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়াসে জিনাতুন নেছা বেগম এই আলীবর্দী খানের দিকে হাত বাড়ালেন এবং বিহারের ব্যাপারে তাঁকেই ব্যবহার করতে চাইলেন।

জিনাতুন নেছার এ পদক্ষেপ একেবারেই অযৌক্তিক ছিল না। হাজী আহম্মদের ভাই হলেও, হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দীর চরিত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক ছিল। হাজী আহম্মদের মধ্যে শৌর্যবীর্য কম, চতুরতা বেশী। আলীবর্দীর মধ্যে কূটিলতা কম, শৌর্যবীর্য অধিক। ভাইয়ের মতো কূটিল তিনি ছিলেন না। তিনি সাহসী, বীর ও অনেকখানি উদার চেতা মানুষ। তিনি এযাবত মোটামুটি নিরপেক্ষভাবেই তাঁর দায়-দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। নবাব সুজাউদ্দীন খানের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখার পাশাপাশি জিনাতুন নেছা ও শাহজাদা সরফরাজ খানের প্রতিও তাঁর আনুগত্যে আর বিশ্বস্ততায় ঘাটতি কিছুই ছিল না। তাই জিনাতুন নেছা বেগম এই আলীবর্দী খানকেই নিজেদের পক্ষে টেনে নিতে আগ্রহী হলেন।

তিনি আলীবর্দী খানকে তলব দিলে আলীবর্দী খান বিনয় ও বিশ্বস্ততার সাথে তৎক্ষণাৎ এসে তাঁর খাস কামরার দোরগড়ায় দাঁড়ালেন। পর্দার আড়াল থেকে তিনি আলীবর্দী খানের সাথে নানাবিধ আলাপ করে প্রীত হলেন। অতপর মূল্যবান খিলাত প্রদান করা সহ আলীবর্দীকে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে বিহারের সহকারী সুবাদার নিয়োগ করলেন। সুবে বাংলার মূল মালিক যে জিনাতুন নেছা বেগমই এবং পরোক্ষভাবে



www.amarboi.org

হলেও নবাব সুজাউদ্দীন খান যে তাঁর প্রতিনিধি, এ বিশ্বাস আলীবর্দী খানসহ আরো অনেকেই দীল থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ লাভ করে তাই আলীবর্দী খান ধন্য হলেন এবং অত্যন্ত তাজিমের সাথে নবাব পত্নীর এ দান তিনি গ্রহণ করলেন।

নবাব সুজাউদ্দীন খান তাঁর নিজের জালে নিজেই আটকা পড়ে গেলেন। জিনাতুন নেছার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সুবে বাংলা শাসন করছেন, এ ঘোষণা নিজেই তিনি জিনাতুন নেছাকে দিয়েছিলেন এবং অনেকটা প্রকাশ্যেই দিয়েছিলেন। সুতরাং, এই নিয়োগ দানের বিরুদ্ধে তাঁর বলার কিছুই রইলো না। তদুপরি, আলীবর্দী খানের মতো একজন অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি বিহারের সহকারী সুবাদার হিসেবে মনোনীত হওয়ায় তিনি-বরং খুশী হলেন এবং অত্যন্ত খোশদীলে এই নিয়োগদান অনুমোদন করে তিনিও তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আলীবর্দী খানকে আর একখানা নিয়োগপত্র লিখে দিলেন।

"আল্লাহ যারে দেয় তারে ছাপ্পড় ফেঁড়ে দেয়।" পরিস্থিতির মার প্যাঁচে আলীবর্দী খানের নসীবে আরো অনেক প্রাপ্তি যোগ ঘটলো। এই অনুগ্রহের কারণে তিনি জিনাতুন নেছা বেগমের একেবারেই অনুগত হয়ে গেলেন ভেবে, রায় রায়ান বাবুরা শংকিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মতো শক্তি জিনাতুন নেছা বেগমের মুঠোর মধ্যে চলে গেলে সর্বনাশ ! আবার তাঁরা তৎপরতা শুরু করলেন। বেগম সাহেবার কাছে নবাব বাহাদুর বদনাত্যায় একদম খাটো হয়ে গেলেন এবং এতে করে আলীবর্দী খানের শ্রদ্ধা হারানো সহ তাঁকে তিনি বেহাত করে ফেললেন—এই মর্মে তাঁরা নবাবকে উত্তেজিত করে তুললেন। ফলশ্রুতিতে, নবাবও বেগম সাহেবার সাথে আলীবর্দী খানের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের প্রতিযোগিতায় নেমে গেলেন। তিনিও আলীবর্দী খানকে নানারকম খিলাতে ভূষিত করলেন এবং একটি সুসজ্জিত হস্তী, রত্ন খোচিত তরবারি ও অনেক মনিমুক্তা উপহার দিলেন। এখানেই থামলেন না। পাঁচহাজারী মনসবদারীসহ আরো কিছু খিলাত-খিতাব দানের জন্যে তিনি দিল্লীর বাদশাহ ও খান-ই-দৌরানের কাছেও পত্র লিখে পাঠালেন।

আলীবর্দী খানের নসীব রাতারাতি খুলে গেল। প্রবাদ আছে, "ধন-জন জোয়ারের পানি।" যাওয়া দেখা যায় না, তবে যখন আসে বন্যার বেগে আসে। আলীবর্দীর বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বন্যার বেগে ধনও যেমন পেলেন তিনি, নসীব গুণে এই মুহূর্তে জনও একজন পেয়ে গেলেন হঠাৎ করেই। অপুত্রক আলীবর্দী খান এই সময়েই একজন নাতীর মুখ দর্শন করলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের কোলে এই সময় একটি পুত্র সন্তান এলো। নিজের নাম অনুসারে আলীবর্দী খান এই পুত্র সন্তানের নাম রাখলেন মীরজা মুহম্মদ আলী। এই মীরজা মুহম্মদ আলীই কাল ক্রমে সিরাজউদ্দৌলাহ নামে পরিচিত হন। এই নাতীকে আলীবর্দী খান দত্তক হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং সহকারী সুবাদার হয়ে বিহারে যাওয়ার কালে, এই নাতী, নাতীর আম্মা আমিনা বেগম ও নাতীর আব্বা হাশেম আলী খান ওরফে জয়েনউদ্দীন আহম্মদ খানকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।



www.amarboi.org

জিনাতুন নেছা বেগমের আশা পূরণ হোক না হোক, আলীবর্দী খান এই থেকেই একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করলেন। বিহার এই সময়ে একটি বিদ্রোহ-বিদ্রুত প্রদেশ বোধে নবাব সুজাউদ্দীন খান অশ্বরোহী ও পদাতিক মিলে পাঁচহাজার সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনীও বিহারে যাওয়ার কালে আলীবর্দী খানকে প্রদান করলেন। শক্তির মালিক আলীবর্দী খান আগে থেকেই ছিলেন। এক্ষণে আরো অধিক শক্তি ও পদমর্যাদাসহ মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

দিলওয়ার আলী সেই থেকেই এন্তেজার আছেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত থেকে শুরু করে শক্তি নিয়ে টানাটানির এই লম্বা ও তুমুল প্রক্রিয়াটা, আলীবর্দী খানের বিহারে যাত্রা করার পর কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলো। অন্য কথায়, বিরোধী পক্ষ সাময়িকভাবে খানিকটা তালকানা হয়ে পড়ায়, সর্বত্রই আবার একটা শান্ত পরিবেশ পরিলক্ষিত হলো। পরিস্থিতি অনুকূলে পেয়ে দিলওয়ার আলী পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর শাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাই দিলীর আলীর দিকটা সামাল দেয়ার আগে তিনি আর ইমাম সাহেবের মকানে যাওয়া সমীচিনবোধ করছেন না। কারণ, সেখানে এখন গেলেই এ প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই উঠে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে তার সুস্পষ্টভাবে বলার কিছু থাকবে না। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। শাহরিয়ার খান সাহেবের মেয়েকে যে তাঁর শাদি করা সম্ভব নয়, একথাটা তাঁর ভাইকে জানাতে আর বিলম্ব করা চলে না।

দপ্তরে যাওয়ার আগে দিলওয়ার আলী মকানে বসে এসব কথাই ভাবছেন। দপ্তরের কাজ সকাল সকাল শেষ করে আজকেই একবার ভাইয়ের দপ্তরে যাবেন, এই চিন্তাই করছেন। এমন সময় নামদার খাঁ এসে হাসিমুখে দাঁড়ানো এবং সাবিহা খানমের তসবীরটা বাড়িয়ে ধরে বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সাথে বললো—এ কৌন্ তাজ্জব বাত হজৌর? এহি লড়কি কাঁহাছে আহ-গৈল?

দিলওয়ার আলী মুচ্‌কি হেসে বললেন লড়কি আ-গৈল্!

ঃ বহুৎ খুব্‌সুরাত লড়কি।

ঃ কৈ, কোথায়?

তসবীরটা আরো খানিক বাড়িয়ে ধরে নামদার খাঁ বললো—এহি তো হজৌর, এহিতো হামার হাতের আন্দর।

ঃ তোমার হাতের আন্দর। তোমার হাতের মধ্যে মেয়েছেলে?

ঃ থোড়া লজর লাগাইয়ে না? এহি তো বিলকুল হামার হাতে।

ঃ আরে, ওটা তো একটা তসবীর। মেয়েটা কোথায়?

ঃ হাইরে বা! ইতো মর্দানা না আছে হজৌর? জরুর জেনানা আদমী, খুব্‌সুরাত লড়কি।

দিলওয়ার আলী বললেন—তা বটে। ওটা তুমি কোথায় পেলে?



www.amarboi.org

ঃ হজৌরকো খাটিয়ার তলে। খাটিয়া ঠিক ঠাক করিতে লাগি এহি লড়কি বাহার হৈ আসিলেক।

দিলওয়ার আলীর খেয়াল হলো। তসবীরটা তিনি তাঁর বিছানার তলে রেখেছিলেন। কোন এক ফাঁকে ওটা পালংকের নীচে পড়ে গেছে। নামদার খাঁর বলার ধরনে তাঁর হাসি পেলো। তিনি হাসি চেপে বললেন—আমার খাটের তলে থেকে বেরিয়ে এলো ?

ঃ ওহি-ওহি। হজৌরের খাটিয়ার তলে লুকাই ছিল।

ঃ লুকাই ছিল ? আমার খাটের তলে মেয়েছেলে লুকাই ছিল ?

ঃ ধুমছে লুকাই ছিল বটে।

ঃ তুমি টেনে বের করলে ?

ঃ নাই-নাই হামি ঝাড় দিতে লাগি এহি লড়কি হুট্ করি বাহার হই আসিলেক আউর তফাৎ পড়ি যাইলেক। হামি উহারে উঠাই লইলেক বটে।

ঃ সাব্বাস্ !

ঃ হজৌর !

ঃ তুম্ মরদকা কাম কিয়া।

ঃ সাচ্ ? এহি লড়কি কৌন আছে হজৌর ?

দিলওয়ার আলী ফস্‌করে বলে ফেললেন—বহু আছে।

তড়াক করে মাথা তুলে নামদার খাঁ বললো—বহু !

ঃ হ্যাঁ, বহু। তুমিই তো বলেছিলে, মকানে একটা বহু আসুক ? বলোনি ?

ঃ হঁ-হঁ ইয়াদ হইবেক বটে।

ঃ এই তো আসা শুরু করেছে।

ঃ এহি বাত ?

ঃ বিলকুল।

খুশীর আধিক্যে নামদার খাঁ লাফিয়ে উঠে বললো—সোবহানআল্লাহ্! কেয়া খোশ ! হজৌরকা বহু ? হামার বহু আম্মা ? হজৌরকা ছাদি হো গৈল্ হামি মালুম না হৈ ? কেয়া তাজ্জব-কেয়া তাজ্জব ! হারে কলিম ভাই—হৈ জেওরীর আম্মা, আব্বে তুম লোগ্ ছব কাঁহা গৈল্ হো ? দেখি যাও—দেখি যাও কেত্তা খুব সুরাত—

নামদার খাঁ ছুটে যেতে উদ্যত হলো। দিলওয়ার আলী চম্‌কে উঠে বললেন—আরে আরে, করো কি ?

ঃ দিখাই লই হজৌর, বহু আম্মারে দিখাই লই ? বেখবর আদমী ছব জিয়াদা খুছি হো যাইবেক।

ঃ আরে থামো-থামো। একে দেখাবে কি ? আসল বউ আসুক।

ঃ আস্‌লী বহু !

ঃ হ্যাঁ, আস্‌লী বহু। ওটা তো নক্‌লী।

ঃ কেয়া গজ্জব ! নক্‌লী ?

ঃ মানে সেরেফ একটা তসবীর। ওটা কি দেখাবে ?



www.amarboi.org

নামদার খাঁ দমে গিয়ে বললো—হুঁ-হুঁ, এহি বাত ঠিক! জ্যাস্ত আউরাত নাই আছে। বিলকুল ঠিক। তব্ তসবীর কেনে হুজৌর? আস্লী বহু কাঁহা?

ঃ নানাজানের মকানে আছে।

ঃ কেনে? খছমের মকানে আসিবেক নাই?

ঃ কি করে আসবে? যা হৈচৈ শুরু করেছো, এমন হলে আসে কি করে? তার শরম নেই?

নামদার খাঁ ভড়কে গেল। চিন্তিত কণ্ঠে বললো—হারে বা! ওহি বাত তো ভি ঠিক। ছরম তো উহার জরুর আছে। নয়া বহু! ছরম থাকবেক নাই কেনে? জিয়াদা ছরম থাকবেক।

ঃ তাহলেই বুঝো।

নামদার খাঁ সাবধান হয়ে বললো—হামি আখুন চুপ্ হো গৈল্। হৈচৈ মাৎ করিবেক আলবত! হুজৌর জল্দি জলদি জিন্দা বহু লই আসিবেক বটে হুঁ!

ঃ হ্যাঁ, চুপ থাকো। গোলমাল না করলে, তাড়াতাড়ি বউ আসবে মকানে।

ঃ ঠিক বাত্ হুজৌর?

ঃ বিলকুল ঠিক বাত। এখন তুমি যাও। আমার দপ্তরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

ঃ আচ্ছা হুজৌর। লেকেন এহি তসবীর?

ঃ ওটা এখন তোমার কাছেই থাক।

ঃ হামারা পাস্?

ঃ হ্যাঁ। ওটা তুমিই রেখে দাও। আমি দেখি আস্লী বহু কত জল্দি আনতে পারি। এখন সরো—

ঃ বহুৎ আচ্ছা হুজৌর, বহুৎ আচ্ছা।

তসবীর হাতে নামদার খাঁ খুশী হয়ে চলে গেল। দিলওয়ার আলী তৈয়ার হয়ে বেরোতেই নবাবের এক হুকুম বরদার এসে মকানের বাইরে থেকে ডাকহাঁক শুরু করলো। দিলওয়ার আলী সামনে এলে, সে ব্যস্ত কণ্ঠে জানালো, নবাব বাহাদুরের জরুরী তলব আছে, দিলওয়ার আলীকে এক্ষুণি নবাব বাহাদুরের সাথে মোলাকাত করতে যেতে হবে। নবাব বাহাদুর এন্তেজারে আছেন, এক লহমাও দেরী করার ফুরসৎ নেই।

রাজার হুকুম তাজা। দপ্তরে যাওয়ার বদলে দিলওয়ার আলী তখনই নবাবের সাথে সাক্ষাত করতে রওনা হলেন। সাক্ষাত করার পর তাঁর তামাম পরিকল্পনা পাল্টে গেল। শাদির চিন্তা চাঙ্গে উঠলো। ভাইয়ের সাথে কথা বলার তামাম ভাবনা উবে গেল। হুকুম হলো—সৈন্য সাজাও—

**ঘটনা ঃ** হুগলীর প্রশাসন তথা বাংলার হুকুমাতের শিরদাঁড়ায় শক্ত কয়টা লাথি ফেলেছে ইংরেজরা। মসনদের আরাম ভোগ আর একপাল চক্রান্তকারী লালন ও তোষণ করার বাইরে যে নবাবের ভবিষ্যৎ চিন্তা বলে কিছুই নেই, একটা বুড়ো ছাগলের অধিক সে নবাবের পরোয়া এখন ইংরেজরা করে না। বাংলার জমিনে শক্ত করে পা দাবার প্রক্রিয়া এখনও তাদের শেষ হয়নি বলেই ইংরেজরা এখন ডালপালায়



www.amarboi.org

আঘাত করছে, গোড়ায় কোপ ফেলছে না। তবে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য তাদের ঐটেই। বাণিজ্য নয়, বাংলার মালিকানা চায় তারা।

এক্ষণে খবর—হুগলীর ফৌজদারের হালত বহুৎ করুণ। মৌখিক ও শারীরিক-ভাবে তো লাঞ্ছিত তিনি হয়েছেনই, ইংরেজদের হাতে তাঁর জানটাও এখন বিপন্ন। তাঁর উদ্ধারে ও সহায়তায় অবিলম্বে রাজধানী থেকে সৈন্য বাহিনী না গেলে, তাঁর জানসহ হুগলীর দখলটাও ইংরেজদের হাতে চলে যাবে। বালাশোরে, কাশিমবাজারে এবং বিশেষ করে, কলিকাতায় দুর্ভেদ্য ও অপ্রতিহত ঘাঁটি স্থাপন তাঁরা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। এবার হুগলীতেও জেঁকে বসবে ইংরেজরা।

এ খবরে কিছুটা টনক নড়েছে বাংলার বিলাস প্রিয় নবাব সুজাউদ্দীন খানের। তিনি জোরেশোরে একটি বড় ধরনের সৈন্যবাহিনী হুগলীতে প্রেরণ করছেন। এ বাহিনীর নেতৃত্বে যদিও অন্য দুইজন সেনানায়ক আছেন, তবু নবাব চান, দিলওয়ার আলীও তার ফৌজ নিয়ে এদের সাথে যোগ দিক এবং হুগলীর সার্বিক অবস্থা জরিপ করে আসুক। তাঁর বিশ্বাস, সবকিছু দেখেশুনে ও জেনে নিয়ে এসে এই উদ্ধত ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশটা দিলওয়ার আলীই ভাল করতে পারবেন।

নবাবের নির্দেশ পেয়ে সেইদিন রাজধানীর এক বাহিনী হুগলীর পথে ছুটলো। দিলওয়ার আলীও তাঁর ফৌজ নিয়ে এই বাহিনীর সাথে রওনা হলেন। সাবিহা খানমের সমস্যা, মাহমুদা খাতুনের মুখ ও তাঁকে নিয়ে ইমাম বাড়ীর সোনালী চিন্তা-ভাবনায় আমেজ—দিলওয়ার আলীর দীল থেকে এক পলকে পালিয়ে গেল। সেখানে এখন উথাল-পাথাল করতে লাগলো এ মুলুকের অদূর ভবিষ্যতের কথা এবং ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্যের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার আক্রোশ।

হুগলীর বর্তমান ঘটনাটা ঘটেছে বাংলার হুকুমাতের ক্রমবর্ধমান উদাসিনতা ও তার ফলে ইংরেজদের দুঃসাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই। বাংলার হুকুমাতের দুর্বলতা ও তার আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা একের পর এক দুর্নীতি ও যদেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে থাকে। শক্ত কোন চাপ বা ধমক-হুমকি না থাকায়, তারা নির্ধারিত শুল্ক, বাৎসরিক কর এবং কলিকাতা গোবিন্দপুর-সূতানটী সহ তাদের তামাম কেনা সম্পত্তির খাজনা প্রদান বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী, বেপারী ও মাল বিক্রেতাদের উপর বল্‌গাহীন জুলম চালানোর সাথে স্থানীয় প্রশাসনকেও তারা বিলকুল অগ্রাহ্য করে চলতে থাকে। দেশের কানুন ও সরকারী নীতি-নির্দেশ তামামই উপেক্ষা করে তারা স্বাধীনভাবে ও খেয়াল-খুশী মাফিক বাণিজ্য করার প্রয়াস পায় এবং অন্যান্য বণিকদের এদেশ থেকে উৎখাত করার অভিপ্রায় শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। শুল্ক ফাঁকি দেয়াটা তাদের একটা অধিকারে পরিণত হয়।

হুগলী বাংলা মুলুকের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। হুগলীর প্রশাসনই ইংরেজসহ দেশী-বিদেশী সমস্ত বণিকদের নিয়ন্ত্রণ করার মুখ্য প্রশাসন। ফলে, হুগলীর ফৌজ্‌দারকেই দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর



www.amarboi.org

ইংরেজ বণিকদের দুর্নীতি নিয়ে সবসময়ই কলহ লিপ্ত থাকতে হয়। কর-শুল্ক-খাজনাদি আদায় ও বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিয়ে ইংরেজদের সাথে হুগলীর বর্তমান ফৌজদার সুজাকুলী খানের ওরফে কুলীখানের কলহ দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। হুগলী নদী দিয়ে বাংলা মুলুকে মালামাল আগমন ও নির্গমনের সময় হুগলী শুল্ক দপ্তরে শুল্ক প্রদান করা একটি স্থায়ী নির্দেশ ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। অন্যান্য সকল দেশের বণিকেরাই এ নিয়ম সবসময় যথাযথভাবে মেনে চলে। কিন্তু এই ইংরেজ বণিকেরাই এ নিয়ম হর-হামেশাই ভঙ্গ করে আসছে এবং এক্ষণে এদের এই আচরণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অধিক ক্ষেত্রে চুরি করে এবং বাঁকী ক্ষেত্রে গায়ের জোরে তারা মালামাল দেশের ভেতরে আনছে ও দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শুল্ক এক পয়সাও দিচ্ছে না। প্রতিবাদ ও দরবার করে কোন কাজ না হওয়ায় ফৌজদার কুলী খান অবশেষে ইংরেজদের কয়েক নৌকা রেশম ও রেশমবস্ত্র চুরি করে পাচার করাকালে আটক করেন এবং মালের গাঁইটগুলো হুগলীর গুদামে এনে বন্ধ করে রাখেন।

এ খবর ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি কলিকাতা দুর্গে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ামে পৌছামাত্র ইংরেজদের কলিকাতা পরিষদ যারপরনেই গোস্বা হয় এবং ফোর্ট উইলিয়াম সেনা ঘাঁটি থেকে সুদক্ষ ও সুসজ্জিত ফৌজের একটি শক্তিশালী বাহিনী হুগলীর ফৌজদারের বিরুদ্ধে তখনই প্রেরণ করে। রাতের অন্ধকারে এসে এই বাহিনী অতর্কিতে হুগলীর গুদামে হানা দেয় এবং গুদামের দেয়াল টপকে ও দরজা ভেঙ্গে মালের গাঁইটগুলো বের করে নেয়। গুদামের প্রহরীরা এই সুসজ্জিত বাহিনীর হাতে বেদম মার খেয়ে পলায়ন করে।

অতপর এই বাহিনী ফৌজদার কুলি খানের বাস ভবনে হামলা করে। কুলি খান বেরিয়ে এলে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করার পর তাঁকে তারা বেঁধে নিতেও উদ্যত হয়। ইতিমধ্যে হুগলীর ফৌজ এসে পাল্টা হামলা করলে লড়াই শুরু হয় এবং সে লড়াই থেমে থেমে কয়দিন ধরেই চলছে। হুগলীর ফৌজ দুশমনের তুলনায় পর্যাপ্ত না হওয়ায় তারা দুশমনদের এঁটে উঠে পারছে না। মার খাচ্ছে আর কমজোর হয়ে পড়ছে। অচিরেই রাজধানী থেকে সামরিক সাহায্য না এলে, ফৌজদারের জানের উপর হুমকি তো আছেই, হুগলী বন্দরটাও ইংরেজরা দখল করে নিতে পারে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই নবাব বাহাদুর রাজধানী থেকে ফৌজ প্রেরণ করলেন। রাজধানী থেকে অতিরিক্তি ফৌজ এসে হুগলীতে পৌছা মাত্র ইংরেজ বাহিনী আতংকিত হয়ে উঠলো। মালের গাঁইট খালাশ করে নিয়ে তারা আগেই পাচার করে দিয়েছিল। রাজধানীর ফৌজের দুরন্ত হামলায় ইংরেজ ফৌজ পিছু হটে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো পালিয়ে গেল।

হুগলী বন্দর দুশমন মুক্ত হলে রাজধানীর ফৌজ রাজধানীতে ফিরে গেল, কিন্তু দিলওয়ার আলী কয়েকদিন হুগলীতেই রয়ে গেলেন। নৌপথে ও স্থল পথে ঘুরে ঘুরে তিনি সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন এবং ইংরেজদের শক্তি ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করলেন। এরপর ফিরে এসে তিনি নবাবকে জানালেন,



www.amarboi.org

ইংরেজদের সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে তাঁর চিন্তা-ভাবনা মতে সামনে এখন পথ দু'টি — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পথ। প্রত্যক্ষ পথ — ইংরেজদের বিরুদ্ধে পূর্ণ যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের এ মুলুক থেকে বিদায় করা, যা এখন অত্যন্ত দুরূহ ও এ মুলুকের তামাম শক্তি নিয়োগ করার কাজ। ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া এ চিন্তা করাই এখন বাতুলতা। দ্বিতীয় পথ হলো, ইংরেজদের কায়দায় ফেলে কাবু করা। যদিও ইংরেজদের শক্তি এখন বিপুল, তবু এই হুকুমাতের অর্থাৎ এই মুলুকের বিরুদ্ধে সরাসরি দাঁড়ানোর মতো তাক্‌ও এখনোও তাদের শরীরে জমা হয়নি। অতএব, "কাক মারি ছায়ে আর জেলে মারি নায়ে," এক্ষণে এই পন্থা অবলম্বন করাই বেহতর। কলিকাতা আর কাশিম বাজারই এখন এ মুলুকে ইংরেজদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। এদেশ, সম্পদ ও জনগণ আমাদের। সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে, এই দুই স্থানে ইংরেজদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হোক। কোন প্রকার শস্যদানা এই দুই জায়গায় প্রবেশ করতে না দিলেই, ডাঙ্গায় উঠবে কুমির। এই হুকুমাতের হুকুম-নির্দেশ পালন করে চলতে আর এই হুকুমাতের কাছে নতজানু হতে বাধ্য হবে তারা।

নবাব বাহাদুর সেই থেকেই চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। দিলওয়ার আলীর এ সুপারিশ তিনি উষ্ণ দীলে গ্রহণ করলেন এবং এই দুই জায়গায় খাদ্য শস্য, রপ্তানী করা তাৎক্ষণিকভাবে নিষিদ্ধ করে দিলেন। যাদুর মতো কাজ হলো। ফাঁদে পড়লো দুর্বৃত্তেরা। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের "কন্টিনেন্টাল ব্লকেডের" মতো কোন 'লিকেজ্‌' সৃষ্টি হওয়ার পূর্বতক্‌, ইংরেজদের চৌদ্দ চোঙ্গা বুদ্ধি এসে এক চোঙ্গায় ঠেকলো — আর সেটা হলো নতিস্বীকার করা। নিরুপায় ইংরেজরা নতজানু হয়ে নবাবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বকেয়া কর পরিশোধ করে, সাময়িকভাবে হলেও, আবার তারা শুল্ক প্রদান শুরু করলো। দিলওয়ার আলীকে ডেকে নবাব বাহাদুর খোশ দীলে বললেন — সাব্বাস্‌ !

হুগলীতে যাওয়ার ফলে এ মুলুক আর হুকুমাতের ভবিষৎ সম্পর্কে দিলওয়ার আলীর দিব্যদৃষ্টি আরো অধিক প্রসারিত হলো। হুগলীর ফৌজদারই তাঁর এই দৃষ্টি প্রসারে সহযোগিতা করলেন। যে কয়দিন হুগলীতে তিনি থাকলেন, হুগলীর ফৌজদার সুজাকুলী খান তাঁকে অত্যন্ত যত্ন খাতির করলেন এবং এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা পয়দা হলো। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরে ফিরে আসার পর, অবসর ওয়াক্তে দিলওয়ার আলী সবসময়ই গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকতেন। গল্প-আলাপের মধ্যেও দিলওয়ার আলীর এই অন্য মনোষ্কতা ফৌজদার কুলী খান লক্ষ্য করলেন এবং লক্ষ্য করে তিনি বিস্মিত হলেন। একদিন এক প্রশস্ত অবসরে ফৌজদার কুলী খান দিলওয়ার আলীকে বললেন — যদি নাখোশ-নারাজ না হন, তাহলে ভাই সাহেবকে আমি একটা প্রশ্ন করতাম।

দিলওয়ার আলী তখনও কিছুটা অন্য মনোষ্ক ছিলেন। এ কথায় তিনি মনোযোগ এনে বললেন — জি-জি, করুন। নাখোশ-নারাজ হওয়ার কি আছে?

ফৌজদার সাহেব তবুও ইতস্তত করে বললেন — না মানে, কিছুটা অনধিকার চর্চার ব্যাপার কিনা, তাই।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী হেসে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, প্রশ্নটা আগে করুন তো, তারপর দেখি কেমন অনধিকার চর্চা ?

ফৌজদার সাহেব এবার সহজ কণ্ঠে বললেন—আমি সবসময়ই লক্ষ্য করছি, অবসর থাকলেই আপনি বসে বসে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করেন। এটা কি কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার, না বাইরের কোন সমস্যা ?

দিলওয়ার আলী অল্প একটু থামলেন। এরপর ঈষৎ হেসে বললেন—ধরেছেন আপনি ঠিকই। কিন্তু প্রশ্নটা এত জটিল যে, কি জবাব দেবো—তাই ভাবছি।

ঃ না-না, অসুবিধে থাকলে জবাব আপনি দেবেন কেন ? এটা আমার নিছকই একটা কৌতূহল মাত্র। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ এত ভাবে না কিনা, তাই।

ঃ কথাটা তো বিলকুল আপনার ঠিক আর জবাব দিতেও কোনই অসুবিধে নেই আমার। তবে ব্যাপারটা একটু এলোমেলো।

ঃ কেমন ?

ঃ ব্যক্তিগত দিকটা যে আমার ভাবনার মধ্যে কিছুই নেই, এমন নয়। তবে সে দিকটা নিতান্তই সামান্য আর একেবারেই ব্যক্তিগত। বাঁদবাকী তামামই রাজনৈতিক দিক। বলতে পারেন, বিপুল এক হতাশা।

ঃ বলেন কি !

ঃ সেই জন্যেই তো একা একা ভাবি। বলার মতো তৈরী কোন বিষয়ও নয়, আর এসব এলোমেলো গাজীর গীত শুনেই বা কে ?

ঃ তাহলে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা থাক। ঐ রাজনৈতিক দিক, মানে আপনার ঐ বিপুল হতাশার কিছু আভাস-ইংগিত দিতে কি কোন অসুবিধে আছে আপনার ?

ঃ অসুবিধে জাররা মাত্র নেই কিন্তু কোন্ কথাটা আর কোন্ বিষয়টা জানাবো আপনাকে, আমি তাল করতে পারছিনে। দৈনিক ঘুরে ঘুরে যতই দেখছি, ততই হতাশায় অবসন্ন হয়ে পড়ছি।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ এই দেশ আর আমাদের এই মুসলমান শাসনের সামনে কেবলই আমি এখন এক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছি জনাব। এক ফোঁটা আলোর আভাস পাচ্ছিনে।

ঃ আচ্ছা ! এই ব্যাপার ?

কণ্ঠে জোর দিয়ে দিলওয়ার আলী বললেন—ব্যাপারটাকে একদম ফালতু বলে ভাবার কোন অবকাশ নেই জনাব। রাজধানীর ভেতরে কি হচ্ছে, তা হয়তো জানেন না। কিন্তু এই ইংরেজদের আচরণ আর আগ্রাসন দেখে কি কিছুই বুঝতে পারছেন না?

প্রবল প্রতিক্রিয়া তুলে ফৌজদার সাহেব বললেন—না-না, ফালতু বলে ভাববো কেন আর এই ইংরেজদের আচরণ দেখে কিছুই বুঝতে পারবো না কেন ? এ ভাবনা তো আমিও মাঝে মাঝে ভাবি এখন।

ঃ ভাবেন ?

ঃ রাজধানীর ভেতরের খবর যে কিছুই জানিনে তা নয়। তবে ইংরেজদের



www.amarboi.org

ব্যাপারটা তো চোখের উপরই দেখছি। এরা যেভাবে বেড়ে চলেছে দিন দিন, তাতে আপনার মতো আমিও এ মুলুকের সামনে আঁধারই দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি।

উৎসাহিত হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন — এইতো-এইতো! তাহলে আর আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে কেন জনাব? আপনি নিজেও তো ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছেন।

ঃ তা পেরেছি ঠিকই। তবে আপনি যতখানি হতাশ হয়ে পড়েছেন, ততটার সাথে আমি কিন্তু পুরোপুরি শরিক হতে পারছিনে।

দিলওয়ার আলী কিঞ্চিৎ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — কেন তা পারছেন না?

ঃ আপনার দুঃশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু কি ইংরেজদের এই আগ্রাসন?

ঃ যদি তা-ই হয়, তাহলেই বা আপনার দ্বিমত পোষণ করার ফাঁকটা কোথায়? নিজেও তো আপনি কমভুক্তভোগী নন? বরং আমার চেয়ে আপনার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে অনেক বেশী।

ঃ কসুর নেবেন না। আপনি কি মনে করেন, আশা-ভরসা বিলকুলই খতম হয়ে গেছে? অন্তিম ঘন্টা বেজে গেছে এ মুলুকের?

ঃ মানে?

ঃ এই ইংরেজদের রোখার আর কোন পথই নেই?

ঃ তার আগে মেহেরবানী করে আপনিই বলুন, আপনি নিজে কি মনে করেন?

ঃ নিজের আমার অনেকখানি অভিযোগ থাকলেও, আমি তো মনে করি, এখনও সময়টা শেষ হয়ে যায়নি। এখনও যদি আমাদের হুকুমাত মানে বাংলার নবাব আবার হুংকার দিয়ে উঠেন, তাহলে এই ইংরেজদের প্রতিহত করা খুব একটা দুরূহ ব্যাপার নয়।

দিলওয়ার আলী অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ! আপনার সাথে ফারাগটা আমার এখানেই। আপনি ভাবছেন সেরেফ এই একটা দিক নিয়ে, আমি ভাবছি তামাম দিকে তাকিয়ে।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ হুংকার দিয়ে উঠার মতো শক্তি থাকলে যে ইংরেজেরা কোন সমস্যাই নয়, সেটা আমিও বুঝি। কিন্তু যাদের নিয়ে শিকারী বাঘ শিকার করবেন, তারাই যদি শিকারীকে জালে জড়িয়ে আজীবন পঙ্গু করে রাখে কিংবা তারাই যদি শিকারীকে শিকার করে ফেলে, সে শিকারী আর বাঘ মারবে কি?

ঃ তার মানে?

ঃ কথাটা আর একভাবেও বলা যায়। যে সরষে দিয়ে ফকির ভূত তাড়াবে, সেই সরষের মধ্যেই যদি ভূত ঢুকে থাকে আর সেই ভূতই যদি ফকিরের ঘাড় মটকিয়ে দেয়, তাহলে আর ফকির ভূত তাড়াবে কি?

বিস্ফারিত নেত্রে দিলওয়ার আলীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কুলী খান বললেন —বলেন কি ভাই সাহেব! বাংলার হুকুমাতের হালত এখন এই পর্যায়ে? মানে এমনই এক প্যাঁচের মধ্যে পড়ে আছে?



www.amarboi.org

ঃ বিলকুল। আভ্যন্তরীণ যে জালে আমাদের এই হুকুমাতটা ক্রমেই জড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে এই জাল ছিঁড়ে এ হুকুমাতের বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। হয়তো বা আমাদের এই মুসলমান শাসনের জিন্দেগীটা ঘরের আঘাতেই খতম হয়ে যাবে, বাইরের কাউকে হাত লাগাতেই হবে না।

ঃ তাজ্জব ! ভেতরের কিছু কথা শুনেছি। কিন্তু এতটা তো আদৌ ভাবিনি !

ঃ এতটাই। একটা আশা ছিল যে, বাইরে থেকে কোন রকম আঘাত যদি না আসে, তাহলে হয়তো ঘরের আঘাতটা আমাদের এই মুসলিম শাসন ধুঁকে ধুঁকে কোন মতে সামলে নিতেও পারে। কিন্তু অবস্থা যা দেখছি, তাতে বাইরে থেকে আঘাত আসার সম্ভাবনাও বিপুল।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ ঘরের কীলই যার সামাল দেয়ার সামর্থ নেই, তার উপর যদি বাইরের কীলও পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লাশ বনে যাওয়া ছাড়া এই হুকুমাতের আর গত্যন্তর কি আছে ?

ঃ সর্বনাশ ! ভেতরের অবস্থা এতটা করুণ ?

ঃ এতই করুণ। এর উপর এই ইংরেজ। সাধে কি আর একা একা বসে আমি ভাবি জনাব ? মওকা পেলেই এরাও যে আঘাত করে বসবে, এ নিয়ে আর আমার আদৌ সন্দেহ নেই।

ফৌজদার সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—সন্দেহ কি বলছেন ভাই সাহেব ? আঘাত করার জন্যে এরা এক পায়ে খাড়া। আঘাত এরা হানবেই, শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

ঃ তাহলে তো হয়েই গেল। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বলে যে একটা কথা আছে, ব্যাপারটা তাহলে ঠিক ঐ রকমই হবে। নিজেরাই যারা মারতে চায়, তারা আর ঐ খাঁড়ার ঘা রোধ করতে আসবে না। বরং সুবিধে লাভের আশায় তারা আরো ঐ খাড়াওয়ালাদের এগিয়ে গুছিয়ে দেবে। ফলাফল যা হবার তাই হবে। এই হুকুমাতের নিশ্চিত কবর আর এই কওম ও মুলুকটার নিঃসীম অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

ঃ উঃ ! এসব কি কথা শুনাচ্ছেন ভাই সাহেব ? আপনারা তাহলে করছেন কি ? ভেতরের এই অবস্থার কথা নবাবকে আপনারা সমঝে দিচ্ছেন না কেন ?

ঃ কে দেবে ? যে লোক চিকিৎসার বাইরে, তার চিকিৎসা করবে কে ?

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ নিজে আমিও কম চেষ্টা করিনি। কিন্তু তামামই বে-কায়দা। যে লোক এই অপচেষ্টা করতে যাবে, অনধিকার চর্চার অপরাধে আর চক্রান্তকারী সাব্যস্ত হয়ে, তারই প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হবে। সাধ করে মরতে কে যাবে, বলুন ?

ঃ কি গজব ! তাহলে তো সত্যিই বড় চিন্তার ব্যাপার !

দিলওয়ার আলী উদাস কণ্ঠে বললেন—যে কয়দিন চলে, এই রকম গড়িয়ে গড়িয়ে চলা ছাড়া, ভবিষ্যতেও যে এ হুকুমাত তেমন কোন শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে, এ ভরসা দেখিনে। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।



www.amarboi.org

অতীত আচরণে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও, ফৌজদার সুজাকুলী খানও একজন মোটামুটি দেশ প্রেমিক লোক। আর না হোক, ইংরেজদের উপর্যুপরি আঘাতই তাঁকে দেশপ্রেমিক বানিয়েছে। দিলওয়ার আলীর মুখে এই চরম কথা শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আপনার সাথে এখন আমি একমত ভাই সাহেব। এ মুলুকের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভেতরের দুশমনেরা কতটা কি করবে জানিনে, তবে আমার স্থির বিশ্বাস, এ দেশটা এই ইংরেজরাই নিয়ে নেবে।

ঃ ফৌজদার সাহেব !

ঃ তাড়ানো বাঘ ঘরে ডেকে আনলে, সেকি আর ছেড়ে কথা বলবে ? বাগে পেলেই গৃহস্তের ঘাড় সে নির্ঘাত মটকাবে।

ঃ কেমন ?

ঃ আমি ইংরেজদের কথা বলছি ভাই সাহেব। নবাব শায়েস্তা খান বাহাদুর এদের তল্পিতল্পা সহ এদেশ থেকে বিদায় করেছিলেন। অথচ আমাদের বদ নসীব। যারা এই বাংলার তথা তামাম হিন্দুস্তানের কর্ণধার, তারাই আবার দাওয়াত করে এদের ঘরে এনে তুললেন। ভবিষ্যৎ আর থাকে কি ?

প্রবল বেগে নড়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব্যাপারটা আপনি কতখানি জানেন জনাব ? আমি যা ভাসাভাসা জেনেছি, তাতে এ আপদ ঐ নবাব শায়েস্তা খান বাহাদুরই নাকি এদেশ থেকে একদম বের করে দিয়েছিলেন। কিভাবে তারা গেল আবার কিভাবে ফিরে এসে জুড়ে বসলো এতটা এ ইতিহাস কতখানি জানেন আপনি ?

ঃ কতখানি কেন ? বলতে পারেন, প্রায় তামামটাই জানি।

সন্দিগ্ধচিত্তে দিলওয়ার আলী বললেন—কি করে ?

ঃ স্থান আর পরিবেশের কারণে। এই হুগলী এলাকাই হলো ঐ ইংরেজ বেনিয়াদের প্রধান রঙ্গমঞ্চ। এখানে আর ওদের নিয়ে কাজ করতে হলে, ওদের অতীত-বর্তমান সব কীর্তিই জানতে হবে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ এখানের প্রশাসনে যে থাকবে, সে দায়ে পড়েই ওদের ঐ ইতিহাসের আদ্য অন্তের সাথে পরিচিত হয়ে যাবে।

ঃ জনাব !

ঃ আর স্রেফ সে কেন ? আমার বিশ্বাস, এই হুগলীর প্রতিটি বাসিন্দাই ইংরেজদের এদেশে আগমন-পুনরাগমনের ইতিহাস মোটামুটি জানে। 'গাঁয়ে পড়লে-গায়ে পড়ে।' ওদের উৎপীড়ন বংশপরম্পরা ওরাও তো কম ভোগ করে আসছে না ?

ঃ আচ্ছা। তাহলে জনাব তকলিফ বোধ না করলে, ঘটনাটা সংক্ষেপে তুলে ধরুন তো, শুনি ? প্রতিকার তো করতে কিছু পারবো না, তবে নিজেদের এই দুর্ভাগ্যের সঠিক কাহিনীটা মোটামুটি জেনে থাকলে দোষ কি ?

কাহিনীটা এমন কিছু আচানক নয়। ব্যাপারটা চিরন্তন আধি-ব্যাধি আপদ-বালাই আপ্‌ছে আপ্ আসমান থেকে ঝরে পড়ে না। ইনসানের আদব আক্কেলই এর



www.amarboi.org

জন্যে বহুলাংশে দায়ী। প্রকারান্তরে ইনসানই যখন এসবের উপকরণ যোগায় আর পরিবেশ পয়দা করে, তখনই উদ্ভব হয় এ সবের। আগুন লাফিয়ে গিয়ে কারো ঘরে লাগে না। কেউ যখন লাগিয়ে দেয় বা লাগার ব্যবস্থা করে রাখে, তখনই আগুন লাগে ঘরে। ইনসানের বিবেকহীন আচরণে পরিবেশ দূষিত হলে, প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজারটা বিমার-ব্যাধি আর আপদ বালাই আসবেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর আসমানী গজবটাও অকারণেই আসে না। মানুষের অমানুষিক কার্যকলাপে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলেই এ দুনিয়ায় গজব নাযেল হয়। নূহের (আ) প্লাবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাংলার ভাগ্যাকাশে ইংরেজ বেনিয়া নামক এই আপদ বা দুর্যোগের সমাবেশটাও ঐ একই প্রক্রিয়ায় ঘটেছে। দূরদর্শী ব্যক্তিরা মহামারীর বিষ বীজানু ঝেড়ে-মুছে, ধুয়ে-পুড়িয়ে গ্রাম থেকে বিদায় করে। অদূরদর্শী ব্যক্তিরা গায়ে-পোশাকে বয়ে আবার সেই বীজানু গ্রামে এনে ঢোকায়। দূরদর্শী নবাব শায়েস্তা খান আঁচ করলেন মুসিবতের আলামত। হুকুম দিলেন—ইল্লত হঠাও—

হুকুম তামিলে তৎক্ষণাৎ তৈরী হলেন বাংলার একদল বাঘ। ফৌজদার আবদুল আজিজ, আবদুল গণি, সালার আব্‌দুস্ সামাদ প্রমুখ শার্দুলেরা হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেনিয়াদের ঘাড়ের উপর। বাঘ পড়লো ছাগের পালে। যুদ্ধ জাহাজ সহকারে বলপ্রয়োগ করতে এসে ইংরেজ সালার নিকোল্‌সন বাঘে ধরা ছাগের মতো সসৈন্যে ডুকরে উঠলো। কোৎকার ঘায়ে কুঁক্‌ড়ে গেল ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর কুখ্যাত বণিকেরা। বাংলায় রাজত্ব স্থাপনের খোয়াব তাদের ছুটে গেল। 'ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি' আকারে তল্পীতল্পা গুটিয়ে নিয়ে তারা উর্ধশ্বাসে পালিয়ে যেতে লাগলো। জাহাজ-বজরা ভাসিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো হুগলী নদীর ভাটিতে। শেয়াল-তাড়ানো তাড়িয়ে নিয়ে পিছে পিছে ধাওয়া করলেন বাংলার শার্দুলেরা। সূতানটী ও হিজলীতে এসে পুনরায় শয়তানীর প্রয়াস পেতেই আবার তাদের ঘিরে ধরে তূলা-ধুনা ধুনতে লাগলেন। দুবৃত্তেরা দুস্‌রা বার দৌড় দিল আতংকে। ভয়ে-তরাশে অনেকেই ঝাঁপ দিল দরিয়ায়। ডুবে-ঝেঁপে জাহাজ চালিয়ে পড়িমরি বাংলা ছেড়ে বঙ্গোপসাগরে ঢুকলো তারা এবং বাংলার নাওয়ারার (নৌবহরের) হাতে আর একদফা ধোলাই খাওয়ার ভয়ে একটানা ছুটতে লাগলো মহাসাগরের দিকে। ফৌজ নিয়ে নিকোলসন আর মালমাত্তা-লোকজন নিয়ে হুগলীর কুঠিয়াল প্রধান জবচার্নক ও অন্যান্য কুঠিয়ালরা ছুটতে ছুটতে অবশেষে মাদ্রাজের ঘাঁটিতে এসে আছাড়া খেয়ে পড়লো। সাফ হলো ইল্লত। বাংলার জমিন থেকে উৎখাত হলো ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর দৌরাত্ম্য।

কিন্তু কথায় বলে, এক পিটনে লাজ হয় না নির্লজ্জের। নিকোলসনের অধীনে প্রচুর লোক-লস্কর ও কামান-বন্দুক দিয়ে এক সাথে স্বদেশ থেকে প্রেরণ করে। এক থাবায় বাংলা মুলুক তুলে নিয়ে যাবে তারা, এই ছিল আশা। কিন্তু বাংলার বাহিনীর বেদম প্রহারে তাদের ঐ পর্বত প্রমাণ শক্তি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ায়, প্রচণ্ড ঘা লাগলো ইংলন্ডে অবস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও ইংরেজ জাতির অহমিকায়। শক্তির অহংকারে



www.amarboi.org

আর একবার গর্জে উঠলো তারা। নিকোল্‌সনকে বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন হীথ্ নামক আর একজন অহংকারী সালারকে আবার তারা পাঠিয়ে দিলো বাংলা মুলুকের বিরুদ্ধে। বিপুল রণপ্রস্তুতি নিয়ে বাংলার দিকে ছুটে আসতে লাগলো হীথের নৌবহর। আক্রোশ দুরন্ত।

কিন্তু এই মুহূর্তে দিল্লী শাহীর খেয়ালীপনা দেখে কে ? রোম যখন পুড়ছিল, রোমের বাদশাহ নীরো নাকি তখন প্রাসাদের ছাদে বসে বংশীবাদন করছিলেন। পুরাকালের কাহিনী কাহিনীটা যত পুরানোই হোক, মা'শাআল্লাহ নীরোর উত্তরসূরীর অভাব কি এই দুনিয়ায়। যুগে যুগে হাজার নীরো হাজার জায়গায় বিদ্যমান। দিল্লীতেও এই সময় এমন অনেক নীরো দিল্লীর দরবার গুলজার করে বসেছিলেন। বাংলার দুর্দিন নিয়ে থোড়াই ভাবনা ছিল দিল্লীর প্রশাসনের। হীথের যুদ্ধজাহাজ যখন মার মার রবে বাংলার দিকে ধেয়ে আসছে, ঠিক সেই ওয়াক্তে বাংলার সিংহ পুরুষ নবাব শায়েস্তা খানকে বাংলা থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। বাদশাহ আওরঙ্গজেব আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে। বাংলা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তাঁর ছিল না। দিল্লীতে অবস্থিত স্বার্থপর শাহী পুরুষ ও সভাসদের দল, সিংহবিহীন বনের মতো বাদশাহ বিহীন রাজধানীতে গা-গতরে আতর মেখে হাওয়া খেয়ে ফিরছিলেন প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও, বাংলায় যা ঘটছে তা নিয়ে আদৌ এদের মাথাব্যথা ছিল না। ফলে, এই সংকটময় মুহূর্তে, সুদূর দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত বাদশাহ যখন কিছুটা না বুঝেই শায়েস্তা খানকে সরিয়ে নিয়ে অন্য একজন অকর্মণ্য সভাসদকে বাংলার সুবাদার করতে গেলেন, তখন রাজধানীর এই নীরোরা নাকে কাঠি দিয়েও হাঁচ্‌লেন না বা এতটুকু সৎ পরামর্শও দিলেন না। শায়েস্তা খান সরে গেলেন। বাংলার ভারপ্রাপ্ত সুবাদার হয়ে এলেন বৃদ্ধ ও অকেজো লোক খান-ই-জাহান সাহেব।

বাংলার দফা এইবারেই রফা হয়ে যেতো। হলো না কেবল বাংলার বীর সৈনিকদের একাগ্রতার কারণে। নবাব শায়েস্তা খানের বিদায় খবর শুনে, সালার-সেপাই-ফৌজদারেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাংলা ছাড়া করলেও, মাদ্রাজে অবস্থিত ইংরেজদের ঘাঁটি বড় মজবুত ঘাঁটি। এখানে তারা যদেচ্ছা শিকড় গজিয়ে চলেছে। অন্য লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে বাদশাহ আওরঙ্গজেব এদের এই ঘাঁটির দিকে মোটেই নজর দিলেন না। এক চক্ষু হরিণের মতো এটা তিনি এড়িয়ে গেলেন বরাবর। বর্তমানটাই দেখলেন কেবল, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবলেন না। পালিয়ে এসে ইংরেজরা এই ঘাঁটিতে দিব্যি হালে রইলো। ঘুমিয়ে রইলো, এমনটি ভাবা নির্বুদ্ধিতা। বাংলার ধন-সম্পদের নিখাদ খোঁজ পেয়েছে ভূখা-নাঙ্গা মুলুকের বে-লেহাজ চোর-চোট্টা। চুন্নি বেলাই স্বাদ পেয়েছে দুধের। এক তাড়াতেই এ লোভ তাদের বিদূরিত হবার নয়। কোমরের বিষ কমে এলেই আর একবার যে হানা তারা দেবে, এ আশংকা নবাবসহ সালার-সেপাই সবার দীলেই ছিল।

তাই, নবাব শায়েস্তা খানের বিদায় খবর শুনেই সালার-সেপাইরা বিষন্ন দীলে এসে ঘিরে ধরলেন নবাবকে। নবাব তাঁদের দীলের কথা বুঝলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে



www.amarboi.org

তাদের তিনি উৎসাহ দিয়ে বলে গেলেন, এদেশ তোমাদের। একে হেফাজত করা তোমাদেরই নৈতিক দায়িত্ব। দেশ ও কওমের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করা একান্ত এবং অতি পবিত্র কর্তব্য। 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী' — এ মর্যাদা আসমানী মর্যাদা।

'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী' — এই পবিত্র প্রেরণা বাংলার জোয়ানদের দুর্বার করে তুললো। বিভেদের বালাই তখন বাংলার সেপাই-সালার ও জঙ্গী লোকের মধ্যে জাররামাত্র ছিল না। একজোটে সবাই তারা পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হীথের বহর এসে বালাশোরে ঢুকতেই হাতুড়ীর ঘায়ের মতো হীথের বহরের উপর একযোগে ঘা ফেললো বাংলার লড়াইয়ারা। আঁতকে উঠে পিছু হটলো হীথ। সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করে সে বাঁকা পথ ধরলো। রাতের অন্ধকারে চোরের মতো গিয়ে হীথ বালাশোরের নয়া শহর অতর্কিতে দখল করলো এবং সেখানে অগ্নি সংযোগ করলো। বাংলার ফৌজ সংগে সংগে গিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণে ঘিরে ধরলো হীথকে। শুরু হলো তীব্রতর লড়াই। কয়েকদিনের এ লড়াইয়ে সর্বশান্ত হয়ে, বাংলার দিকে এভাবে সরাসরি এগুনোর সাহস উবে গেল হীথের। রণ ভঙ্গ দিয়ে সে পেছন দিকে জাহাজ ভাসিয়ে দিলো এবং চট্টগ্রাম দখল করে বাংলা মুলুক আক্রমণ করার নয়া ঘাঁটি খোলার জন্যে রওনা হলো।

আশাই হলো আকাশ কুসুম। চট্টগ্রামের কাছাকাছি এসেই হীথের পিলে চমকে গেল। সেখানের রণ প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশ দেখে তার চোখ উঠলো কপালে। চট্টগ্রামের উপকূলে বাংলার নৌবহর আর তীর বরাবর বেশুমার অশ্বারোহী ফৌজ বাঘের মতো হুংকার দিয়ে ফিরছে। তীরে নামার চেষ্টা করলেই স্থলে-জলে উভয়দিকে শুরু হবে চোরের মার। হীথ আর একবিন্দুও এগুনোর সাহস পেলো না। সে বহর নিয়ে পিছিয়ে এসে মহাসাগরের ঢেউ গুণতে লাগলো। একটানা কয়েকদিন সাগর বক্ষে ভেসে বেড়ানোর পর সে বহরের মুখ ঘুরিয়ে দিলো। হতাশ দীলে ফিরে এলো মাদ্রাজে।

হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূলেও ইতিমধ্যে মুঘল বাহিনীর সাথে ইংরেজদের লড়াই শুরু হয়েছিল। সেখান থেকেও উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল বেনিয়ারা মাদ্রাজে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। একমাত্র মহাসাগর ছাড়া, পূর্ব-পশ্চিম উত্তর দিক তাদের সামনে হারাম হয়ে গেল।

এই সময় ইংরেজদের অবস্থা বড় করুণ। এক ধাক্কাই এখন ইংরেজদের মাদ্রাজ ঘাঁটি উৎখাত করতে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কার গোহালে কে দেয় ধোঁয়া ! বাংলার আওতা থেকে মাদ্রাজ বন্দর বহুদূরে মহাসাগরের সীমানাতে অবস্থিত। একমাত্র দিল্লীর বাদশাহই পারতেন এই ধাক্কা মারতে। কিন্তু তিনি তো তখন মুগুর ভাঁজছেন অন্যখানে।

ইংরেজরা খামুশ হয়ে গেল। তারা অনেক রক্ত দিয়ে উপলব্ধি করলো, ক্ষয়িষ্ণু হলেও, মুঘলশক্তি এখনো বড় শক্ত পেরেক। বাংলার তো কথাই নেই। গায়ের জোরে ভাঁজানো একে সহজ নয়। এ প্রক্রিয়ায় আম-ছালা সবই তাদের যাবে। বাহুবলে



www.amarboi.org

বাংলা মুলুকে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় তারা কয়েক আঁজলা পানি বাড়িয়ে দিলো। ভগ্নদীল ক্যাপ্টেন হীথ ধুঁকতে ধুঁকতে পথ ধরলো স্বদেশের।

এক বেদনাবিধুর বোষ্টুমী একদিন তার বিগত স্বামীর প্রশংসায় জার জার হয়ে বলেছিলো, "ভাত না দিক গোঁসাই আমার কীল দেয়নি একদিনও।" বাংলার ভারপ্রাপ্ত সুবাদার খান-ই-জাহান সাহেবও এই কিসিমের প্রশংসা পাওয়ার অনেকখানি হকদার। তাঁর এক বছর কাল সুবাদারীর মধ্যে সুকাজ তেমন না করতে পারলেও, কিছু অর্থ বানানো ছাড়া, দেশ ও কওমের বিরুদ্ধে বড় কোন কুকাজ তিনি করেননি। তিনি এসে বাংলার ভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই শুরু হয় ইংরেজদের সাথে এই দ্বিতীয় দফার লড়াই। লড়াইটা পুরোপুরি শেষ না হতেই শেষ হয় তাঁর সুবাদারী। লড়াই করে বাংলার লড়াইয়ারা। লড়াইয়া ও বেনিয়াদের ব্যাপারের মধ্যে তিনি বাঁ হাত দিতে যাননি। খান-ই-জাহানের পরে যিনি এলেন, তিনিও সুকাজ কিছু করেননি। কিন্তু দেশ ও জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কুকাজটা তিনি এতবেশী করে গেলেন যে, "ভাত দেয়ার মুরোদ নেই, কীল দেয়ার গোঁসাই" বলে তাঁকে নির্দ্বিধায় আখ্যায়িত করা যায়। ইনি সুবাদার ইব্রাহিম খান। যেমনই দায়িত্বহীন, তেমনই অদূরদর্শী।

বাদশাহ ও সুবাদারদের মিলিত এই অদূরদর্শীতার জন্যেই এতটার পরও ইংরেজ বণিকেরা এদেশে রয়েই গেল। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের উদাসীনতা এদেশে এদের থেকে যাওয়ার সহায়ক হলো আর এসব সুবাদার ও পরবর্তী বাদশাহদের অদূরদর্শীতা, দায়িত্বহীনতা এবং অন্ধ স্বার্থবোধ আবার এদের মজবুত করে বাংলার বুকে বসিয়ে দিল।

ইংরেজরা নিরন্ন দেশের লোক। যাতনা ও জিল্লতির ভয়ে বাংলার এই অঢেল সম্পদ ফেলে গেলে চলবে কেন তাদের? অনাহারে শুকিয়ে মরতে কে চায়? এখন যা কিছু চিক্‌নাই তাদের দেশ ও জাতির গায়ে ধরেছে, তা তো এই মুলুকে বাণিজ্য করার বদৌলতেই? এছাড়া উচ্চাকাঙক্ষাও একটা বরাবরই তাদের আছে। জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে টিকে থাকার আকাঙ্খা। সে জন্যে সম্পদ চাই। কাঁটার ভয়ে ফুল তুলতে নারাজ হলে কি চলে তাদের? ঠেলা খাওয়ার পর, বলের চেয়ে বুদ্ধি বড় এটা বুঝতে একদণ্ডও বিলম্ব তারা করেনি। বল পরিহার করে তারা ভর করলো বুদ্ধির উপর। চতুরতার সাথে তাদের শরমও কম ছিল অনেক। তাই স্বার্থ হাসিলের প্রয়োজনে পায়ে পড়তে সংকোচটা আদৌ তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিপদে পড়ে বিনত হলো তারা। পায়ে পড়লো হাঁটু গেড়ে। অনুতপ্ত দীলে বাদশাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো। সেই সাথে বাদশাহকে তারা সবিনয়ে জানালো, কৃত অপরাধের লক্ষাধিক টাকা জরিমানা সহ যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষতি পূরণে তৈয়ার তারা। বিনিময়ে, বাদশাহর অনুগত গোলাম মাফিক বাংলা মুলুকে পুনরায় বাণিজ্য করার অনুগ্রহটুকুই তাদের শুধুমাত্র প্রার্থনা। এমন হীন আচরণ আর তারা কখনোই করবে না এবং ধার্য জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ, হুকুম হলেই, গুণে দেবে নগদ নগদ।



www.amarboi.org

"খোলোরে খেলো বাছারে হামার বউয়ে গিলেই খেলো,"—এই ঘরোয়া উক্তির মতোই ব্যাপারটা হলো বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীরের। তাঁর ঐ দাক্ষিণাত্যের জীবন-মরণ লড়াইটাই গিলে খেলো তাঁকে। গিলে খেলো তাঁর সব। ঐ লড়াই নিয়ে তিনি এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য আর সব ঝামেলাই তাঁর কাছে বিড়ম্বনার ব্যাপার ছিল। ইংরেজদের নিয়ে এই চলমান ঝামেলাটাও তাঁর পক্ষে ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। মুঘল সাম্রাজ্য থেকে ইংরেজদের পুরোপুরি উৎখাত করতে হলে যে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, সে সময় তাঁর না থাকায় একটা শান্তি স্থাপন হয়ে যাক, বাদশাহও এটা চাচ্ছিলেন। তার উপর ছিল আবার ঐ নগদ অর্থের আকর্ষণ। দাক্ষিণাত্যের লড়াইয়ের খাতে অর্থের অভাব বরাবরই ছিল তাঁর। ইংরেজ বেনিয়াদের ঐ প্রস্তাবিত অর্থ আর তাদের মতো একটা বড় কোম্পানীর বাণিজ্য এ দেশে চললে, তার সম্ভাব্য আয়—এই উভয়বিধ অর্থের আকর্ষণও বাদশাহকে কাবু করে ফেললো। সুবাদার ইবরাহীম খানের মতামত চাইলে, চিন্তা-ভাবনার ঝুট্‌ঝামেলায় না গিয়ে দায়িত্বহীন ইবরাহীম খান ঝুটমুট বলে দিলেন—জি হুজুর, এ অতি উত্তম কাজ।

রফা হয়ে গেল। দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মোটা অংকের নগদ অর্থ পেয়ে বাদশাহ তাদের পুনরায় বাংলা মুলুকে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করলেন। সুবাদার ইবরাহীম খানকে নির্দেশ দিলেন চুক্তি মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন বাদশাহ। স্বাধীনভাবে কুঠিস্থাপন করতে দেবেন, এমন কথা এ চুক্তিতে ছিল না। কিন্তু সেটা তলিয়ে দেখে কে? নীরিহ মানুষ বলে ইংরেজদের কিছু স্তুতি ইতিমধ্যেই সুবাদার ইবরাহীম খানের কানে দেয়া হয়েছিল। বাদশাহর নির্দেশ পেয়েই তিনি নেচে খাড়া হলেন। ইংরেজ কুঠিয়াল প্রধান জব চার্নককে তিনি বেরাদরী হালে পত্র মারফত দাওয়াত করে ডেকে নিলেন এবং এদেশে খোশহালে বাণিজ্য করার ছাড়পত্র দিলেন। তারা কুঠিস্থাপন করবে কিনা, করলে কোথায় করবে, কোথায় করতে দেবেন—এসব নিয়ে বলতেও কিছু গেলেন না, তাদের কার্যকলাপ দেখতেও গেলেন না।

চতুর বেনিয়ারা সুবাদার ইবরাহীম খানের এই উদাসীনতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। তারা শুধু সাড়ম্বরে কুঠিস্থাপনই করলো না, তাদের একান্তই সুবিধে মতো স্থানে তারা কুঠি স্থাপন করে বসলো। বরাবর তাদের কেন্দ্রিয় কুঠি ছিল হুগলীতে। হুগলীর ফৌজদারের সরাসরি নজরের মধ্যে তাদের প্রধান কুঠি রাখা হয়েছিল এবং সেইভাবেই কুঠি তুলতে দেয়া হয়েছিল। হুগলীর বদলে এবার সূতানটীতে গিয়ে তারা প্রধান কুঠি স্থাপন করলো। সূতানটী হুগলী থেকে অনেক দূরে। ফৌজদারের নজরের অনেক বাইরে। এছাড়াও, বাণিজ্যিক ও সামরিক দিক দিয়ে ইংরেজদের জন্যে সূতানটী ছিল অত্যন্ত অনুকূল স্থান। মাল পাচার করার আর মাদ্রাজ থেকে এক পলকে সামরিক সাহায্য পাওয়ার উত্তম স্থান সূতানটী। সুযোগ পেয়ে এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করলো তারা। দায়িত্বহীন সুবাদার কিছুই তলিয়ে দেখলেন না।



www.amarboi.org

তাঁর দায়িত্বহীনতার আহামরি দিক এই একটিই নয়, একাধিক। এই সময় উড়িষ্যার পাঠান নেতা রহিম খান ও মেদিনীপুরের জোতদার শোভাসিং বিদ্রোহ করে মুঘল শক্তিকে হ্যাস্তন্যাস্ত করতে লাগলো এবং নানাস্থানে লুট তরাজ চালাতে লাগলো। সামরিক শক্তি গড়ে তোলার বদ মতলব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বরাবরই ছিল। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তারা। এই বিদ্রোহ তাদের সেই সুযোগ এনে দিল। বিদ্রোহীদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাবে—এই অজুহাত এনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে ইংরেজরা সুবাদারের অনুমতি চাইলো। দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী। এসব কিছুই চিন্তা-ভাবনা না করে, অপরিণামদর্শী সুবাদার ইবরাহীম খান দায়িত্বহীনভাবে "নিজেদের কুঠি তোমরা নিজেরাই সামলাও" বলে এ ব্যাপারে তাদের ঢালাও অনুমতি দান করলেন।

ব্যস্ ! একে ক্ষুধার্ত তাতে ফলার। এই অনুমতি তারা চূড়ান্তভাবে কাজে লাগালো। সৈন্য সমাবেশ করা সহকারে সূতানটী তথা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিশাল ও দুর্ভেদ্য দুর্গটি গড়ে তুললো। সৈন্য, সমরাস্ত্র ও দুর্জেয় দুর্গ নিয়ে ইংরেজরা আবার বাংলার বুকে গাঁট হয়ে বসে গেল। দিল্লীর বাদশাহ রইলেন দাক্ষিণাত্যে। বাংলার সুবাদার রইলেন দিবানিদ্রায় বিভোর। এই ফাঁকে ইংরেজরা শক্তভাবে কোমর বেঁধে নিলো। উল্লেখ্য যে, ঐ একই অজুহাতে চন্দন নগরে ফরাসীদের ফোর্ট অর্লিয়ান্স ও চিচুঁড়ায় ওলন্দাজদের ফোর্ট গষ্টাভাস্ দুর্গও গড়ে উঠলো।

গোদের উপর বিষ ফোড়টা দেখা দিল, ইবরাহীম খানের স্থলে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নাতী শাহজাদা আজিম-উশ-শান বাংলার সুবাদার হয়ে আসার পর। শাহজাদা আজিম-উশ-শান ছিলেন আরো অধিক অদূরদর্শী ও একেবারেই স্বার্থপর। অর্থই ছিল তার একমাত্র কাম্যবস্তু। "মিন্‌ষে গেছে ধান কাটিতে তারে বাঘে ধরে খাক, আমার দেওরা বেঁচে থাক।" দেশ-জাতি জাহান্নামে যাক, অর্থপ্রাপ্তি ঘটলেই তিনি খুশী। বাংলায় তিনি এলেন বাংলার স্বার্থ দেখতে নয়, নিজের স্বার্থ বানাতে। বৃদ্ধ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই এক পাল ওয়ারিশের মধ্যে তাঁর মসনদ নিয়ে যে "মার দ্য-কুড়োল" লড়াই শুরু হবে, সেই লড়াইয়ে অংশ নেয়ার মাল কামানোর জন্যে তিনি এলেন। অর্থ ছাড়া শক্তি সংগ্রহ করবেন তিনি কি দিয়ে আর শক্তি না থাকলে দিল্লীর মসনদ পাবেনই বা কি করে ?

শাহজাদার এই অর্থ লিপ্সার সুযোগ নিয়ে অনেকেই অনেক ফায়দা লুটলেন। সবচেয়ে বড় ফায়দা লুটে নিলো ইংরেজ বণিকেরা। মাত্র ষোল হাজার টাকা নজরানার বিনিময়ে তারা এদেশের জমিদার বনে গেল। অর্থাৎ, ঐ উপঢৌকনের বিনিময়ে শাহজাদা আজিম-উশ-শান ইংরেজদের কলিকাতা, সূতানটী, গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন জমি মালিকের নিকট থেকে কিনে নিয়ে জমিদারী স্থাপন করার অনুমতি দান করলেন। ভবঘুরে বণিকেরা হয়ে গেল এদেশের কিছু অংশের ভূস্বামী, প্রশাসনের অংশিদার ও দেশবাসীর অধিকারের সম অধিকারী। আরো কিছু



www.amarboi.org

টাকা নিয়ে আজিম-উশ্-শান এদেশে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকারও দিয়ে দিলেন ইংরেজদের।

এরপর শুরু হলো ধুম-ধারাক্কা কারবার। "বারো জঙ্গ করে মর্দ কেতাবে খবর, তের জঙ্গ লেখা যায় টঙ্গীর শহর।" জঙ্গটা শুরু হলো বাংলায় এবং শেষে গিয়ে জমাট বাধলো দিল্লীতে। নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার দেওয়ান হয়ে ইতিমধ্যেই এসেছিলেন। তাঁর সাথে শুরু হলো সুবাদার আজিম-উশ্-শানের মোরগ লড়াই। এই লড়াই থেকে জন্ম নিলো বাংলার কর্মকর্তাদের মধ্যে তুমুল কুঁদোকুঁদি। দেওয়ান মুর্শিদকুলী খানকে কেন্দ্র করে এই কুঁদোকুঁদি চলতেই লাগলো অতপর। এরই মাঝে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটলে, তাঁর মসনদ নিয়ে শুরু হলো সেই জঙ্গনামার তের জঙ্গ। দিল্লীতে একের পর এক বাদশাহ্ বদল হতে লাগলো।

বাংলায় কুঁদে আমলারা আর দিল্লীতে নিত্যি নিত্যি তখতে উঠে নয়া বাদশাহ্। কার মড়া কে পোড়ায়? ফাঁকা ময়দান পেয়ে ইংরেজেরা সুনিপুণভাবে তাদের দাপট ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে ফেললো।

যা কিছু ফাঁক-ফোকড় ছিল, শাহজাদা ফররুখ শিয়ার দিল্লীর বাদশাহ্ হয়ে বসে তা নিচ্ছিদ্রভাবে পূরণ করে দিলেন। দেওয়ান থেকে সুবাদার হওয়ার পর মুর্শিদকুলী খান কর-শুল্ক আদায় সহ ইংরেজদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসী হলেন। কিন্তু ফাঁকা ময়দানের স্বাদ একবার যারা পেয়েছে, তারা আর বাঁধন মানবে কেন? জন সুরম্যানের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ বণিক বাদশাহ্ ফররুখ শিয়ারের কাছে এলো মুর্শিদকুলী খানের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দরবার করতে। এই দলে ছিল উইলিয়াম হ্যামিল্টন নামক একজন নামকরা চিকিৎসক। এই চিকিৎসকই মাত করলো বাজী। বাংলায় প্রাসাদ তুললো ইংরেজ বণিকেরা আর বরাবরই তার ভিত্ গাঁথলো ইংরেজ চিকিৎসকেরা। দুর্ভাগ্য, চিকিৎসা শাস্ত্রে তখনও মুসলমানেরা শীর্ষে। থাক সে কথা। এবারও ইংরেজ চিকিৎসকই ইংরেজ প্রভুদের ভিত্ গাঁথলো। বাদশাহ্ ফররুক শিয়ার বীমারগ্রস্ত ছিলেন। হ্যামিল্টনের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। খুশীর আর সীমা কি? রাজ কন্যা সহ অর্ধেক রাজত্ব দিতেই বা ঠেকা কোথায় অদূরদর্শী বাদশাহ্র। ইংরেজদের সুযোগ সুবিধে দেয়ার নামে তিনি এমন এক ফরমান জারী করলেন, যা ইংরেজদের কাছে আলাদ্দীনের চেরাগ তুল্য মূল্যবান ছিল। উৎফুল্ল ইংরেজরা 'ম্যাগ্‌নাকাটা' বা মহাসনদ নামে একে আখ্যায়িত করলো। এই ফরমান বলে তাদের সর্ববিধ স্বার্থ সুরক্ষিত হলো। আচরণে বিচরণে তাদের তামাম বাধা উঠে গেল এবং মাত্র তিন হাজার টাকা বার্ষিক করের বিনিময়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা— এই তিন প্রদেশেই বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার ছাড়পত্র লাভ করলো তারা। বাণিজ্য তো বাণিজ্য, রাজত্বও তারা এই সুযোগে হাসিল করলো আরো খানিক। কলিকাতা, সূতানটী, গোবিন্দপুর— এই গ্রাম তিনটির অতিরিক্ত তারা আরো আট-ত্রিশটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করার অনুমতি পেলো। আর এদের ছান্দে কে?

দেখেশুনে সুবাদার মুর্শিদকুলী খান হাল ছেড়ে দিয়ে আখের গুছাতে লাগলেন এবং বাংলার নবাব হয়ে এঁটে সেঁটে গদীতে উঠে বসলেন। ঠ্যাং বিহীন ঘাটিয়াল



www.amarboi.org

মাফিক মাঝে মাঝে কিছুটা অসার তর্জন-গর্জন করার অধিক আর কিছু করতে তিনি গেলেন না। অন্য কথায়, বাদশাহর অনুগত থাকার অভিপ্রায়ে বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার বিরোধিতা করতে যাওয়া তিনি সমীচিন বোধ করলেন না। পরবর্তীতে নবাব সুজাউদ্দীন খান এসে মেতে রইলেন বিলাসে। এদিকে তেমন নজর দিতেই এলেন না তিনি। কার চুলোয় কে দেয় খড়ি ? কোমর মাজা শক্ত করে নিয়ে ইংরেজেরা এখন বুকে বসে খাচ্ছে আর ধুমছে শান দিচ্ছে ছুরিতে।

এই পর্যন্ত বলার পর হুগলীর ফৌজদার সুজাকুলী খান থামলেন। দম বন্ধ করে শুনার পর দিলওয়ার আলী বসে বসে ভাবতে লাগলেন নীরবে। নবাব মুর্শিদকুলী খান পুনরুজ্জীবিত করলেন মুসলমান শাসনের বুনিয়াদী ঘরের দুশমন। অপরিনামদর্শী বাদশাহরা সমাদরে প্রতিষ্ঠা করলেন উচ্চাভিলাষী বাইরের শত্রু ইংরেজদের। বিদেশী ইংরেজ ও আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তি—এই উভয়ের লক্ষ্যই বাংলার মসনদ। উভয় শক্তিই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে বেধড়ক। একটাকে ঠেকালেও আর একটার হাতে রেহাই নেই বাংলার এই অথর্ব হুকুমাতের।

অপর পক্ষে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এই দুই শক্তির মধ্যে পিরীত গড়ে উঠাও বিচিত্র নয়। পিরীতের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। এদেশের মাল সরবরাহকারীরা অনেকেই হিন্দু। কোম্পানীর এদেশীয় প্রতিনিধি (এজেন্ট) প্রায় তামামই হিন্দু। ব্যাংক ব্যবসায়ী জগৎ শেঠের সাথেও হরদম এদের যোগাযোগ ও হামদরদী ভাব এই সূত্রে এদের মধ্যে একটা সুসম্পর্কও গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। এ সম্পর্ক আরো যদি উষ্ণ হয়, অর্থাৎ এই উভয় শক্তির মধ্যে যদি সমঝোতা গড়ে উঠে একটা, তাহলে ভরাডুবি নিশ্চিত। বাংলার মুসলমান শাসনের সমাধি তো হবেই, এদেশের স্বাধীনতাও লোপ পাবে বাংলার রাজদণ্ড মানদণ্ড বহনকারী বেনিয়ার হাতে গেলে।

## ১১

বিষণ্ন দীল নিয়ে দিলওয়ার আলী হুগলী থেকে ফিরে এলেন। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে তিনি সারা পথ সারা হলেন। কিন্তু তিনি একজন নগণ্য কর্মচারী। হুকুমের গোলাম। কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা সজাগ না হলে, তিনি ভেবে করবেন কি ? এছাড়া, রাজধানী মুর্শিদাবাদ এখন এক উত্তপ্ত উনুন। গায়ে পড়ে এখানে কোন কথা বলতে যাওয়া বা কোন ব্যাপারে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করা মানেই, সাধ করে মুসিবত ডেকে আনা। ব্যাধি এই হুকুমাতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাদশাহ থেকে নবাবতক্ সর্বত্র। তাঁর কি সাধ্য আছে এত ব্যাধি নিরাময় করেন তিনি ? নবাবের চাহিদা মাফিক সম্ভাব্য সুপারিশটুকু পেশ করে দিলওয়ার আলী মকানে ফিরে এলেন।

মকানে এসে নিজের দিকে নজর দিয়ে ঘাবড়ে গেলেন দিলওয়ার আলী। এই সমস্ত ঝড়-বাদলের মধ্যে দিয়ে এত বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, মাহমুদা



www.amarboi.org

খাতুনের কাছে এর জবাবদিহি করার তাঁর আর উপায় নেই। পথ চেয়ে থেকে থেকে বেচারী হয়তো ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

দিলওয়ার আলী হুঁশে এলেন। সংকোচ ও দ্বিধা নিয়ে গড়িমসি করার আর কিছুমাত্র অবকাশ নেই দেখে তিনি সাহস সঞ্চয় করলেন এবং অবিলম্বে ভাইয়ের সাথে রফা করতে রওনা হলেন।

ভাই মীর দিলীর আলী দপ্তর কক্ষেই ছিলেন। তাঁকে নিরিবিলিতে পেয়ে দিলওয়ার আলী তখনই তাঁর শাদির প্রসঙ্গ তুললেন এবং অধিক ভূমিকায় না গিয়ে শাহরিয়ার খান সাহেবের মেয়েকে যে তাঁর শাদি করা সম্ভব নয়—এই মর্মে তাঁর স্থির মনোভাব ভাইকে জানিয়ে দিলেন।

শুনে মীর দিলীর আলী নীরব হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কথা বলতে পারলেন না। তাঁর মুখমণ্ডল খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। দিলওয়ার আলীর এ সিদ্ধান্ত যে ভাইয়ের মনঃপূত হলো না, ভাইয়ের চেহারা দেখেই দিলওয়ার আলী তা যথার্থ উপলব্ধি করলেন। কিন্তু দিলওয়ার আলীর বিকল্প নেই। এখানে তাঁকে দুর্বল হলে চলবে না। তিনি নতমস্তকে চুপ্‌চাপ্ বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ দম ধরে থাকার পর মীর দিলীর আলী নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললেন—অনেকখানি এগিয়ে গেছি আমি এ নিয়ে। তোমার মনোভাবটা আগে জানলে—

মীর দিলীর আলী আবার থেমে গেলেন। তিনি উদাস হয়ে ভাবতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী অসহায় কণ্ঠে বললেন—আমার গোস্তাকী মাফ করুন ভাইজান। আপনার দীলে তকলিফ দেয়ার জন্যে আমি বড়ই পেরেশান বোধ করছি। কিন্তু আমি নিরুপায়।

দিলওয়ার আলীর নত মস্তক আরো অধিক নত হলো। তা দেখে মীর দিলীর আলী নড়েচড়ে উঠে বললেন—না-না, তুমি এজন্যে এতটা ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছো কেন? তোমার অমতে তো কিছুই হতে পারে না।

আশান্বিত হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন—জি?

মীর দিলীর আলী বললেন—আমি ভাবছি আমার দিক। তোমার সাথে এ নিয়ে আরো খানিক খোলামেলা আলাপ করার আগেই এভাবে এগোনো আমার ঠিক হয়নি।

ঃ ভাইজান!

ঃ তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুমি শাদি করবে কাউকে, এটাতো হতেই পারে না কখনোও। এ প্রসঙ্গ আর আমি টানবো না। পারলে, আর একটু চিন্তা করে দেখবে, নইলে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

কথাও এখানেই শেষ করলেন স্বল্পভাষী মীর দিলীর আলী। আর জের টানতে গেলেন না। ভাইয়ের এই মহৎ দীলের প্রতি শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে দিলওয়ার আলী ঘরে ফিরে এলেন।

সে রাতটা দিলওয়ার আলীর পরম খোশে কাটলো। বিপত্তির এতবড় পাথরটা এত সহজেই বুক থেকে নেমে যাওয়ায়, দিলওয়ার আলীর তৃপ্তির অবধি রইলো না।



www.amarboi.org

খুশীর আধিক্যে অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এলো না চোখে। অনাস্বাদিত জিন্দেগীর এক অনুপম নকসা আঁকলেন জেগে জেগে। মাহমুদা খাতুনের অনুপস্থিত অস্তিত্ব অনুক্ষণ দীল তাঁর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো। মাহমুদাকে পেতে আর তাঁর বাধা নেই। ভয় নেই মুরুব্বীদের না-রাজী বা নাখোশের। শংকা নেই জিন্দেগীর এই পরমতম পাওনা থেকে বিড়ম্বিত হওয়ার আর। মাহমুদা খাতুন উন্মুখ, মাহমুদা খাতুনের অভিভাবকেরা অত্যাগ্রহী, নিজে তিনি দায়মুক্ত! বাদবাঁকী আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা।

পরের দিনই দিলওয়ার আলী ইমাম সাহেবের মকানে এসে হাজির হলেন। সংকোচের বালাই একটা থাকলেও, গরজের তাকিদে তিনি তামাম বাধা উপেক্ষা করে পা চালিয়ে এলেন। দীল তাঁর তখন এক সোনালী স্বপনে আচ্ছন্ন। আসন্ন পরিস্থিতির আমেজে বিভোর। কিছু বিলম্বে হলেও, তাঁর এই উপস্থিতি সকলের কাছেই পরিতোষের ব্যাপার হবে, কিছু মান-অভিমান করলেও মাহমুদা খাতুন পুলকিত হয়ে উঠবে এবং সবশেষে তাঁদের ঘিরে এক আনন্দঘন প্রসঙ্গের সূত্রপাত হবে—এসব কথা ভাবতে গিয়ে পুলকের পরশে তিনি পুনঃপুনঃ শিহরিত হতে লাগলেন।

এলেন তিনি দ্রুতপদে। কিন্তু ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই পা দু'টি তাঁর ভারী হয়ে গেল। কেমন একটা শরম শরম বোধ তাঁকে ঘিরে ধরতে লাগলো। লাজে ও পুলকে দোল খেতে খেতে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

এ মকানের চাকর-নফর মালী-মজুর সকলেই তাঁর পরিচিত। অনুগতও বটে। এই মুহূর্তে নিকটে কেউ ছিল না। হেথা-হোথা দূরে যারা বাহির আঙ্গিনায় কর্মরত ছিল, তাঁকে দেখে সবাই তারা হাতের কাজ বন্ধ রেখে স্থির নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। ভাসা ভাসা নজরে এসব কিছু লক্ষ্য করে, তৃপ্তির মাত্রাটা তাঁর আরো খানিক বেড়ে গেল। তাঁর পথ চেয়ে এ মকানের সকলেই কি আগ্রহ নিয়ে আছেন, এ থেকেই তা অনুমান করে আনন্দে আবেগে গতি তাঁর আরো কিছু শ্লথ হয়ে এলো।

দহলীজ পেরিয়ে সামনে একটু এগুতেই, সামনের দিক থেকে দৌড়ে এলো কিতাবউদ্দীন। তাকে দেখে দিলওয়ার আলী খোশ কণ্ঠে বললেন—আরে এই যে কিতাবউদ্দীন, কেমন আছো?

তাঁর এই খোশ প্রবাহ কিতাবউদ্দীনকে আদৌ স্পর্শ করলো না। কিতাবউদ্দীন ছুটে এসে নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললো—আসুন হুজুর, এদিকে আসুন—

বুঝতে না পেরে দিলওয়ার আলী হাসি মুখে বললেন—এদিকে মানে, কোন্ দিকে?

কিতাবউদ্দীন বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—এই দহলীজে আসুন হুজুর, দহলীজে এসে বসুন—

দিলওয়ার আলী থমকে গেলেন। সবিস্ময়ে বললেন—কেন? দহলীজে কেন?

ঃ ও ঘরে মেহমান আছে। ওখানে যাবেন না।

ঃ মেহমান!

কিতাবউদ্দীন গোমড়া মুখে বললো—জি। আপনাকে এখন থেকে এই দহলীজেই বসতে হবে। ওঘরে যাওয়া আর আপনার চলবে না।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী চমকে উঠলেন। এতক্ষণে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিতাবউদ্দীনের মুখ ভার। নজর তাঁর জমিনের দিকে নিবদ্ধ। অপার বিস্ময়ে দিলওয়ার আলী প্রশ্ন করলেন—কি, ব্যাপার কি কিতাবউদ্দীন?

জমিনের দিকে নজর রেখেই কিতাবউদ্দীন অভিযোগের সুরে বললো—খামাখা আর ও ঘরে কেন যাবেন হুজুর? সবাই যা চেয়েছিলেন তা যখন হলো না আর আপনিও তা চাইলেন না, তখন আর ও ঘরে যাবেন কেন?

ঃ তার মানে?

ঃ ও ঘরে আপামনির বর আছেন। আর আপনি ওখানে যাবেন কি করে?

ঃ বর!

ঃ বর মানে স্বামী।

ইস্রাফিল (আ)-এর শিঙ্গার শব্দ হলেই নাকি সে শব্দে দুনিয়াটা তৎক্ষণাৎ চুরমার হয়ে যাবে। সে শব্দের আকার-কিসম্ জানা নেই। কিতাবউদ্দীনের কথাটা অনুভব করার সাথে সাথে বোধকরি তার চেয়েও আরো ভয়ংকর আওয়াজ তুলে গোটা আসমানটাই দিলওয়ার আলীর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো। থরথর করে কেঁপে উঠলো দিলওয়ার আলীর সর্বাঙ্গ। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—স্বামী!

কিতাবউদ্দীন ক্ষোভের সাথে বললো—শাদিটা এখনও হয়নি, তবে অল্পদিনেই হয়ে যাবে। ফাঁক নেই কিছু।

ঃ সেকি!

ঃ তাই হুজুরেরা বলেছেন, আপনি এলে এখন থেকে আপনাকে এই দহলীজে বসাতে হবে। ও ঘরে আপনি গেলে বদনামী হবে।

সজ্ঞালুপ্তির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দিলওয়ার আলী উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—বদনামী।

ঃ জি। বিশেষ করে আপামনির ঐ হবু স্বামী খুবই নাখোশ হবেন।

ঃ নাখোশ হবেন?

ঃ হবেন না? আপনি হলেও তো তাই হতেন। উনার আর দোষ কি?

কিঞ্চিৎ হুঁশে ফিরে এসে দিলওয়ার আলী কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কে সেই বর?

ঃ বরের নাম হায়াত খান। খোদ হাজী আহম্মদ সাহেবের আত্মীয়। নবাবের ডান হাত হাজী আহম্মদ সাহেব।

নিভে যাওয়ার আগে দপ্ করে জ্বলে উঠার মতো দিলওয়ার আলী পুনরায় চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন—হাজী আহম্মদ সাহেবের আত্মীয় মানে? তাঁর জামাই ফৌজদার আতাউল্লাহ খানের রিস্তেদার?

ঃ জি। হায়াত খান সাহেব নাকি ঐ ফৌজদার সাহেবেরই ভাই।

ঃ তার সাথে শাদি হবে তোমার আপামনির?

ঃ জি হুজুর। সব ঠিকঠাক।

ঃ সবাই এতে রাজী আছেন?



www.amarboi.org

ঃ সবাই।

ঃ তোমার আপামনি?

কিতাবউদ্দীন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো— কি করবেন? শাদি হতে হবে না তাঁর?

আর কোন প্রশ্ন নেই দেখে কিতাবউদ্দীন চোখ তুলেই চমকে উঠলো। দেখলো, দিলওয়ার আলী সাহেব কেবলই টলছেন এবং ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে জমিনে পড়ে যাচ্ছেন। কিতাবউদ্দীন ক্ষিপ্রহস্তে দিলওয়ার আলীকে ধরলো এবং এক রকম টেনেই এনে তাঁকে দহলীজে বসালো।

দিলওয়ার আলীর হুঁশ-বুদ্ধি প্রায় বিলুপ্তির পথে তখন। তাঁর আর তখনই হাঁটার অবস্থা ছিল না। সম্বিতহীনের মতো দহলীজের কুরসীর উপর তিনি চুপ্‌চাপ্ বসে রইলেন।

ভড়কে গেল কিতাবউদ্দীন। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। যা নিজেই তিনি চাননি, সে জন্যে তাঁর মতো এত মজবুত লোক এভাবে এতটা ভেঙ্গে পড়লেন কেন, কিতাবউদ্দীন এর কোন অর্থ খুঁজে পেলো না।

সবকিছুর অর্থ সবসময় সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, সবকিছুই এ দুনিয়ায় সবসময় সব মানুষের চোখের উপর ঘটে না। কে কি চেয়েছে আর কে কি চায়নি, এ ব্যাপারেও সকলেই অন্তর্যামী নয়। অজ্ঞাতে ও চোখের আড়ালে অনেক ঘটনা ঘটে আর অনেকে অনেক কিছু চায়, যা নাজানায় অজানা মানুষ পরের টুকুতে চমকে উঠে।

এ ঘটনার পশ্চাদভূমি প্রশস্ত। এর উৎপত্তি স্থল ইমাম সাহেবের মহল্লার ঐ বিয়ে বাড়ী বা শাদির অনুষ্ঠান। বেপরোয়া মেয়েগুলো সেদিন ইমাম সাহেবের মকানে এসে মাহমুদা খাতুনকে এক রকম জোর করেই ঐ শাদির বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল। মাহমুদা খাতুনের মাথা ধরার কোন দোহাই মেয়েগুলো মানলো না। সেখানে গিয়ে ঐ বে-লেহাজ মেয়েগুলোর পাল্লায় পড়ে মাহমুদা খাতুন কিছুটা বে-আব্রু ছিল। অন্দর মহলের এ ঘর থেকে ওঘরে মাহমুদাকে বেশরম ও উচ্ছৃঙ্খল মেয়েগুলো টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

গৃহ স্বামী ধনাঢ্য লোক। পরিবারটা উঠ্‌তি পরিবার। তাই শাদির অনুষ্ঠানটা বেশ জমকালো ছিল এবং অনেক হোমরা-চোমরাকেই এই অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়েছিল। হাজী আহম্মদের পরিবারের খায়-খাতিরের দু' একজনকেও দাওয়াত করেন গৃহস্বামী। আমন্ত্রিতেরা আসেননি। সেই সুবাদে এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পক্ষ হয়ে হায়াত খান এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। হায়াত খান স্বভাবে খন্নাস্ আদমী। হায়া-লাজ অনেক কম। শাদির উৎসবে কাছের দূরের অনেক আত্মীয় স্বজন ও আশ পড়শী আসে। এতে করে সেখানে অনেক লোক ও অনেক খুব্‌সুরাত আউরীতের সমাগম হয়। দাওয়াত রক্ষা করার চেয়ে ফূর্তিফার্তা করার টানেই হায়াত খান এই অনুষ্ঠানে মেহমান হয়ে আসেন এবং স্থির হয়ে না বসে বল্‌গাহীনের মতো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকেন। বাইরে যখন সবাই মেহমানদের মেহমানদারী নিয়ে ব্যস্ত



www.amarboi.org

এবং অন্দরে যখন মাহমুদা খাতুন ঐ বে-আব্রু মেয়েদের সাথে এ ঘর ওঘর করছিলো, এই সময় হায়াত খান নামমাত্র অজুহাতে বেলাজ-বেহায়ার মতো অন্দর মহলে ঢুকে পড়েন এবং মুখ-মাথা খোলা মাহমুদা খাতুনকে সরাসরি দেখে ফেলেন। হায়াত খানকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নেয়া হলেও এবং এ নিয়ে মেজবানেরা বিব্রত বোধ করলেও, হায়াত খানের গায়ে কিছুই লাগে না। মাহমুদা খাতুনের রূপ দেখেই তিনি আওয়ারা হয়ে যান এবং হদিস-খবর যোগাড় করে নিয়ে মাহমুদা খাতুনকে শাদি করার ইরাদায় জান ছেড়ে দেন।

ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেব নবাব মহলে মোটামুটি পরিচিত ব্যক্তি। প্রশাসনিক পরিষদের সদস্যত্রয়ের কাছে, বিশেষ করে, রায় রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতেহ চাঁদ— এই দুই সদস্যের কাছে তিনি আরো অধিক পরিচিত। বড় মসজিদের ইমাম বলে নন, এই সদস্যদ্বয়ের কাছে তিনি অধিক পরিচিত হন তাঁদের স্বার্থে আঘাত করার কারণে। জমিদারী হারানোর জন্যে এই প্রশাসনের উপর ইমাম সাহেবের ক্ষোভ একটা ছিলই। তদুপরি, নবাব সুজাউদ্দীন খান সাহেবের প্রশাসনটা ক্রমেই মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী শক্তির হাতে চলে যেতে দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং কালক্রমে এই ইসলাম বিরোধী শক্তি বাংলার মসনদ দখল করতে পারে বুঝে, তিনি মুসলমানদের এ ব্যাপারে বিধিসম্মতভাবে হুঁশিয়ার করে তোলার চেষ্টা করেন। ইসলামের স্বার্থ রক্ষায় সোচ্চার হওয়া জ্ঞানবান মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। তাই, ওয়াজে নসিহতে এই অমুসলমান শক্তির প্রতি মুসল্লীদের তিনি সজাগ থাকার নসিহত করেন এবং এই শক্তির প্রলোভন ও পক্ষ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। প্রশাসনিক চত্বরের অনেক হোমরা চোমরা ব্যক্তিরা ও আমলারা এই মসজিদের মুসল্লী ছিলেন। এই মুসল্লীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল বেঈমান ও এই বিরোধী শক্তির পেটুয়া। এই পেটুয়ারা একখানাকে সাতখানা করে বানিয়ে ইমাম সাহেবের নসিহতের দিকগুলো আলম চাঁদ ও ফতেচাঁদের কানে দিতে থাকে। এতে করে এই রায় বাবু ও শেঠবাবুরা শংকিত হয়ে উঠেন। ইমাম সাহেবকে কব্জা করার এবং বিফলে, শায়েস্তা করার তাঁরা পথ খুঁজতে থাকেন।

ঠিক এই সময়ই এই ঘটনা ঘটে। ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেবের নাতনীকে শাদি করার খাহেশে এর ওর কাছে ছুটোছুটি করে হায়াত খান তেমন সুবিধে করতে পারেন না। অবশেষে তিনি তাঁর পরম অবলম্বন রায় রায়ান ও জগৎ শেঠ বাবুদের শরণাপন্ন হন। ব্যাপারটা শুনে তারা পুলকিত হয়ে উঠেন এবং কাজটা লুফে নেন। তাঁরা বিবেচনা করে দেখেন, ইমাম হাফিজুল্লাহর নাতনীকে হায়াত খানের ঘরে আনতে পারলে, সহজেই তাঁরা ইমাম সাহেবের মুখ আটকাতে পারবেন। মিষ্টি কথায় তাঁকে পথে আনতে না পারলে, হায়াত খানকে দিয়ে তাঁর নাতনীর পিঠে কীল ফেলালেই পথে আসবেন ইমাম সাহেব এবং ঐ মারাত্মক প্রচারণা থেকে বিরত হবেন তিনি।

তাঁরা উঠে খাড়া হলেন। হায়াত খানের পক্ষ হয়ে তাঁরা হাজী আহম্মদ সাহেবকে শক্ত করে ধরলেন এবং ইমাম সাহেবের নাতনীর সাথে হায়াত খানের শাদির ব্যবস্থা করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করলেন। হাজী আহম্মদ সাহেব তবুও ইতস্তত করতে থাকলে,



www.amarboi.org

ইমাম সাহেবের নসিহতের দিকটা তুলে ধরে তাঁকে তাঁরা সমঝালেন যে, ইমাম সাহেব আসলে এই পরিষদের দুশমন। এসব থেকে তাঁকে বিরত করা না গেলে, অচিরেই প্রশাসনের সিংহভাগ লোক ও অধিকাংশ প্রজাকুল এই প্রশাসনিক পরিষদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং তাঁদের এই একচেটিয়া ক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন হবে। ধর্মীয় ব্যাপারের নামে মূলত এই পরিষদের বিরুদ্ধেই বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন ইমাম সাহেব। হায়াত খানের সাথে তার নাতনীর শাদি হলে, ইমাম সাহেব আপ্‌ছে আপ্ কব্‌জার মধ্যে এসে যাবেন।

সমঝে গেলেন হাজী আহম্মদ সাহেব। একদিন এক অবসরে তিনি মসজিদে এসে হাজির হলেন এবং নামায অন্তে ইমাম সাহেবের সাথে নিরিবিলিতে বসলেন। কুশলাকুশল নিয়ে কিছু বেরাদরী আলাপের পর হাজী আহম্মদ সাহেব ঐ শাদির প্রস্তাব দিলেন। হায়াত খানের যোগ্যতা ও গুণাবলীর এন্তার তারিফ করে তিনি ইমাম সাহেবকে বললেন, পুরানো খানদানী ঘর জেনেই তিনি এ প্রস্তাব এনেছেন। হায়াত খানের সাথে শাদি হলে নাতনী তাঁর পরম সুখে থাকবে।

ইমাম সাহেব তাঁর মকানের কোন খবরই রাখেন না। কোথায় কি হচ্ছে, তা কিছুই তিনি জানেন না। দিলওয়ার আলীকে নিয়ে তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের চিন্তা-ভাবনার সাথেও তিনি পরিচিত নন। কারণ, পরিবারের কেউ তাঁকে একথা জানাননি। দিলওয়ার আলীর মতামতটা চূড়ান্তভাবে পাওয়ার আগে, একথা তাঁকে জানানো তাঁরা সমীচিনবোধ করেননি। ফলে, হাজী আহম্মদ সাহেবের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরাসরি 'হাঁ' 'না' কোনটাই না বলে তিনি তাঁকে জানালেন, প্রস্তাবটা উত্তম। তবে যেহেতু তাঁর পরিবারের তামাম বিষয় তাঁর ভাই ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরাই দেখাশুনা করেন, নিজে তিনি কোন রকম দায়-দায়িত্বে থাকেন না, সেই কারণে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর চূড়ান্ত মতামত তিনি হাজী আহম্মদ সাহেবকে জানাবেন। এই দণ্ডে কিছুই বলতে পারছেন বলে তিনি দুঃখিত।

হাজী আহম্মদ চতুর লোক। এ কথায় তিনি খুশী হলেন, না নাখোশ হলেন, তা কিছুই বোঝা গেল না। মতামতটা যত শিগ্গির সম্ভব জানানোর জন্যে তাকিদ দিয়ে তিনি উঠে গেলেন।

মকানে ফিরে এসে ইমাম সাহেব এ প্রসঙ্গ তুলতেই আজিজুন নেছা ও আফসারউদ্দীন এক সাথে 'না–না' করে উঠলেন। হাজী আহম্মদের নাম শুনে আবিদ হোসেন সাহেব বরং কিছুটা রুষ্টই হলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য তিনি করলেন না। এ প্রেক্ষিতে দিলওয়ার আলীর প্রসঙ্গ তুলে আজিজুন নেছা বেগম বললেন—মাহমুদা খাতুনের শাদিটা দিলওয়ার আলীর সাথে হোক, আমরা এখন এই চিন্তা করছি আব্বাজান। মাহমুদা খাতুনের ইচ্ছেটাও তাই। সুতরাং, এখানে আর অন্য পয়গাম নিয়ে আমাদের চিন্তা করার ফাঁক নেই।

দিলওয়ার আলীর কথায় ইমাম সাহেব খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি সাগ্রহে বললেন — তাই নাকি, এই ব্যাপার?



www.amarboi.org

আজিজুন নেছা বললেন—জি আব্বাজান। এ ব্যাপারে সবাই আমরা একমত। এখন দেখা যাক, আল্লাহ্ তায়ালা কি করেন।

ইমাম সাহেব পরম খোশে বললেন—মারহাবা–মারহাবা ! এর উপর কি আর কথা আছে ? হাজী আহম্মদ সাহেবকে তাহলে এক কথায় 'না' করে দিই, ঝামেলা মিটে যাক।

বয়সে তরুণ হলেও আফসারউদ্দীন আলেম মানুষ। তিনি বললেন—না নানাজান, সরাসরি 'না' করাটা ঠিক হবে না। হাজার হোক, তিনি ক্ষমতাসীন লোক। এভাবে 'না' করলে তিনি অপমানবোধ করবেন। তাঁকে বরং একটু কায়দা করে সরিয়ে দিন।

ঃ কি রকম !

ঃ তাঁকে বলুন, "আমাদের মেয়ের শাদির ব্যাপারটা আমার পরিবারের লোকেরা অন্যখানে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে আছেন। সরাসরি সেখানে 'না' জবাব দেয়া যাচ্ছে না। কোন কারণে এ শাদি না হলে, আপনার পয়গামটা অবশ্যই আমরা বিবেচনা করবো।" যদিও একথা ঐ 'না' বলারই সামিল, তবু একটু ঘুরিয়ে বলতে দোষ কি ?

এই কথাই গ্রহণ করলেন ইমাম সাহেব। এভাবেই বলবেন বলে রাজী হলেন। আবিদ হোসেন সাহেব অবশ্য সরাসরি 'না' করে দেয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভেবে তা করতে তিনি বললেন না।

ভবিষ্যতের ভাবনাটা আবিদ হোসেন সাহেবের মাথায় অমনি অমনি গজায়নি। দিলওয়ার আলীর আচরণই তাঁকে সন্দিহান করে তুলেছে। তাঁদের অনুপস্থিতির সময় দিলওয়ার আলী যে এই মকানে একবার এসেছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে এই পরিবারের চিন্তা-ভাবনার কথাটা যে তিনি জেনে গেছেন, এ তথ্য মাহমুদা খাতুনের কাছেই আবিদ হোসেন সাহেব পেয়েছিলেন। এহেন ঘটনার পর দিলওয়ার আলীর একটানা এই দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি আবিদ হোসেন সাহেবকে শংকিত করে তুলেছে। এতদিন তো দূরের কথা, এর অর্ধেক পরিমাণ দিনও দিলওয়ার আলী এ মকানে না এসে থাকেননি। এক ফাঁকে না এক ফাঁকে একবার তিনি এসেছেনই। অথচ এই শাদির কথা শুনার পর তাঁর একদম হাওয়া হয়ে যাওয়াটা সঙ্গতভাবেই আবিদ হোসেন সাহেবের শংকার কারণ হয়েছে। দেখে দেখে অবশেষে দিলওয়ার আলীকে ডেকে আনার জন্যেও তাঁরা কিতাবউদ্দীনকে পাঠান। কিতাবউদ্দীন এসে দিলওয়ার আলীকে মকানে না পেলেও, নামদার খাঁর কাছে খবরটা রেখে যায়। দিলওয়ার মকানে ফিরে এলে ইমাম সাহেবের মকানে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়ার কথাটা বার বার করে নামদার খাঁকে বলে যায়।

তবুও দিলওয়ার আলী আসেননি। বেভুল নামদার খাঁ যে একথা দিলওয়ার আলীকে বলতে বেমালুম ভুলে যায়, এটা এই পরিবারের কারো জানার কথা নয়। কাজেই, তাঁদের সন্দিহান হওয়াটা অযৌক্তিক ছিল না। এরপরও আবার যখন দিলওয়ার আলীর খোঁজ করেন তাঁরা, তখন দিলওয়ার আলী হুগলীতে। স্বাভাবিক-ভাবেই ঘাবড়ে গেলেন তাঁরা। এতদূরে যাওয়ার আগেও দিলওয়ার আলী একটিবার



www.amarboi.org

তাঁদের মকানে না আসার হেতুটা কি ? তবে কি দিলওয়ার আলী এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন তাঁদের ? সবার দীলে এ প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে।

এই মিথ্যা সন্দেহকে বাস্তব করে তুললেন আফসারউদ্দীন সাহেব। একদিন তিনি মাদ্রাসা থেকে এসে ঠুশ্ খেয়ে পড়লেন। তাঁর আম্মা ও ছোট নানাজান আবিদ হোসেন সাহেবকে ডেকে তিনি বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন — খামাখাই আমরা মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ালাম এতদিন। আর নয় ! ঢের হয়েছে !

বুঝতে না পেরে আজ্জিজুন নেছা বেগম বললেন — তার অর্থ ?

আফসারউদ্দীন একই কণ্ঠে বললেন — আপনারা এখন নানাজানকে বলুন, হাজী আহম্মদ সাহেবের সাথে আবার তিনি যোগাযোগ শুরু করুন।

আবিদ হোসেন সাহেব শংকিত কণ্ঠে বললেন — কি ঘটনা আফসারউদ্দীন ?

আফসারউদ্দীন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন — ঘটনা আবার কি ? এতদিন যা ভেবেছি, ঘটনা ঠিক তাই-ই। দিলওয়ার আলী সাহেব অমনি অমনি লাপাত্তা হয়ে যাননি !

ঃ তার মানে ?

ঃ মাহমুদাকে শাদি করতে তিনি আর আসছেন না। তিনি অন্যখানে শাদি করছেন।

আবিদ হোসেন সাহেব ও আজ্জিজুন নেছা বেগম এক সাথে চমকে উঠে বললেন — সেকি !

ঃ অমনি কি আর বলেছিলাম সেদিন, কার মনে কি আছে কে বলতে পারে ? খামাখাই আমরা এতদিন কল্পনার জাল বুনলাম।

নিদারুণ উদ্বেগের সাথে আজ্জিজুন নেছা বললেন — কোথায় ? কোথায় সে শাদি করছে ?

ঃ তাঁদের নিজের গণ্ডীর মধ্যেই। শাহরিয়ার খান সাহেব নামের এক ব্যক্তির মেয়েকে। তিনিও একজন প্রভাবশালী আমলা। দিলওয়ার আলী সাহেবের ভাই মীর দিলীর আলীর সাথে ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের একগলা পিরীত।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — কোথায় এ খবর পেলে তুমি ? কার কাছে শুনলে একথা ?

আজ্জিজুন নেছা বেগম অবিশ্বাসের সুরে বললেন — কেউ তোমাকে ধোঁকা দেয়নি তো ?

আফসারউদ্দীন বিব্রত কণ্ঠে বললেন — কি যে বলেন আম্মাজান ? আমি কি নাবালক, না কোন পথের লোকের কাছে একথা শুনেছি আমি যে, সে আমাকে ধোঁকা দেবে ? বিশ্বস্ত লোকের কাছেই শুনেছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ আমার এক সহকর্মীর কাছে শুনেছি। ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবেরই এক শ্যালক আমাদের মাদ্রাসার এক মুদাররেছ। দানাদার লোক। তিনিই একথা বললেন।

আবিদ হোসেন সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন — কি বললেন তিনি ?



www.amarboi.org

ঃ অগ্রিম দাওয়াত দিলেন আমাকে। বললেন, তাঁর ভাগ্নীর শাদি মোবারক অচিরেই সুসম্পন্ন হবে। ঐ অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার সকল শিক্ষককে দাওয়াত করবেন তাঁরা। আমাদের সবাইকে সে অনুষ্ঠানে যেতে হবে। পাত্র কে, জিজ্ঞেস করতেই তিনি হাসি মুখে বললেন— "আপনাদের খুব চেনাজন। যেজন আপনার জান বাঁচিয়েছিলেন, সেই সালার দিলওয়ার আলী সাহেবই সেই পাত্র। তিনিই শাদি করছেন আমার ভাগ্নীকে।"

ঃ বলো কি।

ঃ আমি সংশয় প্রকাশ করলে তিনি আমাকে কিছুটা শরম দিয়েই বললেন— "আপনার এমনটি ভাবার হেতু? আমি কি মস্‌করা করছি আপনার সাথে, না আপন ভাগ্নিকে নিয়ে এমনটি কেউ করে? দিলওয়ার আলীর ভাই মীর দিলীর আলী সাহেব দিলওয়ার আলী সাহেবের সাথে আলাপ করেই একাজে হাত দিয়েছেন আর মীর দিলীর আলী সাহেব একাধিকবার গিয়ে আমাদের মকানে বসে তামাম কথা পাকা করে এসেছেন। আমি কি হাওয়ার উপর কথা বলছি আপনার সাথে? দিলওয়ার আলী সাহেবও এ শাদিতে খুবই আগ্রহী?"

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন— সেকি কথা! এই রকম ঘটনা?

ঃ জি। আমার এই সহকর্মীটি আরো বললেন— "শাহ্‌জাদা সরফরাজ খানও চান, এই শাদিটা হোক। দিলওয়ার আলী সাহেব হুগলী থেকে ফিরে এলেই ধুমধাম করে এই শাদিটা সুসম্পন্ন করা হবে ইনশাআল্লাহ।"

আফসারউদ্দীনের সেই সহকর্মীটি মিথ্যা মোটেই বলেননি। দিলওয়ার আলীর অমত কিছু নেই ভেবে, দিলওয়ার আলীর ভাই মীর দিলীর আলী এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং এতদূর পর্যন্তই এগিয়েছিলেন। শুধু দিনক্ষণটাই ধার্য করেননি তিনি। দিলওয়ার আলী হুগলী থেকে সঠিক কবে বা কখন আসবেন তা না জানায়, এই ফাঁকটুকুই বাধ্য হয়ে রেখেছিলেন।

আফসারউদ্দীনের মুখে এই ঘটনা শুনার পর আজিজুন নেছা বেগম ও আবিদ হোসেন সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। তাঁদের এতদিনের এতবড় আশাটা মিথ্যা হয়ে যাওয়ায়, তারা কাহিল হয়ে পড়লেন। মনকে প্রবোধ দিতে না পেরে আবিদ হোসেন সাহেব নিজে গিয়ে যোগাযোগ করলেন শাহরিয়ার খান সাহেবের সাথে। যোগাযোগ করে এসে আজিজুন নেছা বেগমকে তিনি ভগ্ন কণ্ঠে বললেন— ঘটনাটা জাররামাত্র মিথ্যা নয় আম্মাজান, বিলকুল সত্যি। দিলওয়ার আলীর শাদিটা ওখানেই হচ্ছে।

ঘটনাটা বিলকুল মিথ্যা বলে ভাবার লোক তখনও একজন ছিল। সে মনের জোরও তখনও তার ছিল। মাহমুদা খাতুন একে আদৌ সত্যি বলে মেনে নিতে পারেনি। দিলওয়ার আলীর উপর অভিমান তার ছিল, কিন্তু তখনও তার দীলে কোন সন্দেহ পয়দা হয়নি। তার বিশ্বাস, এসব ঘটনার সাথে দিলওয়ার আলীর কোনই সম্পর্ক নেই। দিলওয়ার আলী জানেনই না এসব কিছু। তাঁর সম্পূর্ণ অজান্তে এবং অজ্ঞাতে এই হৈচৈগুলো হচ্ছে।



www.amarboi.org

এ কারণেই অভিভাবকদের অনর্থক এই সন্দেহের কোলাহলে শরিক হয়নি মাহমুদা খাতুন। এঁদের এখন এই এতটাই নিসন্দেহ হতে দেখে অবশেষে মুখ খুললো সে। ঘটনাটা বিলকুল মিথ্যা বলে সবাইকে সে সমঝানো'র চেষ্টা করলো। এটি অসম্ভব, হবার নয়, হতে পারে না—বলে সে সোচ্চার হয়ে উঠলো। কিন্তু ফল কিছু হলো না। উল্টো, তার এই বেশরম উন্মাদনার জন্যে হুমকি-ধমক সহ তাকে নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলো।

যোগাযোগ চলতে লাগলো হাজী আহম্মদ সাহেবের সাথে। লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মুখেও মাহমুদা খাতুন এর প্রতিবাদ করে চললো। দিলওয়ার আলী এসে পড়বেনই এর মধ্যে, এই ছিল তার মনের বল। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, হুগলীর ঐ লড়াইটা থেমে গেছে। নবাবের ফৌজ হুগলী থেকে ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে। দিলওয়ার আলীও তাহলে ফিরে এসেছেন নির্ঘাৎ এবং যে কোন মুহূর্তে এখন তিনি এসে পড়বেন এই মকানে, এই ভরসায় মাহমুদা খাতুন পথ চেয়ে রইলো।

কিন্তু নিরাশ হতে হলো তাকে। হুগলী থেকে যে তখনও মুর্শিদাবাদেই ফিরেনি, ইংরেজদের গতিবিধির তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে যে হুগলীতেই রয়ে গেছে, মাহমুদা খাতুনের আশা পূরণ করার জন্যে সে কি করে সেই মুহূর্তে তার কাছে ছুটে আসবে?

পথ চেয়ে থেকে থেকে আর গঞ্জনা সয়ে সয়ে মাহমুদা খাতুনও ভেঙ্গে পড়লো অবশেষে। দিলওয়ার আলীর উপর বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে উঠলো তারও। উপায়ন্তর না দেখে, দিলওয়ার আলীর খবর করার জন্যে সে কিতাবউদ্দীনকে আবার দিলওয়ার আলীর সরকারী বাসভবনে পাঠিয়ে দিলো। কিতাবউদ্দীনকে বিশেষভাবে সমঝে দিলো, দিলওয়ার আলী আসুন আর না আসুন, তিনি এসব জানেন কিনা আর তাঁর সত্যিকারের মনোভাবটা কি, এসব তথ্য সংগ্রহ করে আনা তার চাই-ই।

"সে কেন দেখা দিলোরে, না দেখা ছিল যে ভাল,"—অবস্থাটা এই রকমই হলো। কিতাবউদ্দীনকে না পাঠানোই ভাল ছিল মাহমুদার। পাঠিয়েই সে বিভ্রান্তিটা পুরোপুরি পাকিয়ে তুললো। হায়াত খানকে শাদি করার মোটেই সে আগ্রহী না হোক, দিলওয়ার আলীর উপর তার বিশ্বাসটা সে পুরোপুরি হারিয়ে ফেললো।

কিতাবউদ্দীন দিলওয়ার আলীর বাসভবনে আসার সময়, নামদার খাঁ সাবিহা খানমের তসবীর নিয়ে ভজন সিং এর সাথে গভীরভাবে খোশ আলাপে নিমগ্ন ছিল। ভজন সিং অনেকদিন এ মকানে আসেনি। সেপাইদের পাকশাক শেষ করে মকানে কাজের চাপ থাকলেও, হঠাৎ সেদিন ভজন সিং তার দোস্ত নামদার খাঁর সাথে মুহূর্ত খানেকের জন্যে মোলাকাত করতে এলো। অনেকদিন পর ভজন সিংকে পেয়ে নামদার খাঁ খুশীতে ডগমগ হয়ে গেল। এলোমেলো কিছুক্ষণ খোশ প্রকাশ করার পর সে দৌড় দিয়ে ঘরের ভেতরে গেল এবং সাবিহা খানমের তসবীরটা হাতে নিয়ে ফের ছুটে এসে বললো—দেখি, লে ইয়ার, দেখি' লে। হামার বহু আম্মা কেত্তো খুব সুরাত, তু দেখি' লে।

তসবীরের দিকে চেয়ে ভজন সিং উল্লাসভরে বললো—কিয়া কহা? তুহার বহু আম্মা?



www.amarboi.org

ঃ হামার হজৌর কা বহু।

ঃ তুহার হজৌর কা বহু?

ঃ আরে হঁ হঁ, এহিবাত তুহারে হামি কহিলেক বটে? ওহি দিন তু চলি যাইলেক, আউর ইধার আসিলেক নাই। কেত্তো মজাদার কাহানী হামারা পাস্ মওজুত হো গৈল্, তু উহার হদিস করিতে আসিলেক নাই বিলকুল।

ভজন সিং বিপুল বিস্ময়ে বললো—হাইরে বা! কি তাজ্জব বাত তু হামারে ছুনাই দিলি? তুহার হজৌর কা বহু মিলা হো গৈল্?

ঃ গৈল্-গৈল্। আখুন বহু আসি যাইবেক।

ভজন সিং মন ভারী করে বললো—তব্ বহুৎ বুড়া বাত আছে। ইয়ার! তু হামারে দাওয়াত ভেজিলেক নাই। তুহার হজৌর কা ছাদি চুকা হো গৈল্, এত্তোবড়া ধুমধাম চুকা হো গৈল্, তু হামারে তালাশ করিলেক নাই। একেলা একেলা তু মজা লুট্ করিলেক বটে!

ঃ আরে নাই-নাই। ওহি বাত বুলিবেক নাই। আভি তক্ ছাদি-চুকা না হৈ। ধুমধাম ভি চুকা না হৈ। বহু আসিবেক তো ওহি ওয়াক্তে ধুমধাম ছুরু হইবেক। তু হামার দোস্ত্ আদমী। ওহি ওয়াক্তে জরুর তুহারে দাওয়াত ভেজি দিবেক বটে।

ভজন সিং আশ্বস্ত কণ্ঠে বললো—হাই ভাগোয়ান! এহি বাত?

ঃ জরুর ওহি বাত। তু দুখ্ লিবেক কেনে কহো?

ঃ নাই-নাই। তব্ হামার কুয়ী দুখ্ নাই। দে, তু তসবীর হামারে দে হামি দেখি' লই।

ভজন সিংয়ের হাতে তসবীরটা দিতে দিতে নামদার খাঁ গর্বভরে বললো—দেখি' লে-দেখি' লে। হামার বহু আম্মার কেত্তো খুব সুরাত, তু খেয়াল করি দেখি' লে।

তসবীরটা দেখতে দেখতে ভজন বললো—ঠিক-ঠিক। আচ্ছা সুরাত বটেক, বহুৎ আচ্ছা সুরাত। এহি বহু আম্মা মকানে আসিলেইমকান উজালা হো যাইবেক রে নামদার ভাইয়া, জরুর উজালা হো যাইবেক।

নামদার খাঁ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো—তুম্ কহো ইয়ার, আউর দুস্‌রা বার তুম কহো। ছালে কলিমউদ্দীন বেহোড় গদ্ধা! উহার দীল ভরিলেক নাই। নাদান আদমী, আউর জিয়াদা খুব সুরাত মাংগি বেড়াইবেক বটে!

ঃ উ গুম্‌রা আদমী কো বাত তু ছাড়ি দে ইয়ার। ই সুরাত বহুত্ উমদা সুরাত জরুর: আখুন কহো, ই লড়কি কৌন্ আদমী কো বেটি আছেরে বা? কাঁহার কুঁয়ারী?

ঃ শাহরিয়ার খান সাহাবকো বেটি দোস্ত্। বহুত্ বড়া আদমীকো বেটি।

ঃ কৌন্ কহা? তুহার হজৌর কহি দিলেক?

ঃ নাই-নাই। বড়া হজৌরকা নওকর হামারে বুলি দিবেক বটে।

ঃ বড়া হজৌর! ওহি হজৌর কৌন্ হজৌর?

ঃ হায় আল্লাহ! তু পয়চান করিলেক নাই? ওহি বড়া হজৌর হামার হজৌর কা বেরাদর মীর দিলীর আলী হজৌর। উহার নওকর হামারে কহি দিলেক—হামার



www.amarboi.org

হজৌর ওয়াপস্ আসিবেক তো ছাদি হো যাইবেক। শাহরিয়ার খান সাহাবকো এহি বেটি হামার বহু আম্মা হো যাইবেক।

ঠিক এই সময় কিতাবউদ্দীন সেখানে এসে হাজির হলো। শাহরিয়ার খান সাহেবের নাম সে স্পষ্টভাবে শুনতে পেলো। ভজন সিংয়ের সাথে আর একবার কথাবার্তা ও পয়পরিচয় হওয়ায়, কিতাবউদ্দীন এবার আর ভজন সিংকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলো না। কিন্তু কিতাবউদ্দীনকে দেখে নামদার খাঁ আর দফা নেচে উঠলো। সে হাত নেড়ে কিতাবউদ্দীনকে ডাকতে ডাকতে বললো—আসি যাও—আসি যাও কিতাব ভাই, তুম্‌ভি বাতাই দাও, হামার বহু আম্মার সুরাত উমদা হৈল্, না কম্‌তি হো গৈল্, তুম ভি বাতাই দাও—

ভজন সিংয়ের হাত থেকে তসবীরটা নিয়ে সে কিতাবউদ্দীনের সামনে বাড়িয়ে ধরলো। কিতাবউদ্দীন সবিস্ময়ে বললো—এ মেয়েটা কে?

ঃ তওবা তওবা ! মেয়ে বুলিবেক নাই। হামার বহু আম্মা। হামার হজৌর কা বহু।

কিতাবউদ্দীনের আগ্রহ বেড়ে গেল। সে প্রশ্ন করলো—তোমার হজৌর কা বহু মানে? দিলওয়ার আলী হুজুরের বউ?

ঃ ওহি বাত—ওহি বাত।

ঃ দিলওয়ার আলী হুজুরের শাদি হয়ে গেছে?

ঃ চুকা না হৈল্ তো গল্‌তি কি হৈল্, তুম কহো? ছাদিতো জলদি জলদি হো যাইবেক জরুর।

ঃ জলদি জলদি হয়ে যাবে?

ঃ হঁ হঁ। হজৌর আখুন তক্ ওয়াপস্ নাই আসিলেক বটে। আসিবেক তো জলদি জলদি হো যাইবেক।

ঃ তোমার হুজুর এখনো হুগলী থেকে ফিরে আসেননি?

ঃ নাই-নাই, আসিলেক নাই। ওহি কাম তো তামাম বেচাল করি দিলেক। ছাদির আনযাম বিলকুল ঠিকঠাক, লেকেন ছাদি হইলেক নাই। কেত্তা দিগ্‌দারী, তুম কহো?

তসবীরের দিকে ইংগিত করে কিতাবউদ্দীন ফের প্রশ্ন করলো—এই লেড়কির সাথে শাদি হবে তোমার হুজুরের?

ঃ হারে-বাবা ! বাত তো ওহি বাত বিলকুল।

ঃ আচ্ছা। তা কার মেয়ে বললে? তোমার এই বহু আম্মা কার বেটি?

ঃ শাহরিয়ার খান সাহাব কো বেঠি বহুৎ দৌলতমান্দ আদমী। জব্বোর নকরী। এত্তাবড়া মকান—এত্তা বড়া দপ্তর।

ঃ তাই নাকি? তা এ তসবীর তুমি কোথায় পেলে?

ঃ হজৌর আনি দিলেক বটে।

ঃ তোমার হুজুর নিজে এ তসবীর নিয়ে এসেছেন।

ঃ খোদ-খোদ। খোদ হজৌর এহি তসবীর আনি' লইবেক। হামারে বুলিয়া দিছে—এহি তুমহারা বহু আম্মা। হজৌর ইহারে বিছানায় তুলি রাখি দিলেক, হঁ।

ঃ বিছানায়?



www.amarboi.org

ঃ ওহি বাত। রোজ রোজ শুই শুই হজৌর ইহারে দেখি লয় বটেক। জব্বোর পেয়ার করে রে কিতাব ভাই! এহি বহু হজৌরেরর বহুৎ পছন্দ্ হো গৈল্।

ঃ বলো কি! তাহলে তোমার হুজুর এই শাদির ব্যাপারটা তামামই জানেন?

বুঝতে না পেরে নামদার খাঁ বললো—কিয়া কহা?

ঃ বলছি, তোমার হুজুরের ইচ্ছাতেই এই শাদি হচ্ছে?

দুই চোখ ফুটিয়ে তুলে নামদার খাঁ বললো—হাইরে বাবা! তুম্ এহি কৌন্ কেচাল জুড়ি দিলেক বেগায়ের! হামার হজৌর খোদ এহি লড়কিরে পছন্দ করি লই উহার ভাইরে ছাদি পাকাইতে লাগাই দিলেক। ভাই আখুন কি করিবেক, তুম্ কহো? ছোটা ভাই ছাদি করিতে চায়, বড়া ভাই না করিবেক কেনে? বড়া ভাই ঠিকঠাক ছাদি পাকাই দিলেক। আখুন হজৌর ওয়াপস্ আসিবেক তো ছাদি হো যাইবেক সাফ সাফ।

ভজন সিংএর তাড়া ছিল। নামদার খাঁকে কিতাবউদ্দীনের সাথে আলাপে মগ্ন দেখে ভজন সিং উঠে দাঁড়ালো। তা দেখে নামদার খাঁ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—কেনে ইয়ার? তু উঠি খাড়া হইলেক কেনে?

ভজন সিং বললো—মকানে জিয়াদা কাম আছে ইয়ার। হামি দুস্‌রা রোজ আসি যাইবেক জরুর। আখুন চলি যাই—

ঃ তা মানে, চলি যাইবেক?

ঃ যাই-যাই। দুস্‌রা রোজ ফির আসি যাইবেক ঠিকঠাক—

ভজন সিং রওনা হলো। তসবীরটা ঝট্‌পট্ বারান্দার তাকের উপর ফেলে দিয়ে নামদার খাঁ ভজন সিংকে বিদায় দিতে দেউটি তক্ চলে গেল।

কিতাবউদ্দীনের জানার আর কিছুই বাঁকী রইলো না। ঘটনাটা যে সত্যি সত্যিই এতটা সঠিক, এ সম্বন্ধে কিতাবউদ্দীনেরও কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। এবার সেও নিসন্দেহ হলো। তার আপামনিকে এটা সে কেমন করে বোঝাবে, একথা ভাবতে গিয়েই তার খেয়াল হলো ঐ তসবীরের কথা। ঐ ছবিটা সাথে থাকলে তার আপামনিকে সমঝে দেয়া খুবই সহজ হবে বোধে, ঐ তসবীরের লোভ সে সামলাতে পারলো না। কিছুটা গা' কাটা হলেও সে ঐ তসবীরটা তুলে নিয়ে তার পিরহানের জেবের মধ্যে পুরলো। নামদার খাঁ ফিরে এসে খোঁজ করলে, সে আগামীকালই এসে তসবীরটা ফেরত দিয়ে যাবে বলে নামদার খাঁকে বোঝাবে এই সিদ্ধান্ত নিলো।

কিন্তু নামদার ফিরে এসে আর তসবীরের খোঁজ করলো না ও কথা সে বিলকুল ভুলে গেল। ফিরে এসেই সে ভজন সিং যে খুব ভাল মানুষ, এই ব্যাখ্যাতেই মগ্ন হয়ে গেল।

অল্প কথায় আলাপ শেষ করে কিতাবউদ্দীন ফিরে যেতে উদ্যত হলে, কিতাবউদ্দীন কেন এলো, সে কথাও নামদার খাঁ জিজ্ঞেস করলো না। গল্পে গল্পে দেউটিতক্ এসে সে কিতাবউদ্দীনকেও খোশদীলে বিদায় করে দিলো।

কিতাবউদ্দীন ফিরে এসে সাবিহা খানমের তসবীরটা মাহমুদা খাতুনের হাতে দিয়ে তামাম ঘটনা বর্ণনা করে শুনালো। অবশেষে সে বললো—শাহরিয়ার খান



www.amarboi.org

সাহেবের এই মেয়েকেই দিলওয়ার আলী হুজুর নিজে পছন্দ করে শাদি করছেন। ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। সন্দেহ করার তিল পরিমাণ ফাঁক কোথাও নেই।

ফলাফল যা হবার তাই হলো। দুনিয়াটা তামামই মাহমুদা খাতুনের সামনে আঁধার হয়ে গেল। দিলওয়ার আলীর (তথা কথিত) এতবড় বেঈমানী সে সহ্য করতে পারলো না। আর্তনাদ করে উঠে সে বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

পরবর্তী ঘটনাগুলো ছক বরাবর এগুলো। মাহমুদা খাতুন জিন্দেগীতে আর দুস্‌রা কাউকে শাদি করবে না বলে জিদ্ ধরে থাকা সত্ত্বেও, হায়াত খানের সাথে তার শাদির কথাবার্তা পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চললো। ইমাম সাহেব যোগাযোগ করে হাজী আহম্মদ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করা মাত্রই ও পক্ষ সোচ্চার হয়ে উঠলো। হাজী আহম্মদের চেয়ে বরং রায় বাবু—শেঠ বাবুরাই অধিক উদ্যোগী হলেন এবং হাজী আহম্মদ সাহেবকে তাঁরা এ ব্যাপারে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলেন। তাঁকে উদ্যোগে এবং হায়াত খানের অস্থিরতায় হাজী আহম্মদ সাহেব তাঁর মকানের কয়েকজন জেনানাকে পাত্রী দেখতে পাঠালেন। যোগাযোগ করে এসে ঐ জেনানারা ইমাম সাহেবের মকান ও পাত্রী দেখে গেলেন। মাহমুদা খাতুনের আচরণে সকলেই তাঁরা রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু মাহমুদা খাতুনের রূপ দেখে মাথা তাঁদের ঘুরে গেল। ঘরে ফিরে এসে এই পাত্রীকে ঘরে নেয়ার জন্যে তাঁরাও দিউয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের যুক্তি হলো, মানুষের আদব-আক্কেল পরিবেশের সৃষ্টি। বিপরীত পরিবেশে, অর্থাৎ শক্ত শাসনের মধ্যে পড়লেই পাত্রীর ঐ বেয়াদবীর ভূত সুড় সুড় করে নেমে যাবে।

হায়াত খানকে ইমাম সাহেবের পরিবারের কেউ তেমন চিনতেন না। আফসার উদ্দীন তাঁকে দু' একবার দেখে থাকলেও, হায়াত খানের গুণাবলী ও আদব আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। স্বাভাবিকভাবেই পাত্র দেখার প্রসঙ্গটাও উঠে পড়লো। আজিজুন নেছা বেগমও পাত্রের আকৃতি-চেহারা দেখার জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী হলেন। আর এতে করেই পাত্র সামলানো দায় হয়ে পড়লো তাঁদের। পাত্রীপক্ষকে পাত্র পক্ষের মকানে আসার কোন ফাঁক মওকা না দিয়ে উদ্বেলিত পাত্র নিজেই ইমাম সাহেবের মকানে পুনঃপুনঃ তস্‌রিফ আনতে লাগলেন।

প্রথমে তবু একজনের ছত্রছায়ায় এলেন, একা একা এলেন না। পাত্রী পক্ষ পাত্র দেখতে আগ্রহী, একথা শুনেই হায়াত খান নেচে খাড়া হলেন। তিনি তর সামলাতে পারলেন না। পরম মুরুব্বী রায় রায়ান আলম চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব যোগাযোগ ছাড়াই তিনি ইমাম সাহেবের মকানে এসে আচম্বিতে হাজির হলেন। রায় রায়ান বাবু এলেন নানাবিধ স্তোকবাক্যে পাত্রী পক্ষকে অধিকতর উৎসাহী করে তুলতে। কিন্তু রায় রায়ান চতুর লোক। এসেই তিনি আবিদ হোসেন সাহেবদের হাসি মুখে বললেন—বাবাজীবনকে সাথে নিয়ে এই পথেই যাচ্ছিলাম। মকানটা সামনে পড়ায় একটু গরজ করেই এলাম। বাবাজীবনকে অনেকেই দেখেননি আপনারা, এই ফাঁকে একটু দেখুন, এই আর কি !

শাদির কথাবার্তা অনেকখানি এগিয়েছে। আবিদ হোসেন সাহেব অবশ্য আপত্তি তোলেন পয়লা দিকে। ইমাম সাহেব তাঁকে বুঝিয়েছেন, "আত্মীয়তা স্থাপন করে



www.amarboi.org

হাজী আহম্মদ সাহেবকে কিছুটা হুঁশে আনতে পারলে, এই কওমের জব্বোর ভালাই করা হবে। ধরে নাও, এটা আমাদের জেহাদেরই একটা অংশ।" ফলে আবিদ হোসেন সাহেবও আর আপত্তি করেননি। কথাবার্তা নির্বিঘ্নে এগিয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় পাত্র আর রায় বাবু হঠাৎ এসে হাজির হলেন। আগমনটা অযাচিত হলেও মেহমানদের অসম্মান করা যায় না। তাই দহলীজে না তুলে তাঁরা মেহমানদের অভ্যর্থনা করে মূল দালানের ঐ বিশেষ কক্ষে এনে মেহমানদের বসালেন। এতে করে পরিবারের মহিলারাও পাশের কক্ষ থেকে পাত্র দেখার সুযোগ পেলেন। পাত্র দেখে মহিলাদের মন না ভরলেও এবং রায় রায়ানকে এ ব্যাপারে এত উৎসাহী দেখে আবিদ হোসেন সাহেব ফের মন ভারী করলেও, লৌকিকতা করতে তাঁরা কার্পণ্য করলেন না। যথাবিহিত আদর-আপ্যায়নের মাধ্যমে তাঁরা মেহমানদের বিদায় করে দিলেন।

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কি করবেন — কি করবেন করতে করতে হাজী আহম্মদ সাহেবের নিরতিশয় আগ্রহের মুখে এর দিন দুয়েক পরেই পাত্রী পক্ষ শাদির কথা একদম পাকা করে ফেললেন। মাহমুদা খাতুনের অসম্মতির পরোয়াও করলেন না বা আর দু'টো দিন দেরী করে আর একটু ভেবে দেখতেও গেলেন না। তাঁরা সান্ত্বনা হিসেবে যুক্তি খাড়া করলেন, মেয়ের নসীবে সুখ না থাকলে, তাঁরা ভেবে করবেন কি?

শাদির অনুষ্ঠানটাও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যেতো। কিন্তু হঠাৎ করে এক প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়ায়, হাজী আহম্মদ নিজেই সময় করতে পারলেন না। তিনি অল্প কিছুদিন অপেক্ষা করতে চাইলেন।

হাজী আহম্মদ অপেক্ষা করতে চাইলেও হায়াত খান অপেক্ষা করতে পারবেন কেন? আর নাহোক, মাহমুদা খাতুনের সান্নিধ্যটা তো চা-ই তাঁর। কে কি ভাববেন, কে কি বলবেন, এই সমস্ত ফালতু ভাবনা ভাবার লোক হায়াত খান নন। অতপর তিনি একা একাই এবং মাঝে মধ্যেই ইমাম সাহেবের মকানে তস্‌রীফ আনতে লাগলেন।

ইমাম সাহেবের মকানে দিলওয়ার আলী যেদিন এলেন, এই রকম তস্‌রিফ হায়াত খান সেদিনও এনেছিলেন। বিব্রতবোধ করলেও, গৃহস্বামীরা সেদিনও হবু জামাইকে এনে ঐ বিশেষ কক্ষেই বসিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে তাঁরা ওখানেই ব্যস্ত ছিলেন।

সময়ের ব্যবধানটা অনেকখানি হলেও এমন কিছু বেশী নয়। অথচ এর মধ্যেই এত কিছু ঘটে গেল। দিলওয়ার আলী এসে দেখলেন ইমাম সাহেবের মকানে তিনি এর মধ্যেই অবাঞ্ছিত হয়ে গেছেন।

মুহ্যমান দিলওয়ার আলীকে টেনে এনে দহলীজে বসিয়ে দিয়ে হতভম্ব কিতাবউদ্দীন অন্দরের দিকে ছুটে গেল। অর্ধচৈতন্য অবস্থায় দিলওয়ার আলী কুরসীর উপর বসে রইলেন। ঐ বিশেষ কক্ষ থেকে ভেসে আসা "হো হো" হাসির আওয়াজ মাঝে মাঝেই তাঁর চেতনাকে নাড়া দিতে লাগলো।

দিলওয়ার আলীর উপস্থিতির কথা কিতাবউদ্দীন এসে অন্দর মহলে বললে, প্রথমে সকলে থতমত খেয়ে গেলেন। বিশ্বাস করতেই সকলের লহমা কয়েক সময়



www.amarboi.org

লাগলো। এরপরেই সকলে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। দিলওয়ার আলী এসে একা একা দহলীজে বসে আছেন, একথা মনে হতেই সবাই তাঁরা অন্তরে ব্যথা অনুভব করলেন। তাঁরা নিজেরাই জানেন, দোষ এখানে দিলওয়ার আলীর এক বিন্দুও নেই। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের উপকার করার মাধ্যমে পরিবারের একজন হয়ে দিলওয়ার আলী তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে ছিলেন। মাহমুদাকে শাদি করার কোন ওয়াদাও তিনি দেননি বা সে দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তায় না। নিজেরাই তাঁরা এক তরফাভাবে এই চিন্তা-ভাবনা করেছেন যার মধ্যে দিলওয়ার আলীর জাররামাত্র শরিকানা নেই। তাঁদের স্বভাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলে, দিলওয়ার আলীর দোষ কি ? মাহমুদাকে শাদি তিনি করুন আর না করুন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ঐ উষ্ণ সম্পর্কটা সে কারণে নষ্ট হবে কেন ? পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দিলওয়ার আলীকে ওঘরে কিছুদিন না আনা গেলেও, তাঁদের আন্তরিকতা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন কেন ? যদিও অপারগতাটা তাঁর তখনই মাহমুদাকে জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল, তবু ভয়ানক লজ্জা পেয়ে সেটা তাঁর না জানাতে পারাটাও এমন কোন অমার্জনীয় অপরাধ নয়।

খবরটা পাওয়া মাত্র আফসারউদ্দীনের মস্তিষ্কে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা এক পলকে পাক খেয়ে গেল। ঐ একই রকম চিন্তা-ভাবনায় আবিদ হোসেন সাহেব ও আজিজুন নেছা বেগমও বিহ্বল হয়ে গেলেন। হায়াত খানের সাহচর্য কিতাবউদ্দীনকে পাঠিয়ে দিয়ে আফসারউদ্দীন ও আবিদ হোসেন সাহেব দহলীজের দিকে ছুটলেন।

মাহমুদা খাতুনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। এ খবর কানে পড়তেই প্রাণের এক প্রচণ্ড প্রবাহ তার মুর্দা দীলে ধাক্কা দিয়ে গেল। আনন্দে, বেদনায় ও অভিমানে কিছু স্থির করতে না পেরে, দিলওয়ার আলীকে এক নজর দেখার জন্যে সে দ্বিতল কক্ষের বারান্দার দিকে ছুটলো।

হন্তদন্ত হয়ে আফসারউদ্দীন ও আবিদ হোসেন সাহেব দহলীজে এসে দেখলেন, দহলীজ শূন্য, দিলওয়ার আলী নেই।

## ১২

ইমাম সাহেবের মকান থেকে বেরিয়ে দিলওয়ার আলী টলতে টলতে নিজ মকানে ফিরে এলেন। ওঁদের এই উপেক্ষা ও অপমান তাঁর আত্মসম্মান বোধটাকে দলে পিষে গুঁড়িয়ে দিলো। দীল তাঁর বিদীর্ণ করে দিলো ওঁদের এই হৃদয়হীন পরিবর্তন আর মাহমুদার এই আজব মনোবৃত্তি। মাহমুদা খাতুনের আদৌ কোন সমর্থন না থাকলে, এই শাদির খেল এত কম সময়ে আর নির্বিঘ্নে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসে কিভাবে ? বর এসে ঘর জুড়ে জেঁকে বসে কোন্ আস্কারায় ? দিলওয়ার আলী চিন্তা করে পেলেন না, তাঁদের মতো এমন দানেশমান্দ আর বিবেকবান লোকদের মনের গতি ও চিন্তা-ভাবনা এত ঠুন্‌কো হয় কি করে ? মাহমুদা খাতুনের ঐ উদগ্র মুহব্বত এক পলকে এতটা ফিকে হয়ে যায় কোন্ মন্ত্রে ? তাও আবার পাত্র যেখানে হায়াত খানের মতো একজন আহামরি মানুষ ! কিতাবউদ্দীনের কণ্ঠে অভিযোগের সুর একটা ছিল বটে।



www.amarboi.org

কি যেন সে বলতে চাইলো। তিনি নিজেও এটা চাননি, এই রকম এক অভিযোগ। কিন্তু তাঁর কসুরটা কোথায় ? ঐ অনিবার্য বিলম্বটা আদৌ তাঁর অনীহা হতে পারে না ? এতটুকু সবুর তাঁদের না থাকলে আর কার কি করার আছে ?

ঘরে ফিরে দিলওয়ার আলী শয্যা নিলেন। এই গ্লানী আর প্রবঞ্চনা দীলে তাঁর প্রচণ্ড আঘাত করলো। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো তিনি একদম অবশ ও কাহিল হয়ে পড়লেন। দেহমন কোনটাতেই জোর না থাকায়, তিনি পরের দিন দপ্তরে যেতে পারলেন না। তার পরের দিনও না। ঘরের মধ্যেই শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগলেন। ক্ষুধা-রুচি না থাকায়, খানা-পিনাও ছেড়ে দিলেন এক রকম।

মকানের চাকর-নফর, বিশেষ করে নামদার খাঁ, এ কারণে যারপরনেই অস্থির হয়ে উঠলো। খানাপিনা এনে নামদার খাঁ সাধাসাধি করতে লাগলো, দাওয়াই-হেকিম খুঁজতে লাগলো এবং হজৌর তার বিমারে পড়ে গেছেন বলে হৈচৈ জুড়ে দিলো। শান্তভাবে বুঝিয়ে শান্ত করতে না পেরে দিলওয়ার আলী রুষ্ট হলেন। শক্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে তাঁকে কিছুটা শান্ত করলেন।

পর পর দুইদিন দপ্তরে না যাওয়ায়, সহকারী আসাদুল্লাহ খবর নিতে এলো। দিলওয়ার আলীর চেহারা আর তাঁকে অবেলায় শুয়ে থাকতে দেখে আসাদুল্লাহ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো হঠাৎ কি করে কি হলো, কোন্ বিমারে ধরলো — সে এবম্প্রকার প্রশ্ন শুরু করলো।

আসাদুল্লাহ দিলওয়ারের সহকারীও বটে, বন্ধু তুল্য সাগ্‌রেদও বটে। তাঁর অসহায় মুহূর্তের এক বিশ্বস্ত অবলম্বন। হাত ইশারায় আসাদুল্লাহকে থামিয়ে দিয়ে দিলওয়ার আলী তাকে কাছে ডেকে বসালেন এবং শান্ত কণ্ঠে বললেন — ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই আসাদ মিয়া। আর দু' একদিনেই ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

আসাদুল্লাহ থামলো। কিন্তু উদ্বেগ তার গেল না। সে আবার প্রশ্ন করলো — কি সে কি হলো উস্তাদ ?

ঃ কিছু নয়। হঠাৎ মনটা খুবই খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে দুর্বল হয়ে পড়েছি। কোন মারাত্মক কিছু নয়।

আসাদুল্লাহ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললো — মন খারাপ হওয়ার জন্যেই এতটা কাহিল হয়ে গেলেন ?

দিলওয়ার আলী ম্লান হেসে বললেন — তাইতো গেলাম।

ঃ তাজ্জব ! কি এমন ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ হলো যে, এমন বিমারী হয়ে গেলেন আপনি ?

এঁড়িয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে দিলওয়ার আলী বললেন — ব্যাপারটা যা-ই হোক, দীল খারাপ হলে তো দেহ খারাপ হবেই। একটার সাথে অপরটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিনা ?

ঃ উস্তাদ !

ঃ মানুষের দীল কি আর তাজা থাকার উপায় আছে বেশীক্ষণ ? এ দুনিয়ার হাজারটা বালাই মানুষের দীলটা হরদম চুরমার করে দিচ্ছে। মানুষ যে মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে দিন দিন, তাতে মন আর প্রফুল্ল থাকবে কতক্ষণ ? খারাপ ওটা হবেই।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী উদাস হয়ে উঠলেন। এ যুক্তিতে আসাদুল্লাহর মন তেমন ভরলো না। সে অতৃপ্ত কণ্ঠে বললো — কি জানি কার মন কতবার খারাপ হয়! কিন্তু আপনার তো দেখি, উঠতে বসতেই মন খারাপ।

দিলওয়ার আলী সচেতন হয়ে বললেন — কি রকম?

আসাদুল্লাহ অভিযোগের সুরে বললো — এত কি ভাবেন উস্তাদ? এই মুলুক আর কওম কি আপনার একার যে ভাবার আর কেউ নেই? এর দুর্দিন দেখে একাই আপনি ভেবে ভেবে জান দেবেন?

ঃ বটে!

ঃ কি আবার দেখলেন কোথায়? কোন্ স্বার্থপর কোথায় আবার ছুরি মারলো কওমের বুকে?

নাছোড় বান্দা আসাদুল্লাহকে নিবৃত্ত করতে না পেরে, দিলওয়ার আলী নিদারুণ মর্ম ব্যথায় বললেন — কওমের বুকে নয় মিয়া, ছুরিটা এবার সরাসরি আমার বুকেই মেরেছে।

আসাদুল্লাহ সবিস্ময়ে বললো — আপনার বুকে!

ঃ জি হাঁ। অমনি কি আর এই হালত্ হয়েছে আমার?

ঃ বলেন কি উস্তাদ! কে ছুরি মারলে?

ঃ আমার প্রাণের রতনে। আমার পরম প্রিয় ব্যক্তিরা। কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, কোন ঘাট্-কসুর করলাম না, অথচ আচমকা সবাই ছুরি চালিয়ে বসলেন।

ঃ উস্তাদ!

ঃ এ দুনিয়ায় কেউ কারো আপন হবার নয়, বিশ্বাস করাও আহম্মকী!

খেই ধরতে না পেরে আসাদুল্লাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললো — প্রিয় ব্যক্তি! বিশ্বাস করা আহম্মকী! কি ব্যাপার উস্তাদ? আমি তো কোন তাল করতে পারছিনে! আপনি কি আপনার ভাইয়ের কথা বলছেন কিছু?

ঃ ভাইয়ের কথা!

ঃ আপনার যে শাদি তিনি পাকাচ্ছেন, আমি জানি, সে শাদি বিলকুল আপনার না-পছন্দ্! এই জন্যেই কি মন খারাপের কারণ কিছু ঘটেছে?

ঃ আরে দূর! ও শাদি আমি একদম নাকোচ করে দিয়েছি — না? ওটা আর হচ্ছে না।

আসাদুল্লাহ সাগ্রহে বললো — তাই নাকি উস্তাদ? হচ্ছে না?

ঃ বিলকুল না। ওটা একদম বাতিল।

আসাদুল্লাহ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো — আলহামদুলিল্লাহ! মস্ত বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। এবার তাহলে আসল কাজে হাত দেই উস্তাদ?

ঃ আসল কাজ!

ঃ আপনার মন কি জন্যে খারাপ তা আমি জানিনে। তবে আপনার মনটা যাতে করে তাজা হয়ে উঠে আবার, সে ব্যবস্থা জলদি জলদি করি?

ঃ অর্থাৎ?



www.amarboi.org

ঃ বুঝলেন না ?-যার সাথে শাদি হলে, মানে যাকে আপনার মন চায়, তার সাথে এবার আপনার শাদির চেষ্টা করি ?

ঃ যাকে আমার মন চায় ! কে সে ?

ঃ কি যে বলেন উস্তাদ ? ঐ ইমাম সাহেবের নাতনী—মানে মাহমুদা খাতুন সাহেবা !

ঃ বটে !

আপনার এযাজত পেলে সেখানেই আগে যাই। শাদির প্রস্তাবটা আমিই তাঁদের দেই। তাঁদের সম্মতি পেলে, আর পাবোই ইনশাআল্লাহ, আপনার ভাইয়ের মতামতটা পরে খুঁজবো এবার।

দিলওয়ার আলী তিক্ত কণ্ঠে বললেন—সেখানে যাবে শাদির প্রস্তাব নিয়ে ?

ভ্রূক্ষেপহীনভাবে আসাদুল্লাহ বললো—যাবো না উস্তাদ ? এ মওকা কি ছাড়া যায় ?

ঃ যাবে যাও, তবে পিঠে ছালা বেঁধে যেও।

আসাদুল্লাহ থমকে গিয়ে বললো—মানে ?

ঃ আর হায়াত খানের সামনে যেন পড়ো না, বা তার কানে যেন এসব কথা যায় না।

ঃ কেন, গেলে কি হবে ?

ঃ পিটে তোমাকে তক্তা বানিয়ে দেবে।

ঃ কে ? ঐ হায়াত খান ?

ঃ জি। কতবড় খন্নাস তাতো জানোই।

ঃ ঐ হায়াত খানের কি সে সাধ্য আছে ?

ঃ একা নয়। অনেক শক্তিধর পেছনে আছে তার। সবাইকে নিয়ে সে তোমাকে ঠ্যাংগাবে।

ঃ কি মুস্কিল ! সে আমাকে ঠ্যাংগাতে আসবে কেন ?

ঃ বাঃ ! তুমি তার বউ ভাগিয়ে আনবে, আর সে তোমাকে সোহাগ করবে ?

ঃ বউ ! কে কার বউ ?

ঃ যার সাথে আমার শাদির প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছো, ঐ মাহমুদা খাতুন।

বিপুল বিস্ময়ে আসাদুল্লাহ বললো—তার বউ মানে ? একি বলছেন উস্তাদ ?

ঃ ঐ হায়াত খানের সাথেই তো শাদি হচ্ছে মাহমুদা খাতুনের। বন্দোবস্তু পাকা।

ঃ মোজাক করছেন উস্তাদ ?

ঃ মোজাক ! আমি কি আর কাজ খুঁজে পেলাম না যে, এই অবেলায় তোমার সাথে মোজাক করতে বসবো ?

আসাদুল্লাহ বাক হারিয়ে ফেললো। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর সে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো—এই ব্যাপার তাহলে ? হায়াত খানের সাথে শাদি হচ্ছে ঐ মেয়ের ?

ঃ জি, তাই হচ্ছে।

ঃ কেমন কথা উস্তাদ ? আপনার কথা তাহলে কিছুই তাঁরা ভাবলেন না ?

ঃ পয়লা একটু ভেবেছিলেন। পরে মত বদল করেছেন।



www.amarboi.org

ঃ বলেন কি ! আপনার কথা ভেবেও ফের মত বদল করলেন ?

ঃ করবে না ? সোনা পেতে কাচ কে কুড়োয়, বলো ?

ঃ সোনা ! কে সোনা ? ঐ হায়াত খান ?

ঃ অবশ্যই।

ঃ আপনি কাচ আর হায়াত খান সোনা ?

ঃ সোনা নয় কেন ? হাজী আহম্মদ সাহেব এখন এই মুলুকের সেরা আদমী। ধনে জনে বলে বিক্রমে তিনি এখন অদ্বিতীয়। তাঁর ঘরে মেয়ে যাবে, একি কম কিস্‌মতের কথা ?

ঃ তাই বলে হায়াত খানের মতো একটা পাত্রের হাতে মেয়ে দেবেন তাঁরা।

ঃ হায়াত খান কেন, পাত্রটা মুর্দা খান কেউ হলেও কি আপত্তি করবে কেউ ? লক্ষ্যটা তো পাত্র নয়, লক্ষ্যটা ঐ হাজী আহম্মদের ঘর।

ঃ তাজ্জব !

আসাদুল্লাহ আবার নির্বাক হয়ে গেল। সে মলিন মুখে চুপ্‌চাপ্ বসে রইলো। তা দেখে দিলওয়ার আলী বললেন—কি হলো কথা বলছো না যে ?

ঃ কি বলবো উস্তাদ ? এমনটিও এ দুনিয়ায় সম্ভব ?

ঃ অসম্ভব এ দুনিয়ায় কোন কিছু আছে বলে আমি আর মনে করিনে।

ঃ তা উনি কি করলেন উস্তাদ ? ঐ মাহমুদা খাতুন সাহেবাও মেনে নিলেন এটা ? আপনার প্রতি খুবই নাকি টান ছিল তাঁর, একথা আপনিই বলেছিলেন। তিনিও এটা মেনে নিচ্ছেন ?

ঃ তা না নিলে শাদিটা হচ্ছে কি করে ?

আসাদুল্লাহ ব্যথিত কণ্ঠে বললো—উস্তাদ !

ঃ দুঃখটাতো এখানেই। মানুষের এই নির্মম স্বার্থবোধই দুনিয়াটাকে বাসের অযোগ্য করে ছাড়লে আসাদ মিয়া।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হয়ে গেলেন। তারপর আসাদুল্লাহ্ নিঃশ্বাস ফেলে বললো—এসব খবর কার কাছে পেলেন উস্তাদ !

দিলওয়ার আলী করুণ কণ্ঠে বললেন—অন্যের কাছে কেন ? ওখানে নিজেই আমি গিয়েছিলাম আর নিজেই এই আক্কেল সেলামী নিয়ে এলাম।

ঃ মানে ?

ঃ চাকর-নফরদের আগেই তাঁরা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। চাকর এসে বাহির আঙ্গিনাতেই আটকিয়ে দিলো আমাকে। ভেতরের দিকে এগুতেই দিলো না।

আসাদুল্লাহ আর্তনাদ করে বললো—আঃ !

ঃ তারাই আমার মুখের উপর সাফ সাফ এসব কথা শুনিয়ে দিলো।

ঃ একি জিল্লতি !

ঃ ভেতরে হায়াত খানের ফূর্তি-আহ্‌লাদের কোলাহল আর অট্টহাসি নিজের কানে শুনে এলাম।

ঃ উস্তাদ !



www.amarboi.org

ঃ সাধে কি আর ফিরে এসে শয্যা নিয়েছি আমি ? এই প্রতারণা আর দিগ্‌দারী আমি সহ্য করতে পারছিনে।

দিলওয়ার আলীর কণ্ঠস্বর ভারী হলো। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বলার মতো আর কোন কথাই কারো মুখে যোগালো না। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসাদুল্লাহ বললো—কি নির্মম দাগা ! এটাকে তো সামাল দেয়া সত্যিই বড় কঠিন।

দিলওয়ার আলী আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—কি আমি করবো এখন, দিশে করতে পারছিনে আসাদুল্লাহ ! বাইরে বেরোনোর উৎসাহটুকুও হারিয়ে ফেলেছি বিলকুল।

ঃ কিন্তু এভাবে ঘরের মধ্যে থাকলে তো আপনি বাঁচবেন না উস্তাদ ? বাইরে না বেরুলে মনের এই ফাঁপড় আপনার ঘুঁচবে না। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

ঃ বাইরে আর কোথায় যাবো, বলো ? এই মুর্শিদাবাদের হাওয়াটাই আমার কাছে এখন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। চারদিকে রাজনৈতিক দুরবস্থা, তাতে আবার আমার নিজের দীলের এই অবস্থা ! ইচ্ছে হচ্ছে, চাকরী-নকরী ছেড়ে এই শহর থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে বাঁচি। এতটুকু আস্থা-বিশ্বাস রাখার যেখানে স্থান নেই, সেখান থেকে পালিয়ে যাই !

আসাদুল্লাহ ক্লান্ত কণ্ঠে বললো—এ অবস্থায় এমন ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক উস্তাদ। কিন্তু এ দুনিয়ার যেখানেই যান না কেন, দাহটা তো দীলে আপনার থাকবেই। কোথাও গিয়ে শান্তি আপনি পাবেন না।

ঃ আসাদ মিয়া।

ঃ কাজ-কাম দায়-দায়িত্ব কিছুই ঘাড়ে না থাকলে, ঐ যন্ত্রণাটাই বড় হয়ে দেখা দেবে। ওটাই আপনাকে হরওয়াক্ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। তার চেয়ে বরং কাজ-কামের মধ্যে ডুবে থাকলে, ওটার হাত থেকে অনেকখানি রেহাই পাবেন আপনি।

ঃ কিন্তু কাজ-কাম করার মানসিকতা আর মোটেই আমার নেই এখন আসাদ মিয়া। সেই মনোযোগ আর সামর্থ কিছুই আমার নেই।

ঃ এখন তাহলে কয়েকদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুন উস্তাদ। এদিক ওদিক থেকে বেড়িয়ে আসুন কিছুদিন।

ঃ এদিক-ওদিক যাবো কোথায় ? বাইরে যাওয়া মানেই তো গুরুতর কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে যাওয়া। আর সেটাও উপরওয়ালার হুকুম হবে যখন, তখন।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে আসাদুল্লাহ বললো—এক কাজ করুন উস্তাদ। আপনি ঢাকায় যান। হাজী কোরবান আলী সাহেবের নেতৃত্বে একটা তদন্তকারী দল ঢাকায় যাচ্ছে খুব শিগগির। আগামীকাল কি পরশু। ঐ দলে সামিল হয়ে ঢাকায় গিয়ে বেড়িয়ে আসুন দিনকয়েক। দায়িত্বে থাকবেন হাজী সাহেব। আপনার নিজের তেমন দায়-দায়িত্ব থাকবে না, আবার সরকারী কাজেও থাকা হবে। এই ফাঁকে বেড়িয়ে আসুন।

উৎসাহী হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন—তাই নাকি ? কে পাঠাচ্ছেন হাজী সাহেবদের ? কিসের তদন্ত ?



www.amarboi.org

ঃ পাঠাচ্ছেন খোদ শাহজাদা সরফরাজ খান বাহাদুর। তদন্তটা দুর্নীতি আর তছরূফের। শাহজাদার জামাতা মুরাদ আলী খান আর মুরাদ আলী খান সাহেবের উপদেষ্টা রাজ বল্লভের স্বেচ্ছাচারিতায় অস্থির হয়ে যশোবন্ত রায় ঢাকা থেকে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন কিনা ?

ঃ বলো কি ! এসব তো কিছুই জানিনে ?

ঃ ঐ দলে গিয়ে যোগ দিলেই সব জানতে পারবেন। আপনি ঐ দলে শরিক হতে আগ্রহী জানলে, হাজী সাহেব আপনাকে লুফে নিয়ে দলভুক্ত করবেন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাতো করবেন ঠিকই। কিন্তু এতদিন দপ্তরটা—

ঃ আমি তো আছিই। এতদিন এত জায়গায় বাইরে গিয়ে থাকলেন, দপ্তর কি তাতে করে অচল হয়েছে কিছু ?

ঃ আরে না-না, সে কথা নয়। তোমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নই কিছু উঠে না। তোমার মতো দক্ষতা আর কয়জন সহকারীর আছে ? কিন্তু আমি ভাবছি, দপ্তরের ঝামেলাটা ইদানিং প্রায় একা একাই তোমাকে সামাল দিতে হচ্ছে। দপ্তরে আমি বসতেই পারছিনে। এই তকলিফ আর কতদিন করবে তুমি ?

আসাদুল্লাহ হেসে বললো—কি যে বলেন উস্তাদ ? আমার পদটা তো এই জন্যেই। এখনই যদি নবাব বাহাদুর বা অন্য কেউ আপনাকে অন্য কোথাও পাঠান আর আমাকে সঙ্গে যেতে না হয়, তাহলে তো এ দায়িত্ব নিতেই হবে আমাকে। আমি থাকতে তো আর আমাদের দপ্তরের ভার বাইরের কোন সালারের উপর অর্পণ করা হবে না ?

এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলো। হাজী কোরবান আলীর তদন্ত দলে সামিল হয়ে একদিন পরেই দিলওয়ার আলী ঢাকায় চলে গেলেন।

হাজী কোরবান আলী সাহেব ধারণা দিয়েছিলেন, আধা হপ্তার মধ্যেই ঢাকার তদন্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে। যাওয়া আসার সময়টা আলাদা। এত কম সময়ের জন্যে ঢাকায় গিয়ে কি হবে, দিলওয়ার আলী আসার আগে এ নিয়ে ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু ঢাকায় আসার পর দিলওয়ার আলীর এ খেদ আর রইলো না। সদল বলে তদন্ত কাজ শুরু করে তাঁরা দেখলেন, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, অনিয়ম আর যদেচ্ছারের মাত্রা এত অধিক যে, একটানা দুই হপ্তা কাজ করলেও তদন্তকাজ শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য ঢাকায় পৌঁছে ঢাকার হালত দেখেই হাজী কোরবান আলী সাহেবেরও পূর্ব ধারণা পাল্টে গিয়েছিল। তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কাজটি অল্পতে শেষ হবার নয়। ঢাকার সমৃদ্ধির ও প্রাচুর্যের এক চিত্তহারী রূপ আগে একবার এসে হাজী সাহেব স্বচোক্ষে দেখে গেছেন। তখনকার ঢাকা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, তাজ্জব হয়েছেন, এন্তার তারিফ ও গর্ববোধ করেছেন। এবার এসে ঢাকা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। ঢাকাকে এবার তাঁর একটা এতিম নগরী ও নিরন্ন মানুষের দীনহীন বসতি বলে মনে হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, ঢাকার এই দুরবস্থা প্রশাসনে নিয়োজিত নিতান্ত অযোগ্য, অসৎ ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের সীমাহীন দুষ্কর্মেরই ফসল।



www.amarboi.org

অথচ এই সেদিনও ঢাকার সমৃদ্ধি ঈর্ষণীয় ছিল। যোগ্যতর ব্যক্তিদের সততা ও নিষ্ঠার গুণে ঢাকা আবার নবাব শায়েস্তা খানের আমলের প্রাচুর্য ফিরে পেয়েছিল। নবাব সুজাউদ্দীন খান তাঁর আওলাদ সরফরাজ খানকে ঢাকার সহকারী সুবাদার বানালেন সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় গেলেন না। ঢাকার প্রশাসন পরিচালনা করার জন্যে গালিব আলী খান নামক একজন প্রতিনিধি পাঠালেন। গালিব আলী খান ছিলেন একজন যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও ঈমানদারী প্রশাসক। গালিব আলী খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে এলেন যশোবন্ত রায় নামক আর একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুদক্ষ রাজস্ববিদ। তাঁরা এসে ঢাকার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার ইরাদায় আত্মনিয়োগ করলেন। গালিব খানের বলিষ্ঠ শাসনে অনাচার-অনিয়ম যা কিছু বিদ্যমান ছিল, সবই দূর হয়ে গেল। সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হলো। জুলুম ও প্রতারণা বিলুপ্ত হয়ে গেল। উৎখাত হয়ে গেল দস্যু-তস্কর ও দুর্জনদের দৌরাত্ম্য। প্রাসাদ থেকে কুটিরতক্ অনুপম শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলো। প্রতিষ্ঠিত হলো শাসক ও শাসিতের এবং বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে এক অপরূপ সম্প্রীতি।

এর সাথে যোগ হলো যশোবন্ত রায়ের যশ-মন্ডিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি রাজস্ব বিভাগে এক বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করলেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে সমতা ফিরিয়ে আনলেন এবং সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ বাণিজ্যনীতি চালু করলেন। পাশাপাশি, তিনি খাদ্য শস্যের উপর আরোপিত বিভিন্ন কর ও আর্থিক চাপ বিলুপ্ত করে দিলেন এবং উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্পী-কারিগরসহ কৃষকদের করভার একেবারেই হাল্কা করে দিয়ে কৃষিকার্যে বিপুল উৎসাহ ও ব্যাপকভাবে সক্রীয় সহায়তা দান করলেন। সংগে সংগে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলো এবং অচিরেই পূর্ব বাংলা ধনধান্যে ভরপুর হয়ে গেল। নবাব শায়েস্তা খানের যুগের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে খাদ্য শস্যের দাম আবার অনেক নীচে নেমে এলো, চালের দাম নেমে এলো টাকায় আটমণে।

নবাব শায়েস্তা খান তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে ঢাকার পশ্চিম ফটক বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন যে, খাদ্য শস্যের দাম যাঁরা আবার তাঁর পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে পারবেন, একমাত্র তাঁরাই এই বন্ধ ফটক উন্মোচন করার গৌরবময় হকদার হবেন। প্রশাসক গালিব আলী খান ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা যশোবন্ত রায় জনগণের বিপুল উল্লাস ও আনন্দধ্বনীর মধ্যে দিয়ে সেই ফটক আবার খুলে দিলেন।

কিন্তু 'সুখে খেতে ভূতে কিলোয়'—এ প্রবাদ অব্যর্থ প্রবাদ। এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? শাহজাদা সরফরাজ খানের জামাতা সেই সময় ঢাকার নৌবহরের দারোগা বা পরিদর্শক ছিলেন। কারণটা যা-ই হোক, এই সমৃদ্ধি ও প্রশাসনের এই সুনাম জমে উঠতেই গালিব আলী খানকে সরিয়ে নেয়া হলো এবং তাঁর স্থলে শাহজাদার প্রতিনিধি হিসেবে মুরাদ আলী খানকে ঢাকার প্রশাসক বানানো হলো। মুরাদ আলী খান ছিলেন যেমনই দায়িত্বহীন, তেমনই অকর্মণ্য ও আরাম প্রিয়। "জাড়েই জান যায়, তার উপর



www.amarboi.org

উত্তরে যাও।" যশোবন্ত রায়কে কোণ ঠাশা করে মুরাদ আলী খান তাঁর উপদেষ্টা বানালেন তাঁরই নৌবহরের এক 'করিত্কর্মা' পেশ্কার রাজবল্লভকে। প্রশাসনের ভালাই চিন্তা বা কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা তিলমাত্রও এই উপদেষ্টা রাজবল্লভের ছিল না। আখের গুছিয়ে নেয়ায় আর স্বার্থসিদ্ধির মানসে 'ছয়কে নয় আর নয়কে ছয়' করায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মূলধন তাঁর চাটুবাক্য। ফলে, প্রশাসকের উদাসীনতায় আর উপদেষ্টার কুমন্ত্রণায় অতিশীঘ্রই ঢাকার বুকে নেমে এলো অনিয়ম ও অরাজকতার ঘোর অন্ধকার। সম্প্রীতি উবে গেল, শান্তি শৃঙ্খলা পালিয়ে গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য পঙ্গু হলো, বন্ধ হলো উৎপাদন, চাঙ্গে উঠলো কৃষি কাজ। পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো স্বেচ্ছাচারিতা, দায়িত্বহীনতা দুর্নীতি ও তহবিল তছরূপ। ঢাকায় প্রাচুর্যও সমৃদ্ধি দারিদ্রের বিষে বিবর্ণ হয়ে গেল। যশোবন্ত রায়কে পাত্তাই দেয়া হলো না, তাঁর নসিহতও গ্রহণ করা হলো না। দুর্নীতি রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে অতিষ্ঠ যশোবন্ত রায় কাজে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা থেকে চলে এলেন।

ব্যাপক অনিয়ম, অপচয় ও তহবিল ঘাট্তি। সমস্ত কিছু তদন্ত করে সুপারিশ-মালা খাড়া করতে এক পক্ষেরও অধিককাল লাগলো। দিলওয়ার আলী কাজের সময় কাজ করে আর অবসরে ঘুরে বেড়িয়ে কাটালেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদে দিলওয়ার আলীর পরিমণ্ডলে খটাখট্ পট পাল্টে গেল। বানরকে আস্কারা দিলে বানর মাথায় উঠে—অতি সত্য কথা। মাথায় উঠে আরো কিছু অপকম্ম করে—একথাও সর্বজন বিদিত। বর্জ্যবস্তু ঘরে তুললে দুর্গন্ধ ছড়াবেই।

হায়াত খানের আবির্ভাব অতপর এতবৃদ্ধি পেলো যে, শামনেই-সবেরা নেই-রাত বিরাতের বালাই নেই, বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের মতো পাক খেয়ে খেয়ে এসে তিনি ইমাম সাহেবের মকানে হাজির হতে লাগলেন। হাজির হওয়ার হুঁশটা তাঁর যে পরিমাণে ছিল, বিদায় নিতে ততটাই বেহুঁশ ছিলেন তিনি। সেই সাথে ক্রমেই তাঁর চরিত্রের পাঁপড়িগুলো এমনইভাবে বিকশিত হতে লাগলো, যা দেখে ইমাম সাহেবের পরিবারের নারী-পুরুষ সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সবাই তাঁরা অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত রুচির লোক। মানুষ যে এতটা নির্লজ্জ আর বেহায়া হতে পারে, এটা তাঁদের কল্পনাতেও আসে না। শংকিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। হায়াত খানের চরিত্রের ব্যাপক খবর করতে শুরু করলেন। বেশীদূর এগুতে তাঁদের হলো না। অল্পখানিক হাতড়িয়েই তারা নিসন্দেহ হলেন যে, এটি একটি জীবন্ত জঞ্জাল। সর্বোতভাবে এড়িয়ে চলার বস্তু এটা, সাদরে জড়িয়ে ধরার নয়। এ বস্তু এতই বিষাক্ত যে, এর সংস্রবে সকলেই বিষে জর্জরিত হয়ে যাবে। এতদিনে তাঁরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন, মেয়েকে জবাই করে গাঙে ভাসিয়ে দেয়া যায়, এমন ইল্লতের হাতে কুত্রাপিও তুলে দেয়া যায় না।

কি করেন-কি করেন ভাবতেই পরিস্থিতিটা তুঙ্গে উঠে গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। মাগরিবের আযান হতে আর বেশী দেরী নেই। মকানের সকলেই নামাযের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। মাহমুদা খাতুন ঐ বিশেষ কক্ষের পাশের কক্ষে এই সময় কিতাব পড়ার নামে নিজের নসীব নিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবছিলো। তার অসম্মতিটা কানেই কেউ



www.amarboi.org

তুললেন না। কি করে এই মুসিবত এখন তরিয়ে উঠবে সে, সেই চিন্তাই করছিলো। আত্মহত্যা মহাপাপ। মকান থেকে পালিয়ে যাওয়াও ভয়ানক বিপদ সংকুল। চরম মুহূর্তে তার এই নারাজীটা তার জন্যে যে দুর্বিসহ দুর্ভোগ বয়ে আনবে, তা আন্দাজ করেই সে শিউরে শিউরে উঠছিল। সেরেফ বাড়ীর মান সম্মানই বিপন্ন হবে না, ঐ চরম মুহূর্তে তার অভিভাবকেরাও হুমকির সম্মুখীন হবেন। চাই কি, মারদাঙ্গা খুন-জখমও হয়ে যেতে পারে, যদিও তখনও তার রাজী হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ইতিমধ্যেই আঁধারটা ঘনিয়ে আসতে দেখে সেও নামাযের জন্যে উঠে দাঁড়াতে গেল। মুস্কিল আসানের জন্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এখন সে এন্তার আরজ পেশ করে চলেছে। এটাকেই এখন সে একমাত্র অবলম্বন করে নিয়েছে। আবার সে সেই ইরাদায় উঠে খাড়া হলো।

কখন যে কে তার কক্ষের দুয়ার খুলে ঐ বিশেষ কক্ষের ভেতর দিয়ে বাইরে চলে গেছে এবং ঐ বিশেষ কক্ষের বাইরের দিকের দুয়ারটাও খোলা রেখে গেছে, মাহমুদা তা জানে না। উঠে দাঁড়িয়ে সে নিশ্চিন্তে পোষাক-আশাক ঠিকঠাক করতে লাগলো। ঠিক এই সময় হায়াত খান এসে বরাবরের মতো ঐ বিশেষ কক্ষে ঢুকলেন। কাউকে কোথাও না দেখে এবং পাশের কক্ষের দরজা খোলা দেখে তিনি সপুলকে এগিয়ে গিয়ে দরজার পর্দা ফাঁক করলেন। আঁধার তখনও জমেনি। ভেতরে নজর দিয়ে মাহমুদাকে একা দেখেই তিনি উল্লাসে নেচে উঠলেন। "পেয়ারী, মেরে পেয়ারী" বলে তিনি মাহমুদার কক্ষে ছুটে গিয়ে মাহমুদাকে জড়িয়ে ধরার উপক্রম করলেন। চমকে উঠে মাহমুদা খাতুন ছুটে পালানোর উদ্যোগ করতেই হায়াত খান তার কামিজটা সবলে আঁকড়ে ধরলেন এবং তাকে টেনে এনে বুকের মধ্যে ফেলতে চাইলেন। মাহমুদা খাতুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার দিয়ে উঠে হায়াত খানের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। বাঘ রক্তের স্বাদ পাওয়ার মতো হায়াত খান বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। ফলে, সমানে চলতে লাগলো ধ্বস্তাধ্বস্তি ও মাহমুদা খাতুনের আর্তনাদ।

সকলেই তখন মকানে হাজির ছিলেন। চীৎকার শুনেই সকলে সে কক্ষে ছুটে এলেন। চারদিক থেকে ছুটে এলো মালী-মজুর চাকর-নফর। সবাই এসে মুহূর্তখানেক হায়াত খানের এই পাশবিক আচরণ স্বচোক্ষে দেখলেন। এরপরেই "ধর শয়তানকে ধর" বলে চারদিক থেকে সকলে হায়াত খানকে ঘিরে ফেললেন। আফসারউদ্দীন সক্রোধে ছুটে এসে হায়াত খানকে উপর্যুপরি গলা ধাক্কা দিতে দিতে দুই কামরা পেরিয়ে এনে বারান্দার নীচে ফেলে দিলেন।

শাটপাট হয়ে পড়ে গেলেন হায়াত খান। মাটি হাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হায়াত খান সগর্জনে বলতে লাগলেন— কি ! এতবড় অপমান ! এবতড় দুঃসাহস ! আমার গায়ে হাত তোলার পরিণাম যে কি, তা মোটেই কেউ ভাবলে না ?

তাঁর কথায় কান না দিয়ে সকলেই "দূর দূর" করতে লাগলেন। কিতাবউদ্দীন এ মকানের নওকর। সেও ক্রোধ সামলাতে না পেরে বলে উঠলো— ওরে পরিণাম-ওয়ালা! একজন ভদ্র মহিলার কক্ষে ঢুকে তাঁকে বেঈজ্জত করতে যাওয়ার পরিণামটা কি, সেইটেই আগে ভাবো !



www.amarboi.org

হায়াত খান সদম্ভে বললেন— কেন, বেইজ্জতির কি দেখলে এখানে ? আজ বাদে কাল আমার বউ যে হবেই, তাকে নিয়ে স্ফূর্তি করতে বাধা কোথায় ? কোন সম্পর্ক ছাড়াই, অমন কত মেয়ের ইজ্জত এই হায়াত খান এক তুড়িতে পয়মাল করে দিয়েছে, কেউ কোন কথা বলার সাহস পায়নি, আর হবু-বউয়ের ইজ্জতে হাত দিতেই—

সকলেই সক্রোধে গর্জে উঠে বললেন—হুঁশিয়ার বেয়াদব !

অন্য একজন নওকর লাফিয়ে উঠে বললো—হুকুম দিন হুজুর, হাড়গুলো পিষে ফেলি—

আফসারউদ্দীন বললেন—লাগাও। এরপরও আক্কেল যখন হলো না, ডাণ্ডা হাঁকাও সবাই—

মার মার রবে চাকর-নফর ধেয়ে আসতেই হায়াত খান আঁতকে উঠে দৌড় দিলেন। পালাতে পালাতে বলতে লাগলেন—আমার নাম হায়াত খান। এর বদলা আমি নেবোই—সবাইকে টিট্ না করে ছাড়বো না—

হায়াত খানকে কুকুর তাড়ানো তাড়িয়ে নিয়ে চাকর-নফর সহকারে আফসার-উদ্দীনও ফটক পর্যন্ত এলেন। প্রাণের দায়ে হায়াত খান ফটক পেরিয়ে ছিটকে এসে রাস্তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াতেই হায়াত খানকে শুনিয়ে শুনিয়ে আফসারউদ্দীন চাকর-নফরদের বললেন—এরপর ভেতরেতো নয়ই, ফটকের বাইরেও এই শয়তানটাকে দেখলে, সমানে ধরে পেটাবে।

"হাঁকাও লাঠি"—বলে দলবল নিয়ে কিতাবউদ্দীন রাস্তায় ছুটে আসতেই, পুনরায় আঁতকে উঠে দৌড় দিলেন হায়াত খান।

মকানে এসে হায়াত খান একথা কাউকে বলুন আর না বলুন, মাহমুদা খাতুনের অভিভাবকেরা লোক মারফত হাজী আহম্মদ সাহেবকে জানিয়ে দিলেন, এমন বেহুদা পাত্রের হাতে তাঁরা মেয়ে দিতে রাজী নন। শাদির এ প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন।

হায়াত খানের চরিত্র হাজী আহম্মদ জানতেন। এর প্রতিবাদে তাঁর কিছু বলার মুখ ছিল না। তবে এ অপমান তাঁর আত্মসম্মানে প্রচণ্ডভাবে লাগলো। আক্রোশে তিনি গর গর করতে লাগলেন।

খবর শুনেই ছুটে এলেন রায় বাবুরা শেঠ বাবুরা। এসেই তাঁরা সক্রোধে বললেন—কি ! এতবড় অপমান ! মুষিকের এত সাহস ! না—না, এ অপমান মুখ মুজে সহ্য করা যায় না জনাব। এতে আপনার মান সম্মান দশের সামনে পানির দামে বিকিয়ে যাবে।

হাজী আহম্মদ উদাস কণ্ঠে বললেন—সেতো ঠিকই, কিন্তু করিটা কি ?

রায় বাবুরা উস্কে দিয়ে বললেন—বদলা নিন। উপযুক্ত বদলা। আর সেইটেই হলো গিয়ে বিপন্ন মান রক্ষার একমাত্র পথ।

কিন্তু পথটা প্রশস্ত নয়। ইমাম হাফিজুল্লাহর পরিবার এ শহরের এক মানীগুণী পরিবার। আমলা-অমাত্য সহকারে অনেক প্রভাবশালী লোক ইমাম সাহেবের মুসল্লী, ইমাম সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শহরেরও অনেক লোক ইমাম সাহেবের মুসল্লী ও ভক্ত। এর উপর মাদ্রাসার মহাদ্দেস্ হিসেবে আফসারউদ্দীন সাহেবেরও সামাজিক



www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠা আছে একটা। পেছনে তার শক্তি আছে সহকর্মী ও তালেবে-এলেমদের। শাহজাদা সরফরাজ খানও ঐ মাদ্রাসার উপর দুর্বল। ফলে, ইচ্ছে করলেই তাঁদের কাউকে সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে আনা যায় না। তাহলে যে হৈচৈ শুরু হবে, তা নবাবকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেবে।

ভেবে চিন্তে দেখে তাঁরা তৎক্ষণাৎ কিছু করার সাহস পেলেন না। ভবিষ্যতের মওকার আশায় রইলেন।

আফসারউদ্দীন সাহেবের মাদ্রাসায় এমতেহান শুরু হয়েছে। মস্তবড় মাদ্রাসা। উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন। তালেবে-এলেমের সংখ্যা এখানে অনেক। দুই বেলা দুই দফায় এমতেহান চলছে। আফসারউদ্দীন সাহেব মাদ্রাসার সেদরুল-মুদারিছ অর্থাৎ অধ্যক্ষ সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও তাঁর ডান হাত। বিশ্বস্ত হলেই তার মাশুল দিতে হয়। মাদ্রাসার প্রধান সাহেব পরম বিশ্বাসে এমতেহানের অনেক দায়িত্ব আফসারউদ্দীন সাহেবের উপর ন্যস্ত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। দুই তিনজন শিক্ষকও আবার এই সময় অনুপস্থিত। কেউ আছেন ছুটিতে, কেউবা আবার হঠাৎ করেই গরহাজির আছেন। এর ফলে, আফসারউদ্দীনের কাজ ও দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়ে গেছে। অন্যদিনের তুলনায় আফসারউদ্দীন সাহেবকে এখন বেশ সকাল সকাল মাদ্রাসায় যেতে হয়। সে কারণে মকানে এখন পাকশাকও সকাল সকাল শুরু হয়।

বেলা আজ বেড়ে যাচ্ছে, তবু পাক এখনও শুরু হয়নি। ঝি-চাকরানী সকলেই তৈয়ার হয়ে বসে আছে, তবু পাক চড়েনি। কারণ, বাজার-সওদা এখনও এসে পৌছেনি। কিতাবউদ্দীনকে সকালেই বাজারে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু সে এখনও ফিরেনি। অবশ্য বাজারটা অনেক দূরে। বড় বাজারেই কিতাবউদ্দীনকে যেতে বলা হয়েছে। বড় বাজারটা শহরের এক পাশে, ঘাটের উপর। নদীর এই ঘাটে হরওয়াক্ত বেচা-কেনা ও ব্যবসা বাণিজ্য চলে। এতে করে এখানেই সর্ববিধ পণ্যদ্রব্য আসে আর জমজমাট কাঁচা বাজার বসে। মাছটা গোস্‌টা এখানেই ভাল পাওয়া যায়, দামেও অনেকখানি সস্তা।

হাতে সময় রেখেই কিতাবউদ্দীনকে ঘাটে পাঠানো হয়েছে। কয়দিন ধরে এই বাজারেই পাঠানো হচ্ছে তাকে। অন্যদিন সে একদণ্ডও বিলম্ব করে না। তড়িৎ গিয়ে তড়িৎ ফিরে আসে। কিন্তু আজ সে লাপাত্তা। আড্ডা মারার স্বভাবও কিতাবউদ্দীনের নেই। তবু এই বিলম্ব দেখে সকলেই মনে মনে উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন। পাকের এখনও, একেবারেই অসময় হয়নি, কিন্তু কিতাবউদ্দীন গেছে তো সেই সাত সকালে! পয়সা-কড়িই হারিয়ে ফেললো, না কারো সাথে কোন ফ্যাসাদ বাধিয়ে দিলো, কে জানে?

ফ্যাসাদ না হলেও ঐ রকমই একটা কিছু নিয়ে কিতাবউদ্দীন আটকে ছিল এবং সেটা জানা গেল একটু পরেই। অন্যদিন কিতাবউদ্দীন ধীরে সুস্থে আসে। আজ তাকে দেখা গেল, সে দৌড়ের উপর আসছে। দৌড়ের উপর এসেই সওদা-পাতি ধড়াশ করে ফেলে দিয়ে বিপুল উৎসাহে সে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করলো। "হুজুর, আম্মা হুজুর, এদিকে আসুন — শিগ্‌গির এদিকে আসুন," বলে সে তোলপাড় শুরু করলো।



www.amarboi.org

বাজার-সওদা তুলে নিয়ে ঝি-চাকরাণীরা তখনই পাক ঘরে চলে গেল। কিতাবউদ্দীনের ডাক-হাঁকে আজিজুন নেছা বেগম, আবিদ হোসেন সাহেব, আফসারউদ্দীন, মাহমুদা খাতুন— সকলেই দ্রুত পদে এগিয়ে এলেন। আবিদ হোসেন সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন— কি হয়েছে? এমন হৈচৈ করছো কেন?

খুশীতে নেচে উঠে কিতাবউদ্দীন বললো— জব্বোর খবর আছে হুজুর— মজাদার খবর!

ঃ মজাদার খবর!

ঃ জারিজুরি শ্যাষ। খোয়াবটা খতম!

ঃ মানে?

ঃ চিড়িয়া উড়ে গেছে হুজুর, একদম ফুড়ুৎ!

ঃ উড়ে গেছে!

ঃ একদম মুঠোর বাইরে চলে গেছে, আর বুক চাপ্‌ড়িয়ে ফায়দা নেই।

ঃ কিতাবউদ্দীন!

খুশীর আধিক্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে কিতাবউদ্দীন কেবলই তার মনের খেদ ঝাড়তে লাগলো। বললো— আশার মুখে ছাই পড়েছে হুজুর, মুঠো মুঠো ছাই। হুঁঃ! এখন আসমানের তারা গুণুন বসে বসে।

আবিদ হোসেন সাহেব বিব্রত কণ্ঠে বললেন— কি বলছো আবোল-তাবোল?

ঃ নেশা ছুটে গেছে হুজুর। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ধর্ম বলে কি কোন কিছুই নেই?

ঃ আহ্! কথাটা কি তোমার, সেটা বলবে তো?

ঃ সেইটেই তো বলছি। সাদাদীলে দাগা দিলে এই রকমই হয়। এখন মুখ লুকাবেন কোথায়, লুকান তো দেখি!

অসহ্য হয়ে উঠায় আফসারউদ্দীন সাহেব ধমক দিয়ে বললেন— চুপ্ করো! যত্তসব আহম্মকের কারবার।

কিতাবউদ্দীন থতমত করে বললো— হুজুর!

ঃ পাগলামী করছো কেন? কি বলতে চাও তা সরাসরি বলতে পারো না? কে মুখ লুকাবে?

ঃ ঐ দিলওয়ার আলী হুজুর।

সকলেই উৎকর্ণ হয়ে বললেন— দিলওয়ার আলী!

ঃ জ্বি! ঐ হুজুরের মুখখানা চুণ হয়ে গেছে।

মাহমুদা খাতুন দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। দিলওয়ার আলীর নাম শুনে সে আর একটু কাছে এগিয়ে এলো। আফসারউদ্দীন বললেন— চুণ হলো মানে?

ঃ তাঁর শাদিটা যে ভেঙ্গে গেছে।

ঃ শাদিটা ভেঙ্গে গেছে!

ঃ ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের বেটির সাথে শাদি আর তাঁর হচ্ছে না। ও আশা শ্যায্!

ঃ হচ্ছে না কেন?

ঃ কি করে হবে হুজুর? পাত্রী যে হাত ছাড়া। উনি শাদি করবেন কাকে?



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব আর একটু এগিয়ে এসে বললেন—হাত ছাড়া মানে? হাত ছাড়া হলো কি করে?

ঃ অন্যজনকে শাদি করেছে হুজুর। ঐ মেয়েটা তার পছন্দের মানুষকে শাদি করে ফেলেছে।

সচকিত হয়ে উঠে মাহমুদা খাতুন আবার ক' ধাপ পেছনে সরে গেল। অন্যান্য সকলে এক সাথে বলে উঠলেন—সেকি!

ঃ সে জন্যে সেরেফ ঐ দিলওয়ার আলী হুজুরই নন, মেয়ের বাপটাও মুখ লুকানোর ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছেন না।

আফসারউদ্দীন বললেন—কি রকম?

ঃ মেয়েটা যে চুরি করে শাদি করেছে হুজুর। বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে শাদি করে নিয়েছে। ঐ শাহরিয়ার খান সাহেব কিছু জানেনই না।

ঃ সেকি কথা! মেয়ে একা একা এতবড় কাজ করবে কি করে?

ঃ একা হবে কেন? তার ফুফু আম্মা যে এর পেছনে আছেন।

ঃ ফুফু আম্মা!

ঃ জি–জি। মেয়েটা তার ঐ ফুফাতো ভাইকেই মুহব্বত করতো। জব্বোর মুহববত। কিন্তু ওরা গরীব আর ছেলেটা বেকার, তাই শাহরিয়ার খান সাহেব রাজী হননি। ওখানে শাদি না দিয়ে উনি মেয়ের শাদি দিলওয়ার আলী হুজুরের সাথে দিতে গিয়েছিলেন।

ঃ তারপর?

ঃ মেয়েটা পালিয়ে তার ফুফুর মকানে এলে আর ফুফুর কাছে কেঁদে পড়লে, ঐ ফুফুই কাজী ডেকে এনে ওদের শাদি পড়িয়ে দিয়েছেন।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—তাজ্জব ব্যাপার! তা শাহরিয়ার খান সাহেব এরপর কি করলেন?

ঃ কি আর করবেন হুজুর? হাজার হোক, তাঁর নিজের বোন এই কাজ করে ফেলেছেন আর শাদিটাও হয়ে গেছে। এখন আর কি করবেন তিনি? আপন বোনকে তো খুন করতে পারেন না? বরং এ নিয়ে এখন হৈচৈ করলে, মান সম্মান তাঁর আরো চলে যাবে। এমনিতেই তো জব্বোর বেকায়দায় আছেন!

ঃ বেকায়দায়!

ঃ বেকায়দা নয় হুজুর? দিলওয়ার আলী হুজুরের সাথে মেয়ের শাদি ঠিকঠাক, আজ বাদে কাল শাদি হবে, এই অবস্থায় মেয়ে উধাও! ব্যাপারটা চিন্তা করুন! দিলওয়ার আলী হুজুরদের সামনে উনি এখন মুখ দেখাবেন কি করে?

ঃ আচ্ছা, এই ব্যাপার?

ঃ জি হুজুর, বিলকুল এই ব্যাপার।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ্‌চাপ্‌। এ কাহিনী শুনে মকানের সকলেই একাধারে তাজ্জবও হলেন, খুশীও হলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন। একটু পরে আফসারউদ্দীন কিতাবউদ্দীনকে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—ঐ দিলওয়ার আলী



www.amarboi.org

সাহেবের সাথেই নাকি আশনাই ছিল মেয়েটার, মানে দিলওয়ার আলী সাহেব নিজে তাকে পছন্দ করে শাদি করতে গিয়েছিলেন, আবার তুমি আজ একথা বলছো, ব্যাপারটা কেমন হলো ?

মুখ কাঁচুমাচু করে কিতাবউদ্দীন বললো — সেই তো কথা হুজুর ! আমিও এর কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঃ এসব কথা কোথায় পেলে তুমি ?

ঃ হুজুর !

ঃ এতসব ভেতরের কথা কার কাছে শুনলে ?

ঃ ঐ ভেতরের লোকের কাছেই হুজুর। এই জন্যেই তো বাজার থেকে ফিরতে এতদেরী হলো।

ঃ ভেতরের লোক।

ঃ জি হুজুর। ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের মকানের এক নওকরের কাছে শুনলাম। ইয়ার বকস। নওকরটার নাম ইয়ার বকস। আমাদের এলাকার লোক হুজুর, এক কালের খুব খাতিরের লোক। ইয়ার বকস যে ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের মকানে এসে নকরী নিয়েছে তাকি আর জানি ? হঠাৎ আজ ঐ ঘাটে দেখা। একই মাছ ধরে টানাটানি করতেই দেখি ইয়ার বকস। তাকে দেখে আমিও তাজ্জব, আমাকে দেখে সেও তাজ্জব।

ঃ তারপর ?

ঃ খবর জিজ্ঞেস করতেই সে শাহরিয়ার খান সাহেবের নাম করলো। বললো, সে তাঁরই মকানে নকরী করে। আর কি ছেড়ে কথা আছে হুজুর ? তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে এক পাশে বসলাম আর একটা একটা করে তামাম কথা শুনলাম।

ঃ এত কথা কেন জিজ্ঞেস করছো, সে তা বললো না ?

ঃ বললো। আমি বললাম, দিলওয়ার আলী সাহেব আমার খুব চেনাজানা লোক, তাই জানতে চাইছি। আর কিছুই বলিনি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এতেই তো ফিরতে আজ দেরী হলো হুজুর। অবশ্য দেরীটা ইয়ার বকসেরও হয়েছে। সেও হয়তো গা'ল খাচ্ছে মকানে গিয়ে।

মুখ নীচু করে কিতাবউদ্দীন হাসতে লাগলো। আবিদ হোসেন সাহেব বললেন —ঘটনাটা তো তাজ্জবই বটে। তা একথাটা বলতে গিয়ে তুমি এত পাগ্‌লা হয়ে গেলে কেন ? প্রথম দিকে যে কেবলই আবোল-তাবোল বকছিলে ?

নীচের দিকে মুখ রেখেই কিতাবউদ্দীন সহাস্যে বললো — আমার যে খুব আনন্দ হয়েছে হুজুর ! জিয়াদা খুশী হয়েছি যে।

ঃ খুশী হয়েছো ! কি জন্যে ? দিলওয়ার আলীর শাদি ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যে ?

ঃ জি হুজুর, জি–জি।

ঃ কেন ? এতে তোমার এত খুশী হওয়ার কি হলো ?



www.amarboi.org

কিতাবউদ্দীন আবেগের ঝোঁকে বলে উঠলো—হবো না হুজুর ? বেঈমানীর শাস্তি হলে খুশী হবো না ? দিলওয়ার আলী হুজুরকে আমাদের এই আপামনি কত পেয়ার করেন। তাঁর পেয়ার ইনকার করে, তাঁকে কাঁদিয়ে উনি কিনা গেলেন ঐ—

কথার মাঝেই চমকে মাহমুদা খাতুন চাপা কণ্ঠে "ছিঃ বলে ছুটে পালালো। তা দেখে কিতাবউদ্দীনও হুঁশে এসে "তওবা" বলে জিহ্বায় কামড় খেলো এবং বেজায় শরম পেয়ে সেও দৌড় দিয়ে পালালো। এদের এইভাব দেখে, বিশেষ করে কিতাব-উদ্দীনের আন্তরিকতায়, সকলেই হেসে ফেললেন।

এরপরে সকলেই আবার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। আজিজুন নেছা বেগম এতক্ষণ অবাক হয়ে তামাম ঘটনা শুনছিলেন। এবার তিনি আবিদ হোসেন সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন—ব্যাপারটা কেমন হলো চাচাজান ? এ পর্যন্ত জেনে আসছি, দিলওয়ার আলী নিজে পছন্দ করে মেয়েটাকে শাদি করছে। এখন শুনছি মেয়েটার মনোযোগ অন্যদিকে। ব্যাপার কি কেমন গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে না ?

আবিদ হোসেন সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি আম্মাজান। এটা হয় কি করে ? এমন একটা কাণ্ড—আচ্ছা আফসারউদ্দীন, এসব কথা কিছুই তোমার কানে পড়েনি এযাবত ?

আফসারউদ্দীন বুঝতে না পেরে বললেন—আমার কানে পড়বে মানে ?

ঃ মানে, ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের শ্যালক না কে একজন তোমার সহকর্মী, যিনি তোমাকে অগ্রিম দাওয়াত দিলেন, তিনি তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি ?

আফসারউদ্দীন ক্ষোভের সাথে বললেন—কি বললেন ? ঐ তাকে নিয়েই তো যত মুসিবত হয়েছে আমার ? মাদ্রাসায় এমতেহান চলছে। দুইজন শিক্ষক ছুটিতে, এর উপর হঠাৎ করে উনিও এই হপ্তাকাল ধরেই গরহাজির। এমতেহান সামলানো এখন যে কি মুস্কিল হয়েছে আমার ! উনি থাকলে তো শুনতে পাবো।

ঃ বলো কি !

ঃ এই জন্যেই তাহলে হয়তো অনুপস্থিত আছেন উনি। ঠিক আছে, উনি এলেই এবার জিজ্ঞেস করবো এসব কথা। আমি যাই। আমার মাদ্রাসার সময় হয়ে যাচ্ছে, গোছল-টোছল সেরে নিই—

আফসারউদ্দীন চলে গেলেন। আবিদ হোসেন সাহেব ও আজিজুন নেছা বেগম এসে নিরিবিলিতে বসলেন। এরপর আজিজুন নেছা বললেন—ঐ আফসারউদ্দীনের জানার আর অপেক্ষায় আমাদের বোধ হয় চুপ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। চাচাজান ? কিতাবউদ্দীন যা বললো তা কতটা ঠিক এর মধ্যে কোন রহস্য আছে কিনা, তারও খোঁজ নেয়া উচিত।

আবিদ হোসেন সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—আম্মাজান।

আজিজুন নেছা বেগম বললেন—গোলমাল যদি কিছু থেকেই থাকে, মানে আমাদের জানাটা যদি পুরোপুরি ঠিক না হয়, তাহলে তো বিপরীত চিন্তা-ভাবনা এখনই আমাদের করতে হয়।



www.amarboi.org

ঃ সে তো ঠিকই। কিন্তু সেই খোঁজটা নেই কার কাছে? ঘটনাটা এমন হলে তো ঐ শাহরিয়ার খান সাহেবের কাছে এসব কথা তোলা যাবে না? উনি নিজেই তাহলে অতিশয় বিব্রত আছেন। ওদিকে আবার, গোড়া-মাথা না জেনে সরাসরি দিলওয়ার আলীর সাথেও এ নিয়ে কথা বলা যায় না।

ঃ এক কাজ করুন চাচাজান। দিলওয়ার আলীর ভাই মীর দিলীর আলী না কে একজন আছেন, তাঁর কাছে যান। শুনলাম, উনিই নাকি এই শাদির সাথে সরাসরি জড়িত আছেন। আপনি গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলুন। কিভাবে কথাটা তুলতে হবে, তাতো আর আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে না?

সোচ্চার হয়ে উঠে আবিদ হোসেন সাহেব বিপুল উৎসাহে বললেন—ঠিক ঠিক। ঠিক কথা বলেছো তুমি আম্মাজান। শুনেছি, উনি খুব দানাদার লোক। ওখানে গেলে জরুর সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। তাহলে আমি চলি, এখনই বেরোই। মকানটাতো চিনিনে। এখন গেলে ঠিক তাঁকে দপ্তরেই ধরতে পারবো।

ঃ আপনার খুব তকলিফ হবে চাচাজান। কতদূরে তাঁর দপ্তর তা জানিনে। তবু বোধহয় দেরী না করে এইটেই করা উচিত।

আবিদ হোসেন সাহেব এইটেই করলেন। তৈরী হয়ে তখনই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। অধীর আগ্রহ আর চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে আজিজুন নেছা বেগম তাঁর পথ চেয়ে রইলেন।

খবর করে যথা সময়েই ফিরে এলেন আবিদ হোসেন সাহেব। নিদারুণ এক দাহ তাঁকে দহন করছে তখন। আজিজুন নেছা বেগমের সামনে এসে তিনি প্রায় শাট্‌পাট হয়ে পড়ে গেলেন এবং আফসোসের তাড়নায় তিনি অস্থির কণ্ঠে বললেন—সর্বনাশ করে ফেলেছি আম্মাজান। নিজের ঘরে নিজেই আমরা আগুন দিয়ে বসে আছি। হায় হায়! কি বিভ্রান্তি—কি বিভ্রান্তি!

বিচলিত হয়ে উঠে আজিজুন নেছা বললেন—কি খবর চাচাজান? কি আপনি জেনে এলেন?

আকুলি বিকুলি করে উঠে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—বেকসুর-বেকসুর, দিলওয়ার আলী বিলকুল বেকসুর। তার জাররামাত্র কসুর নেই। এক ফোঁটাও গলদ নেই তার মধ্যে। খামাখাই একি করতে কি করে বসলাম আমরা!

ঃ চাচাজান!

ঃ দিলওয়ার আলী কিছুই জানে না। এই শাদির ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার অনুপস্থিতিতে ঐ মীর দিলীর আলী সাহেবই পাকিয়ে তুলেছিলেন শাদিটা।

ঃ সেকি!

ঃ হুগলী থেকে ফিরে এসে একথা শুনামাত্রই দিলওয়ার আলী তৎক্ষণাৎ এ শাদি নাকোচ করে দিয়েছে। তার ভাইয়ের কাছে সরাসরি না জবাব দিয়ে দিয়েছে। এছাড়া, ঐ মেয়েটার সাথে তার কোন যোগাযোগও ছিল না। দেখেওনি, ওদের মকানে সে কখনো যায়ওনি।



www.amarboi.org

বিপুল বিস্ময়ে আজিজুন নেছা বললেন—একি অসম্ভব কথা চাচা ! তার বড় ভাই তাহলে এমন একটা কাজ করলেন কি ভেবে ?

ঃ উনি ভুল করেছেন আম্মাজান। উনি নিজেই বললেন, উনি মস্তবড় ভুল করেছেন। ভাই তাঁর মকানে একা একা কষ্টে আছে, তার ঠিকমতো তয়-তদবীরের লোক নেই, তার বাউণ্ডেলে জিন্দেগী নিয়ন্ত্রণ করার কোন বাঁধন নেই—এসব দেখে উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভাইকে শাদি দিতে গিয়েছিলেন। দিলওয়ার আলী তাঁর কথা কোনটাই ফেলেনি বলে ভেবেছিলেন, এটাও ফেলবে না।

ঃ তারপর ?

ঃ কিন্তু দীলের ব্যাপার স্যাপার ! এ জায়গায় উনি হাত দিয়ে ভুল করেছেন। দিলওয়ার আলী এসে যখন মরিয়া হয়ে এটা নাকোচ করে দিলো, তখনই তাঁর ভুলটা বুঝতে পেরেছেন মীর দিলীর আলী সাহেব। সেই সাথে তিনি এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, দিলওয়ার আলীর দীলটা জরুর অন্য কোথাও আটকা আছে বলেই এত শক্তভাবে তাঁর এ কাজ নামঞ্জুর করলো সে, অন্যথায় করতো না।

ঃ চাচাজান !

ঃ ঐ মীর দিলীর আলীর দীলটাও খুব বড় দেখলাম। দিলওয়ার আলী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাদি করুক, উনিও এটা মোটেই চান না। তাই নিজের খানিকটা গা-কাটা গেলেও, ভাইয়ের এ অস্বীকৃতি তিনি খুবই সহজভাবে আর সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছেন।

ঃ বলেন কি ! উনি এতকথা বললেন ?

ঃ সেরেফ এতকথা। দিলওয়ার আলী তীর বিদ্ধ হয়ে আমাদের মকানে ছিল জেনে, উনি এতখুশী হলেন যে, আমাকে কোথায় বসাবেন, কিভাবে যত্ন নেবেন–সেকি ব্যস্ততা ! কিন্তু আমার দীল তো তখন অস্থির ! নিজেরা আমরা যে ভুলটা করেছি, সেই ভাবনায় দিশেহারা। তাই উনাকে কোন যত্ন নেয়ার সময় দিতে পারলাম না। ঘটনাটা জেনে নিয়েই চলে এলাম। আমরাও দিলওয়ার আলীর শুভাকাঙ্ক্ষী জেনে উনি কত খুশী !

ঃ আচ্ছা। তা উনি তাহলে কনে পক্ষকে না-জবাব দিয়েছিলেন ?

ঃ না–না, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সে জিল্লতিতে ফেলেননি। উনি বললেন, "আল্লাহ্ তায়ালার হাজার শুকুর, এতবড় পাকা কথা দেয়ার পর আমাকে আবার মুখ ফুটে 'না' বলতে যেতে হয়নি। ইতিমধ্যেই ঐ মেয়েটা তার ফুফাতো ভাইকে শাদি করে নিয়ে আমাকে মস্তবড় দায় থেকে বাঁচিয়েছে।"

ঃ বলেন কি চাচাজান ! কিতাবউদ্দীনের কথা তাহলে সবই সত্যি ?

ঃ বিলকুল সত্যি। দিলওয়ার আলীকে অন্যায়ভাবে খামাখা আমরা কি দোষটাই না দিলাম।

আজিজুন নেছা বেগমও অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—তাইতো হলো চাচাজান ! একি মারাত্মক এক গোলমাল পাকিয়ে ফেললাম আমরা ! কি ভুলটা করলাম !

ঃ ভুলটা শুধু দেখছো ? দাগাটা কতবড় দীলে তার দিলাম আমরা, সেদিকটা দেখছো না ?



www.amarboi.org

ঃ চাচাজান !

ঃ হিসেব করে দেখলাম, যেদিন দিলওয়ার আলী ঐ শেষবার আমাদের মকানে এসেছিল, তার আগের দিন বিকেলেই ঐ শাদিটা নাকোচ করে দিয়ে সে আমাদের মকানে এসেছিল। কতবড় আশা নিয়ে সে এসেছিল আর তার বিনিময়ে কতবড় দাগাটা সে পেয়ে গেল, ভেবে একবার দেখো ?

আবিদ হোসেন সাহেব খবর করে এসে এসব কথাবার্তা শুরু করতেই মাহমুদা খাতুন এসে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল এবং চুপচাপ এসব কথা শুনছিলো। এবার আর সে সহ্য করতে পারলো না। শত চেষ্টা করেও সে তার অবাধ্য বেদনাকে চাপা দিতে পারলো না। "ওম্মা!" বলে ডুকরে উঠে সে কক্ষান্তরে ছুটে গেল এবং পুনরায় বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। তার আওয়াজ কানে যেতেই আবিদ হোসেন সাহবে ফের আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন — দেখেছো, কি গুনাহ্‌টা করে ফেলেছি আমরা ?

এর জবাবে আজিজুন নেছা বেগম আপ্লুত কণ্ঠে বললেন — সংশোধন করুন চাচাজান, যেভাবেই হোক, এই ভুলটা আবার সংশোধন করুন ! এর বেশী আপনার কাছে আর কিছুই আমি চাইনে —

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আজিজুন নেছা বেগমও দ্রুতপদে সরে গেলেন।

আবিদ হোসেন সাহেব কোন উদ্যোগ নেয়ার আগেই কিতাবউদ্দীন আবার দিলওয়ার আলীর বাসভবনে ছুটলো। মাহমুদা খাতুন সেদিনই আর তখনই তাকে পাঠিয়ে দিল। বলে দিলো, আর কিছুই মাহমুদা খাতুন চায় না, শুধু দিলওয়ার আলীর সাথে দু'টো কথা বলতে চায় সে। বিছানায় পড়ে গুম্‌রে গুম্‌রে মর্মব্যথা লাঘব করতে না পেরে, সে এই উদ্যোগ নিলো।

দিলওয়ার আলী তখনও ঢাকা থেকে ফেরেননি। কিতাবউদ্দীন এসে দেখলো, মাথায় হাত দিয়ে নামদার খাঁ অধোবদনে বসে আছে। কিতাবউদ্দীনকে দেখেই নামদার খাঁ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললো — চাক্কু বসাই দিলেকরে কিতাব ভাই, বেঈমান আউরাত হামার হজৌরের সাদাদীলে চাক্কু বসাই দিলেক ! হামার হজৌর আখুন দিউয়ানা হই যাইবেক বিলকুল !

কিতাবউদ্দীন প্রথমে হকচকিয়ে গেল। এরপর চিন্তা করে বললো — কার কথা বলছো ? তোমার ঐ বহু আম্মার কথা ?

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে নামদার খাঁ বললো — বুলবেক নাই — বুলবেক নাই। উ হারামী আউরাত হামার বহু আম্মা নাই আছে। উ খানকী আছে, বেহোড় কস্‌বী আছে। হারামী ই মকানডা জ্বালাই দিলেক বটে।

ঃ খাঁ সাহেব।

ঃ আখুন কেত্তো মুসিবত, তুম্ কহো ? হজৌর ওয়াপস্ আসি ই বাত ছুনিবেক তো বেকারার হো যাইবেক, আওয়ারা হো যাইবেক।

ঃ মানে ? হারে কিতাব মিয়া ! মুহব্বত হো গৈল্, পেয়ার হো গৈল, আখুন ছাদি হইবেক — তামাম ঠিকঠাক। কসবী আউরাত দুস্‌রা মরদের গলাধরি ভাগি গৈল্। কিয়া দিগ্‌দারী ! হজৌর লাচার হইবেক তো জরুর ?



www.amarboi.org

কিতাবউদ্দীন সবিস্ময়ে বললো—সেকি ! তোমার হুজুর এখনও একথা শুনেননি ?

ঃ হাইরে বা ! হজৌর তো আখুন ঢাকা ছহর। ওয়াপস্ নাই আসিলেক। আসিবেক তো কি গজব হো যাইবেক, তুম্ সম্‌ঝি লাও ?

কিতাবউদ্দীন তার নিজের ভাবনাতেই অস্থির ছিল। দিলওয়ার আলী নেই জেনে সে আরো মুষড়ে পড়লো। এই পাগলামীতে কান না দিয়ে সে হতাশ কণ্ঠে বললো—তোমার হুজুর তাহলে মকানে নেই, মানে ঢাকায় গেছেন ?

ঃ হুঁ–হুঁ, ওহি বাত।

ঃ কবে ফিরে আসবেন তা কিছু জানো ?

ঃ জরুর আসিবেক। বহুত্ রোজ হো গৈল্, আখুন আসি যাইবেক জরুর। আসি যাইবেক তো তুফান পয়দা হো যাইবেক। এহি দাগা হামার হজৌর ছামাল দিতে পারিবেক নাই বিলকুল। বিমারী হো যাইবেক। হামি আখুন কৌন্ কাম করি, তুম বাতাও ?

ঃ কিচ্ছু করতে হবে না।

ঃ হইবেক নাই ! হজৌর লাচার হো যাইবেক আউর হামি—

ঃ কিছু হবেন না। তোমার হুজুর আওয়ারাও হবেন না, লাচারও হবেন না। বরং একথা শুনলে উনি খুশী হবেন।

ঃ কিয়া কহা ?

ঃ জিয়াদা খুশী হবেন।

ঃ হাইরে বা ! তুম মোজাক জুড়ি দিলেক ?

ঃ মোজাক ! মোজাক জুড়ে দেবো কেন ?

ঃ আলবত মোজাক জুড়ি দিলেক। এহি বদনসীব দেখি, তুহার দীলে তামাছা পয়দা হো গৈল্, জরুর। ইন্‌কার পয়দা হো গৈল্ !

ঃ খাঁ সাহেব !

ঃ তুম্ ভাগি যাও। হামি আখুন বেহাল আছি বটেক। বুরাবাত বলি দিবেক, তুম্ ভাগি যাও—

ঃ কি মুস্কিল ! আরে ভাই, আমার কথাটা আগে বোঝার চেষ্টা করো। ঐ আউরাতকে নিয়ে তোমার হুজুরের কোন মাথা ব্যথা নেই। ওকে শাদি করতে তোমার হুজুর কখনো চাননি।

ঃ চাহিলেক নাই ?

ঃ কোনদিনই চাননি।

নামদার খাঁ লাফিয়ে উঠে বললো—হুশিয়ার কিতাব মিয়া ! হামার দিমাগে আগুন ধরাই দিবেক নাই। হজৌর উহারে বহু বানাইবেক, খোদ হজৌর হামারে ছুনাই দিলেক, তু উহারে ঝুটা বানাই দিবেক ? হামারে ভি ঝুটা বানাই দিবেক ? ভাগি যাও, আভভি ভাগি যাও। কেঁচাল করিবেক তো জরুর খুন খারাবী হো যাইবেক—হুঁ।

ইতিমধ্যে আসাদুল্লাহ্ সেখানে এসে হাজির হলো। নামদার খাঁকে গর্জন করতে শুনে সে বলতে বলতে এলো—কি হলো খাঁ সাহেব, হঠাৎ খুন খারাবীর ব্যাপর কি ঘটলো ?



www.amarboi.org

আসাদুল্লাহকে দেখে নামদার খাঁর খেদ আরো বেড়ে গেল। সে অভিযোগ করে বললো — দেখি লাও সাহাব, ই না-হক আদমী কৌন্‌ বদ মতলব লই আসি গৈল্‌, দেখি লাও৭*

ঃ বদ মতলব !

ঃ হঁ হঁ, হামার হজৌর কো লি' তামাছা করিতে আসি গৈল্‌ বটে !

কিতাবউদ্দীনের দিকে পুরোপুরি নজর তুলেই আসাদুল্লাহ নাখোশ হলো। সে নাখোশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো — একি তুমি ! তুমি ঐ ইমাম সাহেবের মকানের নওকর নও ?

কিতাবউদ্দীন সালাম দিয়ে বললো — জি হুজুর, আমার নাম কিতাবউদ্দীন।

সালামের জবাব দিয়েই আসাদুল্লাহ নারাজ কণ্ঠে বললো — তুমি আবার এখানে এসেছো কেন ?

ঃ দিলওয়ার আলী হুজুরের খোঁজ করতে এসেছি হুজুর। তাঁর তালাশে এসেছি।

ঃ কেন, তাঁর তালাশ কেন ?

ঃ তাঁকে ডাকতে এসেছি।

ঃ বটে ! কে তোমাকে পাঠিয়েছে ? তোমার মুনিবেরা ?

ঃ জি–জি।

দিলওয়ার আলীর ঐ জিল্লতিটা আসাদুল্লাহর দীলে বড় বেজেছিল। একথায় তার মাথায় দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠলো। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করার চেষ্টা করে সে বললো — এখন তাঁকে ডাকতে এসেছো ?

ঃ জি হুজুর।

ঃ এতদিন কোথায় ছিলে ?

ঃ হুজুর !

আসাদুল্লাহ ক্ষোভটা তার সামাল দিতে পারলো না। সে তিক্ত কণ্ঠে বললো — আজ পাঁকে পড়ে গেছো বলে এসেছো ? হাজী আহম্মদ সাহেবদের হাতে আক্কেল সেলামী পাওয়ার পর এসেছো ?

ঃ তা–মানে —

ঃ বড় ঘরে যাবে তোমরা, বড় ডাল ধরবে, সেটা আর হলো না বলে দিলওয়ার আলীর ডাক পড়েছে আজ ?

ঃ একি বলছেন হুজুর ?

ঃ ঠিকই বলছি। হায়া-শরম কি নেই তোমাদের ? এক জায়গায় ছ্যাঁকা খাওয়ার পর তবে এখানে এসেছো ?

ঃ হুজুর।

ঃ দিলওয়ার আলী সাহেব কি বুরবক, না বেলেহাজ আদমী যে, ডাক দিলে আর অমনি উনি আবার ওখানে দৌড় দিলেন ?

ঃ কিন্তু হুজুর —

ঃ একজনকে কয়বার করে বোকা বানানো যায় ? বেচারাকে একবার তো চোরের হাল করে তোমরা ছেড়েছো ? আবার এসেছো তাকে নিয়ে মস্‌করা করার জন্যে ?



www.amarboi.org

নামদার খাঁ লাফিয়ে উঠে বললো — ওহি বাত সাহাব, ওহি বাত। ই আদমী মোজাক করিতে আসি গৈল্ বটে !

ওদিকে কান না দিয়ে আসাদুল্লাহ এবার কিতাবউদ্দীনকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে বললো — অবশ্য, তোমাকে এসব বলা ঠিক নয়। কিন্তু তাঁরা তো কেউ এখানে নেই। তুমিই আছো বলে বলতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে বলোগে, দিলওয়ার আলী সাহেব দীলের কারবার করেন, দালালী করেন না। দালালী করেন তাঁরাই। গরুর দালালী। এক হাটে বিক্রি না হলে, তাঁরা আর এক হাটে বিক্রি করতে চান। ওসব কারবার এখানে চলবে না।

ঃ হুজুর।

ঃ যাও–যাও। দিলওয়ার আলী সাহেবের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ও জালে আর পা দেবেন না তিনি। এসব ফন্দি ফিকির বাদ দিতে বলোগে তাঁদের।

ঃ কিন্তু হুজুর, কথাটা হলো —

ঃ কোন কিন্তু নেই। ওদিকে ভুলেও আর যাবেন না, এটা তিনি প্রায় হলপ করেই বলে গেছেন। দীলের কদর কারো কাছেই নেই যেখানে, সেখানে তাঁর কোন কারবার নেই। তোমার মুনিবদের গিয়ে বলো, ডাল এখানে গলবে না, তাঁরা অন্য মক্কেল ধরুন —

— বলেই নামদার খাঁকে ডেকে নিয়ে আসাদুল্লাহ অন্য দিকে চলে গেল।

## ১৩

কিতাবউদ্দীন ফিরে এসে এসব কথা হুবহু মাহমুদা খাতুন সহকারে তার মুনিবদের সবাইকে শোনালো। এতে করে দিলওয়ার আলীর ক্ষোভের পরিমাণটাও যেমন বুঝতে পারলেন তাঁরা, তেমনই আবার এর ফলে, পরিস্থিতিটাও অনেকখানি নাজুক হয়ে গেল। দিলওয়ার আলীকে নিয়ে আজিজুন নেছা বেগম ও আবিদ হোসেন সাহেবরা যতটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, দিলওয়ার আলীর মকানের ঐ অপ্রীতিকর আবহাওয়ার খবর পেয়ে, তাঁদের উৎসাহটা আবার প্রায় ততখানিই ঝিমিয়ে পড়লো। তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলেন। দিলওয়ার আলীর প্রতি মাহমুদা খাতুনের দুর্নিবার আকর্ষণ এতে করে কিছুমাত্র কমজোর না হলেও, শোকে দুঃখে অভিমানে সে আবার শয্যাশায়ী হয়ে গেল।

ভাসমান পানার মতো দিলওয়ার আলী পূর্ববৎ পানির উপর ভাসতে লাগলেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে সব ঘটনাই দিলওয়ার আলী শুনলেন। সাবিহা খানমের অন্যত্র শাদি হওয়ার আর হায়াত খানের সাথে মাহমুদা খাতুনের শাদি না-হওয়ার — এই দুই খবরই পেলেন। মাহমুদা খাতুনের শাদিটা ভেঙ্গে যাওয়ার খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি খুবই উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু যখন খবর করে জানলেন, মাহমুদা খাতুনের দুর্বার অসম্মতি বা তার চিত্তবৈকল্যের কারণে এ শাদি ভাঙ্গেনি, ভেঙ্গেছে হায়াত



www.amarboi.org

খানের দুর্ব্যবহারের জন্যে, তখন তিনি আবার মুষড়ে পড়লেন। সান্ত্বনা তো এক বিন্দুও পেলেন না, উল্টো, এই উৎসাহী হয়ে উঠার খেশারত হিসেবে তিনি তাঁর পুরাতন মর্মব্যথাই নবায়ন করে নিলেন।

দিলওয়ার আলীর মর্মব্যথা মাহমুদা খাতুনের অভিভাবকদের আচরণ নিয়ে নয়, মাহমুদা খাতুনের দীল নিয়ে। ইমাম সাহেবের মকানে গিয়ে সেদিন তিনি যে আচরণ পেলেন তা অনভিপ্রেত হলেও এবং তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, তাঁর মর্মবেদনার মূল কারণ তা নয়। এ অপমান—এ উপেক্ষা গায়েই তাঁর লাগতো না, তার তামাম গ্লানী ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেতো, যদি তিনি জানতেন, মাহমুদা খাতুনের মৌন গৌণ, কোন সমর্থনই এর পেছনে নেই, হাত-পা বেঁধে মাহমুদাকে শাদি দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু তা তিনি জানেননি। এমন কোন আভাসই তিনি পাননি। কিতাবউদ্দীন সেদিন অনেক কথাই বলেছে, কিন্তু এ মর্মে কোন কথাই বলেনি। বরং তার বক্তব্য থেকে, সরব নীরব যে কিসিমেরই হোক, মাহমুদা খাতুনের সমর্থনের দিকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। মাহমুদা খাতুনের মুহব্বত এতটা তরল বলে কখনো তাঁর মনে হয়নি। এত শক্ত ভিতের মুহব্বত প্রাণান্তেও ধ্বসে পড়া সম্ভব মনে করেননি। এই অসম্ভবটাই তার সামনে আজ সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে অসম্ভব বলে ভাবার আর আজ তাঁর সামর্থ নেই। এ রকম চিন্তা করার তিল পরিমাণ উৎসও সামনে নেই তাঁর। মাহমুদা খাতুনের নির্মম নীরবতাই সে উৎসের মুখে ঊষর মরুর মতো শুষ্ক করে দিয়েছে। সাবিহা যা পেরেছে, মাহমুদা তার কণা মাত্রও পারেনি। সাবিহা খানম তার মুহব্বতকে যে ইজ্জত দিয়েছে, মাহমুদা খাতুন সে ইরাদায় এক পা'ও হাঁটেনি। অথচ অবস্থাটা বিপরীত হওয়ার কথা ছিল।

চিন্তা করে দিলওয়ার আলী দীলকে প্রবোধ দেয়ার কোন অবলম্বন পেলেন না। সাবিহা খানমের মতো মাহমুদা খাতুন এতটা বেয়াড়া ও ইজ্জতের প্রতি এতটা উদাসীন হোক, রুচি-সম্ভ্রম মাড়িয়ে যাক, দিলওয়ার আলী তা কখ্খনো চান না। কিন্তু গোলমাল করা নিষেধ বলে কি নিঃশ্বাস ফেলাও নিষেধ? দিলওয়ার আলীর উপর যদি অবিচলই থাকবে সে, তাহলে কি দিলওয়ার আলীকে সে আভাসটা কোনভাবেই দেবেন? একটু 'আঃ! –উঃ !' করবে না? খবর-বার্তা পাঠাবে না? পত্র লিখেও জানাবে না। খত-পত্র এর আগে তো সে একাধিকবার লিখেছে? খত লিখে সে ভজন সিংয়ের কৌতুহল বাড়িয়েছে? খত লিখে তার অভিভাবকদের মনোভাব তাঁকে জানিয়েছে? আর আজ এই চরম মুহূর্তে একটা ছত্রও কি লিখার আগ্রহ হবে না তার? যেন চেনা নেই, জানা নেই, দিলওয়ার আলী তার কাছে এক অচিন দ্বীপের মানুষ!

কয়দিন আগে কিতাবউদ্দীন তাঁর মকানে এসেছিল আসাদুল্লাহ তা বলেছে। কিতাবউদ্দীনের মুনিবেরা কিতাবউদ্দীনকে পাঠিয়েছিলেন, আসাদুল্লাহর কাছে তিনি এই কথাই জেনেছেন। আসাদুল্লাহকে নানাভাবে প্রশ্ন করেও কিতাবউদ্দীনের ঐ আগমনের সাথে মাহমুদা খাতুনের কোন সংশ্রব তিনি তালাশ করে পাননি। কোন



www.amarboi.org

চিঠি-চিরকুটও কিতাবউদ্দীনের হাতে কেউ দেখেনি। হাজী আহম্মদের ঘরে মেয়ে দেয়া সম্ভব না হলে, তাঁর ডাক যে পড়বে, এটাতো স্বাভাবিক। ছাই ফেলার জন্যে তো ভাঙ্গা কুলোরই তালাশ করে মানুষ! কিতাবউদ্দীনের এ আগমন তাঁর জন্যে পুলকের নয়, গ্লানীরই ব্যাপার।

'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।' ঢাকা থেকে ফিরে এসে দিলওয়ার আলী পাথর হয়ে গেলেন। উভয় দিকের উভয় খবর শুনে এবং এসবের তত্ত্ব-তথ্য নিয়ে তিনি নির্বিকার হয়ে গেলেন। এ দুনিয়ায় সবকিছুই সম্ভব বলে ধরে নিয়ে তিনি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার স্রোতে, ভাসমান পানার মতো গা ভাসিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই, জিন্দেগীর তরণীখানা কোন্ বন্দরে ভিড়বে, তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ নেই, কাজের স্রোতে সামিল হয়ে কেবলই তিনি কাজের সাথে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগলেন। আসাদুল্লাহর নসিহতকে কাজে লাগিয়ে ঢাকাতেও কাজের মাঝেই অধিকতর চিত্তবিনোদন লাভ করেছেন তিনি, ফিরে এসেও সেই আশায় লাগাতার কর্মব্যস্ততা তালাশ করে নিলেন।

কাজ অকাজে ভরপুর এই দুনিয়ায় ব্যস্ততার অভাব কি? দিলওয়ার আলী কর্মব্যস্ততা চেলেন, কর্মব্যস্ততা পেলেন। নবাব সুজাউদ্দীন খানই তাঁর কর্মসংস্থান করে দিলেন। দৈনন্দিন দপ্তরের কাজ ছাড়াও তিনি বাড়তি কাজ নগ্দানগ্দী পেয়ে গেলেন। বিজ্ঞজনের বিবেচনায় হোক না সেই বাড়তি কাজটা অকাজ, তাতে দিলওয়ার আলীর কি? ব্যস্ত থাকতে চান তিনি, ব্যস্ত থাকার মওকা পেলেন। তিনি সবেরা-শাম ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

নতুন করে রাজধানীতে উৎসব শুরু হলো। খান-বাহাদুর জং-বাহাদুর খিতাব দানের উৎসব। নবাব সুজাউদ্দীন খানের এ গুণটা ছিল। নিজে তিনি বিরাম-বিলাসে থাকলেও, অন্যকে কর্মের প্রতি উৎসাহিত করার কিছু বাছাই বাছাই টোপ্-তক্মা তিনি হরওয়াক্ত সবার সামনে উন্মুক্ত করে রাখতেন আর প্রায়শঃই তা অকাতরে বিলাতেন। একাজটি তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্তই করতেন। এতে তিনি আমোদের আস্বাদও পেতেন, আবার এর মাহাত্ম্যে কাজও কিছু পেতেন।

এমনই কিছু কাজ পেয়েছেন নবাব। তক্মার লোভে হোক না হোক, কয়েকজন কর্মবীর এই প্রশাসনের খেদমতে বেশ কিছু ভাল কাজ করেছেন। এঁদের একজন হাজী আহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র মীরজা মুহম্মদ সাইদ। ইনি রংপুরের ফৌজদার। কুচবিহারের রাজা ও দিনাজপুরের জমিদারের দেহে কিছুটা মেদ পয়দা হওয়ার দরুন তাঁরা এই হুকুমাতের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করলে, মীরজা মুহম্মদ সাইদ তাঁদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন এবং এই দুই এলাকা জয় করে তাঁদের আবার বশীভূত করেছেন। অন্য দুইজন মীর শরাফউদ্দীন ও খাজা বসন্ত্। বীরভূমের বিদ্রোহী জমিদার বদীউজ্জামান ও বর্ধমানের বিদ্রোহী জমিদার কিরাত সিংহকে দমন করেছেন এঁরা। এঁদের সাথে আছেন উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী মীর হাবিব। উড়িষ্যাতে এসেও তাঁরা ঢাকার মতোই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তদুপরি তাঁরা প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে পুরীর জমিদার 'দুনদেও' কর্তৃক স্থানান্তরিত পুরীর জগন্নাথ মূর্তি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং মূর্তি এনে পুরীর জগন্নাথ



www.amarboi.org

মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে করে তাঁরা পুরীর তীর্থস্থানের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছেন এবং হিন্দু মুসলমান সকলের তারিফ হাসিল করেছেন।

এই সমস্ত কর্মবীরদের খিলাত-খিতাব দিয়ে সম্মানিত করার ইরাদায় নবাব সুজাউদ্দীন খান আবার তোড় জোড়ের সাথে রাজকীয় উৎসবের আনযাম করেছেন। এর জন্যে কাজের লোক চাই নবাবের। দিলওয়ার আলী নবাব বাহাদুরের চিহ্নিত কাজের লোক। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাই দিলওয়ার আলীর ডাক পড়েছে অন্যান্যদের আগেই। দপ্তরের কাজ না করলেও দিলওয়ার আলীর চলে এখন। কিন্তু দিলওয়ার আলী দুই কাজকেই আঁকড়ে ধরে সবেরা-শাম খাটছেন। মকানে তাঁর রাতটুকুও এখন পুরোপুরি কাটে না। প্রত্যুষে বেরিয়ে গিয়ে তিনি মকানে ফিরে আসেন অনেক বেশী রাত করে। দাওয়াত করা, খবর করা, মঞ্চ-মণ্ডপ তৈয়ার করা— এসব নিয়ে থাকেন। উৎসবটা দুই দিনের। কিন্তু এটা শুরু ও সাঙ্গো করা দুই সপ্তাহের কাজ। দুই হপ্তাকাল ধরে দিলওয়ার আলী এই কাজে ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। বর্হিবিশ্ব থেকে তিনি দুই হপ্তাকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাঁর কাজের গণ্ডীর বাইরে কোথায় কি হচ্ছে বা হলো, সেসব খবরও রাখলেন না, বাইরের কেউ এসেও তাঁর পাত্তা করতে পারলেন না।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। আয়োজন গুটিয়ে নেয়ার সংশ্লিষ্ট কাজও প্রায় সমাপ্ত। আর একদিন বা অর্ধদিনের অল্প শ্রমেই শেষ হবে শেষটুকুও। দিলওয়ার আলীর প্রয়োজন আর অপরিহার্য নয় এখানে। দিলওয়ার আলী আজ তাই সকাল-সকাল বেরোননি। কিছুটা দেরীতে তৈরী হচ্ছেন। ধীরে সুস্থে বেরুবেন। এমন সময় নামদার খাঁ সামনে এসে বললো— এক হপ্তা আগারী খত তো একঠো আসি গৈল্ হজৌর, লেকেন আপ্‌কো পাস্ হামি ভেজিলেক নাই আখুন তক্।

দিলওয়ার আলী নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন— কেন, ভেজিলেক নাই কেন?

নামদার খাঁ নতমস্তকে বললো— হামি থোড়া বেভুল হো গৈল্ হজৌর। আউর—

ঃ ভুলে গেলে?

ঃ নাই-নাই, কভি কভি ইয়াদ হো গৈল্, লেকেন মওকা তো পাইলেক নাই সাথ্ সাথ্।

ঃ কি রকম?

ঃ ইয়াদ হো গৈল্ তো হজৌর লা-পাত্তা হো গৈল্। হজৌর বিলকুল মকান ছাড়ি দিলেক। দিনভর ওয়াপস্ নাই আসিলেক হামি আখুন ভেজি দিবেক কাঁহাছে, দিছা পাইলেক নাই।

ঃ যখন এলাম, তখন দিবে।

ঃ ওহি ওয়াক্তে ইয়াদ মে নাই আসিলেক। হামি বেভুল হো গৈল্। হামি কিয়া করিবেক, বাতাইয়ে?

ঃ ও আচ্ছা। তা কোথা থেকে এলো ওটা? দপ্তর থেকে?

ঃ নাই-নাই। ওহি কিতাব মিয়া পৌছাই দিলেক বটে।

সচকিত হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন— কিতাব মিয়া মানে কিতাবউদ্দীন? ঐ ইমাম সাহেবের মকানের নওকর?



www.amarboi.org

ঃ ওহি ওহি।

ঃ কিতাবউদ্দীন এসেছিল?

ঃ আসি গৈল্। ওহি মকানের এক সাহেব ভি দো দো রোজ আসি গৈল্।

ঃ ঐ মকানের সাহেব?

ঃ এক নওজোয়ান সাহাব। দো-দো রোজ আসি হজৌরকো তালাশ করিলেক বটে। মকানে আসি ঢুড়িলেক, দপ্তরে যাই ঢুড়িলেক, লেকেন তামাম বেফায়দা। হজৌর কো পাত্তা পাইলেক নাই বিলকুল।

দিলওয়ার আলী সবিস্ময়ে বললেন— সেকি! কৈ, কোথায় সে খত?

ঃ এহি তো হজৌর, হামারা পাস্।

পিরহানের জেব থেকে একটা লেফাফাবদ্ধ খত বের করে নামদার খাঁ দিলওয়ার আলীর হাতে দিলো। পত্রখানা মেলে ধরেই দিলওয়ার আলী চমকে উঠলেন। তাঁর দেহ-মন বিপুলভাবে শিহরিত হয়ে উঠলো। মাহমুদা খাতুনের পত্র।

মাহমুদা খাতুন লিখেছে—

*সালার সাহেব,*

*বাদ তসলিম জানতে চাই, আমার কি কসুর? বিভ্রান্তি যার যেখানে যতবড়ই হোক, তার শাস্তি আমার উপর ঘুরে ফিরে আসবে কেন? প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মাঝেও তো আমি আমার স্বস্থানেই রয়েছি? অকথ্য নির্যাতনও তো আমাকে একবিন্দু টলাতে পারেনি? তবু আমার উপর কিসের এতক্রোধ? শত চেষ্টা করেও আপনার সাক্ষাত আমি পাচ্ছিনে, এটাও কি আমার কসুর? আপনার অভিমানটাই বড় হলো, আমার জানটা কিছুই নয়? ধুঁকে ধুঁকে খতম হয়ে যাই আমি, এইকি আপনি চান?*

*থাক সে কথা। যে বাঁধন খোলার নয় বলে আপনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন সেদিন, সে বাঁধনটা খুলে গেল কার দোষে, এটুকু জানার জন্যেই এই খত পাঠালাম। আপনার ঐ আশ্বাসটা যদি কেবলই কথার কথা না হয়, তাহলে জরুর আপনি আসবেন, এই বিশ্বাসে পথ চেয়ে রইলাম।*

*দীলের টানে পাহাড় কাটে মানুষ! আপনি দ্বিধা কাটাতে না পারলে বুঝবো, আমার জিন্দেগীটা এভাবে বিরান হয়ে যাক, এটা আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছা। আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।*

*'মাহমুদা খাতুন'*

দিলওয়ার আলী একাধিকবার পত্রখানা পাঠ করলেন। এরপর তিনি থরথর করে কেবলই কাঁপতে লাগলেন। মাহমুদা খাতুনকে অবিকল সেই মাহমুদা খাতুন রূপেই তিনি দেখতে পেলেন আবার। এইটা দেখার জন্যেই জানটা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি। দিলওয়ার আলী আওয়ারা হয়ে উঠলেন। আনন্দে ও বেদনায় দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মস্তবড় এক প্যাঁচ লেগেছে কোথায় যেন! সেই প্যাঁচের পাকেই পাক খাচ্ছেন তিনি। মাহমুদা খাতুনও এই কথাই স্পষ্ট করে বলেছে।



www.amarboi.org

কার বা কোন্ একটা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন তিনি। তিনি এবং অনেকেই। এই বিভ্রান্তির নিষ্পেষণে পিষ্ঠ হচ্ছে মাহমুদা খাতুন। জরুর তাই হচ্ছে সে। মুহব্বত তার ঠুন্‌কো, এটা তো আসলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস তিনি করেন না।

দিলওয়ার আলীর মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো। আফসোসে ও অবসাদে দেহটা তার এলিয়ে পড়লো। কুরসীর হাতলের উপর মাথা রেখে চোখ মুজলেন দিলওয়ার আলী। মাহমুদা খাতুনের পত্রখানা এক ফাঁকে হাত থেকে খসে পড়লো।

নামদার খাঁ শংকিত হয়ে উঠলো। পত্রখানা কুড়িয়ে নিয়ে সে ভয়ে ভয়ে বললো — কেয়া বাত হজৌর? তবিয়ত গড়বড় হো গৈল্?

মাথা না তুলেই দিলওয়ার আলী বললেন — এ্যাঁ, না-না, ও কিছু নয়।

ঃ তব্ কুয়ী মুসিবতের খবর? এহি খত কুয়ী মুসিবতের খত?

আস্তে আস্তে মাথা তুলে দিলওয়ার আলী বললেন — কি বললে?

ঃ উহার আন্দর কৌন্ বাত আছে হজৌর? কুয়ী মুস্‌কিল কো বাত?

দিলওয়ার আলী ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — না-না, মুস্কিলের বাত নয়, খুশীর বাত। কিন্তু এ খত এতদিন কেন দাওনি তুমি? কোথায় ফেলে রেখেছিলে?

ঃ এহি জেবের আন্দর হজৌর।

ঃ তারপরেই ভুলে গেলে?

ফের মাথা নীচু করে নামদার খাঁ বললো — হুঁ হজৌর! থোড়া বেভুল হো গৈল্ জরুর।

ঃ ঐ মকানের এক সাহেব যে দুই-দুই দিন এলেন, এটাও বলতে ভুলে গেলে?

ঃ নাই হজৌর। ইয়াদ হো গৈল্ তো হামি বুলি দিলেক সাথ্ সাথ্।

ঃ বুলি দিলেক! কবে বললে?

ঃ এহি তো হজৌর, আখুন হামি বুলি দিলেক বিলকুল।

দিলওয়ার আলী উষ্ণ হয়ে উঠলেন। উষ্মার সাথে বললেন — এখন বললে?

ঃ হুঁ-হুঁ! ইয়াদ হো গৈল্ তো হামি বুলবেক নাই কেন?

দিলওয়ার আলী দাঁত পিষে বললেন — তোমাকে খুন করা উচিত।

নামদার খাঁ চমকে উঠে বললো — হজৌর!

ঃ তোমাকে ফাঁশিতে ঝুলানো উচিত।

ঃ হাইরে বা! গল্‌তি কিয়া হো গৈল্, মালুম তো না হই!

ঃ এই জিন্দেগীতেও হবে না।

ঃ হজৌর!

ঃ মগজ এত কম হলে, মালুম করার তাকত্ কারো থাকে না। বুরবক কাঁহাকার।

ঃ হায় আল্লাহ!

ঃ সাফ সাফ বলো, ঐ মকানের সাহেব ঠিক কোন্ কোন্ দিন এসেছিলেন, হিসেব করে বলো?

ঃ হজৌর!

ঃ এটুকুও বলতে যদি না পারো, তাহলে এরপর থেকে ঘরে তোমাকে তালাবদ্ধ



www.amarboi.org

করে রেখে যাবো, যাতে করে কেউ তোমাকে না দেখতে পায় আর কোন খবর তোমাকে না দিয়ে যায়।

ঃ কেয়া গজ্জব হজৌর। এ কৌন্ মুসিবত হো গৈল্?

নামদার খাঁ এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। দিলওয়ার আলী বললেন—বলো, সবশেষে কোন্ রোজ উনি এসেছিলেন?

নামদার খাঁ হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলো। সে খোশ কণ্ঠে বললো—হুঁ-হুঁ, এহিবাত হামি ঠিক ঠিক বুলি দিবেক বটে। ওহি সাহাব এহি রোজ আসি গৈলেন। ঠিক ঠিক আসি গৈলেন।

ঃ এহি রোজ! মানে আজ?

ঃ ওহি বাত-ওহি বাত। আখুন আসি গৈলেন, ঠিকঠিক আসি গৈলেন—

নামদার খাঁ হাসিমুখে সামনের দিকে চেয়ে রইলো। তার দৃষ্টিপথে চেয়ে দিলওয়ার আলী বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, আফসারউদ্দীন সাহেব নত মস্তকে ফটক পেরিয়ে মকানে প্রবেশ করছেন।

আফসারউদ্দীনকে দেখেই দিলওয়ার আলী ধড়মড় করে আসন থেকে উঠলেন এবং কয়েক কদম দৌড়ে এসে শশব্যস্তে বললেন—আরে ভাই সাহেব যে! আসুন—আসুন—

আফসারউদ্দীনের চেহারা উস্কোখুস্কো। মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও মলিন। গতি অতি ধীর। নিজেকে টেনে নিয়ে আফসারউদ্দীন কাছে এসে দাঁড়াতেই সালাম বিনিময়ে করে দিলওয়ার আলী ফের খোশ কণ্ঠে বললেন—কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! ভাই সাহেব আমার মকানে! আসুন—আসুন,' বসুন—

দিলওয়ার আলী কুরসী টানতে গেলেন। আফসারউদ্দীন বাধা দিয়ে নিস্তেজ কণ্ঠে টেনে টেনে বললেন—থাক ভাই সাহেব, বসবো না। আপনার যে মোলাকাত পাবো, এটা আশাই আমি করিনি। সেরেফ একটা কথা বলেই আমি ফের চলে যাবো।

দিলওয়ার আলী এতক্ষণে আফসারউদ্দীনকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। তাঁর বিষণ্ন চেহারা দেখে ও নিস্তেজ কণ্ঠ শুনে দিলওয়ার আলী ঘাবড়ে গেলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—একটা কথা!

জমিনের দিকে নজর রেখে আফসারউদ্দীন ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—জি-জি। নেহায়েত বেকায়দায় পড়েই আমি আপনার কাছে এসেছি—মানে, আপনার একটা এযাজত চাইতে এসেছি।

ঃ এযাজত!

ঃ আমার বোন মাহমুদা খাতুন আপনার এই মকানে আসতে চায়, অর্থাৎ আপনার সাথে দু' একটা কথা বলতে চায়। আপনি এযাজত না দিলে তো আনতে পারিনে তাকে?

অপরিসীম বিস্ময়ে দিলওয়ার আলী বললেন—সেকি! একি তাজ্জব কথা বলছেন? উনি এখানে আসবেন—

ঃ তাজ্জব তো বটেই ভাই সাহেব। একথা কি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করা যায়?



www.amarboi.org

আমি বা আমরাও তা করিনি। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ কোনভাবে তাকে আর সামলাতে না পেরেই এসেছি। শাসন জুলুম তো আর কম করা হলো না ! কম করা কোনদিন হয়ওনি। কিন্তু কোন কিছু করেই তাকে সামলাতে আমরা পারলাম না।

দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন—শাসন-জুলুম !

আফসারউদ্দীন ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন—সেরেফ আজ কেন ভাই সাহেব ? নির্যাতন তো তার উপর সেই প্রথম থেকেই চলছে। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে সয়ে সে এখন প্রায় বিরাণ হওয়ার পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

দিলওয়ার আলী কম্পিত কণ্ঠে বললেন—ভাই সাহেব !

আফসারউদ্দীন বললেন—সেই যেদিন হায়াত খানের সাথে তার শাদির কথা শুরু হলো, সেইদিন থেকেই তো নির্যাতনের শিকার হয়েছে সে। এ শাদি সে কিছুতেই করবে না বলে পয়লা থেকেই বেঁকে বসলো আর শেষ পর্যন্ত একই জিদ ধরে সে মরিয়া হয়ে রইলো। বোঝানোর সমঝানোর সবরকম চেষ্টা করার পরও যখন তাকে নরম করা গেল না, তখন স্বাভাবিকভাবেই শুরু হলো নির্যাতন। ধমক-হুমকি, লাঞ্ছনা-ধিক্কার সমানে চলতে লাগলো। মকানে এমন কেউ নেই, যে তাকে লাঞ্ছিত করতে কম করলো কিছু। কিন্তু কি অদ্ভূত তার ধৈর্য। আম্মাজান শেষ পর্যন্ত শারীরিকভাবে একাধিকবার বেদম নির্যাতন করলেন তাকে। তবু—

দুই কান চেপে ধরে দিলওয়ার আলী চীৎকার করে বললেন—আহ্ ! সেকি ভাই সাহেব !

আফসারউদ্দীন একইভাবে বললেন—তবু সে টলেনি। তার সিদ্ধান্ত থেকে তাকে একবিন্দু সরিয়ে আনা যায়নি। ভেঙ্গে না দিলেও, হায়াত খানের সাথে তার শাদিটা যে ভেঙ্গে যেতোই, জবাই করে ফেললেও যে তাকে রাজী করানো যেতো না, এ নিয়ে আর কারো দীলে সন্দেহ নেই। এত নির্যাতন করার পর আর কি করতে পারি আমরা।

আফসারউদ্দীন উদাস হয়ে উঠলেন। কণ্ঠে তার অসহায়ত্বের সুর প্রকট হয়ে উঠলো। দিলওয়ার আলী আর্তকণ্ঠে বললেন—এত নির্মম আপনারা ! এতটাই করতে পারলেন ?

ঃ না পেরে তো উপায় ছিল না আমাদের ! সে অবস্থায় গত্যন্তর ছিল না।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ কিন্তু আমরাই শেষে হা'ল ছাড়তে বাধ্য হলাম। আর কত নির্যাতন করবো তাকে ? তার চেহারার দিকে চোখ তুলে তাকালে এখন আমাদের কান্না আসে।

দিলওয়ার আলীর মাথায় তখন অবিরাম পাক খাচ্ছে মাহমুদা খাতুনের চিঠির ঐ একটি কথা—"অকথ্য নির্যাতনও তো আমাকে একবিন্দু টলাতে পারেনি ? তবু আমার উপর কিসের এত ক্রোধ ?

প্রতিক্রিয়ার নিদারুণ তাড়নায় দিলওয়ার আলীর সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরে গেল।



www.amarboi.org

মাহমুদা খাতুনের প্রতি নির্মমভাবে বিরূপ হওয়ার অনুশোচনায় তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। আফসারউদ্দীনের একথায় তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—উঃ!

আফসারউদ্দীন সাহেব আপন খেয়ালে বলে চললেন—তাই আর তার উপর নির্মম হতে পারলাম না। বেশীদিন আর তার বাঁচার আশা কম। বাধ্য হয়েই এ কারণে আপনার কাছে আসতে হলো আমাকে।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ ঐ একটিই বোন আমার। সে যদি আর না বাঁচে, তাহলে আপনার কাছে আসার তার এই শেষ অনুরোধ না রাখার যাতনা জিন্দেগী ভর আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে।

আফসারউদ্দীনের কণ্ঠস্বরও ঘন হলো। কান্নার বেগ কিছুতেই দমন করতে না পেরে দিলওয়ার আলী দাঁত দিয়ে সবলে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আফসারউদ্দীন পুনরায় নত মস্তকে বললেন—দিন সাতেক আগে নাকি মাহমুদা খাতুন আপনাকে খত পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাও আপনি গেলেন না দেখে সে মরণ পণ জিদ ধরেছে, তাকে এখানে আনতে হবে। এ জন্যে সে প্রায় দুইদিন যাবত অনাহারে আছে। এখানে না আনলে আর কিছুই সে মুখে দেবে না এই তার কথা। তার জিদ তো আমরা জানি। না আনলে সে দেবেও না ঠিকই।

দিলওয়ার আলীর দাঁত তাঁর ঠোঁটের মধ্যে বসে গেলো। রক্ত বেরিয়ে এলো। দিলওয়ার আলীর তবু কোন অনুভূতি নেই আর। দিলওয়ার আলীকে নীরবে দেখে মুখ তুলতে তুলতে আফসারউদ্দীন ফের বললেন—আপনি তো আর আমাদের মকানে যাবেন না! তাই তার এই হালতের কথা চিন্তা করে একটু এযাজত যদি দিতেন—

দিলওয়ার আলীকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে দেখে আফসারউদ্দীন কথার মাঝেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই তিনি দেখলেন, দিলওয়ার আলীর ঠোঁট বেয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর দুই চোখে ঢল নেমেছে অশ্রুর। দেখেই আফসারউদ্দীন চমকে উঠে বললেন—একি! একি ভাই সাহেব!

দিলওয়ার আলী ফুঁপিয়ে উঠে আওয়াজ দিলেন—আমি সইতে পারছিনে —আমি সইতে পারছিনে—

দুইহাতে মুখ ঢেকে দিলওয়ার আলী ছুটে যেতে গিয়েই পড়ে যেতে লাগলেন। নামদার খাঁ এতক্ষণ হতবাক হয়ে এঁদের কথোপকথন শুনছিল। এ অবস্থা দেখেই নামদার খাঁ ছুটে এসে দিলওয়ার আলীকে জড়িয়ে ধরে আওয়াজ দিলো—হুজৌর!

আফসারউদ্দীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। নামদার খাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিলওয়ার আলী এসে তাঁর পরিত্যক্ত কুরসীতে থপ্ করে বসে পড়লেন। দেখেশুনে আফসারউদ্দীন এক পা দু'পা করে তাঁর কুরসীর কাছে এগিয়ে এলেন। দিলওয়ার আলী এর মধ্যে নিজেকে কিছুটা সংযত করে নিলেন। হাত দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে তিনি নামদার খাঁকে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আর একটা কুরসী আনো, জলদি—

নামদার খাঁ ছুটে গিয়ে আর একটা কুরসী এনে পেতে দিলো। হতবুদ্ধি আফসার-



www.amarboi.org

উদ্দীন নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দিলওয়ার আলী ধরা গলায় তাঁকে বললেন — দোহাই আপনার, কোন কথা আর বলবেন না। মেহেরবানী করে বসুন একটু।

যন্ত্র চালিতের মতো আফসারউদ্দীন কুরসীতে এসে বসলেন এবং নির্বাক হয়ে দিলওয়ার আলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। দিলওয়ার আলীও আর কথা বললেন না। ইংগিত পেয়ে নামদার খাঁ পানি এনে দিলে, দিলওয়ার আলী উঠে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিলেন এবং ধীরে ধীরে এসে আবার কুরসীর উপর শান্তভাবে বসলেন। আফসারউদ্দীন এবার কিছু বলার উদ্যোগ করতেই দিলওয়ার আলী হাতজোড় করে বললেন—তকলিফ্ আর বাড়াবেন না ভাই সাহেব। আমি সহ্য করতে পারবো না। একটু ফুরসৎ দিন, নিজেকে একটু সামলে নিই। এরপর আপনার সাথে এখনই আমি আপনার মকানে যাচ্ছি।

আফসারউদ্দীন তবুও সবিস্ময়ে বললেন—ভাই সাহেব !

দিলওয়ার আলী অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন—এযাজত কি জরুরত ? আমার মকানের দুয়ার মাহমুদা খাতুনের সামনে হরওয়াক্ত খোলা। কিন্তু তার আগে যে আমার জরুর এখন যাওয়া চাই আপনার মকানে। একটু বসুন, আমি তৈরী হয়ে আসি—

দিলওয়ার আলী দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

আফসারউদ্দীনের সাথে দিলওয়ার আলী ইমাম সাহেবের মকানে চলে এলেন। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব মকানটা সজীব হয়ে উঠলো। বাহির আঙ্গিনায় মালী-মজুর চাকর-নফর যে যেখানে কর্মরত ছিল, দিলওয়ার আলীকে দেখেই তারা হাতের কাজ বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেল এবং একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। সেদিনও এরা এভাবেই তাঁর দিকে চেয়েছিল। কিন্তু সবার দৃষ্টিতে সেদিন ছিল কি একটা অনীহা আর বিস্ময়। দিলওয়ার আলী লক্ষ্য করলেন, আজ সেখানে বিরাজ করছে খুশীর তরঙ্গ ও অকপট প্রফুল্লতা। কিতাবউদ্দীন মূল দালানের বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছিল। দিলওয়ার আলীকে দেখেই সে উৎফুল্ল কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে বলে উঠলো — সোবহান আল্লাহ ! হুজুর এসে গেছেন — সালার হুজুর এসে গেছেন —

বলেই সে দৌড় দিয়ে দিলওয়ার আলীর কাছে এলো এবং সালাম দিয়ে ফের উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলো — আসুন হুজুর, আসুন। ভাল আছেন ? তবিয়ত ভাল হুজুর ?

সালামের জবাব সহ দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে কিতাবউদ্দীনের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আফসারউদ্দীনের সাথে সামনে এগিয়ে চললেন। ঐ বিশেষ কক্ষের দিকে ইংগিত করে আফসারউদ্দীন কিতাবউদ্দীনকে বললেন — যাও, কামরাটা প্রায় বন্ধই থাকে, জলদি গিয়ে দরজা জানালা সব খুলে দাও —

ফের দৌড়ালো কিতাবউদ্দীন। দিলওয়ার আলীর আগমন বার্তা উল্লাসভরে অন্দর মহলে জানান দিতে দিতে গিয়ে সে দরজা-জানালা খুলতে লাগলো।



www.amarboi.org

আফসারউদ্দীনের সাথে দহলীজতক্ এসেই দিলওয়ার আলী একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। যদিও তিনি নিশ্চিত যে, ঐ বিশেষ কক্ষেই নেয়া হবে তাঁকে, তবু অতীত স্মৃতির এক অবচেতন পরশে এখানে এসেই গতি তাঁর শ্লথ হয়ে গেল। তা দেখে আফসারউদ্দীন মৃদু আফসোসের সুরে বললেন—কি হলো ? ভাই সাহেব দেখছি এখনো আমাদের ক্ষমা করতে পারেননি ! আসুন—আসুন—

দিলওয়ার আলীর পিঠে হাত রেখে মৃদু চাপে আফসারউদ্দীন তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এলেন এবং সরাসরি এসে ঐ বিশেষ কক্ষে ঢুকলেন। যদিও ইতিমধ্যেই অন্দর মহলে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তথাপিও দিলওয়ার আলীকে কক্ষে এনে বসিয়ে দিয়েই, এ খবর জানানোর জন্যে আফসারউদ্দীন ব্যস্তভাবে অন্দর মহলে ছুটলেন।

অন্দর মহল আন্দোলিত হয়ে উঠলো। হঠাৎ করে কিভাবে এটা সম্ভব হলো, তা জানার জন্যে আবিদ হোসেন সাহেব, আজিজুন নেছা বেগম, কিতাবউদ্দীন ও উৎসুক কিছু ঝি-চাকরাণী এসে আফসারউদ্দীনকেই ঘিরে ধরলেন আগে। শয্যাশায়ী মাহমুদা খাতুনও শয্যা থেকে উঠে দেয়াল-দরজা ধরে ধরে আড়ালে এসে দাঁড়ালো। পরিস্থিতির দুর্নিবার চাহিদায় দিলওয়ার আলী কিছুক্ষণ একা একাই বসে রইলেন।

আফসারউদ্দীন খোশ কণ্ঠে দিলওয়ার আলীকে নিয়ে তাঁদের নিছক বিভ্রান্তির কথাবার্তা সহ মাহমুদা খাতুনের হালত্ শুনে দিলওয়ার আলীর ঐ অবিশ্বাস্য আফসোস ও আকুলতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে সবাইকে শুনালেন। বেদনার চাপে দিলওয়ার আলীর ঠোঁট কেটে ফেলার কথাটাও এক ফাঁকে বলে ফেললেন। সমাপ্তি টেনে আফসারউদ্দীন বললেন—অন্তত আমার কাছে এটি এখন পরিষ্কার যে, ত্রুটিটা আসলেই যোগাযোগের ও ভুল খবরের। দিলওয়ার আলী নির্দোষ ও নিষ্কলুষ।

পরের পর্ব পরিষ্কার। এরপর সকলেই ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন দিলওয়ার আলীর কক্ষে। আবিদ হোসেন সাহেব ও আজিজুন নেছা বেগম এ কক্ষে এসেই তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি অকপটে স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং মুহুর্মুহু আফসোস-আক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই সাথে, দিলওয়ার আলীর এই উপস্থিতির আনন্দে কলকণ্ঠে খোশ প্রকাশ করতে লাগলেন। এই প্রবল প্রবাহের মাঝে দিলওয়ার আলী অসহায় হয়ে গেলেন। "না-না, ও কিছু নয়, একি বলছেন, কিছু হয়নি, ঠিক আছে"—ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে লাগলেন।

এরপর সবাই যখন দিলওয়ার আলীর আদর-যত্ন ও আপ্যায়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তখন দিলওয়ার আলী স্বাভাবিকভাবেই উস্‌খুস্ করতে লাগলেন। মাহমুদা খাতুনের কি অবস্থা, সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, এ বিষয়ে দিলওয়ার আলী তখনও অজ্ঞাতেই রইলেন। অথচ এই জন্যেই দিলওয়ার আলী এমন আওয়ারা হয়ে ছুটে এসেছেন এখানে। তিনি বলতেও পারছেন না আবার সইতেও পারছেন না।

ইতিমধ্যে পাশের কক্ষের পর্দার পাশে ভারী একটা পতন শব্দ হলো। আজিজুন নেছা বেগম ছুটে গিয়ে পর্দাটা ফাঁক করেই আর্তনাদ করে উঠলেন—ওম্মা !



www.amarboi.org

হতভাগীটা মরেই গেল বোধহয়। মাহমুদা খাতুন পড়ে গেছে, শিগ্‌গির সবাই এসো—

বলেই তিনি ছুটে গিয়ে মাহমুদা খাতুনকে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। আবিদ হোসেন সাহেব ও আফসারউদ্দীন তখনই গিয়ে হাত লাগিয়ে মাহমুদাকে তুলে বসালেন। ভাগ্গিস্ তার মাথাটা পাশেই ভাঁজ করে রাখা তোষকের গাদার উপর পড়েছিল বলেই রক্ষে। তোষকটা ভাঁজ করে পালংকের পাশে নামিয়ে রেখে কাজের ঝি তখন বিছানা পাতার ইরাদায় পালংকটা ঝাড়ামুছা করছিলো।

মাথায় আঘাত না লাগায় মাহমুদা খাতুন নিজের বলেই নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলো। সকলেই ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—চোট্ লেগেছে কোথাও? মাথায় পানি দিতে হবে কি?

মাহমুদা খাতুন দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলো—জিনা। কোমরে সামান্য একটু লেগেছে, এছাড়া আর কিছু হয়নি।

আজিজুন নেছা বেগম ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—এই শরীর নিয়ে তুমি এখানে এলে কিভাবে? কোথায় থেকে পড়ে গেলে?

মাহমুদা খাতুন নতমস্তকে চুপ করে রইলো। কাজের ঝিটা জবাব দিলো—আমাকে ধরে এসেছেন আম্মা হুজুর। আপামনি হুকুম করায় আমিই তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছি। আপামনি পর্দার পাশে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি এদিকে পালংক সাফ করছি, পড়ে গেলেন কিভাবে, খেয়াল করতে পারিনি।

আজিজুন নেছা মাহমুদাকে ফের প্রশ্ন করলেন—পড়লে কিভাবে?

মাহমুদা খাতুন ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল—মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল।

আজিজুন নেছা বেগম আক্রমণ করে বললেন—ঘুরবে না? একে শয্যাশায়ী, তার উপর দুইদিন ধরে পেটে কিছু দেয়া নেই। আমার হয়েছে যত মুসিবত।

মাহমুদা খাতুন উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—একটা কুরসী আনো। কুরসী এনে এই পর্দার পাশে পেতে দাও। আগ্রহ করে এসেছে, আপাতত এখানেই একটু বসুক।

তাই করা হলো। কুরসী পেতে দিলে, মাহমুদা খাতুন কুরসীর উপর বসলো। এই হুট্‌পিটের মধ্যে দরজার পর্দাটা অনেকখানি ফাঁক হয়ে ছিল। দিলওয়ার আলী এঁদের সমস্ত কথাবার্তা শুনলেন। মাহমুদা খাতুন কুরসীতে উঠে বসলে, পর্দার এই ফাঁক দিয়ে এবার মাহমুদা খাতুনের চেহারা দেখেই দিলওয়ার আলী আঁতকে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন, মোটেই বাড়িয়ে বলেননি আফসারউদ্দীন সাহেব। এই হালত্ স্থায়ী হলে সত্যি সত্যিই মাহমুদা খাতুনের বাঁচার আশা কম। ব্যথিত নয়নে তিনি মাহমুদা খাতুনের ঐ করুণ চেহারার দিকে একভাবে চেয়ে রইলেন।

আবিদ হোসেন সাহেব এই সময় দিলওয়ার আলীর দিকে তাকিয়েই মাহমুদা খাতুনের মুখের নেকাব ঠিক করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপরেই তিনি দিলওয়ার আলীকে উদ্দেশ করে বললেন—এসো ভাই, এসো-এসো। ঐযে কথায় বলে, "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগ্‌ড়ার প্রাণ যায়।" আমরা সবাই ভুলের বেল্‌না সমানে বেলে চলেছি, আর মাঝখানে এই মেয়েটার কি হালত্ হয়েছে, দেখে যাও—



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী ইতস্তত করতে লাগলেন। আফসারউদ্দীন উৎসাহ দিয়ে বললেন—আসুন না ভাই সাহেব, শরম কি? আসলে এর খবর শুনেই তো এসেছেন আপনি এখানে। এবার দেখুন, আমি মিথ্যা কিছু বলেছি নাকি, মিলিয়ে নিন।

আজিজুন নেছা বেগম বললেন—এসো বাপজান। ভুলে যাচ্ছো কেন, আফসারউদ্দীনের মতো তুমিও এই মকানেরই এক ছেলে?

জড়িত পদে দিলওয়ার আলী পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন। পর্দার পাশেই মাহমুদা খাতুন কুরসীর উপর বসেছিল। দিলওয়ার আলী পাশে এসে দাঁড়াতেই, চকিতে একবার চোখ তুলে মাহমুদা খাতুন তাঁর দিকে তাকালো। এরপর চোখ নামিয়ে নিয়ে সে নতমস্তকে বসে রইলো। এক লহমাও কাটলো না। মাহমুদা খাতুনের চোখ থেকে টশ্ টশ্ করে কয়েক ফোঁটা পানি মেঝের উপর ঝরে পড়লো।

দিলওয়ার আলী এসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কি বলবেন—কি করবেন, স্থির করতে না পেরে তিনি মাহমুদা খাতুনের নেকাব-আঁটা মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। মাহমুদা খাতুনের চোখ থেকে পানি ঝরে পড়তে দেখেই তিনি আরো নাজেহাল হয়ে গেলেন। তাঁর অনুভূতির তন্ত্রীগুলো বিপুল বেগে নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও দুই চোখ পানিতে ভরে গেল। দৃষ্টি তাঁর ঝাপ্সা হয়ে এলো। চোখের পানি চোখ থেকে নীচের দিকে নামতে শুরু করতেই তিনি সম্বিতে ফিরে এলেন। লক্ষ্য করলেন, সকলেই তাঁর অশ্রুভরা চোখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন।

শরমে তিনি এতটুকু হয়ে গেলেন। গত্যন্তর না দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ ছিটকে ঐ কক্ষ থেকে বেরিয়ে তাঁর নিজের কক্ষে চলে এলেন। এতদ্দৃশ্যে সকলেই সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। আবিদ হোসেন সাহেব স্বগতোক্তি করলেন—কি যে এক গুনাহ আমরা করতে বসেছিলাম, তা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন।

আবেগ ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল। অনেকেই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। দিলওয়ার আলী আসার পর মাহমুদা খাতুনকে এক পাত্র গরম দুধ দেয়া হলে, সাগ্রহে সে তখনই তা পান করে এবং সেই থেকে সে ঐ একপাত্র দুধের উপরই আছে। এবার সে নিজ আগ্রহে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আফসারউদ্দীনও আহারের জন্যে তাকিদ দিতে লাগলেন। আবিদ হোসেন সাহেব বৃদ্ধ মানুষ। তিনিও অনুভব করলেন আর আবেগ উচ্ছ্বাস নয়, পেটে কিছু দেয়া দরকার।

সকলেই তৎপর হয়ে উঠলেন। সকলের তৎপরতায় যথা সম্ভব কম সময়ে খানাপিনা তৈয়ার হয়ে গেল এবং তা পরিবেশন করা হলো।

আহারান্তে দিলওয়ার আলীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে সকলেই কিছুক্ষণ বিরাম নেয়ার ইরাদায় নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলেন। দিলওয়ার আলী শুয়ে পড়লেন। আফসারউদ্দীন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দিলওয়ার আলীকে বলে গেলেন, সকাল থেকেই একটানা পেরেশানী গেছে চরম, এখন জরুর একটু ঘুমিয়ে নেয়ার দরকার। নইলে তবিয়ত খারাপ হবে।

ক্লান্তিতে অবসাদে দিলওয়ার আলীর চোখও তখনই জড়িয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি এবং অল্পক্ষণ ঘুমানোর পরই আবার জেগে উঠলেন। এরপর



www.amarboi.org

বায়োস্কোপের দৃশ্যের মতো বিগত ঘটনাগুলো দিলওয়ার আলীর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। তিনি শুয়ে শুয়ে সেগুলো রোমন্থন করতে লাগলেন এবং চোখে আর ঘুম না আসায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন।

তখনও সকলেই বিশ্রাম রত। কারো কোথাও সাড়াশব্দ নেই। দূরে কেবল চাকর-নফরদের দু' একজনের দু' একটা ছেঁড়া ছেঁড়া কথা শুনা যাচ্ছে। দিলওয়ার আলী একটানা নানা কথা ভাবতে লাগলেন। সেই সাথে ভাবতে লাগলেন, মাহমুদা খাতুন কোথায় এখন, কোন কক্ষে আছে, সেও কি ঘুমোচ্ছে, না শুয়ে শুয়ে তাঁর কথাই ভাবছে।

দিবা স্বপ্নের মতো এই সময় তাঁর কানে এলো মাহমুদা খাতুনের কণ্ঠস্বর। তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। নিশ্চিত হতে না পেরে কান পেতে রইলেন। পর্দার ওপার থেকে মাহমুদা খাতুন পুনরায় মৃদু কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার ! এত ঘুম ?

তড়িৎ বেগে বিছানার উপর উঠে বসলেন দিলওয়ার আলী। শশব্যস্তে বললেন—না-না, ঘুমিয়ে নেই। কিন্তু আপনি আবার কি করে এখানে এলেন ? কেউ কি ধরে এনেছেন ?

ঈষৎ হাসিমুখে মাহমুদা খাতুন বললেন—না, আর সে প্রয়োজন নেই। এখন অনেকখানি শক্তি পাচ্ছি।

ঃ একা একাই এলেন ?

ঃ আসবো কেন ? আমি এই কক্ষেই এতক্ষণ শুয়েছিলাম।

ঃ এখানেই শুয়ে ছিলেন ?

ঃ হ্যাঁ। ঘুম কিছুতেই এলো না, তাই উঠে এসে এখন এই কুরসীতে বসে আছি।

ঃ বলেন কি !

ঃ ঘুমতো আমার অনেক আগেই হারা হয়ে গেছে। তা কি আর এত সহজে ফিরে আসে ?

ঃ এ্যাঁ ! হ্যাঁ-তা ঠিক।

মাহমুদা খাতুন মলিন কণ্ঠে বললো—সেই এলেন, এত তকলিফ দেয়ার পর তবে এলেন ?

ঃ তা-মানে—

ঃ আগে যদি আসতেন, তাহলে এত নির্যাতন সইতে হয় না আমাকে !

দিলওয়ার আলী অসহায় কণ্ঠে বললেন—আসবো কি করে বলুন ? এসব কি কিছু আমি জানি ?

মাহমুদা খাতুন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—জানেন না ! এসব কিছুই আপনি জানেন না ?

ঃ জানলে কি আর আসিনে ? যা জানার তাতো এই আজকেই কেবল জানতে পারলাম।

ঃ সেকি ! এতভাবে জানানো হলো, তবু আপনি জানেন না ?

ঃ কিছুই আমি জানিনে।



www.amarboi.org

মাহমুদা খাতুন অভিমান ভরে বললো— অস্বীকার করলে আর কার কি করার আছে!

দিলওয়ার আলী আহত কণ্ঠে বললেন— অস্বীকার করলাম?

মাহমুদা খাতুন সতর্ক হয়ে বললো— আমার কসুর নেবেন না। আপনার দীলে চোট্ লাগুক, এটাতো আমি চাইতেই পারিনে। কিন্তু আমার কথার পেছনে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

ঃ যেমন?

ঃ সেই প্রথম থেকেই কিতাবউদ্দীন কতবার আপনার মকানে গেল, কত খবর রেখে এলো, আমার অভিভাবকেরাও পাঠালেন— আমি নিজেও কতভাবে খোঁজ করলাম কিতাবউদ্দীনের মাধ্যমে। এই শেষের দিকে আমার ভাইজানও দুই দুইবার গেলেন, তবু আপনি কিছুই জানলেন না?

দিলওয়ার আলী অসহায় হয়ে বললেন— বিশ্বাস করুন, এসব আমি জানিনে। কিতাবউদ্দীনের যাওয়ার খবর উড়ো উড়ো যৎকিঞ্চিৎ যা পেলাম, তাও আপনার অভিভাবকদের ব্যাপার স্যাপার আর বলতে পারেন, নিতান্তই নিরুৎসাহজনক ব্যাপার স্যাপার। আপনার তকলিফের কথা তো নয়ই, আপনিই যে কিতাবউদ্দীনকে পাঠিয়ে ছিলেন, একটুকুও জানতে আমি পরিনি।

ঃ তাজ্জব! এই হপ্তাখানেক আগে এমন করুণভাবে আমি আমার নিজের কথা বলে খত পাঠালাম আপনাকে, কিতাবউদ্দীন সে খত আপনার নওকরের হাতে দিয়ে বিশেষভাবে বলে এলো, সেটাও কি পাননি আপনি?

নিরতিশয় বিষণ্ন কণ্ঠে দিলওয়ার আলী বললেন— হায়রে আমার নসীব! কি এক আজব মকানে যে বাস করি আমি, তা কি করে কাকে বুঝাই!

ঃ কি রকম?

ঃ আমার মকানটা যে লোক হরওয়াক্ত আগ্‌লে নিয়ে থাকে, সেই নামদার খাঁ আসলেই একটা আজব চিড়িয়া। যেমনই বেহুঁশ, তেমনই আহম্মক। একটা বললে আর একটা বোঝে। যতবারই বলা যাক, সব কথাই সে ভুলে যায় তৎক্ষণাৎ। আমি বুঝতে পারছি, এসব দুর্ঘটনার জন্যে ঐ আহম্মকই বহুলাংশে দায়ী।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনার ঐ খতটাও এই আজকেই পেলাম। বেয়াকুফটা আজকেই ঐ খতটা এনে আমার হাতে দিলো।

সীমাহীন বিস্ময়ে মাহমুদা খাতুন বললো—সেকি! আজকেই আপনি পেলেন?

ঃ আজকেই পেলাম আর আজকেই জানলাম। যা জানলাম, তার কিঞ্চিৎও যদি জানতে পারতাম আগে কখনো, তাহলে আমাকে কি বেঁধে রাখতে পারতো কেউ? শত বাধা ঠেলে আমি আসতামই এখানে ছুটে। আপনি কিছু বলেন, আপনি কিছু জানান, এই আশাতেই যে অনুক্ষণ কান পেতে ছিলাম আমি।

ঃ এ্যাঁ!

ঃ আমার প্রতি আপনার কোন আগ্রহ নেই ভেবে যে কত তকলিফ পেয়েছি আমি,



www.amarboi.org

সেটা আর কি করে আপনাকে বোঝাবো ? তুষের আগুনও বোধকরি এতটা কাউকে সংগোপনে পুড়ায় না।

দিলওয়ার আলীর কণ্ঠস্বর ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। মাহমুদা খাতুন বিমোহিত হলো। তার চোখের সামনে থেকে ভ্রান্তির পর্দাটা অপসারিত হয়ে গেল। ভিজে গেল তার তনু মন। সমবেদনার সুরে সে বললো—আচ্ছা ! এই ব্যাপার ? হায়-হায় ! তাইতো আমি ভেবে কূল কিনারা পেলাম না, আপনি এত নির্দয় হলেন কি করে ? এত জ্বালা এত যন্ত্রণা সহ্য করার মাঝেও বার বার আমার মনে হয়েছে, এটা হতে পারে না, নিশ্চয়ই কোথাও কোন জট পাকিয়ে গেছে। এত হৃদয়হীন কখনোও আপনি হতে পারেন না আমার উপর—কিছুতেই না। আর আমার এই বিশ্বাসই তামাম যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি যুগিয়েছে আমাকে।

মাহমুদা খাতুনের কণ্ঠস্বরও ভারী হলো। দরদ ভরা কণ্ঠে দিলওয়ার আলী বললেন—মাহমুদা খাতুন !

মাহমুদা খাতুন বলেই চললো—এই বিশ্বাসের জোরেই তো শেষ পর্যন্ত নিজেই আমি আপনার কাছে যাওয়ার জন্যে জিদ্‌ ধরলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, আপনার কাছে এলেই তামাম গিট্‌ খুলে যাবে, আর আপনি ফেলতে পারবেন না আমাকে।

দিলওয়ার আলী তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—এই জন্যেই তো আজও আপনি মাহমুদা খাতুন। অনন্য একজন। অন্যজনের মতো নন। তামাম আশা ছেড়ে দেয়ার পরও, আমিও এই মর্মে হা'ল ধরে ছিলাম যে, মাহমুদা খাতুন মাহমুদা খাতুনই থাকবে, অন্য কেউ হবে না।

মাহমুদা খাতুন এই ফাঁকে একটু ঠেশ দিয়ে বললেন—ইশ্‌ ! আমার মতো রুগ্ন একটা মেয়ে সেনানিবাসে যাওয়ার মতো ঐ অসম্ভব জিদ্‌টা না ধরলে, হা'লটা হাতে আপনার কতক্ষণ থাকতো ?

দিলওয়ার আলী প্রত্যয়ের সাথে বললেন—মউত তক্‌। হায়াত খানের সাথে শাদিটা আপনার হয়ে গেলেও, এই বেদনাই দীলে আমার অক্ষয় হয়ে থাকতো যে, জরুর কোন রহস্য এখানে রয়ে গেছে, কোন বিভ্রান্তি শক্তভাবে কাজ করেছে। আমাকে বিলকুল উপক্ষো করে সম্মতি আপনি দেননি বা আমার চিন্তায় পেরেশান আপনি হননি।

মাহমুদা খাতুন বিহ্বল হয়ে গেল। তৃপ্তির আধিক্যে সে লহমা কয়েক অচেতন হয়ে রইলো। এরপর হুঁশ ফিরতেই সে প্রশ্ন করলো—এতই যদি বিশ্বাস, তাহলে আমিতো একজন আউরাত, আমি যদি আপনার ঐ সেনানিবাসে যাওয়ার সাহস করতে পারি, আপনি কেন পুরুষ মানুষ হয়ে আসতে পারেননি এখানে !

ঃ তা পারা যায় না। আপনি সেনানিবাসে গেলে আপনার খুব তকলিফ হতো এটা ঠিক, কিন্তু উপেক্ষিত হওয়ার কোন ভয় আপনার ছিল না, বিশেষ করে আমার এযাজত নিয়ে যাচ্ছেন যখন। কিন্তু এখানে আমার সে ভয়টা দস্তুর মতো ছিল। আমি সব সইতে পারি, কারো উপেক্ষা সইতে পারিনে।

ঃ উপেক্ষা !



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী ক্ষোভের সাথে বললেন—আপনি আমাকে ভোলেননি বলেই আমি আপনার টানে ছুটে এসেছি এখানে। নইলে স্বাভাবিক অবস্থায় এ জিন্দেগীতেও হয়তো এ মকানে আর আসা হতো না আমার।

ঃ তার মানে ?

ঃ আমার সাথে আপনার শাদির কথা এঁরা যদি কখনোও না ভাবতেন, আমার বলার কিছু ছিল না বা মর্মে লাগারও কারণ ছিল না। কিন্তু সেটা ভাবার পর এই উপেক্ষা—

ঃ উপেক্ষা বলছেন কেন ? আপনাকে উপেক্ষা করলেন কে এখানে ? সেদিন ঐ বিষাক্ত পদার্থটা এই কামরাটা দখল করে ছিল বলেই আপনাকে এই কামরায় নেয়া সম্ভবপর ছিল না। এ জন্যে এ মকানের সকলেই মনঃকষ্টে ছিলেন। আপনাকে উপেক্ষা তো কেউ করেননি ?

ঃ ঐ হায়াত খানের সাথে আপনার শাদির আনযাম করাটাই তো আমাকে চরম উপেক্ষা করা। এই কক্ষে আসতে না দেয়াটা তার তুলনায় নিতান্তই গৌণ ব্যাপার।

দিলওয়ার আলী মুখ ভারী করলেন। মাহ্‌মুদা খাতুন তৃপ্তির সাথে অনুভব করলেন, দিলওয়ার আলীর দীলে ঘা'টা কোথায় শক্তভাবে লেগেছে। কপট অভিমানে মাহ্‌মুদা খাতুন বললেন—বাহ্ ! এতে তাঁদের দোষটা হলো কোথায় ? আপনি গিয়ে শাদি করবেন অন্যখানে, আর তাঁরা তাঁদের মেয়েকে অবিবাহিত রাখবেন ?

ঃ অন্যখানে শাদি করছি মানে ?

ঃ মানে আবার কি ? সানন্দেই তো শাদি করতে গিয়েছিলেন ? মেয়েটা বেঁকে না গেলে, শাদি এতদিন হয়েই যেতো। এরপরও—

দিলওয়ার আলী বাধা দিয়ে বললেন—আরে ওটাতো আমার ভাইজানের খামখেয়ালী। উনি কোথায় কি করলেন, সে দায় আমার উপর বর্তাবে কেন ? আমার কি কোন সম্মতি ছিল সেখানে, না সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি ?

মাহ্‌মুদা খাতুন মুখ টিপে হাসলো। এরপর বললো—জানেন না ? কিন্তু আমি তো জানি, দুলহীনটা খুবই আপনার মনের মতো ছিল। খুব মনে ধরেছিল আপনার। শুয়ে শুয়ে তার মুখখানা ধ্যান না করলে ঘুমই আপনার ধরতো না !

দিলওয়ার আলী গোস্বা হলেন। নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কি সব ফাল্‌তু কথা বলছেন ? কে বললে এসব কথা ?

ঃ এই যে এই তসবীরই তা বলেছে। এটা আপনার পালংকেই পাওয়া গেছে—

বলেই মাহ্‌মুদা খাতুন পর্দার ফাঁক দিয়ে সাবিহা খানমের তসবীরটা দিলওয়ার আলীর দিকে সংযতভাবে ছুড়ে দিলো। তসবীরটা তুলে নিয়েই দিলওয়ার আলী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বিপুল বিস্ময়ে বললেন—সেকি ! এটা এখানে কিভাবে এলো ?

মাহ্‌মুদা খাতুন মুচকি হেসে বললো—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একজনকে ধোকা দিয়ে অন্যজনকে শাদি করবেন আপনি, আর সেটা ফাঁশ হয়ে যাবে না ? কিতাবউদ্দীনকে তসবীরটা দেখিয়ে আপনার ঐ নামদার খাঁ-ই এসব কথা বলেছে আর কিতাবউদ্দীন তসবীরটা ওখান থেকেই এনেছে।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী নির্বাক হয়ে গেলেন। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি প্রচণ্ড আক্ষেপের সাথে বললেন — উঃ ! এতসব সর্বনাশই ঐ আহম্মক আমার করেছে? এতবড় গোলমালই পাকিয়ে তুলেছে বেয়াকুফটা ! এবার আমি বুঝতে পারছি, কেন তাঁরা আপনার শাদি অন্যখানে দিতে গেলেন।

ঃ শুধু ঐটুকুই নয়। আপনার ঐ তথাকথিত শ্বশুরকুলও ফলাও করে এ কাহিনী অনেককেই শুনিয়েছেন। বলেছেন, নিজে আপনি পছন্দ করে শাদি করছেন ঐ মেয়েকে।

দিলওয়ার আলী সরবে বলে উঠলেন — বুঝতে পারছি, সব আমি বুঝতে পারছি। এর চেয়ে আরো বেশী কেউ কিছু বলে থাকাও অসম্ভব নয়। আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এখন।

ঃ এরপরও কি দোষ ধরবেন আমার অভিভাবকদের ?

ঃ না-না, এমন হলে তো তাঁদের চিন্তা-ভাবনা তাঁরা করবেনই। কোনই কসুর নেই তাঁদের। সবই এক দুর্বিপাক আর সবই আমার নসীব !

ঃ তবে ?

অপরাধীর কণ্ঠে দিলওয়ার আলী বললেন — আপনি অন্তত বিশ্বাস করুন, যা শুনেছেন সব মিথ্যা। আমার ভাইজান আমাকে তসবীরটা দেখতে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এসবের সাথে আমার কোনই সংস্রব নেই, সমর্থনও নেই।

মাহমুদা খাতুন হাসি মুখে বললেন — পেরেশান হবেন না। সেরেফ আমি নই, এটা যে মিথ্যে, তা আগেই এ মকানের সবাই জেনে গেছেন। খোঁজ নিয়ে দেখেই তো আজ এত অনুতপ্ত হয়েছেন তাঁরা।

দিলওয়ার আলী আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন — তাই নাকি ?

ঃ নইলে কি ভাইজান এমন বার বার যেতেন আপনার কাছে ?

ঃ মাহমুদা খাতুন !

ঃ আমার সাথে সেই যে কথা বলে গেলেন, তারপরেই যদি আসতেন একবার, তাহলে এসব কিছুই ঘটতো না।

ঃ কি করে আসবো ? নবাবের হুকুমে হুগলীতে গিয়ে আটকে রইলাম আর এই ফাঁকে এত অঘটন ঘটে গেল।

ঃ আর মারা পড়লো উলু-খাগড়া।

ঃ মানে ?

ঃ ঐ যে ছোট নানাজান বললেন, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় —

খেয়াল হতেই দিলওয়ার আলী ঈষৎ হেসে বললেন — ও, আচ্ছা-আচ্ছা। তবে উনিও ঠিক বলেননি। কথাটা হলো, 'ভুল করলেন মামারা, মারা পড়লাম আমরা।

ঃ আমরা !

ঃ আমরা দুইজনই। আমার তকলিফটাও কম হয়নি। কিন্তু আপনারটাতো বলার মতোও নয়, শুনাও যায় না।



www.amarboi.org

মাহমুদা খাতুন রসকিতা করে বললো—শুনতে গেলে ঠোঁট কেটে যায়।

ঃ কেমন?

ঃ কসুর করলেন আপনি। ইচ্ছে করলেই আসতে পারতেন, তা আপনি এলেন না। বেচারা ঠোঁটটা কি দোষ করলো যে কামড়ে ধরে ঠোঁটটা কেটেই ফেললেন একদম?

দুই চোখ বিস্ফারিত করে দিলওয়ার আলী বললেন—যা-বাব্বা! সে কথাও কানে পড়েছে আপনার?

ঃ সেরেফ কানেই কি পড়েছে? চোখেও তো পড়লো। চোখ তুলে তাকিয়ে ওটাই তো চোখে পড়লো আগে।

ঃ সে কি! কখন?

ঃ ঐ যে যখন এই কক্ষে এলেন।

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ ঠোঁটটাকে এত আজাবই দিলেন? মানে, ঝালটা ঠোঁটের উপরই ঝাড়লেন?

দিলওয়ার আলী গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—পরিহাস করছেন? এটা আপনার পরিহাসের ব্যাপার হলো?

মাহমুদা খাতুন সংযত হয়ে বললো—পরিহাস! পরিহাস করবো কেন?

ঃ আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

মাহমুদা খাতুনও গম্ভীর হলো। অভিমানী কণ্ঠে বললো—বটে! ওটা দেখার পরই যে আমার চোখ ফেটে পানি এলো ঝর ঝর করে, সেটাও বুঝি পরিহাস ছিল আমার?

ঃ মাহমুদা খাতুন।

ঃ দীলটা কেবল আপনারই নরম, আমারটা বুঝি পাথর?

"আরে-আরে, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। ও নিয়ে আফসোস্ করে এরা বিরামটাও হারাম করে ফেললে দেখছি—"

হাসতে হাসতে হাজির হলেন আবিদ হোসেন সাহেব।

## ১৪

বসন্ত অন্তরে, বসন্ত বাইরে। শীতটা অনেক আগেই চলে গেছে। দিলওয়ার আলীর বসন্ত এখন সর্বত্রই। সর্বত্রই বসন্ত এখন দুর্যোগপিষ্ট মাহমুদারও। শীত পেরিয়ে উভয়েই বসন্তের উষ্ণাঙ্গনে গা মেলে দাঁড়িয়েছেন। দীলেই তাঁদের নয়, প্রকৃতির বুকেও এখন বান ডেকেছে বসন্তের। ফলে, অন্তর-বাহির এক প্লাবনে প্লাবিত হয়ে গেছে। বনে-কাননে শাখায় শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে ঘন-সবুজ কিশলয়। প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম কলি। লাল-সবুজের রং লেগেছে বনান্তরে, নয়া জিন্দেগীর ছোয়া লেগেছে প্রতিক্ষিত অন্তরে। ফুলে পল্লবে ভরে গেছে শৈত্যাঘাতে বিবর্ণ তরুলতা। পল্লবিত হয়ে উঠেছে মাহমুদা খাতুনের বেদনাবিধুর অঙ্গ সৌষ্ঠব। রং ফিরেছে পাণ্ডুর মুখে। ভগ্নদেহ ভরাট হয়ে ষোলকলায় ভরে গেছে পূর্ণিমার চন্দ্রবৎ।



www.amarboi.org

দেহমনে মাহমুদা এখন পুষ্পতুল্য প্রাণবন্ত। বিমোহিত অলিবৎ দিলওয়ার আলী বিহ্বল।

বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে দিলওয়ার আলী ও মাহমুদা খাতুন আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছেন। ভুল ভ্রান্তি সকলেরই নিরসন হয়ে গেছে। ইমাম সাহেবের মকানে আবার এঁদের ঘিরে শুরু হয়েছে আনন্দঘন সংলাপ। আলোচনা ও পরামর্শ। সকলেই একমত —শাদি এঁদের অধিককাল আর ধরে রাখা ঠিক নয়। শুভ কাজে অনেক বাধা। আবার কখন কোন্ বিপত্তি দেখা দেয়, ঠিক কি?

দিলওয়ার আলীর একমাত্র অভিভাবক মীর দিলীর আলী। তাঁর সাথেও কথাবার্তা শেষ করেছেন মাহমুদা খাতুনের অভিভাবকেরা। দিলওয়ার আলীর দীলের বাঁধন সনাক্ত করতে পেরে মীর দিলীর আলী যারপরনেই খুশী হয়েছেন। আবিদ হোসেন সাহেবের আন্তরিক আহ্বানে মীর দিলীর আলী তাঁদের মকানে এসেছেন এবং খোশ দীলে এ শাদিতে সম্মতি দিয়ে গেছেন।

দিলওয়ার আলীর আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে আবার। ইমাম সাহেবের মকানে তিনি মাঝে মাঝেই আসেন এখন। খানিক আসেন দীলের টানে, অধিকটা গরজে। প্রয়োজনের তাকিদেই অধিকবার আসতে হয় তাঁকে। মীর দিলীর আলী মাথার উপর থাকলেও, দিলওয়ার আলীর পক্ষে এবার কর্মকর্তা দিলওয়ার আলী নিজেই। ওদিকে আবার আফসারউদ্দীন ছেলে মানুষ। ইমাম সাহেব ভিন্ন মানুষ। আবিদ হোসেন সাহেবই কনে পক্ষের সব। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ লোক। দৌড়ঝাঁপে অসমর্থ। তাই, দিলওয়ার আলীর ডাক পড়ে হর-হামেশাই।

দিলওয়ার আলী আসেন। কিন্তু আগের সেই স্বাচ্ছন্দ আর উচ্ছলতা নিয়ে তিনি আসেন না, শেকল পরে আসেন। এক পুলকমিশ্রিত সংকোচে সংকুচিত হয়ে তিনি এখানে এসে চলাফেরা করেন। মাহমুদা খাতুনের উচ্ছ্বাসও শেকল বদ্ধ হয়েছে। আবেগ তার ঠাঁই নিয়েছে অন্তরে। বাইরে তার স্ফূরণ অতি সীমিত। দিলওয়ার আলীর উপস্থিতিতে মাহমুদা খাতুনের বিচরণ এখন সলজ্জ পদক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত হয়। আবিদ হোসেন সাহেব বেজায় রসিক মানুষ। তাঁর সুবিমল রসিকতা মাঝে মধ্যেই এদের আরো লাচার করে ফেলে। বিবশ করে দেয়।

কিন্তু শেকলটা তো আসলেই স্বেচ্ছায় পরা শেকল। স্বগৃহীত বন্ধন। বাইরে থেকে জড়িয়ে দেয়া নয়। ফাঁক-অবকাশ আজও তাঁদের আগের মতোই অখণ্ড। মওকা-সুযোগ-অবস্থান আগের মতোই অটুট। অবলীলায় ও উপলক্ষ্যে এ বাঁধন সময় সময় শিথিল হয়ে যায়। পর্দাটাকে মাঝে রেখে দীল বিনিময় হয়।

সেদিনও তাই হলো। পর্দার এপার ওপার আচম্বিতেই কথা হলো দু'জনের। মাঝে আর নখে গোণার মতোও নয়, এমনই ক'টা দিন। এরপরেই শাদি। শেষ হবে এই পালাই পালাই খেলার। আনযামের শেষ পর্যায়ের খুঁটিনাটি কথাবার্তা শেষ করে আবিদ হোসেন সাহেব কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। দিলওয়ার আলী উঠি উঠি করতেই পর্দার ওপার থেকে কথা বললো মাহমুদা খাতুন— এই, শুনছেন?



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন — ছিঃ ! একি হচ্ছে ?

মাহমুদা খাতুন বললো — কি হচ্ছে ?

ঃ এখন কি আর চলে এসব ? কেউ দেখে ফেললে মাথা কাটা যাবে না ?

ঃ যাক্‌গে। ও দেখলে আমার চলছে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ কি ফুল আপনার পছন্দ, চট করে বলুন তো ?

ঃ ফুল !

ঃ ইশ্‌রে ! ফুলই তো !

ঃ ফুল কি হবে ?

ঃ সেটা আমি বুঝবো। আপনাকে যা বললাম, তাই বলুন। কোন্ ফুল আপনি পছন্দ করেন বেশী ?

ঃ কোন্ ফুল ? তা, সেটা সূর্যমুখী।

ঃ দূর ! ওটা একটা ফুল হলো ?

ঃ হলো না কেন ?

ঃ ও দিয়ে কি কিছু করা যায় ? গোলাপ-বকুল-গন্ধরাজ — এত ফুল থাকতে সূর্যমুখীই পছন্দের ফুল আপনার ?

ঃ ওটাই আমি পছন্দ করি বেশী।

ঃ কেন ?

ঃ ওর মুহব্বতের কারণে। সূর্যকে ভালবাসে সূর্যমুখী। একনিষ্ঠ ভালবাসা। তাই সূর্যের দিকেই মুখ তার নিবদ্ধ থাকে অনুক্ষণ। সূর্য যেদিকে ঘোরে সূর্যমুখীর মুখটাও ঘুরে যায় সেইদিকে। সূর্যমুখী সূর্য ছাড়া অন্যদিকে তাকায় না। নিখাদ মুহব্বত।

ঃ আচ্ছা !

ঃ ঠিক আপনার মতো।

ঃ ধ্যাৎ !

মাহমুদা খাতুন একা একাই শরমে মুখ ঢাকলো। দিলওয়ার আলী বললেন — তাই ওটাকে এত পছন্দ করি আমি। ফুলের কথা উঠলেই ওটার কথা মনে পড়ে আর সেই সাথে মনে পড়ে আপনার কথা। আপনিও এক সূর্যমুখী।

ঃ ভাল হচ্ছে না কিন্তু !

ঃ নাহলে আর কি করবো ? সত্যটা কি অস্বীকার করবো ?

ঃ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সইতে পারবেন তো ? জঞ্জাল মনে তো করবেন না ?

ঃ সূর্যমুখী সূর্যের কোন জঞ্জাল নয়। সূর্যের সে অহংকার।

মাহমুদা খাতুন কপটরোষে বললো — ঠিক আছে। সময় এলে ঐ অহংকারের পাহাড়ই কিন্তু দেখতে পাবেন চারপাশে। দরজায়, মেঝেয়, বিছানায়–সর্বত্র। জঞ্জালবোধে তখন কিন্তু নাক সিট্‌কালে শুনবো না।

ঃ মাহমুদা খাতুন !

ঃ মাহমুদা খাতুন কেন আবার ? সূর্যমুখী বলুন ?



www.amarboi.org

ইতিমধ্যেই আওয়াজ এলো — "যেও না যেন বাপজান! একটু মিষ্টিমুখ না করে কিন্তু যাওয়া হবে না আজ তোমার — "

অন্দর থেকে আওয়াজ দিলেন আজিজুন নেছা বেগম। হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল দিলওয়ার আলীর সূর্যমুখী।

সূর্যমুখী পূর্ববৎ সূর্যের দিকেই চেয়ে রইলো। সূর্যের নাগাল সে পেলো না এবং অহংকারের পাহাড় দেখানোর সময় আর তার এলো না। বসন্তের সমারোহে অকস্মাৎ বাদল নেমে আসায়, বসন্তের রং-বর্ণ বিমলিন হয়ে গেল।

ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেব এই মুহূর্তে ইন্‌তেকাল করলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ইমাম সাহেব শেষ ধাক্কাটা আর সামাল দিতে পারলেন না। ধাক্কা এলো ঐ শ্বাপদ-সংকল দিক থেকেই। হাজী আহম্মদের নেতৃত্বে ধাক্কা মারলেন হাজী আহম্মদের সারথিরা। বদ্‌লা নেয়ার মওকা খুঁজে না পাওয়ায়, হাজী আহম্মদের চেয়েও চোখের ঘুম হারা হলেন রায় বাবু আর শেঠ বাবুরা। হায়াত খানের শাদি ভেঙ্গে যাওয়াতে তাঁদের মনে এক বিন্দুও ঘা লাগেনি। ইমাম সাহেবকে বাগে আনতে না পারাটাই মাথা ব্যথা তাঁদের। তাঁদের মর্ম পীড়ার কারণ ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেবের ঐ স্বজাতীয় চেতনাবোধ উজ্জীবিত করে তোলা। কওমী হুকুমাত অটুট রাখার লক্ষ্যে ইমাম সাহেব তখনও দ্বীনী চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলছিলেন। বিজাতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁর মুসল্লীদের তখনও তিনি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন। ফলে হাজী আহম্মদের আক্রোশে কিছু ভাটার প্রভাব থাকলেও, এদের আক্রোশ তুরঙ্গ বেগে বেড়েই চলে মুহুর্মুহু।

তাঁরা হাজী আহম্মদ সাহেবের অপমানবোধটা উস্কে দিয়ে দিয়ে উগ্র করে তুললেন এবং হাজী আহম্মদ সাহেবকে সামনে নিয়ে গিয়ে নবাবকে ঘিরে ধরলেন। সবাই মিলে নবাবকে তাঁরা বোঝালেন, শহরের ঐ বড় মসজিদের ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেব নবাব বাহাদুরের ঘোর বিরোধী লোক। নবাব বাহাদুর ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঐ ইমাম সাহেব প্রকাশ্যে এবং অহরহ বিষোদগীরণ করছেন। অচিরেই তাঁর মুখ বন্ধ না করলে জনগণ বিদ্রোহ করতে পারে এবং এতে করে মস্তবড় মুসিবত পয়দা হতে পারে।

তাঁরা নবাবকে আরো বোঝালেন, আসলে তো ইমাম সাহেব নিজ গরজে এসব কিছু করছেন না, প্রশাসনের ভেতর থেকেই তাঁকে দিয়ে করানো হচ্ছে এসব।

প্রশাসনিক পরিষদের সম্মিলিত অভিযোগ। মশা মারতে কামান দাগার ব্যাপার মনে হলেও, নবাব সুজাউদ্দীন খান তাঁদের কথা রাখলেন। বয়োবৃদ্ধির অছিলায় ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেবকে তিনি অপসারিত করলেন এবং সেখানে ভিন্ন ইমাম নিয়োগ করলেন।

পদচ্যুত হয়ে ইমাম হাফিজুল্লাহ সাহেব একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন। সুদীর্ঘকাল ধরে এই নিয়েই বিভোর হয়েছিলেন তিনি। জমিদারী হারিয়ে তিনি মসজিদকে কেন্দ্র



www.amarboi.org

করে নয়া জগৎ গড়ে তোলেন এবং এই জগতেই খোশহালে দিন গুজরান করতে থাকেন। এক্ষণে তিনি একেবারেই বেকার হয়ে গেলেন। সংসারের সাতে পাঁচে কোনদিনই থাকেননি। এখন আর সংসারে তিনি নতুন করে করার কিছু পেলেন না।

ইমামতি হারিয়ে এসে লাচার হয়ে পড়লে, পরিবারের সকলেই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এ বরং ভালই হলো। এতটা বয়সে আর কি গরজ এই দৌড়ঝাঁপ করার? ক'দিনই আর বাঁচবেন, এই কয়টা দিন বিরাম করুন শুয়ে বসে।

প্রবল আপত্তি তুলে ইমাম সাহেব বললেন—বাঁচবো না–বাঁচবো না। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—মানে?

ইমাম সাহেব বললেন—একাজ থেকে বিরত হলে আমি আর বাঁচবো না। এর সাথেই প্রাণশক্তি মিশে আছে আমার। অন্য কোন কাজে আর মনোনিবেশ করা এখন সম্ভব নয়। চুপচাপ শুয়ে বসে থাকাও আমার পক্ষে এখন মউতকেই আহ্বান করার সামিল। দম আমার রুদ্ধ হয়ে আসবে।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—ভাইজান!

ঃ মসজিদ, জালসা, নসিহত—এসব নিয়ে যতক্ষণ আমি থাকি, ততক্ষণই মনে হয় আমি বেঁচে আছি। ঘরে ফিরে এলেই কেমন যেন অস্তিত্বহীন হয়ে যাই।

ঃ তাহলে এখন কি করতে চান? অন্য কোন মসজিদে চেষ্টা করে দেখবো কি?

আবিদ হোসেন সাহেবকে নিরুৎসাহ করে আফসারউদ্দীন বললেন—কোন ফায়দা হবে না। যে চক্রের কোপনজরে পড়ে গেছি আমরা, তাতে সবই এখন বিফল প্রয়াস হবে। ঐ দুষ্ট চক্র এ শহরে নানাজানের এ কাজ আর বরদাস্ত করবে না। যে মসজিদেই যান না কেন, অচিরেই তাঁকে আবার সেখান থেকে অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসতে হবে।

আজিজুন নেছা বেগম বললেন—তার মানে?

ঃ ওরা বড় শক্তভাবে পিছু নিয়েছে আমাদের আম্মাজান। আমাদের ওরা কিছুতেই স্বস্তিতে থাকতে দেবে না।

ঃ সেকি! তাহলে তো তোমার উপরও চাপ আসতে পারে এরপর?

ঃ এরপর কি বলছেন! অনেক আগেই সে চাপ আমার উপর আসতো কিন্তু শাহজাদা সরফরাজ খান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এই মাদ্রাসাটাকে একান্তভাবেই তিনি আপন করে নিয়েছেন। ফলে, ওখানে আর ও চক্র নাক গলাতে পারছে না।

ঃ বলো কি!

ঃ মাদ্রাসার বার্ষিক অনুষ্ঠানে শাহজাদাকেই এবারও প্রধান মেহমান করা হলো। শাহজাদার সাথে যোগাযোগ করার আর তাঁকে আনার ও অভ্যর্থনার দায়িত্ব আমার উপরই ছিল। এতে করে আমার সম্বন্ধে শাহজাদার কিছু তারিফ ওদের কানে পড়ে। আর এতেই ওদের চরম গাত্রদাহ শুরু হয়। রায় রায়ান, আলম চাঁদ একদিন আমাকে পথের উপরই বলে বসলেন, "শাহজাদার ছত্রছায়ায় কতদিন আর মোহাদ্দেসগিরি করবেন নওজোয়ান? ঐ মাদ্রাসার কর্তৃত্ব তো একদিন অন্যের হাতেও যেতে পারে?"



www.amarboi.org

আমি বললাম, "একথা বলছেন কেন ?" উনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "ঘুরে ফিরে ঐ শাহজাদাকেই বার বার প্রধান মেহমান করছেন আপনি, হাজী আহম্মদ সাহেব কি পদমর্যাদায় কম ? খোদ প্রশাসনিক পরিষদের মুকুট মণি তিনি। তাঁর কথা একবারও আপনি ভাবলেন না ?"

এবার ইমাম সাহেব উদগ্রীব হয়ে বললেন—তারপর ?

ঃ আমি বললাম, "আমি একা ভাবার কে ? মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী আর তালেবে-এলেমরা—" কথা আমাকে শেষ করতে না দিয়েই উনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "আরে রাখেন–রাখেন ! ভাত দিয়ে মাছ ঢাকার ফালতু চেষ্টা করবেন না ! আপনিই যে নাটের গুরু তা আমরা জানি। শাহজাদার প্রিয় পাত্র হওয়ায় এখন তো মাদ্রাসায় আপনারই একচ্ছত্র রাজত্ব চলছে। কিন্তু কয়দিন সাহেব ? বৃদ্ধ নবাবের প্রায় এখন-তখন অবস্থা। এরপর মসনদের শিকেটা যদি শাহজাদার নসীবে না ছিঁড়ে, তখন কোথায় থাকবে নকরী আপনার আর কোথায় থাকবেন নিজেরা আপনারা ? হায়াত খানকে নাকোচ করে একবারতো হাজী আহম্মদ সাহেবকে চরম অপমান করেছেন। এরপর তাঁর নাকের ডগার উপর দিয়ে শাহজাদাকে ড্যাং ড্যাং করে নিয়ে যাওয়ার এই অপমান কমে ছাড়া হবে কখনোও ভেবেছেন ?"

ইমাম সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন—এতবড় কথাটাই বললে ?

জবাবে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—কেন বলবে না ভাইজান ? ওদের আসল লক্ষ্য যে কি, তা কি বিলকুলই ভুলে গেলেন ?

ইমাম সাহেব সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। আফসারউদ্দীন বললেন—ওদের হাতে মোটেই আর নিরাপদ নই আমরা। আমাদের ভালাই ওরা কখনোও বরদাস্ত করবে না। এ শহরে যেখানেই যা করতে চাই আমরা, সেখানেই ওরা দাঁত বসাতে ছুটে আসবে।

ঃ আফসারউদ্দীন !

ঃ একমাত্র ওরা যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় কখনো, তখনই হয়তো নিরাপত্তা ফিরে আসবে আমাদের। তার আগে অন্য কোথাও ইমামতী পেলেই সেখানে ওরা নানাজানকে টিকে থাকতে দেবে না।

ইমাম হাফিজুল্লাহ গা-নাড়া দিয়ে উঠে বললেন—না দিক এ শহরে আর কোথাও ইমামতী করবো না। আমি স্থির করেছি, ফৌজীপুরে গিয়ে আমি বাঁকী ক'দিন ওখানেই থাকবো আর ওখানকার মসজিদটাই দেখাশুনা করবো।

সরবে আপত্তি তুলে আজিজুন নেছা বললেন—সেকি আব্বাজান ! এই বয়সে সেখানে গিয়ে একা একা—মানে আমরা আপনার সাথে গেলে এ মকানটা দেখবে কে?

ইমাম সাহেব বললেন—আহা তোমরা যাবে কেন ? ওখানে তো আমাদের আদায়কারী আর পাইক-পেয়াদা আছেই। ওতেই আমার চলবে।

ঃ অসম্ভব ! এ বয়সে এভাবে কখনই আপনাকে ছেড়ে দিতে পারিনে। ওসব খামখেয়ালী চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন আব্বাজান।



www.amarboi.org

ইমাম সাহেব অসহায় কণ্ঠে বললেন — ত্যাগ করলে যে আমি মোটেই বাঁচবো না আম্মাজান। আমার কাজ নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে দাও তোমরা।

কিন্তু ইমাম সাহেব পরাস্ত হলেন। সকলের সমবেত বিরোধিতার মুখে তিনি খামুশ হয়ে গেলেন। হা'ল ছেড়ে দিয়ে তিনি নিষ্ক্রীয় হয়ে রইলেন। প্রথম প্রথম কয়েকদিন উঠবোস্ করে কাটালেন এবং এরপর আস্তে আস্তে তিনি ঝিমিয়ে পড়তে লাগলেন। মাথা-ঘোরা, বুক জ্বালা, অজীর্ণ, অনিদ্রা — ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গে আক্রান্ত হতে লাগলেন। দিলওয়ার আলীর সাথে মাহমুদা খাতুনের শাদির ব্যাপার নিয়ে মকানের সবাই যখন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সেই সময় অধিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন তিনি এবং শাদির ঠিক দুইদিন আগে তাঁর আশংকাই সত্য প্রমাণ করে ইমাম হাফিজুল্লাহ্ সাহেব ইহধাম ত্যাগ করলেন।

আনন্দ মুখর মকান নিরানন্দে ভরে গেল। ভেস্তে গেল শাদির আনযাম। শোকতাপ, আহাজারী আর দুঃখ-বেদনার তাড়নায় সূর্য থেকে সূর্যমুখী অনেক দূরে ছিটকে পড়লো। সুনিশ্চিত বিষয় অনিশ্চিত হয়ে গেল। দিলওয়ার আলী ও মাহমুদা খাতুনের রসগন্ধে ভরা সুশোভিত বসন্ত অকাল বরিষণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

নসীবের পরিহাস ! অতপর কিছুদিন অতিবাহিত হতেই বিধ্বস্ত বসন্ত ফের ফেরারী হয়ে গেল। শোক তাপ তরিয়ে শান্ত হলো ইমাম সাহেবের মকান, কিন্তু ঝড় উঠলো বাইরে। ঘটনা ও দুর্ঘটনার দুরন্ত প্রবাহে ওলটপালট হয়ে গেল সুবে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। একই সময় এক আকস্মিক উল্কাপাতে তছনছ হয়ে গেল হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লী। নবাবের দিকে ধেয়ে এলো পরপারের পরওয়ানা, বাদশাহর দিকে ধেয়ে এলো নাদির শাহর কালো থাবা। চমকে গেল বাংলাসহ হিন্দুস্তানের মানুষ, শংকা ও আবেগসহ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দিলওয়ার আলী সালার। মুলুক ও কওমের তিনি একনিষ্ঠ সেপাই। তাঁর কতব্যজ্ঞান তীক্ষ্ণ। ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। এই রাজনৈতিক সংকটে তিনি নিদারুণ-ভাবে শংকিত হয়ে উঠলেন। শাদির প্রশ্ন এই মুহূর্তে অবান্তর হয়ে গেল। তিনি হারিয়ে গেলেন চলমান বিবর্তনের আবর্তে, ডুবে গেলেন কাজের মাঝে।

বাংলায় ফের শুরু হলো রাজনৈতিক পালাবদলের পালা। বৃদ্ধ নবাব সুজাউদ্দীন খান মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তিনি প্রহর গুণতে লাগলেন। মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কি হয় — কি হয়, মুমূর্ষু নবাব বাঁচেন কি মরেন, সুজাউদ্দীনের পরে বাংলার তখ্তে কে আসেন, এই ফাঁকে কোন্ চক্র কোন্ চা'ল চালে, নবাব ফের ভিন্ন কাউকে মনোনয়ন দিয়ে বসেন কিনা — এ নিয়ে দারুণ এক উদ্বেগ ও শংকা রাজধানীর সর্বত্র বিরাজ করতে লাগলো। নবাব আকস্মিকভাবে মুমূর্ষু হয়ে পড়ায়, পূর্ব চিন্তা করার কোন অবকাশ কেউ পেলেন না, না বাংলার শুভাকাঙ্ক্ষীরা, না কোন মতলববাজেরা। কি হয়, কি ঘটে, এই দোলায় দোল খেতে লাগলেন সবাই।



www.amarboi.org

নবাবের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি দেখে, নবাবের দিন যে শেষ হয়ে এসেছে, এ সম্বন্ধে সকলেই প্রায় নিসন্দেহ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত তখ্‌ত তিনি কাকে দিয়ে যাচ্ছেন, এ সম্বন্ধে অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়ে গেলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে বিদ্যমান অসম্প্রীতি ও কলহই এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণ। জোয়ার ভাটার মধ্যে দিয়ে এ কলহ আগাগোড়াই প্রবহমান থাকার দরুন, প্রকাশ্যেই কেউ কেউ মন্তব্য করতে লাগলেন, নবাব বাহাদুর নির্ঘাত তাঁর জামাতা বা অন্য কোন আত্মীয়কে মসনদের জন্যে মনোনীত করে যাবেন, শাহজাদা সরফরাজ খানকে কখনোও করবেন না।

নবাব সুজাউদ্দীন খান শিগ্গিরই এ সন্দেহ নিরসন করে দিলেন। শত্রু হলেও পুত্র, দুশমন হলেও পিতা। সুজাউদ্দীনের পিতৃস্নেহ সংগোপনে বরাবরই প্রবাহিত ছিল। শাহজাদা সরফরাজ খানের পিতৃভক্তিও লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রায়শঃই ছুঁয়ে যেতো সুজাউদ্দীনের অন্তর। বিভেদ সৃষ্টিকারীরা এটা বোধ করতে পারেনি। বিরামহীন উস্কানীর মুখেও নবাব সুজাউদ্দীন খান এই শেষের দিকে সজ্ঞানে ফিরে আসেন এবং সকলের অলক্ষ্যে দীল তাঁর পুত্রস্নেহ প্রবল হয়ে উঠে। ফলে, পুরোপুরি সজ্ঞাহীন হওয়ার আগেই তিনি প্রশাসনিক পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ উচ্চ পর্যায়ের তামাম অমাত্য ও আমলাদের তাঁর শয্যার পাশে ডেকে নিলেন এবং সকলের সামনে তিনি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিলেন, তাঁর অভাবে সুবে বাংলার তখ্‌তে বসবেন তাঁর একমাত্র পুত্র শাহজাদা সরফরাজ খান। তাঁকেই তিনি তাঁর মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন।

নবাবের ঘোষণা শুনে হাজেরান মজলিসের প্রায় সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাজ পড়লো কিছু লোকের মাথায়। বিশেষ করে, প্রশাসনিক পরিষদের তিন সদস্য—হাজী আহম্মদ সাহেব, রায় রায়ান আলম চাঁদ, জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ এই তিন ব্যক্তি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন একটা ঘোষণা নবাব বাহাদুর দেবেন, এটা তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি। যে সরফরাজ খানকে ফারাগ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এত কাঠখড়ি পুড়ালেন, পিতাপুত্রের মধ্যে এত সংঘাত পয়দা করলেন, সেই সরফরাজ খানকেই নবাব তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করলেন দেখে, তাঁরা হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের তামাম কসরত ব্যর্থ হওয়ার বেদনায় তাঁরা বিবর্ণ মুখে বসে বসে নীরবে ফুঁশতে লাগলেন।

নবাব সুজাউদ্দীনের নজর এটা এড়ালো না। এটা তিনি লক্ষ্য করলেন। পুত্রের ভালাই কামনায়, উপস্থিত সকলকে বিদায় করে দিয়ে তিনি এদের নিয়ে পৃথকভাবে বসলেন। এই শেষের দিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এই তিন ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমতার এতই উচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছেন এবং প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কল-কজাগুলো এমনভাবেই তাদের দখলে দিয়ে দিয়েছেন যে, এখন এদের নাখোশ রেখে এই মুলুকের মসনদে কারো পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁর এই ঘোষণা তাঁদের মনঃপুত হলো কিনা সে প্রসঙ্গে না গিয়ে, তিনি সরাসরি এই সদস্যত্রয়কে অনুনয়ের সুরে বললেন—আপনাদের কাছে আমি একটি আবেদন রাখতে চাই। আপনারা আমার একান্ত আপনজন। সুখে দুঃখে সবসময়ই আপনারা



www.amarboi.org

আমার পাশে থেকেছেন আর অভিন্ন আত্মার মতো আমার সুখ-দুঃখের শরিক হয়েছেন। আশা করি আমার অন্তিম অনুরোধ কেউ আপনারা ফেলবেন না!

অন্তরে যা-ই থাক, সৌজন্যের খাতিরে হাজী আহম্মদ সাহেব বললেন—জ্বি জনাব, বলুন।

ঃ শাহজাদা সরফরাজ খান আপনাদের সকলেরই পুত্র তুল্য। কিছুটা জেদি আর অভিমানী হলেও, পিতার বন্ধু হিসেবে আপনাদের সকলের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু ওর কর্মবুদ্ধি খুব কম। ওকে আমি আপনাদের হাওলায় রেখে গেলাম। বরাবর আমাকে আপনারা সৎপরামর্শ আর সুবুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করে এসেছেন। নিজের পুত্রজ্ঞানে সরফরাজ খানকেও তাই আপনারা করবেন, এই আমার অনুরোধ।

কোন জবাব না দিয়ে সদস্যত্রয় একে অন্যের মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন। নবাব বাহাদুর ফের বললেন—বলুন, আমার এ অনুরোধ আপনারা রাখবেন?

জবাব এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় রায় রায়ান আলম চাঁদ বললেন—এত না-উম্মিদ হচ্ছেন কেন জাঁহাপনা? সে তো অনেক পরের কথা। ঈশ্বরের কৃপায় অচিরেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সাময়িকভাবে অসুখটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেলেও, এ অবস্থা অধিক সময় থাকবে না। শিগ্গিরই আবার সেরে উঠবেন আপনি।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে নবাব সুজাউদ্দীন খান বললেন—মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আর ফায়দা নেই রায় রায়ান বাবু! আমার অবস্থা আমি ভাল বুঝি। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, দিন আর আমার মোটেই বাঁকী নেই। তামামই নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ সেই জন্যেই আপনাদের এত তকলিফ দিয়ে এনে আমি এই অনুরোধ রাখছি।

হাজী আহম্মদ সাহেব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—সে জন্যে অনুরোধ রাখতে হবে কেন জাঁহাপনা? আমাদের উপর কি জাঁহাপনার আস্থা নেই?

চরম নিস্তেজ অবস্থার মধ্যেও সুজাউদ্দীন খান নড়ে চড়ে উঠলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—না-না, সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনারা আমার একান্ত সুহৃদ। আপনাদের উপর আস্থা আমার কোনদিনই কমজোর হয়নি এতটুকু আজই বা তা হবে কেন?

হাজী আহম্মদ সাহেব বললেন—তবে?

ঃ তবু আপনাদের মুখ থেকে এই অন্তিম সময়ে এ আশ্বাসটা পেলে, আমি বড়ই তৃপ্ত হই। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার তিনি মুখ তুলে বললেন—আলমপনাহ্!

নবাব সুজাউদ্দীন খান রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আপনারা বলুন, আমার অভাবে শাহজাদা সরফরাজ খান এতিম হয়ে যাবে না? পিতার অভাবটা আপনারাই পূরণ করবেন?

সঙ্গীদের সাথে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করে জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন—বিলক্ষণ-বিলক্ষণ! জাঁহাপনার পেছনে আমরা অনুক্ষণ থেকেছি,



www.amarboi.org

শাহজাদার পেছনেও তাই আমরা থাকবো। কখনো তাঁকে ফেলে দূরে সরে যাবো না বা যুক্তি-পরামর্শ দিতেও কম কিছু করবো না।

ঃ জগৎ শেঠ বাবু !

ঃ এই মুলুক আর এই হুকুমাতের কল্যাণে বরাবরই আমরা প্রাণপাত করে এসেছি, আজও তার কসুর কিছু হবে না। এই মুলুকের ভালাইয়ের জন্যেই শাহজাদার পেছনে হরওয়াক্ত লেগে থাকতে হবে আমাদের। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জনাব।

ঃ আলহামদু লিল্লাহ !

নবাব নিশ্চিন্ত হলেন। না হয়ে উপায়ও তাঁর ছিল না। তিনি খোশদীলে এই সদস্যত্রয়কে বিদায় করে দিলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই নবাব আবার তাঁর আওলাদ সরফরাজ খানকে ডেকে নিলেন। পুত্রকে কাছে ডেকে বসিয়ে তিনি বললেন—এক গুরুদায়িত্ব অচিরেই তোমার কাঁধে এসে পড়ছে বাপজান ! তখন কিন্তু ধৈর্য হারালে মোটেই তোমার চলবে না।

মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত হওয়ায় শাহজাদা সরফরাজ খান মনে প্রাণে খুশী থাকলেও, ওয়ালেদের এ কথায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর ওয়ালেদ যে তাঁদের ছেড়ে অচিরেই চলে যাচ্ছেন, ওয়ালেদের কথার মধ্যে এই ইংগিতই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শাহজাদা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—আব্বাজান !

নবাব বাহাদুর বললেন—আমি জানি তুমি একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ছো। অনেক আগে থেকেই অনেকে তোমার উপর জিয়াদা বিরূপ আছেন। এই ঘাটতি কিন্তু তোমাকে পুষিয়ে নিতে হবে জরুর।

ঃ আব্বাজান !

ঃ সবচেয়ে বড় যেটা কাজ হবে তোমার, তাহলো—প্রশাসনিক পরিষদের ঐ সসদ্যত্রয়ের—অর্থাৎ হাজী আহম্মদ, আলম চাঁদ আর ফতেচাঁদ—এদের মন তোমাকে জয় করতে হবে। নইলে মহা মুসিবতে পড়বে তুমি।

প্রয়োজনের তাকিদেই ভারাক্রান্ত অন্তর কিছুটা সামলে নিয়ে শাহজাদা বললেন—তা কি করে সম্ভব জনাব ? ওঁরা তো বরাবরই আমার প্রতি—

ঃ সবই আমি বুঝি। তবুও উপায় নেই বাজপান। যতই অপ্রিয় হোক, এই কাজটি সফল করে তুলতেই হবে তোমাকে। ভক্তি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে তাঁদের তুমি আপন করে নিতে না পারলে, মসনদে তুমি কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না।

ঃ আব্বাজান !

ঃ এর জন্যে আমার নিজের কসুরটা কতখানি, সে ব্যাখ্যায় এই অবেলায় আর যাবো না। বর্তমানে যা সত্য, সেই দিকটাই তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই আমি। এই তিন ব্যক্তিই এখন এ মুলুকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক দিক দিয়ে হাজী আহম্মদ সাহেব এখন অত্যন্ত শক্তিশালী। ওদিকে আবার, মসনদের পেছনে মূলশক্তি এ মুলুকের রাজা-জমিদার বৃন্দ। ঐ রায় রায়ান আর জগৎ



www.amarboi.org

শেঠ বাবুই মূলত এই মূলশক্তির কর্ণধার। এঁরা যেদিকে থাকবেন, ঐ প্রায় তামাম রাজা-জমিদারদের সমর্থনও সেইদিকে থাকবে।

ঃ এটা যে কতটা নির্মম—

ঃ আফসোস্ করে লাভ নেই বাপজান। আমি সেরেফ একাই নই, এ জন্যে তোমার নানাজানও বিপুলাংশে দায়ী। যা হবার তা হয়েই গেছে এখন আমি যা বললাম, তাই তুমি করবে।

ঃ কিন্তু—

ঃ কোন কিন্তুর আর অবকাশ নেই। সবসময়ই ওঁদের প্রতি তুমি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, ওঁদের হাতের মধ্যে রাখবে আর ওঁদের পরামর্শ ও নসিহত মেনে চলবে— এই আমার অন্তিম উপদেশ। এ উপদেশ কখনো যেন ভুলে যেও না বাপজান।

জবাবে শাহজাদা সরফরাজ খান আর কিছুই বলতে পারলেন না। পিতার পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেবলই তিনি অঝরে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।

রুগ্ন নবাব সুজাউদ্দীন খান সন্তানের ভালাইয়ের জন্যে যতটুকু সম্ভব শুয়ে শুয়ে সবই করলেন। তবু আসল কাজটা কিছুই করা হলো না। সেটি হলো, বাদশাহর সনদ লাভ। পুত্র সরফরাজ খানের পক্ষে দিল্লী থেকে সনদ আনার কোন ব্যবস্থাই করতে তিনি পারলেন না। কসূরটা তামামই নবাবের নয়, এক্ষণে তা করার আর পথও ছিল না। কারণ, দিল্লীর বাদশাহর নিজের বাদশাহীই তখন টলটলয়মান। তিনি তখন নিজেই সর্বহারা হওয়ার পথে, অন্যকে নবাব বানানোর সনদটা আর দেয় কে?

অকস্মাৎ উল্কাপাতের মতো পারস্যের মহাপরাক্রম সম্রাট নাদির শাহ এই সময় আচম্বিতে এসে হিন্দুস্তানের পশ্চিম প্রান্তে হানা দিলেন এবং অপ্রতিরোধ্য হিমবাহের মতো সামনের সবকিছু দলে মথে নিয়ে রাজধানী দিল্লীর দিকে ধেয়ে আসতে লাগলেন। দিল্লীর তৎকালীন দুর্বল বাদশাহ মহাতংকে কম্পিত হয়ে উঠলেন এবং নাদির শাহর অগ্রযাত্রা রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে কেবলই ছুটোছুটি করতে লাগলেন। এই অবস্থায় দিল্লী থেকে সনদ পাওয়ার কোন মওকাই ছিল না। পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়, সেই অপেক্ষা করতে করতেই নাদির শাহ সসৈন্যে এসে দিল্লীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর ঠিক এই সময়ই রোগ মুক্তির তামাম আনযাম ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলার নবাব সুজাউদ্দীন খান ইন্তেকাল করলেন।

নবাবের মৃত্যু সংবাদ বাইরে আসার সাথে সাথেই বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। একদিকে শোক ও অন্যদিকে শাহজাদার নিরাপত্তা বিধান করা আর মসনদ আগ্‌লানো নিয়ে এই হুকুমাতের শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। লাশ দাফন করা সহ কোন রকম বাধা-বিপত্তি পয়দা হওয়ার আগেই শাহজাদা সরফরাজ খানের মসনদ লাভ নিশ্চিত করার কাজে মীর দিলীর আলী, সেনাপতি গাউস খান, সেনানায়ক শরাফউদ্দীন, হাজী কোরবান আলী, হাজী লুৎফুল আলী, মীর কামাল, মীর গাদাই, মীর সিরাজউদ্দীন, বিজয় সিংহ প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ আহার-নিদ্রা হারাম করে ফেললেন। দিলওয়ার আলীর কথাই নেই। এ কাজে তিনি জান ছেড়ে দিলেন।



www.amarboi.org

সকলের সতর্ক তৎপরতার জন্যে শাহজাদা সরফরাজ খানের মসনদ লাভ নির্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হলো। 'আলাউদ্দৌলা হায়দার জঙ্গ' উপাধি নিয়ে নবাব সরফরাজ খান বাংলার মসনদে আরোহণ করলেন। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় ও বিকল্প কিছু না থাকায় বিরোধিতা করার কোন মওকাই কেউ পেলো না বা বাদশাহর সনদ নিয়ে কোন প্রশ্ন তাৎক্ষণিকভাবে উঠলো না। পিতার নির্দেশ অনুযায়ী মসনদে উঠে তিনি কাউকে পদচ্যুত না করে সকলকে স্ব স্ব স্থানে নিয়োজিত রাখলেন। নিরুদ্বেগের সাথেই তাঁর নবাবী শুরু হলো।

দম ফেলার অবকাশ পেলেন নবাব সরফরাজ খানের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। এই ফাঁকে দিলওয়ার আলী ইমাম সাহেবের মকানের দিকে ছুটলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দিলওয়ার আলী ওখানে আর বেশ কিছুদিন যাওয়ার অবকাশ পাননি এবং তাঁদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেননি। ফাঁক পেয়েই তাই তিনি সেখানে ছুটে গেলেন তাঁদের সাথে মোলাকাত করতে এবং বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও তাঁর নিজের ব্যস্ততার কথা জানাতে।

সময়ই শোকতাপ বিমোচনের অব্যর্থ দাওয়াই। সময়ের প্রলেপে ইমাম সাহেবের মৃত্যুঘটিত শোকতাপ ইতিমধ্যেই সেখানে স্তিমিত হয়ে গেছে। সবাই আবার হাসিখুশী আর স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে এসেছেন। এখন আর ওদিকে কারো তেমন কোন নজর নেই। সকলেরই নজর এখন রাজনৈতিক চত্বরের দিকে নিবদ্ধ। কারণ অতি স্পষ্ট। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই পরিবারের শুভাশুভ মুর্শিদাবাদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। তাঁদের জীবন মরণের প্রশ্নটাও জড়িয়ে গেছে এরই সাথে। রাজনৈতিক এই দুর্যোগের খবর পাওয়া মাত্রই এই মকানের সকলেই শংকিত হয়ে পড়েন। কিনা কি ঘটে ভেবে, সেই থেকেই সকলে পেরেশানীতে ছিলেন এবং দিলওয়ার আলীর পথ চেয়ে ছিলেন।

দিলওয়ার আলী মকানে এসে প্রবেশ করার সাথে সাথে সকলেই সরবে বেরিয়ে এলেন। জেনানারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, পুরুষেরা ছুটে এলেন আঙ্গিনায়। সকলেরই চোখেমুখে অনন্ত জিজ্ঞাসা। শাহজাদার মসনদ লাভের খবরে আতংক তাঁদের কমলেও, ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে অদম্য আগ্রহ সবার মাঝেই বিদ্যমান ছিল। দিলওয়ার আলীকে নিয়েও দুর্ভাবনা কম ছিল না তাঁদের। বিশেষ করে, মাহমুদা খাতুনের উপর দিয়ে আবার এক দুঃশ্চিন্তার ঝড় বয়ে গেছে। রাজনৈতিক উত্থান-পতন মানেই সংঘাত-লড়াই, হত্যা-খুন, হাজারটা দুর্ঘটনার সমাহার। দিলওয়ার আলী দুরন্ত এক সৈনিক। জানের পরোয়া নেই। এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে তাঁর কখন কি ঘটে, এ নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না মাহমুদার।

বাহির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সকলের সাথে কথা বলার মাঝেই দিলওয়ার আলীর সন্ধানী নজর মাহমুদাকে তালাশ করে ফিরতে লাগলো। নীচের বারান্দায় না দেখে দিলওয়ার আলীর নজর গেল দ্বিতল কক্ষের বারান্দায়। উপরে চোখ তুলেই তিনি দেখলেন, নেকাব আঁটা মাহমুদা খাতুন উদগ্রীব নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। চোখ তুলতেই চোখাচোখী হয়ে গেল। মাহমুদা খাতুনের ক্লান্ত নজর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। আবিরের রং লাগলো দিলওয়ার আলীর অন্তরে।



www.amarboi.org

নিজেকে সামাল রেখে দিলওয়ার আলী সকলের সাথে কথা বলতে লাগলেন। কুশলাকুশলের সাথে রাজনৈতিক দিক নিয়ে দু' একটি প্রশ্ন করার পরই আবিদ হোসেন সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—চলো-চলো, ঘরে গিয়ে বসি আগে, তারপর শুনবো সব—

দিলওয়ার আলীকে ঘরে এনে বসিয়ে সকলে উদগ্রীব হয়ে বিগত ঘটনাবলীর মোটামুটি সব কথা শুনলেন। এরপর আবিদ হোসেন সাহেব আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন—যাক, শাহজাদা সরফরাজ খান যে নবাব হয়েছেন, এই জন্যেই আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে হাজার শুকুর জানাই। কিযে আতংকের মধ্যে ছিলাম আমরা সবাই!

দিলওয়ার আলী বললেন—খুবই স্বাভাবিক। চারদিকে দুশমন আর ষড়যন্ত্র। ব্যতিক্রম ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

ঃ তোমাকে নিয়েও ভাবনা আমাদের কম ছিল না ভাই। হুজ্জত কিছু বাধলে যে সবার আগে তুমিই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ নিয়ে সন্দেহ করার কারো কিছু নেই।

দিলওয়ার আলী স্মিতহাস্যে বললেন—তাই নাকি?

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—বিলকুল। নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই নিঃশ্বাস আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম, এই বুঝি বাধে লড়াই। জয়-পরাজয় কি হয়, সে প্রশ্ন তো ছিলই, সেই সাথে ভাবনা ছিল, কে মরে, কে বাঁচে। মাহমুদা খাতুনের মুখের দিকে তো তাকোনোই যায় না চোখ তুলে।

আবিদ হোসেন সাহেব হাসতে লাগলেন। দিলওয়ার আলী মাথা নীচু করলেন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে আফসারউদ্দীন বললেন—থাক ওসব। দুর্যোগটা যে মোটামুটি পুরোটাই কেটে গেল, এটাতো এখন আশা করা যায়, না কি বলেন ভাই সাহেব?

জবাবের আশায় আফসারউদ্দীন দিলওয়ার আলীর মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলেন। কিন্তু দিলওয়ার আলী সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ দমধরে বসে থাকার পর দিলওয়ার আলী ম্লানকণ্ঠে বললেন—না ভাই সাহেব, এটা ভাবা ঠিক নয়। এতটা নিশ্চিত হওয়ার সময় এখনো আসেনি।

এ জবাবে সকলেই ফের উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। আফসারউদ্দীন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—মানে?

দিলওয়ার আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সাময়িকভাবে নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকলেও, দুর্যোগটা পুরোপুরি কাটেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় ওটা থমকে আছে মাত্র।

এক পাশে দণ্ডয়মান আজিজুন নেছা বেগম বললেন—কেন বাপজান, শাহজাদা সরফরাজ খান তো মসনদ দখল করেই নিয়েছেন। তিনি এখন এ মুলুকের নবাব। এরপরে আর দুর্যোগ কি?

ম্লান হাসি হেসে দিলওয়ার আলী বললেন—দখল করে নেয়া আর সে দখল কায়েমী হওয়া, এক কথা নয় আম্মাজান। সেটা গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। মসনদে উনি উঠে বসেছেন এইটুকুই বলা যায়। কিন্তু নীতিগতভাবে তাঁর মসনদ লাভ এখনো পুরোপুরি প্রশ্নাতীত হয়নি। মরহুম নবাবের মনোনয়ন পেলেও, আর একটা ফাঁক রয়েই গেছে।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব ও আফসারউদ্দীন এক সাথে বললেন — কি রকম ?

ঃ আসল কাজটাই তো এখনও বাঁকী রয়ে গেছে। যে কারণে গতবার তাঁর মসনদ পাওয়া হয়নি, এবারও তো সেই ফাঁকটাই বিদ্যমান।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — অর্থাৎ ?

ঃ অর্থাৎ, বাদশাহর সনদটা এখনো তিনি পাননি। বাদশাহর সনদ লাভের আগে কারোই মসনদ দখল পুরোপুরি কায়েমী নয়। সনদ নিয়ে এসে যে কেউ মসনদটা দাবী করে বসতে পারে। যার হাতে সনদ থাকবে, আর না হোক, সর্বস্তরের সমর্থনের পাল্লাটা তার দিকেই ভারী হবে।

ঃ বলো কি ! সনদ এখনও পাননি ?

ঃ জ্বিনা। এছাড়া, আরো তো কথা আছে।

ঃ যেমন ?

ঃ এই হুকুমাতের কায়েমী দুশমনেরা আর মতলববাজেরা আদৌ শাহজাদাকে মেনে নেবেন কিনা, কতক্ষণ মসনদে টিকে থাকতে দেবেন তাঁকে, এ প্রশ্নও জ্বলন্ত হয়ে আছে।

আফসারউদ্দীন হতাশ কণ্ঠে বললেন — ভাই সাহেব !

ঃ তাঁদের এই একদম নিশ্চুপ হয়ে থাকাটা কোন ভালাইয়ের আভাস নয় মোটেই, প্রচণ্ড ঝড় উঠারই আলামত। কখন যে কোন্ দিক দিয়ে কোন্ গুটি চালে আবার, কে জানে ?

ঃ সেকি !

ঃ কায়েমী দুশমন আর মতলববাজদের পুরোপুরি খামুশ করে দেয়ার আগে, কোন কিছুই নিশ্চিত নয় ভাই সাহেব ? এটা একটা সাময়িক সফলতা মাত্র। মুসিবতের মেঘ এখনোও চারদিকে জমজমাট।

ঃ তাজ্জব ! তাহলে তো হরওয়াক্ত তলোয়ারটা খুলে নিয়েই থাকতে হবে ! স্বস্তির সময় কখনই আসবে না।

ঃ কখোনই আসবে কিনা বলা যায় না, তবে এতে করে এই হুকুমাতের শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিদ্ঘুম বেশ কিছু দিনের জন্যেই হারাম হয়ে গেল।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ ঝড়টা উঠুক আর না উঠুক, এখন আমাদের কেবলই সতর্ক থাকার সময়। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে হরওয়াক্ত তৈরী থাকার সময়। আরামে দম ফেলার অবকাশটাও এখন আমাদের খুঁজে বেড়ালে চলবে না।

আজিজুন নেছা বেগম সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন — হুঁউ ! ঘুরে ফিরে কথা তাহলে ঐ একটাই দাঁড়াচ্ছে।

দিলওয়ার আলী বললেন — আম্মাজান !

ঃ পয়লা থেকেই যে কি বিপাকে পড়লো, মেয়েটার পেরেশানী বুঝি কখনো আর কাটে না।

ঃ জ্বি ?



www.amarboi.org

ঃ আমি মাহমুদা খাতুনের কথা বলছি। ও বেচারার সদগতি বুঝি কিছুতেই আর হয় না ?

আবিদ হোসেন সাহেব করুণ কণ্ঠে বললেন—সবই নসীব। এ অবস্থার মধ্যে তো কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।

ভিড়টা কেটে গেলে দিলওয়ার আলী ক্ষণিকের জন্যে একা হলেন। এই ফাঁকে মাহমুদা খাতুন পর্দার আড়াল থেকে ভারী কণ্ঠে বললো—জিন্দেগীটা তাহলে এই হালেই কাটাবেন ?

সচকিত হয়ে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন—এই হালে মানে ?

ঃ ঐ দুর্যোগের পেছনেই ছুটে বেড়াবেন আজীবন ? স্থির হয়ে ঘরে বসার মওকা কি নসীবে আপনার ঘটবে না ?

ঃ ঘটবে না, এতটা ভাবছেন কেন ? আপাতত ঘটছে না, ব্যাপারটা এই।

ঃ আপাতত বলে তো সময়ের কোন মাপ নেই। এক মাসও আপাতত এক বছরও আপাতত।

মাহমুদা খাতুনের কণ্ঠ থেকে হতাশা ঝরে পড়লো। দিলওয়ার আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কি আর করা যাবে, বলুন ? ঘরটার অস্তিত্বই যেখানে অনিশ্চিত, খুঁটিগুলো নড়বড়ে, মজবুত করে নেয়ার আগে আরাম করে ঘরে বসার অবকাশটা কোথায় ?

ঃ কিন্তু ঘরটা মজবুত করতেই যদি অপঘাতে জানটা যায়, তাহলে আর—

ঃ অপঘাতে !

ঃ আমার দুশ্চিন্তাটা এখানেই। অহরহ জানের উপর এই ঝুঁকি—

ঃ ছিঃ ! এতটা দুর্বল হওয়া সাজে না। সেপাইদের জানটা রেহান দেয়া জান। সব অবস্থার জন্যেই এখানে প্রস্তুত থাকতে হয়। এ জানের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাতর হলে চলে না।

মাহমুদা খাতুন থমকে গিয়ে বললো—জি ?

ঃ সেপাইরা এতে দুর্বল হয়ে পড়ে। পেছনের প্রেরণা তাদের করে দুর্জেয়।

লহমাখানেক নীরব থেকেই মাহমুদা খাতুন বললো—আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুন আপনাকে।

ঃ মাহমুদা খাতুন !

ঃ তিনি আপনাকে কামিয়াব করুন।

# ১৫

দিলওয়ার আলীর আশংকাটাই সত্যি হলো। মসনদের পেছনে শুরু হলো ষড়যন্ত্র। হাজী আহম্মদ আর আগের মতো ভবঘুরে নন। তাঁর দুর্দিন আর নেই। তিনি এখন প্রতিষ্ঠিত একজন, ধনে-জনে-বলে-বীর্যে বলীয়ান এক ব্যক্তি। আত্মীয়-পরিজন নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছেন তিনি। ভাগ্যটাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার আগে থামবেন কেন তিনি পথ যেখানে খোলা ? মরহুম নবাব সুজাউদ্দীনের প্রতি বিশ্বস্ত



www.amarboi.org

থাকলেও, মুর্শিদাবাদে আসার পর এই হুকুমাতের হালত্ আর এই হুকুমাতের চিরন্তন বিরোধী শক্তির অবাধ বিচরণ ও সীমাহীন বেঈমানী দেখেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, বাংলার মসনদ একটা লা-ওয়ারিশ মাল। কৌশলে যে লুটে নিতে পারবে, এ মসনদ তারই। সুজাউদ্দীন লুটে নিলেন, সুজাউদ্দীনের হলো। আবার যে লুটে নিতে পারবে, তারই হবে তখন। সেই থেকেই হাজী আহম্মদের নজর আছে বাংলার মসনদের দিকে। নবাব সুজাউদ্দীন খানের অপরিণামদর্শিতাই হাজী আহম্মদের এই আকাঙ্ক্ষাকে দিন দিন পরিবর্ধিত করেছে। সুজাউদ্দীন খানই তাঁকে সপরিবারে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছেন এবং তাঁর এই লালসাকে লালন করে গেছেন।

মুসলমান শাসনের চিরন্তন বিরোধী গোষ্ঠীর আকিঞ্চন—মসনদটা পুনঃপুনঃ হাত বদল হতে থাকুক এবং পুনঃপুনঃ তাঁদের হাতের লোকের হাতে আসুক। হাজী আহম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের হাতের লোক, সরফরাজ খান নন। তকী খানকে নিয়ে খেলাটা যখন এগুলো না আর তাঁরা নিজেরাও যখন এই মুহূর্তে দখল করতে পারছেন না, তখন মসনদটা হাজী আহম্মদ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে আসাও তাঁদের হাতেই আসা। তাঁদের লক্ষ্যে তাঁরা অটল। হাজী আহম্মদের সাথে অনেক আগে থেকেই গাঁটছড়া বাঁধা আছে তাঁদের। নবাব সুজাউদ্দীন খানের ঐ অপ্রিয় ঘোষণাটা শোনার পরই হাজী আহম্মদের পেছনে তাঁরা আরো মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রেরণা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে, হাজী আহম্মদের উম্মিদকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। সরফরাজ খান তখ্তে উঠার পর, হাজী আহম্মদ সহকারে সবাই তাঁরা মৌখিকভাবে নবাব সরফরাজ খানের প্রতি হামদরদী ভাব দেখাতে লাগলেন এবং তলে তলে শিকড় কাটতে লাগলেন।

ফলে, পিতার নির্দেশানুযায়ী নবাব সরফরাজ খান এই তিন ব্যক্তির প্রতি যতই শ্রদ্ধাশীল হোন আর যতই তাঁদের আপন করার চেষ্টা করুন, সে চেষ্টা সফল হবার ছিল না। হলোও না শেষ অবধি। তাঁরা শ্রদ্ধা চান না, মসনদ চান। আর সে কারণেই, নবাব সরফরাজ খান যতই তাঁদের বুকের কাছে টেনে নিতে লাগলেন, ততই তাঁরা বুক বরাবর ছুরি চালানোর জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন।

পয়লা তারা ঘা মারলেন আসল জায়গায়। অর্থাৎ মওকা পেয়েই, দিল্লীর বাদশাহকে তাঁরা নবাব সরফরাজ খানের প্রতি যারপরনেই বিরূপ করে দিলেন। পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ ইতিমধ্যেই দিল্লী দখল করে দিল্লী শহর তছনছ করে ফিরছিলেন। মসনদে আরোহণ করার কিছুদিন পরেই নবাব সরফরাজ খান নাদির শাহর এক পত্র পেলেন। পত্রটি বেশ কিছুদিন আগেই এসেছিল এবং পত্রটি মূলত মরহুম নবাব সুজাউদ্দীন খানকেই লেখা হয়েছিল। এই পত্রে নাদির শাহ বাংলার নবাবকে অবিলম্বে দিল্লীর বাদশাহর বদলে তাঁর প্রতি আনুগত্য আনায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বাংলার রাজস্ব তাঁর নামে প্রেরণ করার হুকুম দিয়েছিলেন। অন্যথা করলে, বাংলার নবাবকে উৎখাত করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন।

দিল্লী এখন মহাপরাক্রম নাদির শাহর দখলে। পত্র প্রাপ্তির পর কি করবেন স্থির করতে না পেরে, পিতার নসিহত অনুযায়ী নবাব সরফরাজ খান ঐ তিন ব্যক্তির পরামর্শ চাইলেন আর এতে করেই এক পা কবরে বাড়িয়ে দিলেন।



www.amarboi.org

ঐ তিন ব্যক্তি, অর্থাৎ হাজী আহম্মদ সাহেব, রায় রায়ান আলম চাদ ও জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ আসলেও ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, কূটনীতিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তি। তাঁরা যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, নাদির শাহর এ আক্রমণ হিন্দুস্তান জয় করার আক্রমণ নয় এবং দিল্লীতে সাময়িকভাবে আধিপত্য বিস্তার করাও মুঘল সাম্রাজ্য দখল করা নয়। ধন-সম্পদের লালসায় ছুটে এসেছেন নাদির শাহ। সম্পদ হস্তগত হয়ে গেলেই, এদেশ আবার ত্যাগ করবেন তিনি। দিল্লীর বাদশাহ আপাতত দৃশ্যের বাইরে থাকলেও, এটা সাময়িক। আবার তিনি স্বস্থানে ফিরে আসবেন।

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে এই তিন ব্যক্তি নবাব সরফরাজ খানকে বিলকুল উল্টাপথে চালিত করলেন। পত্রখানা মেলে ধরে নবাব তাঁদের পরামর্শ চাইলে, তাঁরা এমনভাবে প্রদর্শন করলেন, যেন নবাব একেবারেই সর্বশান্ত হয়ে বসে আছেন। রায় রায়ান আলম চাঁদ চোখ মুখ ফুটিয়ে তুলে বললেন—কি সর্বনাশ—কি সর্বনাশ! এতো অনেকদিন আগের পত্র! এখোনও নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন জনাব?

নবাব সরফরাজ খান থতমত করে বললেন—হ্যাঁ, মানে—

ঃ এখনও যে এই বাংলা মুলুকটা চষে সরষে বুনেননি মহাপরাক্রম পারস্য রাজ, থুড়ি, এই হিন্দুস্তানের অধিপতি, এইটেই তো তাজ্জব লাগছে!

নবাব সরফরাজ খান অবিশ্বাসের সুরে বললেন—এতটাই চিন্তা করেন আপনি?

জবাব দিলেন হাজী আহম্মদ সাহেব। তিনি বললেন—কি তাজ্জব! জনাব তো কোন খবরই রাখেন না দেখছি! বাদশাহ নাদির শাহ যেমনই মহাবলে বলীয়ান, তেমনই একরোখা আর জেদি। 'এক বাপ এক বাত'—এ কিসিমের মানুষ। যা বলেন, তা না করে পানি স্পর্শ করেন না।

জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ বাবু যোগ দিয়ে বললেন—জাগলো খেয়াল, দিল্লীর মসনদ চাই, ব্যস্! অমনি পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে নিয়ে এসে দিল্লী দখল করে তবে ছাড়লেন।

রায় রায়ান বললেন—বাংলা দখল করা তাঁর এক লহমার ব্যাপার। একটা মুখের কথা খসালেই তাঁর দুর্ধষ্য বাহিনী এসে থাবা মেরে এ দেশটা তুলে নিয়ে যাবে। ও বাহিনীর সামনে বাংলার বাহিনী হাতীর সামনে সেরেফ একটা তেলাপোকা।

নবাব সরফরাজ খান বিব্রত কণ্ঠে বললেন—সেকি! এসব কি বলছেন আপনারা?

ঃ জনাব!

ঃ জানিনে কি কারণে এতটা ঘাবড়ে গেছেন আপনারা তবে এসব আপনাদের নিরাতিশয় আধিক্য।

সামলে নিলেন হাজী আহম্মদ সাহেব। তিনি বললেন—হ্যাঁ জনাব, আপাতত সেই রকমই মনে হওয়ার কথা। আসলে তো ভেতরের খবর অনেকেই সঠিক জানেন না? জনাবেরও তা না জানা থাকলে মোটেই আশ্চর্য হবো না। তবে ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে এই রকমই জনাব। বাদশাহ নাদির শাহর ক্ষমতা আর মেজাজ রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য। জানা না থাকলে এটা সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না।



www.amarboi.org

নবাব সরফরাজ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ। তাহলে কি করতে বলেন আপনারা?

জগৎ শেঠ বললেন—আনুগত্য আনুন হুজুর। জলজ্যান্ত সত্যটাকে অবিশ্বাস করে মুসিবতটা আহ্বান করে আনবেন না। বিপদ হলে তো হুজুরের একারই হবে না, হুজুরের আর এই হুকুমাতের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার দায়ে আমাদের মাথাগুলোও সাথে সাথেই যাবে।

ঃ শেঠ বাবু!

ঃ শাহান শাহ্ নাদির শাহর প্রতি আনুগত্য এনে শিগ্গির শিগ্গির দিল্লীতে দূত পাঠিয়ে দিন জনাব। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। হয়তো ভুলে আছেন, খেয়াল হলেই আর রক্ষে নেই।

ঃ এরপর মুঘল বাদশাহ্ দিল্লীর তখ্‌তে ফিরে এলে, তখন কি হবে?

রায় রায়ান আলম চাঁদ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—অসম্ভব! তা তিনি আসতেই পারেন না। কোথায় গিয়ে মরে পচে পয়মাল হয়ে আছেন, কে জানে? শাহান শাহ্ নাদির শাহ্ কি ফিরে যাওয়ার জন্যে এত তোড়জোড় করে এসেছেন? হিন্দুস্থানের মতো এমন সম্পদশালী মুলুক হাতে পাওয়ার পর পারস্যের ঐ পাথর-কাঁকড় ঠেলতে কি আর উনি যান? এখন থেকে দিল্লীতে নাদির শাহী হুকুমাত কায়েম হয়ে গেল।

নবাব সরফরাজ খান তবুও আমতা আমতা করে বললেন—কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কি কিছু নিশ্চিত করে বলা যায়? যদি তেমন কিছু ঘটেই?

ঃ তো কি হয়েছে জনাব? ঐ দুর্যোগের সময় কে কোথায় কি করেছে—না করেছে, সে খবর জানছেই বা কে আর জানাচ্ছেই বা কে? তেমন ক্ষেত্রে সবকিছু চেপে গিয়ে অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা নিলেই চলবে।

হাজী আহম্মদ সাহেব বললেন—ওদিকে আবার কি ফ্যাসাদ দেখুন? জনাবের তো দুশমনের অন্ত নেই। ঘরে বাইরে দুশমন। আত্মীয়-স্বজন, জামাই জোড়া, ভগ্নিপতি, বিমাতা পক্ষ—মানে বাইরের দুশমন পড়ে মরুক, মসনদের প্রশ্নে কোন আত্মীয়ও আত্মীয় নয়। এই ফাঁকে কেউ আগেই গিয়ে যদি শাহান শাহ্ নাদির শাহর আনুগত্য স্বীকার করে আকর্ষণীয় নজরানার মাধ্যমে শাহী সনদটা বাগিয়ে আনে, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে, তা একবার চিন্তা করে দেখুন।

সঙ্গীদ্বয় সঙ্গে সঙ্গেই সমর্থন দিয়ে বলে উঠলেন—ওরে বাপরে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে ভয়টা তো চূড়ান্তই রয়ে গেছে!

নবাব সরফরাজ খান একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং অত্যন্ত সরল লোক ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিচক্ষণতার যথেষ্ট অভাব ছিল তাঁর। তিনি কূটনীতি জানতেন না, কারো চাতুরী ধরতেও পারতেন না। এর উপর, তাঁর চিত্তের কোন দৃঢ়তাও ছিল না। অত্যন্ত নড়বড়ে দীলের মানুষ ছিলেন তিনি। কোন সিদ্ধান্তেই তিনি অটল থাকতে পারতেন না। তাপ লাগলেই গলে যেতেন। এঁদের এই উপর্যুপরি যুক্তির



www.amarboi.org

সামনে তিনি ক্রমশই নেতিয়ে পড়তে লাগলেন এবং হাজী আহম্মদের এই শেষের কথায় একবারেই খামুশ হয়ে গেলেন। লহমাখানেক বিস্মিত নেত্রে হাজী আহম্মদের মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন— ঠিক আছে। আপনারা যা বললেন— তাই হবে। আপনারা তো আর আমাকে খারাপ পরামর্শ দেবেন না?

জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ তোড়জোড়ে বললেন— কখ্খনো না-কখ্খনো না।

নবাব বললেন— আপনারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনারা থাকতে, আমার চিন্তা কি?

রায় রায়ান গদ গদ কণ্ঠে বললেন— বটেই তো-বটেই তো! জনাবের গায়ে কি আমরা একটা কাঁটার আঁচড় লাগতে দেবো? মরহুম নবাব বাহাদুর আমাদের শুধু মালিকই ছিলেন না, পরম বন্ধুও ছিলেন। সেই বন্ধু নিজে জনাবকে আমাদের উপর হাওলা করে দিয়ে গেছেন। আর কি নড়ন চড়নের জো আছে আমাদের? কর্তব্যের বাঁধনে আমরা বাঁধা পড়ে গেছি।

চাতুরীরই জয় হলো। এই তিন ব্যক্তির প্রবল উৎসাহের মুখে নবাব সরফরাজ খান সেরেফ আনুগত্যনামা সহ নাদির শাহর কাছে দূত পাঠিয়েই দিলেন না, বাংলার রাজস্বও পাঠিয়ে দিয়ে নাদির শাহর নামে মুদ্রা জারী করলেন এবং খোত্‌বা পাঠ শুরু করলেন।

নসীবের খেল্! এর কিছুদিন পরেই নাদির শাহ ধন-সম্পদ বেঁধে নিয়ে স্ব মুলুকে চলে গেলেন। হিন্দুস্তানের দিকে আর ফিরেও তাকালেন না। দিল্লীর মসনদে আবার মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ এসে শক্ত হয়ে বসলেন এবং মুঘল শাসন চালু করলেন। এ খবর বাংলায় এসে পৌঁছামাত্রই রায় রায়ান আলম চাঁদ গোপনে পত্র লিখে বাদশাহ মুহম্মদ শাহকে জানালেন, বাংলার নবাব সরফরাজ খান বিশ্বাসঘাতক। তিনি যেমনই সুবিধেবাদী, তেমনই অকৃতজ্ঞ। হুজুরের দুর্দিন দেখেই সরফরাজ খান নাদির শাহর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে বাংলার রাজস্ব তাঁকেই প্রদান করেছেন এবং তাঁর নামে খোত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা জারী করেছেন।

পত্র পেয়ে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্বগতোক্তি করলেন— তবেরে!

বিধ্বস্ত রাজধানী পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় বাদশাহ মুহম্মদ শাহ নবাব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ কোন পদক্ষেপ নেয়ার অবকাশ পেলেন না। তিনি কেবলই ফুঁশতে লাগলেন।

অভ্রান্ত ব্যবস্থা। পরিপক্ক যোগাযোগ। পথঘাট আগেই বেঁধে নেয়া ছিল। হাজী আহম্মদ সাহেব বিহারে অবস্থিত তাঁর ভাই আলীবর্দী খানের সাথে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা পোক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি জানিয়েছিলেন, নবাব সরফরাজ খান তাঁদের উপর মোটেই তুষ্ট নন। আগাগোড়াই তিনি তাঁদের পরম দুশমন। পায়ের তলার মাটিটা শক্ত হয়ে গেলেই, সরফরাজ খান তাঁদের সবাইকে লাথি মেরে ছুড়ে দেবেন। সরফরাজ খানকে উৎখাত করা না গেলে, আত্মীয় বান্ধব সহকারে তাঁদের দুই



www.amarboi.org

ভাইকেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা থেকে উৎখাত হয়ে যেতে হবে। আবার তাঁদের পথে নামতে হবে। সুতরাং বাংলা মুলুকে টিকে থাকতে হলে, সুবে বাংলার মসনদ দখল করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। বাংলার মসনদ দখল করার বিকল্প নেই। মসনদ দখল করতেই হবে তাঁদের।

সেই সাথে হাজী আহম্মদ আলীবর্দী খানকে আরো জানিয়ে ছিলেন, বাংলার মসনদ দখল করে সে মসনদে আলীবর্দীকেই বসতে হবে এবং সেই মোতাবেক শক্তি সঞ্চয় করা সহ আলীবর্দীকে এখন থেকেই সর্ববিধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আলীবর্দী খানের সে শক্তি আগে থেকেই বহুলাংশে সঞ্চয় করা ছিল। বিহারে সহকারী সুবাদার হয়ে আসার কালে পাঁচ হাজার ফৌজের এক বাহিনী নবাব সুজাউদ্দীন খান আগেই তাঁকে দিয়েছিলেন। এর উপর বিদ্রোহ-বিদ্রুত বিহারের বিদ্রোহ দমনের প্রয়োজনে আলীবর্দী খান নিজেও এক বিশাল বাহিনী তৈয়ার করে নিয়েছিলেন। লড়াকু বেকারদের সংখ্যা বিহারে এই সময় বিপুল পরিমাণে ছিল। এদের এনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে আলীবর্দী খান এমন এক বিশাল সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছিলেন যে, যে কোন শক্তির সাথেই পাঞ্জা লড়ার তাকত্ তাঁর পয়দা হয়ে গিয়েছিল। ভাই হাজী আহম্মদ সাহেবের নির্দেশ ও নসিহত অনুযায়ী আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করার ইরাদায় আরো মজবুতভাবে প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং আনুসঙ্গিক পথঘাট বাঁধতে লাগলেন।

রায় রায়ান আলম চাঁদের পত্র পেয়ে দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহ যখন অতিশয় ক্রুদ্ধ, সেইক্ষণে আলীবর্দী খানের আরজ এসে বাদশাহর সামনে পড়লো। দিল্লীর দরবারে এই সময় সর্বাধিক প্রভাবশালী সভাসদ ছিলেন ইসহাক খান। আলীবর্দী খান এই ইসহাক খানের মাধ্যমে মোটা নজরানা দিয়ে বাদশাহর কাছে সনদ প্রাপ্তির আবেদন জানালেন এবং বিশ্বাসঘাতক নবাব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সরফরাজ খানের উপর বাদশাহ নিজেও রুষ্ট ছিলেন। সেই সাথে, নাদির শাহর হামলায় বিধ্বস্ত বাদশাহ এই সময় সভাসদদের হাতের ক্রীড়ানকও ছিলেন। ফলে, অল্পায়াসেই ইসহাক খান কাজ হাসিল করলেন। বাদশাহ মুহম্মদ শাহ আলীবর্দী খানকে শাহী সনদ প্রদান করার হুকুম দিলেন এবং তাঁর যুদ্ধ ঘোষণার আরজও অনুমোদন করলেন।

যথাসময়ে এই গোপন খবর হাজী আহম্মদের কানে এসে পৌছলো। আলীবর্দী খানের বিজয়কে সহজতর করে তোলার লক্ষ্যে এই চতুর ব্যক্তিত্রয় আর এক চা'ল চাললেন। বাংলার প্রশাসন পুনর্বিন্যাস করতে বসে এই তিন ব্যক্তি নবাবকে বোঝালেন যে, রাজ কোষে নিদারুণ অর্থ ঘাটতি দেখা দিয়েছে, ব্যয় সংকোচন না করলে অচিরেই প্রশাসন যন্ত্র বিকল হয়ে যাবে। ব্যয় সংকোচনের খাত হিসেবে হাজী আহম্মদ সাহেব সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করার পরামর্শ দিলেন। তিনি যুক্তি খাড়া করলেন–দেশে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই, কোন রাজ্য জয়ের পরিকল্পনাও নেই, অথচ সৈন্য সংখ্যা অনর্থক এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এই পঙ্গপাল পুষতেই রাজ কোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যয় নিছকই অপব্যয়। কমছে কম এর অর্ধেকটা ছাঁটাই করা হোক।



www.amarboi.org

নবাব সরফরাজ খান বুঝলেন, এ পরামর্শ গ্রহণ করলে নিজেই তিনি হীনবল হয়ে যাবেন, তাঁর নিজেরই সামরিক শক্তি খর্ব হয়ে যাবে। তবু তিনি শেষ অবধি শক্ত থাকতে পারলেন না। এঁদের জোরদার যুক্তি ও শুভ কামনার মুখে দুর্বলচিত্ত নবাব নতি স্বীকার করলেন এবং প্রায় অর্ধেক সৈন্য ছাঁটাই করে দিলেন।

নবাবের শুভাকাঙ্ক্ষীরা অধিকাংশই বাইরের লোক। সামরিক ও অন্য বিভাগের লোক। প্রশাসনের নীতি নির্ধারক বা উচ্চতর পরিকল্পনা বিভাগের তেমন কেউ নন। ফলে, কোথায় কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, তা তাঁরা বড় একটা জানার সুযোগ পান না। এবার সৈন্য ছাঁটাই হতে দেখেই তাঁর সামরিক বিভাগের শুভাকাঙ্ক্ষীরা হৈচৈ শুরু করলেন। নবাব নিজে নিজের পায়ে কুড়োল মারছেন কেন বলে তাঁরা ক্ষোভ জানাতে এলেন। নবাব তাঁদের সমঝালেন, ব্যয় সংকোচন করা এক্ষণে একান্ত প্রয়োজন তাই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এটা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। অর্থনৈতিক টানাটানিটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আবার তাদের সেনাবিভাগে পুনর্বহাল করা হবে। আপাতত কিছুদিন তারা অবসরে থাকুক।

সরল চিত্তে নবাব যা বুঝেছিলেন, তাই বোঝালেন। কিন্তু আসল ঘটনা তা ছিল না। নবাব সরফরাজ খানের বাহিনী থেকে ছাঁটাই হলো সৈন্য আর সে সৈন্যেরা তামামই বিহারে গিয়ে যুক্ত হলো আলীবর্দী খানের বাহিনীর সাথে। হাজী আহম্মদ সাহেব সে ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন। হাজী আহম্মদের গোপন ইংগিতে নবাবের বাহিনীচ্যুত সেপাইসেনা বিহারে গিয়ে আলীবর্দী খানের বাহিনী পুষ্ট করে তুললো।

এত ঘটনা একেবারেই চাপা পড়ে থাকে না। হাজী আহম্মদের দলও বুঝতেন, তা থাকবে না। তাঁদের প্রয়োজন ছিল সময়টা, যা তাঁরা অনেকখানিই পেলেন। এরপর ঘটনাগুলো ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগলো। সৈন্য ছাটাইয়ের মাহাত্মটাই ফাঁশ হলো আগে। ব্যাপকহারে সৈন্য ছাঁটাই হতে দেখে সেনাপতি গাউস খান, সেনানায়ক দিলওয়ার আলী, বিজয় সিংহ, মীর কামাল, মীর গাদাই, এমন কি নবাবের অত্যন্ত কাছের লোক মীর দিলীর আলীও নবাবের ঐ সাদাসিদে ব্যাখ্যাতে আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তাঁরা সন্দিহান হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটার ভেতরে কি আছে, এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য এই বেকারত্ব নীরবে কেন মেনে নিচ্ছে, কোথায় তারা যাচ্ছে—এর হদিস্ করার জন্যে মীর কামাল ও মীর গাদাইকে তাঁরা ছাঁটাইকৃত সেপাই সেনার পেছনে লাগিয়ে দিয়ে রাখলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আসল তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে মীর কামাল ও মীর গাদাই সেনা ঘাঁটিতে ফিরে এলেন এবং এ পক্ষের সকলকে তা জানালেন।

শুনামাত্র গাউস খান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দিলওয়ার আলী, মীর কামাল ও বিজয় সিংহকে সংগে নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের কাছে ছুটে এলেন। নবাব বাহাদুর একাই ছিলেন। তাঁর এযাজত নিয়ে এসে গাউস্ খান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন — গোস্তাকী



www.amarboi.org

মাফ হয় জাঁহাপনা। নিতান্তই নিরুপায় হয়ে জনাবকে এই অসময়ে তকলিফ দিতে হচ্ছে।

সকলেই এঁরা নবাবের খুব বিশ্বাসী লোক। অকস্মাৎ এদের এভাবে হাজির হতে দেখে নবাব সরফরাজ খান শংকিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—ঘটনা কি খান সাহেব?

গাউস খান বললেন—জাঁহাপনা কি কিছুই খেয়াল করে দেখবেন না? এই কিসিমের বেহিসেব কাজ করে কি জনাব এই হুকুমাতের সর্বনাশ ডেকে আনবেন?

ঃ মতলব?

ঃ সেনা বাহিনীর অর্ধেকটাই ছাঁট করে ফেলা হলো কোন্ উদ্দেশ্যে মেহেরবান?

ঃ কেন, আপনাদের তো বলেছিই, ব্যয় সংকোচনের জন্যে?

ঃ স্থান পরিবর্তন করার নাম কি ব্যয় সংকোচন জনাব?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ বিহার কি সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত নয়? সেখানের ব্যয় কি একই রাজ কোষের ব্যয় নয়?

ঃ তা হবে না কেন? কিন্তু এর সাথে বিহারের কি সম্পর্ক?

ঃ আমাদের ঐ ছাটাইকৃত সেপাই সেনা তামামই এখন বিহারে জনাব তামামই বিহারের সহকারী সুবাদার সাহেবের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে।

নবাব সরফরাজ খান চমকে উঠে বললেন—তার মানে?

দিলওয়ার আলী অভিযোগের সুরে বললেন—সেই ব্যয় বহন করতেই হচ্ছে, অথচ জাঁহাপনা নিজের শক্তি খর্ব করে আলীবর্দী খান সাহেবের শক্তি বৃদ্ধি করে দিলেন।

ঃ এসব আপনারা কি বলছেন?

বিজয় সিংহ বললেন—তাজ্জব হবার কি আছে জনাব? এর ভেতরে যে এমনই একটা ষড়যন্ত্র আছে, তা সেনাবাহিনীটা একেবারেই কমজোর করে আনা দেখে তখনই আমরা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

ঃ ষড়যন্ত্র !

ঃ জাঁহাপনা কি এরপরও কিছুই অনুধাবন করতে পারছেন না? এটা কি ব্যয় সংকোচনের প্রয়াস?

ঃ তাজ্জব ! সেপাই সেনা তামামই কি আলীবর্দী খান সাহেবের বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছে?

ঃ জি জনাব, তামামই।

ঃ সেপাই-সেনারা কি করে জানলো যে, ওখানে গেলেই নকরী পাবে তারা?

ঃ এইটেই তো ষড়যন্ত্র। সে ব্যবস্থা আগেই করে রাখা ছিল।

ঃ আগেই করে রাখা ছিল !

ঃ যাঁদের কথায় জনাব এই সৈন্য ছাঁটাই করলেন, তাঁরাই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।



www.amarboi.org

সন্দেহ মুক্ত হতে না পেরে নবাব বাহাদুর প্রশ্ন করলেন — এসব খবর কার কাছে পেলেন আপনারা ? কি করে এসব তথ্য জানলেন ?

এবার কথা বললেন সেনানায়ক মীর কামাল। তিনি বললেন — কারো কাছে শোনা কথা নয় জনাব। আমি নিজে গিয়ে তামাম তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি।

আবার চমকে উঠলেন নবাব বাহাদুর। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন — আপনি নিজে ?

ঃ জি মেহেরবান। হাজী আহম্মদ সাহেব এই ব্যবস্থা করে রেখেই জনাবকে এই সৈন্য ছাঁটাইয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেপাই সেনাদের নিয়োগ-ছাঁটাই তো তাঁরই আওলাদ আর তাঁরই নিজের লোকদের হাতে। হাজী আহম্মদ সাহেব নিজেই ঐসব সেপাই সেনাদের গোপনে সেখানে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

ঃ সেকি !

ঃ সেপাই সেনারা সবাই আমাদের লোক। চেনাজানা মানুষ। তাদের মুখ থেকেই এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি জনাব। এ অপকীর্তি তামামই হাজী আহম্মদ সাহেবের।

দিশেহারা কণ্ঠে নবাব বাহাদুর বললেন — হাজী আহম্মদ সাহেবের ? হাজী আহম্মদ ? কি বলছেন আপনি ? এতখানি তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব ?

হাজী আহম্মদের প্রতি তবুও নবাবের এই বিশ্বাস দেখে গাউস খান ক্রুদ্ধ হলেন। নিজেকে তিনি সামলে নিয়ে বললেন — আমিও তো ভেবে তাজ্জব হচ্ছি, জনাব আজও এদের চেনেন না আর এসবের কোন খবরই রাখেন না, এটা কি করে সম্ভব ?

নবাব বাহাদুর ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন — খান সাহেব !

ঃ গোস্তাকী মাফ হয় জনাব। জনাবের বিরুদ্ধে যে জোরদারভাবে ছুরি শানানো হচ্ছে, জনাবকে মসনদচ্যুত করার জন্যেই যে জনাবের শক্তি ক্ষয় করে আলীবর্দী খান সাহেবের বাহিনীকে শক্তিশালী করা হচ্ছে, এই এতবড় খবরটা কিছুই জনাব রাখেন না ?

নবাব সরফরাজ খান অস্থির কণ্ঠে বললেন — দোহাই আপনাদের ! আপনারা বলুন, যা আপনারা বলছেন, তা বিলকুল সত্য ? কোন উড়ো খবর নয় ?

দিলওয়ার আলী অভিমানী কণ্ঠে বললেন — কসুর মাফ হয় মেহেরবান। উড়ো খবর নিয়ে এসে জাঁহাপনাকে আমরা বিভ্রান্ত করে তুলবো, এমন ধারণা জাঁহাপনার দীলে তিল পরিমাণ থাকলে, সেটা আমাদের নিতান্তই বদনসীব।

নবাব বাহাদুর অসহায় কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন — দিলওয়ার আলী !

নবাব অতপর নীরব হয়ে গেলেন। বিজয় সিংহ দিলওয়ার আলীকে বললেন — বিভ্রান্ত আমি নিজেই হচ্ছি ভাই সাহেব ! জাঁহাপনাকে উৎখাত করার জন্যে যারা সেই শুরু থেকেই ষড়যন্ত্র করে আসছে, সেই লোকেরাই যে কি করে জাঁহাপনার এত বিশ্বস্ত লোক হলেন আর তাদের কথা কি করে তিনি এমন নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন, আমি এর খেই খুঁজে পাচ্ছিনে।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী বললেন—আমার সন্দেহ হচ্ছে সিংহ বাবু, আরো যে কত চাতুরী তাঁরা ইতিমধ্যেই জনাবের সাথে করেছেন, কে জানে? আমাদের সবাইকে জানে-প্রাণে খতম হয়েই যেতে হবে দেখছি।

কথাগুলো জনান্তিকে হলেও, সব কথাই নবাবের কানে পড়লো। নবাব বাহাদুর সক্রোধে স্বগতোক্তি করলেন—হাজী আহম্মদ এতবড় এক শয়তান! যাকে আমি পিতার মতো শ্রদ্ধা করি, সেই হাজী আহম্মদ—উঃ!

নবাব বাহাদুর দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরলেন। সেনা নায়ক গাউস খান বললেন—ঐ হাজী আহম্মদই তামাম ষড়যন্ত্রের নায়ক জাঁহাপনা। তিনি কারোই শুভাকাঙ্ক্ষী নন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এই বাংলার মসনদ। এটা এখন অনেকের কাছেই পরিষ্কার।

হাজী আহম্মদের বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে আরো কিছু ছোটখাটো অভিযোগ ইতিমধ্যেই নবাব বাহাদুরের কানে এসে পড়েছে। কিন্তু পাত্তা না দিয়ে তিনি সেসব উপেক্ষা করে গেছেন। এবার তিনি উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—কি করবো আমি, বলতে পারেন খান সাহেব? বলতে পারেন, এখন ঠিক কি আমার করা উচিত?

গাউস খান সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—সাবধান হয়ে যান জনাব। সময় আর আছে কিনা জানিনে, তবু মেহেরবানী করে হুঁশিয়ার হয়ে যান। এতটা বেখেয়াল হয়ে থাকবেন না।

খেয়ালে এলেন বাংলার নবাব সরফরাজ খান বাহাদুর। মুঘল বাদশাহ মুহম্মদ শাহ দিল্লীর তখ্‌তে ফিরে আসার পরই সরফরাজ খান ফের উপঢৌকনাদি সহ তাঁর দরবারে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ছিলেন সনদ প্রাপ্তির জন্যে। এতদিন বেখেয়ালে ছিলেন তিনি। মসনদের প্রতিদ্বন্দ্বি পয়দা হওয়ার খবর শুনেই সবার আগে এই প্রশ্নই তাঁর দীলে উদয় হলো। তিনি ঘরপোড়া গরু। একবার এই সনদ অভাবেই মসনদ তিনি দখল করতে পারেননি। আবারও অদ্যাবধি সেই সনদের অভাব। একথা খেয়াল হতেই তিনি গাউস খানদের বিদায় করে দিয়ে মুন্সি সাহেবকে তলব দিলেন। দিল্লীর কোন খবর আছে কি না তা তিনি জানতে চাইলেন। তলব পেয়ে মুন্সি সাহেব একখানা খত হাতে এসে ভয়ে ভয়ে নবাবের সামনে দাঁড়ালেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বললেন—গতকাল শাম ওয়াক্তে এই দুঃসংবাদটা এসে পৌঁছেছে হুজুর! হুজুরকে নিরিবিলিতে পেলাম না আর সাহসও পেলাম না, তাই খতখানা হুজুরকে দেয়া হয়নি।

বলেই তিনি কম্পিত হস্তে খতখানা নবাবের সামনে রাখলেন। ক্ষিপ্রহস্তে তুলে নিয়ে নবাব সরফরাজ খান এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পাঠ করলেন। পাঠ করেই তিনি দিউয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর দুই চোখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি উন্মত্তের মতো হুংকার দিয়ে উঠলেন—হাজী আহম্মদ!

দিল্লী থেকে নবাবের প্রতিনিধি এই খত লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, সনদপ্রাপ্তির তামাম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বাদশাহকে ইতিমধ্যেই বাংলার দরবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনৈক ব্যক্তি পত্র দিয়ে জানিয়েছেন যে, বাংলার নবাব সরফরাজ



www.amarboi.org

খান একজন বিশ্বাসঘাতক। তিনি মুঘল বাদশাহকে অস্বীকার করে নাদির শাহর প্রতি আনুগত্য এনেছেন এবং নাদির শাহকে কর প্রদান করা সহ তাঁর নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রাজারী করেছেন। নবাব সরফরাজ খান দিল্লীর শাহনশাহের প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধাশীলও নন, বিশ্বস্তও নন। এই সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই বাদশাহ মুহম্মদ শাহ বাংলার নবাব সরফরাজ খানের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। এই ফাঁকে বিহারের সহকারী সুবাদার আলীবর্দী খান মোটা নজরানা ও তদবিরের মাধ্যমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা—এই তিন প্রদেশের সুবাদারীর শাহী সনদ হাত করে নিয়েছেন। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঐ সনদ বাতিল করে নবাব সরফরাজ খানকে সনদ প্রদান করার জন্যে দিল্লীর বাদশাহকে কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছে না। চেষ্টা অব্যাহত আছে। মসনদ হাত ছাড়া না হলে, ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনাও আছে।

নবাব সরফরাজ খানের দুই চোখে আগুন ছুটতে লাগলো। হাজী আহম্মদের উদ্দেশ্যে হুংকার দিয়ে উঠে ক্রোধে তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে সামাল করে নিলেন এবং এরপর জরুরী ভিত্তিতে দরবার ডেকে তিনি দরবারে গিয়ে বসলেন। দরবারের শুরুতেই নবাব সরফরাজ খান আলম চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বললেন—রায় রায়ান বাহাদুর ! আপনিই বলেছিলেন, আপনারা থাকতে আমার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না। এখন কুড়োলের ঘা কি করে আপনারা মারছেন ?

আকস্মিকভাবে এই দরবার ডাকা দেখেই হাজী আহম্মদ, আলম চাঁদ ও ফতে চাঁদ —এই তিনজনেই শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। নবাবের একথায় তাঁরা নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, গোপন তথ্য কিছু না কিছু ফাঁশ হয়ে গেছে। এখন তাঁদের ঘাবড়ে গেলে চলবে না। বিনয় ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এ তুফান তাঁদের তরিয়ে উঠতে হবে। নবাবের এই প্রশ্নের জবাবে রায় রায়ান আলম চাঁদ তাজিমের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন—কথাটা তো পরিষ্কার হলো না জাঁহাপনা ? কুড়োলের ঘা মারলাম আমরা মানে ?

নবাব বাহাদুর বললেন—আপনারাই সবাই মিলে নাদির শাহর প্রতি আনুগত্য আনায়নের জন্যে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। বলেছিলেন, দিল্লীর মসনদে মুঘল বাদশাহ ফিরে এলে তিনি এ খবর জানবেন না বা জানতে দেয়া হবে না। তিনি মসনদে উঠে বসতে না বসতেই তাঁকে পত্র লিখে এ খবর কে জানালে ?

ঃ সে খবর তো আমি কিছুই জানিনে জাঁহাপনা। এমন কথাতো কখনও কানে পড়েনি আমার ?

ঃ কানে পড়েনি, এখনতো পড়ছে ? বলুন, এই পত্র কে লিখলেন ?

ঃ তা কি করে জানবো জনাব ? কোন্ আলতুফালতু লোক কখন কি লিখেছে—

ঃ আল্‌তু ফাল্‌তু নন। এই দরবারের তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি। এই ইংগিতটুকুই পাওয়া গেছে, নামটা বাদশাহর দপ্তর থেকে এখনও উদ্ধার করা যায়নি। সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি কে ? আপনারাই এই তিন ব্যক্তির কোন এক ব্যক্তি কি নন ?

বিপদ দেখে হাজী আহম্মদ সাহেব তড়িঘড়ি দাঁড়িয়ে গিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন



www.amarboi.org

—তা হবে কেন আলমপনাহ্ ? এই দরবারের তামাম সভাসদই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্ত আর দায়িত্ব সম্পন্ন লোক, ফালতু কেউ নন ?

ঃ কিন্তু আপনাদের মতো এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ নন।

ঃ জাঁহাপনা !

ঃ দরবারের এই মাননীয় সভাসদদেরই জিজ্ঞাসা করুন, তামাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ এই দরবারের অন্য কোন সভাসদ দেন, না আপনারাই দেন ? সকলে সমান গুরুত্বপূর্ণ হলে, এই হুকুমাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও দায়িত্ব কেবল আপনাদের উপরই আছে কেন, অন্যের উপরও থাকতো ? আমার মরহুম আব্বাজান সেরেফ আপনাদের এই তিনজনকে দিয়েই তাঁর প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করে ছিলেন কেন, এই মাননীয় সভাসদদের অন্য যে কাউকে দিয়েও গঠন করতে পারতেন ?

ঃ এতে করে জাঁহাপনা কি বলতে চান ?

নবাব বাহাদুর শক্ত কণ্ঠে বললেন—আপনাদের এই তিনজনেরই কেউ না কেউ ঐ খত লিখেছেন।

ঃ জাঁহাপনার এ এক অমূলক সন্দেহ।

ঃ অমূলক ? আপনার ভাই আলীবর্দী খান সাহেব যে চাতুরী করে সুবে বাংলার সনদ তাঁর নিজের নামে বানিয়ে নিয়েছেন, এটাও আমার অমূলক সন্দেহ ?

হাজী আহম্মদ অলক্ষ্যে আঁতকে উঠলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—জাঁহাপনা !

ঃ বলুন, তা নেননি তিনি ? তা আপনি জানেন না ?

ঃ তা কি করে জানবো জনাব ? আমার ভাই থাকে বিহারে। তার সাথে দীর্ঘদিন আমার কোন যোগাযোগ নেই। সেকি করছে বা করেছে, তা আমি কি করে জানবো জাঁহাপনা ?

নবাব বাহাদুর গর্জে উঠে বললেন—খামুশ ! মিথ্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না ! মাথার উপর আসমানটা ভেংগে পড়তে পারে !

ঃ আলমপনাহ্ !

ঃ কোন যোগাযোগ নেই তো, এই আচানক যোগাযোগটা কেমন করে হলো ? ব্যয় সংকোচনের বুদ্ধি দিয়ে যে সৈন্য ছাঁটাই করালেন, সেই সন্যেরা কেমন করে সরাসরি আলীবর্দী খানের বাহিনীতে গিয়ে ঢুকলো ? আলীবর্দী খান সাহেব কি ঐ সেনা-সৈন্যদের ভাই, না আপনার ভাই ?

ঃ জ্বি, মানে—

ঃ বলুন, এ পথ তাদের কে দেখালে ? এ ব্যবস্থা কে করে দিলে ? ব্যয় সংকোচন করার এই অভিনব উদ্যোগটি কার ? উদ্দেশ্য কি আপনার ?

ঃ তা-মানে—

ঃ পিতৃতুল্য লোক আপনি। আপনাকে আমি পিতার মতো শ্রদ্ধা করি আর আপনার পেটে পেটে এতটা শয়তানী ?

জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ লাফ দিয়ে উঠে বললেন—এ অন্যায় জাঁহাপনা ! একজন মানী লোককে এভাবে প্রকাশ্যে অপমান করাটা—



www.amarboi.org

ধমকে উঠলেন নবাব। বললেন— থামুন ! সেরেফ অপমানটাই দেখছেন ? শুভাকাঙক্ষী সেজে মসনদ দখল করার ষড়যন্ত্রটা দেখছেন না ? সেই ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হতে পারে, সে কথা ভাবছেন না ?

ঃ মেহেরবান !

ঃ এই জঘন্য বেঈমানীর একমাত্র শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড, সে কথা কি ভুলে গেলেন ?

জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ চমকে উঠে বললেন— জাঁহাপনা !

ঃ এ অপরাধেও কারো প্রাণদণ্ড না হলে আর কোন্ অপরাধে হবে ?

জগৎ শেঠ লা-জবাব হয়ে গেলেন। হাজী আহম্মদ থর থর করে কেঁপে উঠলেন। গোটা দরবারটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং বদ-হুকুম হয়ে যাওয়া আর মোটেই বিচিত্র নয় দেখে, দুই হাত জোড় করে রায় রায়ান আলম চাঁদ বললেন— দোহাই ধর্মাবতার। ধৈর্য হারা হবেন না। হাজী আহম্মদ সাহেব একজন অত্যন্ত প্রবীণ ব্যক্তি। অত্যধিক বয়সের কারণে মাথা তাঁর ঠিক নেই। ভুল-ভ্রান্তি যা-ই তাঁর হয়ে থাকুক, হুজুরের মহানুভবতায় তো ঘাটতি হতে পারে না ? হুজুর মহানুভব, হুজুর সুবে বাংলার মুকুট মণি ! এ মুলুকের সকলের আশা ভরসার হুজুর শেষ আশ্রয় আর সকলের রক্ষেকর্তা। এই বৃদ্ধের প্রতি হুজুরের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিই সকলের কাম্য মেহেরবান।

ঃ ক্ষমা ?

গোপন ইঙ্গিত পেয়ে হাজী আহম্মদ সঙ্গে সঙ্গে দুইহাত জোড় করে বললেন— আমাকে মাফ করে দিন হুজুর। আলীবর্দী খান যখন আমার ভাই, তার কার্যকলাপের দায় আমি অস্বীকার করবো না। বিভ্রান্ত অবস্থায় যা কিছু ভুল আমার হয়েছে, সে জন্যে আমি অনুতপ্ত। মেহেরবানী করে একবার আমাকে সংশোধনের সুযোগ দিন ?

ঃ সংশোধন !

ঃ জি মেহেরবান ! এই শেষ বয়সে আর আমি এসব ঝুট্ঝামেলায় থাকতে চাইনে। আর কোন ঝুট্ঝামেলায় যাবো না বা এ রকম ভুল আর আমি করবো না। মেহেরবানী করে আমাকে মাফ করে দিন হুজুর !

জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ কাঁপতে কাঁপতে বললেন— হাজার হোক জনাবের পিতৃ তুল্য ব্যক্তি, পিতার বন্ধু। সে দিকটা বিবেচনা করে অনুকম্পা প্রদর্শন হুজুরের মহত্ত্বের পরিচয়ই হবে মহানুভব !

নবাব সরফরাজ খানের নরম দীলে তাপ লাগলো। সকলেরই ধারণা ছিল, এতবড় ষড়যন্ত্রের দায়ে আর নাহোক, হাজী আহম্মদকে নবাব বাহাদুর কারারুদ্ধ করবেন। নবাব সরফরাজ খান সে দিকেও গেলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নবাব বাহাদুর অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠে বললেন— ঠিক আছে। যান, এ হুকুমাতের তামাম দায়-দায়িত্ব থেকে আপনাকে অবসর দেয়া হলো। নিরিবিলিতে বসে এখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা করুন গিয়ে। ভুলেও আর রাজনীতির দিকে নাক গলাতে আসবেন না, যান—

"হুজুর মহানুভব !— হুজুর দরাজদীল !— বলতে বলতে হাজী আহম্মদ সাহেব



www.amarboi.org

দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আলম চাঁদ বাবু খোশদীলে বললেন—হুজুরের এই মহত্ত্ব চিরকালের জন্যে একটা নজীর হয়ে থাকবে। হুজুরের এই অনুপম দীলের জন্যেই হুজুরের প্রতি এতটা মুহব্বত সকলের। এ কারণেই হুজুরের খেদমতে না এসে আমরা স্থির থাকতে পারিনে।

নবাব বাহাদুর আবার খানিকটা শক্ত কণ্ঠে বললেন—খেদমতে আসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু খেদমতটা এই কিসিমের হলে, তার শাস্তিটা অতপর অনেক বেশী বেদনাদায়ক হবে।

বিগলিত কণ্ঠে রায় রায়ান বললেন—অবশ্যই অবশ্যই ! তা হতেই হবে। মসনদের দিকে হাত বাড়ানো, একি একটা কম গোস্তাকীর কথা ? না এটা চিন্তা করা যায় কখনো ? হুজুর তাঁকে মার্জনা করেছেন, এটা হুজুরের মহত্ত্ব। কিন্তু যার বুকে বসে খাবো, তারই চোখের ভুরু উপড়াবো—এর কি মার্জনা আছে কিছু ?

ঃ সেটা আপনারা বোঝেন ?

শেঠবাবু বললেন—অবশ্যই বুঝি। বুঝবো না কেন হুজুর ? হাজী আহম্মদ সাহেব যে তলে তলে এত কুমতলব পাকিয়েছেন, তা কি আমরা জানি কেউ ? এর বিন্দু বিসর্গও যদি জানতাম, তাহলে তাঁর সাথে কোন সম্পর্কই আমরা রাখতাম না।

রায় রায়ান বললেন—এরপর আর কোন সম্পর্কই তাঁর সাথে নেই। বাপরে বাপ্! একেবারে মসনদ দখলের ষড়যন্ত্র ! তাইতো লোকে বলে, পানির মধ্যে কি আছে আর মানুষের মনের মধ্যে কি আছে, তার সন্ধান করে, সাধ্য কার ?

নবাব বাহাদুর ভ্রূকুটি করে বললেন—সেই সন্ধানই তো এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। বাদশাহর কাছে ঐ খত কে পাঠালেন আপনারা তা জানেন কিনা, সেই তথ্যই তো উদ্ধার করা যাচ্ছে না !

মনে মনে চমকে উঠে রায় রায়ান আলম চাঁদ বললেন—জানিনে হুজুর, একবিন্দুও জানিনে। এমন একটা নিকৃষ্ট কাজ যে কে করলে—মানে, এটাও কি তাহলে ঐ হাজী আহম্মদ সাহেবের ইংগিতেই হলো না কি—

জগৎ শেঠ মোখ্‌তাছার বললেন—হতে পারে। তা যার ইংগিতেই হোক, সে তথ্য আর না বের করে ছাড়ছিনে। এই হুকুমাতের বিরুদ্ধে কি আর কোন ষড়যন্ত্র গড়ে উঠতে দেবো এরপর ? সরল বিশ্বাসে যা হবার তা হয়ে গেছে। নজর আমাদের সবদিকেই প্রখর থাকবে এখন।

নবাব বাহাদুর বললেন—তাই থাকুন। কিন্তু হুঁশিয়ার ! পেটের ভেতরে থেকে কেউ যেন পেট কাটার দুঃসাহস আর করবেন না !

ঃ কখখনো নয় হুজুর, কস্মিনকালেও নয়। এহেন মহাপাপ কোন মানুষ কি করতে পারে কখনোও ?

আলম চাঁদ যোগ দিয়ে বললেন—রৌরব নরক বড় ভয়ংকর নরক হুজুর। সে ভয় কি প্রাণে আমাদের নেই ?

জগৎ শেঠ বললেন—অবশ্যই। নেমক খেয়ে নেমক হারামী, এ কক্‌খনো হতে পারে না।



www.amarboi.org

অভিনয় যা করার দরকার, তাৎক্ষণিকভাবে তা করে এলেন রায় রায়ান আলম চাঁদ আর জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ। দরবার থেকে বেরিয়ে এসে ঐ তিনজনই আবার একত্র হলেন। গোপন বৈঠকে সাব্যস্ত হলো, সকলেই সন্দেহের পাত্র হয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে এলে, লক্ষ্যে পৌঁছা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। ভেতরে এবং বাইরে থেকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। হাজী আহম্মদের বিপক্ষে কিছু কথাবার্তা বলে নবাবের বিশ্বস্ত হয়ে আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ ভেতরে থেকে কাজ করবেন অতপর। হাজী আহম্মদ বাইরে থেকে মদদ যোগাবেন আলীবর্দী খানের পেছনে। হাজী আহম্মদ সাহেবের সাথে প্রকাশ্যে যোগাযোগ আর এই দুইজনের থাকবে না। যোগাযোগ এখন থেকে সংগোপনে চলবে।

ধূর্ত লোকের পরিকল্পনা অব্যর্থ হলো। সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব থাকায় সরলচিত্ত নবাব বাঘটাকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখলেও, চিনতে না পেরে, ঘোগ্ দু'টোকে বুকের কাছেই রাখলেন এবং তাদের স্তোকবাক্যে গলে গিয়ে আবার তাদেরই পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হলেন। আত্মীয় বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের যথেষ্ট হিতোপদেশ সত্ত্বেও তিনি আলম চাঁদ ও ফতে চাঁদের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। তাঁর দুর্বল মানসিকতার কারণে ঘুরে ফিরে এসে তিনি এঁদের খপপরেই পড়তে লাগলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে যতবারই তিনি সঠিক পদক্ষেপের উদ্যোগ নিলেন, এঁদের প্রভাবে পড়ে, ততবারই তিনি মাঝপথে সে উদ্যোগ পরিহার করতে লাগলেন। খোঁচা দিয়ে পুনঃপুনঃ সাপটাকে সজাগ ও ক্ষিপ্ত করেই তুলতে লাগলেন শুধু, সাপটা পুরোপুরি মারতে কখনো গেলেন না।

হাজী আহম্মদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ পাওয়ার পরেই নবাব মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা নবাবকে বোঝালেন, শুধু আলীবর্দী খানই নন, হাজী আহম্মদ সাহেবের পুত্রেরা, জামাতারা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে বিপুল শক্তি নিয়ে এক একজন বসে আছেন, দুঃসময়ে দেশের এই শক্তি নবাবেরই বিরুদ্ধে যাবে। সময় থাকতে এঁদের সবাইকে বরখাস্ত করা হোক এবং সেখানে নবাবের বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করা হোক।

নবাবও এই চিন্তাই করছিলেন। সুতরাং এই নসিহতের গুরুত্ব তিনি ঠিকই অনুভব করলেন এবং সেই মোতাবেক বিহারের সহকারী সুবাদার আলীবর্দী খানসহ হাজী আহম্মদ পরিবারের তামাম ব্যক্তিদের তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করে নতুন লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ নিলেন।

যথাসময়ে এই খবর যথাস্থানে পৌঁছলো। এ খবরে ও পক্ষের সকলেই তটস্থ হয়ে উঠলেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন কেন্দ্রীয় এই ব্যক্তিত্রয়। হঠাৎ সবার পদচ্যুতি ঘটলে, তাঁদের যাবতীয় পরিকল্পনা সাকুল্যেই ভেস্তে যাবে। কারণ, প্রস্তুতি এখনোও পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে উঠেনি। অর্ধপ্রস্তুত অবস্থায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, নবাবের শক্তিকে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। সকলেই মারা পড়বে। এ জন্যে আরো কিছু সময় চাই। হাজী আহম্মদ আলম চাঁদদের বললেন — যেভাবেই হোক, এই রদবদলটা আর কিছুদিন ধরে রাখুন, এই অবসরে সবাইকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে নিই।



www.amarboi.org

শুরু হলো মন্ত্রণা। এই ব্যাপক পরিবর্তনের খবর যখন চারদিকে প্রচার হয়ে গেল এবং দায়িত্ব নেয়ার জন্যে নবাবের বিশ্বস্ত লোকেরা যখন তৈয়ার হয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়ই রায় রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে নবাবকে সমঝাতে শুরু করলেন—হুজুর করেন কি-করেন কি ? এখন ফসল উঠার পুরো মওসুম, রাজস্ব আদায়ের গরম সময়। এক্ষণে হঠাৎ এই ব্যাপক পরিবর্তন আনলে, এ নিয়ে হৈচৈ শুরু হবে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অস্থিরতা আসবে, রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়ে যাবে। শতাংশের একাংশও রাজস্ব আদায় হবে না। হুজুরের এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, প্রশংসনীয় উদ্যোগ। একাজটি অবশ্যই করতে হবে। তামাম ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করতে হলে এর বিকল্প নেই। কিন্তু হুজুর ঠিক এখন নয়। মাওর মওসুমের এই ক'টা দিন অপেক্ষা করা হোক।

এ প্রেক্ষিতে নবাব বাহাদুর বললেন—কিন্তু হাজী আহম্মদ সাহেব যদি এই ফাঁকে কোন নয়া উদ্যোগ নিয়ে বসে ? কোন নতুন গুঁটি চালে ?

আলম চাঁদ বললেন—সম্ভব নয় হুজুর। পানিতে বাস করে কুমীরের সাথে লড়াই করার সাহস তিনি পাবেন না। তিনি তো এই রাজধানীতে আছেন আর কড়া পাহারার মধ্যে আছেন। পালাবার জো নেই। তবু সন্দেহ হলে তাঁর পাহারা আরো জোরদার করা হোক হুজুর। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি এ ঝুঁকি অবশ্যই নিতে যাবেন না।

ঃ কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস কি ? যদি তাই করেনই ?

ঃ তাহলে তাঁকে ডাকা হোক হুজুর। তার মুখ থেকে জেনে নিয়ে হুজুর নিশ্চিন্ত হোন। তাঁর জিম্মাদারী তো আমরা করতে পারিনে ? এই প্রশাসনের কল্যাণটা চাই বলেই আমরা আমাদের সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। রাজস্ব আদায় বিঘ্নিত হলে প্রশাসনটা চলবে কি করে এই আমাদের ভাবনা।

নবাব সরফরাজ খান পটে গেলেন। হাজী আহম্মদ সাহেবকে তলব দিয়ে আনা হলে হাজী আহম্মদ শপথ করে জানালেন, তিনি এসবের মধ্যে আর নেই। এসব নিয়ে আর তিনি কখনো মাথা ঘামাতে যাবেন না। এছাড়া, বাইরে থেকে যা-ই শোনা যাক, আলীবর্দী খান নবাবের প্রতি চিরদিনই বিশ্বস্ত। তাঁর বিশ্বস্ততার জন্যেই আম্মা বেগম আলীবর্দীকে বিহারের দায়িত্ব দিয়েছেন। কার কোন্ উল্টাপাল্টা কথা শুনে ঝোঁকের মাথায় ভুল-ভ্রান্তি যা করে ফেলেছে, সময় দেয়া হলে সে নিজেও সে জন্যে এসে জনাবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবে—এই আমার বিশ্বাস। কারণ, সুখ ছেড়ে দুঃখের মধ্যে কোন মানুষই যেতে চায় না। পদচ্যুত হলে তাকে কোথায় গিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে, তা কি সে মূর্খ বোঝে না ?

ব্যস্ ! মোমের মতো গলে গেলেন নবাব ! রাজস্ব আদায় না হলে, নবাবী তিনি করবেন কিসের বলে ? তামাম উদ্যোগ বন্ধ করে দিয়ে তিনি রদবদলের পরিকল্পনা স্থগিত ঘোষণা করলেন। আর এখানেই তাঁর রাজনীতির চরমতম ভুলটা করে বসলেন তিনি।

এই অবকাশ তাঁর শত্রুপক্ষ পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে লাগলেন। হাজী আহম্মদ আলীবর্দীকে জানালেন, আর সময় নেই যা করার তা এখনই করতে হবে। এই সময়টুকুর মধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিয়ে বাংলা মুলুক আক্রমণ করতে হবে।



www.amarboi.org

হাজী আহম্মদ এই মর্মে তাঁর পুত্র, জামাই ও দায়িত্বে নিয়োজিত আত্মীয়-স্বজনদের কাছেও হুঁশিয়ারী পাঠিয়ে দিলেন। বাংলা ও বিহারের মধ্যে রাজমহল সংযোগ পথ। রাজমহলেরর ফৌজদার জামাতা আতাউল্লাহ খানকে তিনি নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন বিহারের সাথে বাংলা তামাম যোগাযোগ সাময়িকভাবে ছিন্ন করে দিতে, যাতে করে আলীবর্দী খানের যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন খবর বাংলায় এসে না পৌছে।

প্রস্তুতি পোক্ত হয়ে গেল। এই সময়টা জুত্সইভাবে কাজে লাগিয়ে আলীবর্দী খান যুদ্ধের জন্যে সর্বোতভাবে তৈয়ার হয়ে গেলেন। ঈসায়ী সতের শো চল্লিশ সনের প্রথম দিকের ঘটনা। জামাতা জয়েনউদ্দীন আহম্মদকে বিহারের দায়িত্বে রেখে, হাজী আহম্মদ, রায় রায়ান ও জগৎ শেঠদের জানান দিয়ে এবং আফগান সেনাপতি মোস্তফা খান ও অন্যান্য পাঠান সেনানায়কদের নেতৃত্বে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলীবর্দী খান বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। বিহারের অনেক কয়জন হিন্দু জমিদার আলীবর্দী খানের সঙ্গী হলেন এবং বাংলার হিন্দু রাজা জমিদারগণ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আলীবর্দী খান এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন, ওদিকে হাজী আহম্মদ গং টোপ্-লোভের মাধ্যমে বাংলার সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে লাগলেন।

এই সংবাদ বাংলায় এসে পৌছামাত্র বাংলা মুলুকে হুলস্থূল পড়ে গেল। নবাব সরফরাজ খান ক্রুদ্ধ হয়ে হাজী আহম্মদকে বন্দি করলেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে সেনাঘাঁটিতে জরুরী এত্তেলা পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দূরদৃষ্টির একান্তই যার অভাব, তার আর ভবিষ্যৎ কি? রায় রায়ান আর জগৎ শেঠকে তলব দেয়া হলে, তাঁরা এসে জানালেন—"আমরা তো এই প্রশাসনের স্বার্থে সৎ যুক্তিই দিয়েছিলাম হুজুর। হাজী আহম্মদ বেঈমানী করলে আমরা কি করবো?" এতেই নবাবের ক্রোধ পড়ে গেল। ভুল পরামর্শ দেয়ার জন্যে তিনি কেবল তাঁদের কিছুটা ভৎসনাই করলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিলেন না। তাঁরা পূর্ববৎ নবাবের কোলের মধ্যেই রয়ে গেলেন।

যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার জরুরী নির্দেশ এসে সেনাঘাঁটিতে পৌছলে, শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। নবাবের একটানা নির্বুদ্ধিতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও একগুঁয়েমীর কারণে নবাবের শুভাকাঙ্ক্ষী সেনানায়কদের অনেকেই বিষিয়ে গিয়েছিলেন। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করার পরও নির্বোধ নবাবের বোধোদয় না হওয়ার এবং নির্বুদ্ধিতাকে জিদ্ ধরে আঁকড়ে ধরে থাকায়, তাঁরা হা'ল ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বসেছিলেন। এক্ষণে আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার নির্দেশ পেয়ে প্রবীণ সেনানায়ক গাউস খান নবাবের শুভাকাঙ্ক্ষী সেনানায়কদের ডেকে উৎসাহ দিতে গেলে, তাঁরা অনেকেই অভিমান ভরে বেঁকে বসলেন। সেনানায়ক শমশির খান সরাসরি বললেন—কেন? একজন অদূরদর্শী উন্মাদের পক্ষে আমরা লড়তে যাবো কেন?

সেনাপতি গাউস খান নিজেও একই সমান ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু নবাবের উপর অভিমান করে কলহ করার সময় এটা নয়, এটা মুসিবত ঠেকানোর সময়। তিনি ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—একি বলছেন আপনি?



www.amarboi.org

জবাবে মর্দান আলী খান বললেন—ঠিকই বলছেন উনি। আমরা কেন এ লড়াইয়ে শরিক হতে যাবো?

গাউস্ খান সবিস্ময়ে বললেন—তাজ্জব! এসব আপনারা কি বলছেন?

মীর শরাফউদ্দীন বললেন—সেরেফ কৃতজ্ঞতার বশেই, অর্থাৎ আমাদের পূর্বমানসিকতা অনুযায়ী, নবাব মুর্শিদকুলী খানের নাতীর পক্ষ নেয়া আমাদের উচিত, তা বুঝি। কিন্তু একমাত্র ঐ খেয়ালের কারণেই একজন পাগল আর অপরিণামদর্শীকে আমরা সমর্থন দিতে যাবো কেন? এ মুলুক হেফাজত করার কি যোগ্যতা আছে তাঁর?

ঃ মীর সাহেব!

ঃ এরপরও রায় রায়ানদের ঘোর যাঁর কাটেনি, তাঁকে সমর্থন দিলেই কি তাঁকে রক্ষে করতে পারবো আমরা?

মীর কামাল বললেন—রক্ষে করার মালিক আল্লাহ তায়ালা। ও নিয়ে আমরা ভাবতে যাবো কেন? আমরা আমাদের কর্তব্য করবো। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবো।

মীর মোর্তুজা বললেন—কৃতজ্ঞতার ঋণ কি আমাদের ঐ এক ব্যক্তির কাছেই? এই দেশটার কাছে কি কোন ঋণ আমাদের নেই? এই দেশ আর হুকুমটা হেফাজত করার সঠিক বুদ্ধি যার নেই আর সঠিক পথ যে এখনো চিনলো না, তার পেছনে মদদ দিয়ে কি হবে?

শমশির খান বললেন—অথচ দেখুন, আলীবর্দী খান এই নবাবের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্য লোক। এ মুলুক হেফাজত করার যথেষ্ট হিম্মত তাঁর আছে।

গাউস্ খান ঘাবড়ে গেলেন। সেনানায়কদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে, তার বাতাস এসে এখানেও লাগলো নাকি ভেবে তিনি ভড়কে গেলেন। তিনি শংকিত কণ্ঠে বললেন—এ আপনারা কি বলছেন! এই কি আপনাদের দীলের কথা?

শমশির খান অসহায় কণ্ঠে বললেন—আমাদের দীলের কথা যে কি, তা আপনিও জানেন। সে কথা থাক। আসলে তো এ কথাগুলো অগ্রাহ্য করতে পারেন না আপনি?

বিজয় সিংহ বললেন—কিন্তু আলীবর্দী খানের এ পদক্ষেপ তো বৈধ নয়। তিনি ষড়যন্ত্র করে মসনদ দখল করছেন।

মীর মোর্তুজা বললেন—ষড়যন্ত্র আলীবর্দী খান করেননি, ষড়যন্ত্র করেছেন তাঁর ভাই হাজী আহম্মদ সাহেব। উনি এই ষড়যন্ত্রের শিকার মাত্র। নিরুপায় হয়েই তিনি এতে জড়িয়ে গেছেন।

বিজয় সিংহ বললেন—কি রকম?

ঃ আলীবর্দী খান দানাদার লোক। অনেক উঁচু দীলের মানুষ। ভাই ও পরিজনদের চরম বিপদ বোধেই তিনি বাধ্য হয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

ঃ বটে!

ঃ এছাড়া মসনদের লোভ কার না আছে বলুন? এই লোভে সুজাউদ্দীন খান পুত্রের স্বার্থ দেখেননি, আলীবর্দী খানকে আমরা দোষ দিতে যাবো কেন?

ঃ কিন্তু—এইটেই কি নিয়ম?



www.amarboi.org

ঃ নিয়ম যা-ই হোক, নবাব হওয়ার বদ মতলব তো দীলে তাঁর ছিল না ? মসনদটা আপ্‌ছে আপ্‌ তাঁর কাছে এগিয়ে এলে তিনি ছাড়বেন কেন ?

দিলওয়ার আলী এতক্ষণ নীরবে সবার কথা শুনছিলেন। তিনি এবার বললেন — শেষ হয়েছে আপনাদের কথা ?

মর্দান আলী খান বললেন — বলার কথা তো আরো অনেক আছে। তবু যা বলা হয়েছে, তা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?

দিলওয়ার আলী বললেন — না, বিলকুল অস্বীকার আমি করবো না। আলীবর্দী খান সাহেব ভাল লোক, যোগ্য লোক, ষড়যন্ত্রেরও শিকার তিনি অনেকখানি। কিন্তু আমাদের বিবেচ্য বিষয় কি এইটুকুই ? আর কিছু দেখার নেই ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ মূর্খ হোন, অজ্ঞ হোন, নবাব সরফরাজ খানও মানুষ হিসেবে একজন খুবই ভাল মানুষ আর এ কারণেই আমরা তাকে ভালবাসি, আমরা সকলেই তাঁর কল্যাণ-কামী, এটা তো ঠিক ?

মীর শরাফউদ্দীন কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন — আমাদের মুসিবতটা তো হয়েছে এখানেই নওজোয়ান। নবাব সরফরাজ খানকে আমরা ফেলতেও পারছিনে, গিলতেও পারছিনে ! একটু যদি শক্ত দীলের মানুষ হতেন তিনি ! যাঁর জন্যে আমরা জান দিতে তৈয়ার, তিনি যদি নিজের কবর নিজেই খুড়েন, তাহলে আমরা আর কি করতে পারি?

ঃ কিছু করতে না পারলেও, আমরা হা'ল ছাড়তে পারিনে। যাঁকে ভালবাসি, আন্তরিকভাবে যার ভালাই কামনা করি, তিনি যত বেয়াকুফীই করুন না কেন, তিনি তো আসলেই অসহায় ? আমরা আমাদের ভালবাসার সাথে বেঈমানী করতে পারিনে ? আমরা আমাদের ঈমানের কাছে খাটো হতে পারিনে !

মর্দান আলী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন — ভাই সাহেব !

ঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও শিশুরা পুনঃপুনঃ আগুনে হাত দিতে যায়। তাই বলে কি রাগ করে শিশুকে আগুনের কাছে একা রেখে সরে আসা যায় ?

ঃ তা কি আর বুঝিনে ভাই সাহেব ? এই জন্যেই তো এত মর্মদাহ আমাদের !

ঃ মর্মদাহের কোনই কারণ নেই। যে দ্বন্দ্ব দীলে আপনাদের এক্ষণে জেগেছে, তা ক্ষণিকের একটা ভ্রান্তি। একটু গভীরভাবে খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, নিছকই একটা মরীচিকার পেছনে প্রলুব্ধ হচ্ছেন আপনারা।

ঃ মরীচিকা !

ঃ আলীবর্দী খান সাহেবের চরিত্র ও যোগ্যতা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখুন, আলীবর্দী খানের চরিত্র অনেক উন্নত মানের হলেও, তাঁর সেই চরিত্র এবং যোগ্যতা আমাদের কাছে মোটেই কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। এই মুসলমান হুকুমাতটা শক্তভাবে হেফাজত করার কোন মওকাই তাঁর নেই।

শমশির খান বললেন — আর একটু খোলাসা করে বলুন।

দিলওয়ার আলী বললেন — বিজয় হলে, এ বিজয় আলীবর্দী খানের হবে না, হবে এই হুকুমাতের কায়েমী দুশমনদের। মরহুম নবাব মুর্শিদকুলী খান আর



www.amarboi.org

সুজাউদ্দীন খানের মতো ঐ একই মরণ ফাঁশ গলায় জড়িয়ে নিয়ে এসে উনি এই মসনদে বসতে চান মুর্শিদকুলী খানের আশা বানচাল করে দিয়ে যারা সুজাউদ্দীনকে এনেছিলেন, সুজাউদ্দীনের আশা বানচাল করে দিয়ে তাঁরাই আবার আলীবর্দীকে আনছেন। সময়ে এ প্রয়োজনে আলীবর্দী খানের আশাও তাঁরা বানচাল করে দেবেন —এতো অতি সহজ অংক।

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ অন্য কথায়, পূর্ববর্তী নবাবদ্বয়ের মতো ঐ একই গেঁড়াকলে জড়িয়ে গেছেন উনিও আর ঐ কুচক্রীদের সাহায্যে এবং তাদেরই দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উনি নবাবী করতে আসছেন। তাঁর কাছে এই হুকুমাতের প্রকৃত ভালাই কি আশা করেন আপনারা।

ঃ দিলওয়ার আলী সাহেব।

ঃ উনি যদি স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে সৎ পথে আসতেন, তাঁকে সমর্থন করতে না পারলেও, বিরোধিতা করা আমাদের বিবেক বিরোধী অবশ্যই হতো। কিন্তু তাঁর পেছনে জোরদার সমর্থন আজ রায় বাবু শেঠ বাবুদের মাধ্যমে এ মুলুকের প্রায় তামাম রাজা জমিদারদের, যারা সকলেই অমুসলমান। তাঁর নিজস্ব শক্তি অনেকখানি থাকলেও, তাঁর পেছনে মূলশক্তি ঐ তারাই। যাদের হাতে এই মুসলমান হুকুমাতটা চিরকাল বিপন্ন, হাজী আহম্মদই বলুন, আর আলীবর্দী খানই বলুন, তাঁরা আসছেন ঐ তাদেরই হাতে পুতুল হয়ে। এবার পরিণামটা ভাবুন?

মীর মোর্তুজা শংকিত কণ্ঠে বললেন—পরিণাম।

দিলওয়ার আলী বললেন—নবাব মুর্শিদকুলী খান আর সুজাউদ্দীন খানের মতো ঐ বেড়াজালে আবৃত হয়ে থেকে উনিও হয়তো নিজে কোনমতে পার পেয়ে যাবেন, কিন্তু তার পরে আর কোন ভরসা দেখছিনে।

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ দেখতেই তো পাচ্ছেন, মুর্শিদকুলী খান আর সুজাউদ্দীন খান যাকেই তারা আনছে, তারা সেরেফ তার পেছনেই থাকছে, তার বংশধরের প্রতি আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। আলীবর্দী খানের হালতও যে এমনই হবে, এ আর বিচিত্র কি? যদি আলীবর্দী খানের বংশধর এদের হাতের ক্রীড়ানক হতে না চান, সরফরাজ খানের মতো তাঁর দিকেও এরা আর ফিরে তাকাবে না। এমনিভাবে আলীবর্দী খানের বংশধরকেও ফাঁশিয়ে দিয়ে তারা অন্যজনকে টানবে।

ঃ বলেন কি!

ঃ এভাবেই এরা এই মুসলমান শাসনের কবর রচনা করবে, চাই কি দেশের আজাদীরও।

গাউস খান সপুলকে বলে উঠলেন—মারহাবা-মারহাবা কি তাজ্জব অন্তর্দৃষ্টি আর কি পরিষ্কার তফসির!



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী বলেই চললেন—এদিকে আবার দেখুন বেহুঁশ হোন, অজ্ঞ হোন, দুর্বলচিত্ত-তরলমতি, যা-ই হোন, নবাব সরফরাজ খান এই কওম আর এই মুলুকের বড় দরদী সন্তান, জাতি আর দেশের সাথে এতটুকু বেঈমানী দীলে তাঁর নেই।

বিহ্বল মীর শরাফউদ্দীন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন নারায়ে তকবির—সকলেই বিপুল আবেগে সাড়া দিলেন—আল্লাহু আকবার—

—নবাব সরফরাজ খান বাহাদুর—

—জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ!
মার মার রবে সকলেই যুদ্ধের জন্যে তৈয়ার হতে গেলেন।

## ১৬

ইতিমধ্যেই হায়াত খান এক কাণ্ড করে বসলেন। আলীবর্দী খানের অভিযানের খবরে বাংলা মুলুকে হৈচৈ পড়ে গেলে এবং হাজী আহম্মদ কয়েদ হলে, সে মকানের অনেকেই গোপনে পলায়ন করলেন ও আলীবর্দী খানের সাথে সামিল হতে চলে গেলেন। হায়াত খানও পলায়ন করে তাঁর ভাই রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহ খানের সাথে সামিল হতে বেরুলেন। কিন্তু সরাসরি সেদিকে না গিয়ে জোশ ও খোশের আধিক্যে হায়াত খান ইমাম সাহেবের মকানের দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, অতীত অপমানের ঝালটা খানিক মেটানো এবং সম্ভব হলে ভয় দেখিয়ে মাহমুদা খাতুনকে বাগানো, যা তাঁর মতো আহম্মকেরাই কল্পনা করতে পারে।

হায়াত খান ইমাম সাহেবের মকানতক ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সাহসটা আর পেলেন না। কারণ, ওদিকে ধরা পড়ার ভয়তো আছেই, এদিকে আবার ইমাম বাড়ীর লোকদের হাতে ধোলাই হওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর। তিনি খোলা ফটকে দাঁড়িয়ে ডাকহাঁক জুড়ে দিলেন—এই যে, মকানে কে আছে? বেরিয়ে আসুন—

লড়াইয়ের খবরে এ মকানের সকলেই তখন দিশেহারা। সঠিক তথ্য জানার জন্যে তাঁরা ঘরে বাইরে ছুটোছুটি করছিলেন এই সময় কিতাবউদ্দীন ফটকের কাছে ছিল। অকস্মাৎ হায়াত খানকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল। সে কাছে এসে থতমত করে বললো—একি! আপনি?

হায়াত খান দম্ভভরে বললো—এবার? এবার কি হবে?

কিতাবউদ্দীন বললো—কি হবে মানে?



www.amarboi.org

ঃ এবার তোমাদের রক্ষে করবে কে ?

ঃ রক্ষে করবে ! একি বলছেন ?

ঃ কি বলছি, তা এখনও বুঝতে পারছো না ? আর মাত্র কয়েকটা দিন সবুর করো, এরপর মজাটা কেমন তা দেখিয়ে তবে ছাড়বো।

কিতাবউদ্দীনের রাগ হলো। সে শক্ত কণ্ঠে বললো — তা যখন দেখাবেন, তখন দেখাবেন। এখন পালান। নইলে মজাটা আমরাও না দেখিয়ে ছাড়বো না।

বলেই সে মকানের অন্যান্য চাকর-নফরদের ডাক দিতে গেল। ফটকে গরম গরম কথাবার্তা শুনে ইতিমধ্যেই আবিদ হোসেন সাহেব এসে সেখানে হাজির হলেন এবং হায়াত খানকে দেখেই তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন — তাজ্জব ! তুমি আবার এসেছো ?

হায়াত খান বললেন — আসবো না মানে ? এরপর আমার আসাটা আর ঠেকায় কে ?

ঃ কি রকম ?

ঃ দুইদিন পরেই তো এ মুলুকের নবাব হচ্ছি আমরা। আমরাই হচ্ছি এই মুলুকের মালিক। তখন আমাকে ঠেকাবে, এমন সাধ্য আছে কার ?

ঃ বটে !

ঃ তখন কোথায় থাকবে আপনাদের এই দম্ভ আর কে বাঁচাবে আপনাদের ? যে অপমান করেছেন আপনারা আমাদের, সেটা আমরা কমে ছেড়ে দেবো তখন ?

আবিদ হোসেন সাহেব ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। কি বলবেন কি করবেন ভাবতেই, হায়াত খান ফের বললেন — তখন বাঁচালে, একমাত্র এই আমিই আপনাদের বাঁচাতে পারি, যদি এখনও আপনারা সোজা পথে আসেন। নইলে —

ঃ সোজা পথে !

ঃ মাহমুদা খাতুনকে আমার হাতে দিয়ে দিন। আমি তাকে নিয়ে যাই একমাত্র তাহলেই আপনাদের জান বাঁচবে। নইলে —

ক্রোধে ফেটে পড়ে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — বেরোও, বেরোও এখান থেকে ! বেয়াদব — বেলেহাজ —

হায়াত খানও চীৎকার করে বললেন — আপনাদের মকানে আমি আগুন ধরিয়ে দেবো। বংশে বাতি দেয়ার মতো কাউকেই আপনাদের রাখবো না। ভালোয় ভালোয় মাহমুদাকে এনে এখনই দিয়ে দিন —

চীৎকার শুনে চাকর-নফর সহকারে আফসারউদ্দীন এদিকে দৌড়ে এলেন। আসতে আসতে বললেন — কি হয়েছে ? কি হয়েছে এখানে ?

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন — ঐযে, ঐ ইতরটা আবার এসেছে। বলছে, মাহমুদাকে দিয়ে দাও, নইলে মকানে আগুন ধরিয়ে দেবো — বংশে বাতি দেয়ার কাউকে রাখবো না।

হায়াত খানকে দেখেই আফসারউদ্দীন গর্জে উঠে বললেন — তবেরে শূয়ার। ধরো শয়তানকে। পিটে ওর হাড়গোড় ভেঙ্গে দাও।



www.amarboi.org

কিতাবউদ্দীন সহকারে চাকর-নফর সকলেই হুকুমের অপেক্ষা করছিলো। এবার তারা হুংকার দিয়ে ছুটে এলো। হুকুম দিয়ে আফসারউদ্দীনও তাদের সাথে ধেয়ে এলেন। হায়াত খান এতক্ষণ জোশের উপর ছিলেন। তিনি হুঁশে এসেই আঁত্‌কে উঠলেন এবং ছিটকে এসে অশ্বের পিঠে সওয়ার হলেন। অশ্ব ছুটিয়ে দেয়ার উদ্যোগ করেই তিনি পেছন ফিরে আফসারউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—লড়াইয়ে যদি জয় হয়, আল্লাহর কসম, তোমার বোনের ইজ্জত তো লুট করবোই, তোমাকেও এ দুনিয়ায় রাখবো না

কিতাউদ্দীনেরা ঘিরে ধরার চেষ্টা করতেই হায়াত খান অশ্ব ছুটিয়ে দিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেল।

লড়াইয়ের জন্যে সৈন্যবাহিনী তৈয়ার হতে লাগলো। দিলওয়ার আলী এই ফাঁকে আসাদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে বাসভবনে ছুটে এলেন। তিনি যুক্তি-সঙ্গতভাবেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, এ লড়াই চূড়ান্তভাবেই অস্তিত্বের লড়াই তাঁদের। জিতলে টিকে থাকবেন, হারলে সবান্ধবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। নিজেকে নিয়ে তেমন কোন চিন্তা তাঁর নেই। তিনি সৈনিক। জীবনমরণ পায়ের ধূলো তাঁর। তাঁর ভাইও একজন সৈনিক। তাঁকে নিয়েও ঐ একই কারণে চিন্তা নেই। কিন্তু তাঁর বড় চিন্তা হলো, মাহমুদা খাতুনকে নিয়ে এবং মাহমুদা খাতুনের পরিবারবর্গ নিয়ে। যুদ্ধে যাওয়ার আগেই তাঁদের একটা ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে। এই ভাবনায় তিনি পরিকল্পনা এঁটে নিলেন এবং আসাদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে মকানে ছুটে এলেন।

মকানে এসেই তাঁরা নামদার খাঁ ও কলিমউদ্দীনের মুখে শুনলেন, হায়াত খান ইতিমধ্যেই ইমাম সাহেবের মকানে গিয়ে শাসন গর্জন করে গেছেন। এতে তাঁরা অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েছেন এবং দিলওয়ার আলীর পথ চেয়ে আছেন। ইমাম সাহেবের বাড়ীর একজন নওকর এসে এ খবর দিয়ে গেছে।

নামদার খাঁ কথাগুলো জড়িয়ে পেঁচিয়ে ফেললো। কলিমউদ্দীন আস্তে আস্তে হায়াত খানের বক্তব্যগুলো মোটামুটি তুলে ধরলো। শুনে আসাদুল্লাহ ক্রোধে ক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দিলওয়ার আলীও লহমাখানেক নীরব হয়ে বসে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে আসাদুল্লাহকে বললেন—এই জন্যেই তোমাকে আমি ডেকে আনলাম আসাদ মিয়া। রাজধানীর পাহারায় তুমি তো এই মুর্শিদাবাদেই থাকছো। তোমার উপর আমি একটা গুরু দায়িত্ব দিয়ে যাবো।

আসাদুল্লাহ বললো—বলুন উস্তাদ—

ঃ যুদ্ধের খবর তো অহোরহ আসতেই থাকবে রাজধানীতে। এ খবর তুমি মাঝে মাঝেই ইমাম সাহেবের মকানে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। যদি আল্লাহর রহমে আমরা কামিয়াব হই, তাহলে আর বেশী কিছু করতে হবে না তোমাকে। কিন্তু আল্লাহ না করুন, যদি পরাজয় ঘটে, তাহলে তোমাকে আরো কিছু করতে হবে।

আসাদুল্লাহ ভারী কণ্ঠে বললো—জ্বি, বলুন—



www.amarboi.org

ঃ পরাজয়ের খবর পাওয়া মাত্রই এই নামদার খাঁর সাথে ও মকানের সকলকেই মকান থেকে নিরাপদে বের করে দেবে। আগে ওঁরা সরাসরি ফৌজীপুরে যাবেন। তারপর কি করবেন ওঁরা, তা নামদার খাঁ আর তাঁদেরকে এখনই বুঝিয়ে দিয়ে যাবো।

আসাদুল্লাহ্ ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—জি উস্তাদ, তাই হবে।

ঃ হাজী আহম্মদ আর তাঁর দোসরেরাও ওদের উপর বহুৎ খাপ্পা। এর উপর ঐ বদমায়েশ হায়াত খানের তো কথাই নেই। নাগালের মধ্যে পেলে, ওরা ঠিকই ঐ পরিবারটা মিস্‌মার করে দেবে।

ঃ জি-জি, এতে সন্দেহ্ নেই উস্তাদ।

ঃ তাই স্থির করেছি, সে ক্ষেত্রে তাঁরা এ মুলুক ত্যাগ করে উড়িষ্যায় বা তারও পশ্চিমে এই নামদার খাঁর মুলুকে গিয়ে আপাতত আত্মগোপন করে থাকবেন। যদি বেঁচে থাকি, আমিও গিয়ে তাঁদের সাথে সামিল হবো। আর যদি মরে যাই, অবস্থা বুঝে যা ভাল মনে করেন, তাঁরাই তা করবেন।

ক্রন্দন চেপে আসাদুল্লাহ্ রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—উস্তাদ!

নামদার খাঁ পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলো। ঠিক ঠিক! বুঝতে না পারলেও, এটুকু সে বুঝতে পারলো যে, পরাজয় ঘটতে পারে এবং তার হজৌর না-ও বাঁচতে পারেন। আসাদুল্লাহকে ক্রন্দনোন্মুখ দেখে নামদার খাঁ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললো—তব্ হামার কি হইবেক হজৌর?

দিলওয়ার আলী শান্ত কণ্ঠে বললেন—তুমি তাঁদের কাছেই থাকবে। সেই কথাই এখন বুঝিয়ে বলছি তোমাকে, মন দিয়ে শুনো—

অতপর দিলওয়ার আলী নামদার খাঁকে তাঁর পরিকল্পনার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তামামই বুঝিয়ে দিলেন। আলীবর্দী খানের জয় হলে, ইমাম সাহেবের পরিবারবর্গ নিয়ে নামদার খাঁকে ফৌজীপুর হয়ে উড়িষ্যা, উড়িষ্যা হয়ে তার মুলুকে কিভাবে যেতে হবে; উড়িষ্যার শেষ সীমানাতক্ কোন্ পথে যেতে হবে, উড়িষ্যায় পৌঁছা পর্যন্ত কোন্ কোন্ সরাইখানায় দিলওয়ার আলীর জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হবে, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপর কি করতে হবে, একে একে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। যে মুলুকে যেতে হবে, সে মুলুক নামদার খাঁর নিজের মুলুক। যে পথের কথা দিলওয়ার আলী বাত্‌লিয়ে দিলেন, সে পথেরও বাঁক-মোড়, সরাইখানা, মুসাফিরখানা, খান্‌কা-মসজিদ, আশ্রম-আবাস, নামদার খাঁর নখদর্পনে। সুতরাং বুঝে নিতে নামদার খাঁর কোন অসুবিধে হলো না।

এরপর দিলওয়ার আলী তাঁর নিজের বাহিনীর প্রস্তুতি তদারক করার কাজে আসাদুল্লাহকে পাঠিয়ে দিলেন এবং তৎপরেই নিজেও রণসাজে সজ্জিত হয়ে নামদার খাঁ সহ তিনি ইমাম সাহেবের মকানের দিকে ছুটলেন।

ইমাম সাহেবের মকানে এসে দিলওয়ার আলী দেখলেন, সেখানে শোকের ছায়া পড়ে গেছে। চাকর-নফরদের মুখও মলিন এবং বিশুষ্ক। সকলের চোখে মুখেই



www.amarboi.org

আতংকের প্রচ্ছন্ন আভাস। দিলওয়ার আলী এসে মূল দালানের বারান্দার কাছে পৌঁছতেই জেনানা-পুরুষ সকলেই এক সঙ্গে বেরিয়ে এলেন এবং দিলওয়ার আলীকে রণসাজে সজ্জিত দেখে সকলেই আরো অধিক বিচলিত হয়ে উঠলেন। পুরুষেরা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, জেনানারা ফুঁপিয়ে উঠে আড়ালে চোখ মুছতে লাগলেন। আজিজুন নেছা বেগম কান্নার বেগ চাপতে চাপতে বললেন—একি হলো বাপজান!

দিলওয়ার আলী বুঝলেন, এঁরা অতিশয় হতাশ ও ভীত হয়ে পড়েছেন। এ মুহূর্তে তাঁকে দুর্বল হলে চলবে না। তিনি সাহস দিয়ে বললেন—কই, কি হয়েছে এমন?

ঃ একি গজব নেমে এলো আচানক। লড়াইটা বেধেই গেল শেষ পর্যন্ত?

ঃ লড়াই-গজব সবকিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা আম্মাজান। আমাদের তাতে ঘাবৃড়ে গেলে চলবে কেন? ধৈর্যের সাথে সবকিছু তরিয়ে উঠার কসরত করতে হবে।

ঃ কিন্তু তোমরা হেরে গেলে, কসরত আর কিসের জোরে করবো বাপজান! তরিয়ে উঠবো কি করে?

ঃ আহ্হা! হেরেই যে যাবো, সেরেফ এটা ভাবছেন কেন? হার-জিতের মালিকও ঐ আল্লাহ তায়ালাই।

ঃ বাপজান!

ঃ লড়াই শুরু না হতেই কে হারবে কে জিতবে, সে ব্যাপারে কি আগেই নিশ্চিত হওয়া যায়?

ভগ্ন কণ্ঠে সমর্থন দিয়ে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—হ্যাঁ, সেতো ঠিকই। এসো-এসো, আগে আগাগোড়া ব্যাপারটা শুনি—

পরক্ষণেই তিনি আবার নামদার খাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—এই বুঝি তোমার সেই নামদার খাঁ?

দিলওয়ার আলী বললেন—জি-জি। জরুরী এক প্রয়োজনে ওকে এনেছি।

ঃ বেশ-বেশ এসো, সবাই তোমরা এসো। বসে আগে শুনি—

সকলেই ঐ বিশেষ কামরার দিকে চললেন। আজিজুন নেছা বেগমের পিছে পিছে মাহমুদা খাতুনও অবলীলাক্রমে এসে আজ ঐ বিশেষ কক্ষে ঢুকলো। মুখে তার নেকাবটা থাকলেও, আজ সে শরম-সংকোচ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সবকিছুর অতীত। দুর্যোগের ধাক্কায় আর ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় সবকিছুই সবার কাছে উহ্য হয়ে গেছে। কারো আর কোন দিকেই লক্ষ্য নেই।

কক্ষে এসে বসে দিলওয়ার আলী ঘটনাটা বলতে শুরু করলেন। কি দিয়ে কি হলো, কিভাবে এই লড়াইটা বাধলো, আলীবর্দী খানের অগ্রগতি কতদূর—সবকিছুই সংক্ষেপে তিনি বর্ণনা করে শুনালেন। সবকিছু শুনার পর সকলের শুকনো মুখ আরো অধিক শুষ্ক হয়ে গেল। আবিদ হোসেন সাহেব ঢোক চিপে বললেন—তা এ যুদ্ধের ফলাফলটা কি তোমরা চিন্তা করছো ভাই? তোমাদের প্রস্তুতিটা কেমন?

দিলওয়ার আলী প্রত্যয়ের সাথে বললেন—আল্লাহর রহমে আমরা যে কামিয়াব



www.amarboi.org

হবো, এ নিয়ে আমাদের কারো দীলে এতটুকু সন্দেহ নেই। যদি এর মধ্যে হঠাৎ আবার চরম কোন বেঈমানী না ঘটে, তাহলে জয় আমাদের ইনশআল্লাহ সুনিশ্চিত।

আফসারউদ্দীন এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন। আশান্বিত হয়ে উঠে এবার তিনি বললেন — কি কারণে এতটা আশা করছেন ভাই সাহেব ?

ঃ আমাদের মনোবলের কারণে। নবাবের পক্ষে অনেকগুলো ডানপিটে সেনানায়ক একজোট হয়ে আছি আমরা। আমাদের সাথে একজোট হয়ে আছেন আরো অনেক প্রবীন ও অভিজ্ঞ সেনানায়ক। সকলেই নিবেদিত প্রাণ আর দুর্বার নিয়াতে বলীয়ান।

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ সকলেই দুর্ধর্ষ আর কামিয়াবীর জন্যে জান দিতে এক পায়ে খাড়া। সকলেই নবাব সরফরাজ খানের অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী আর এই হুকুমাতের স্বার্থের সাথে সকলেরই উত্থান-পতন এক সাথে গাঁথা। তাই আমরা লড়বো জীবন-মরণের লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই। কোন পদ-পাওনা-পুরস্কারের লোভে নয় বা আলীবর্দী খানের সেপাই-সেনার মতো ভাড়াটিয়ে হয়ে নয়।

ঃ আচ্ছা।

ঃ মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী এ আমাদের একমাত্র নিয়াত। জয় আমাদের ইনশাআল্লাহ হবেই।

সকলের চোখে মুখে অনেকখানি রক্ত ফিরে এলো। আজিজুন নেছা বেগম অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন — আল্লাহ তায়ালা তাই যেন করেন বাপজান। তিনি যেন তোমাদের উম্মিদ পূরণ করেন। কিন্তু —

ঃ কিন্তু কি আম্মাজান ?

ঃ সব কথার পরেও তো ভবিষ্যৎ বলে একটা কথা আছে বাপজান ? ভবিষ্যতের কথা তো কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ? এতদ্ সত্ত্বেও যদি —

আবিদ হোসেন সাহেব কথা ধরে বললেন — হ্যাঁ ভাই, তবু যদি ব্যতিক্রম কিছু ঘটে, তাহলে যে ভবিষ্যৎটা একদম অন্ধকার। এই নবাব তো খতম হয়ে যাবেনই, সেই সাথে আমরাও সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

দিলওয়ার আলী বললেন — নানাজান !

আফসারউদ্দীন বললেন — ঐ শয়তান হায়াত খান আবার এখানে এসেছিল তা হয়তো শুনেছেন। আপনার বাসভবনে সে খবর পৌঁছে দেয়া হয়েছে। শয়তানটার যে মতিগতি দেখলাম আর হাজী আহম্মদ সহকারে রায়বাবু আর শেঠ বাবুদের যা দুরন্ত আক্রোশ আমাদের উপর, তাতে লড়াইয়ে বিপরীত কিছু ঘটলে, আমাদের হালত্ যে কি হবে, তা কল্পনা করতে পারছিনে।

আজিজুন নেছা বেগম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন — আমাদের কি হবে বাপজান ? কোথায় আমরা যাবো আর কিভাবে আমরা বাঁচবো ? বিশেষ করে এই মেয়েটার আর আফসারউদ্দীনের বেঁচে থাকার কোন আশাই দেখছিনে !



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আম্মাজান, জান-মাল বিষয়-বিত্ত এ সবের মালিকও ঐ আল্লাহ্ তায়ালাই। তাঁর ইচ্ছের উপর কোন হাত নেই। তবু, মন্দের জন্যে সবসময়ই বিকল্প কিছু চিন্তা-ভাবনা আমাদের রাখতে হবে বৈকি?

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—কি যে সেই বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করবো ভাই, দিশে করতে পারছিনে।

দিলওয়ার আলী বললেন—সেই কথাটা বলার জন্যেই আমার এখন এখানে বিশেষ করে আসা। আমার সহকারী আসাদুল্লাহকে তো চেনেনই, এই নামদার খাঁকেও চিনে রাখুন। যদিও সম্ভাবনা ইনশাআল্লাহ্ খুবই কম, তবু বিপর্যয় কিছু ঘটলে, এরাই সে ব্যবস্থা করে দেবে।

ঃ কি রকম?

ঃ আসাদুল্লাহ্ অহরহই যুদ্ধের খবর আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। আল্লাহ্ না করুন, আমরা পরাজিত হলে, সে খবরটাও সঙ্গে সঙ্গেই পাবেন। সে খবর পাওয়া মাত্রই এই নামদার খাঁর সাথে বেরিয়ে পড়বেন আপনারা। আসাদুল্লাহই আপনাদের নিরাপদে শহরের বাইরে পৌঁছে দেবে।

ঃ কোথায় আমরা যাবো।

ঃ প্রথমে ফৌজীপুরে যাবেন। তারপর সেখান থেকে উড়িষ্যায়। আপনাদের কিছু স্বজনও নাকি উড়িষ্যাতে আছেন?

আফসারউদ্দীন বললেন—উড়িষ্যাও তো এই সুবে বাংলারই শাসনাধীন? সেখানেই বা আমাদের নিরাপত্তা কোথায়?

দিলওয়ার আলী বললেন—সে ক্ষেত্রে আপনাদের উড়িষ্যাও ছাড়তে হবে। উড়িষ্যার পশ্চিমে এই নামদার খাঁর মুলুকে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। তারপর এই ঝড়-ঝঞ্ঝাটা থেমে গেলে, পরিস্থিতি বুঝে যা হয় তাই করবেন।

আজিজুন নেছা বেগম বললেন—সেকি বাপজান! একদম অতদূরে?

ঃ এছাড়া যে উপায় নেই আম্মাজান! আপনাদের তকলিফ হবে। তবু দুশমনদের যে আক্রোশ, তাতে এই বাংলা মুলুক আপনাদের না ছাড়লে যে উপায় নেই।

ঃ কিন্তু বাপজান, মুসিবতটা এই মেয়েটাকে আর আফসারউদ্দীনকে নিয়ে। আমরা সকলেই এভাবে—

ঃ বেশ তো। আপনি, নানাজান আর জেনানাদের সহ অন্যান্যেরা না হয় ফৌজীপুরেই থাকবেন। দু' একজন চাকর-নফর এখানে ফাঁকে ফাঁকে থেকে এই মকানটা আগ্লাবে। পরিস্থিতি নিতান্তই প্রতিকূল না হলে, আপনাদের কষ্ট করার দরকার নেই। কিন্তু আফসারউদ্দীন ভাই সাহেব আর মাহমুদা খাতুনকে অবশ্যই বাংলা মুলুক ছাড়তে হবে।

ঃ কিভাবে? কোথায় যাবে তারা?

ঃ ঐ যে বললাম, এই নামদার খাঁর সাথে উড়িষ্যায় যাবেন তাঁরা এবং দরকার হলে, এই নামদার খাঁর মুলুকে।



www.amarboi.org

ঃ এই ভাই সাহেবের, মানে এই নামদার খাঁর সাথে ?

ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিন্দা রাখলে, আমিও সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে তাদের সাথে সামিল হবো। রাস্তাঘাট তামামই নামদার খাঁকে বলে দেয়া আছে। কোন্ স্থানে, কোন সরাইয়ে কোন্ মুসাফিরখানায় গিয়ে গিয়ে থামবেন তাঁরা আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন—সবকিছু নামদার খাঁকে বুঝিয়ে দেয়া আছে।

ঃ কিন্তু তুমি পৌছার আগে সেরেফ তো এরা এই তিনজন। তাও আবার একজন মেয়েছেলে। ঐ অচিন পথে—

ঃ ভয়কি আম্মাজান। পথে আরো অনেককেই হয়তো পেয়ে যাবেন তাঁরা। দুর্দিনে কতজন কতদিকে ছুটে বেরুবে !

ঃ কিন্তু—

আবিদ হোসেন সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—না, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এমন একটা উপায়ের কথা ভাবতেই আমরা পারিনি, না কি বলো আফসারউদ্দীন ?

আফসারউদ্দীন সায় দিয়ে বললেন—জি-জি। দুঃসময় এলে তাই আমাদের করতে হবে। আমাকে নিয়েও তেমন আমি ভাবিনে। কিন্তু এই মাহমুদাকে হেফাজত করতে হলে এর আর বিকল্প নেই।

আবিদ হোসেন সাহেব যোগ দিয়ে বললেন—তার উপর দিলওয়ার আলী ভাইও যখন তোমাদের সাথে থাকবে।

আজিজুন নেছা বেগম নিরাশ কণ্ঠে বললেন—তাই বা জোর দিয়ে বলা যায় কিভাবে ? লড়াইয়ে বাপজানের কি হালত্ হবে, মরবে, না বাঁচবে, কে বলতে পারে।

আফসারউদ্দীন শক্ত কণ্ঠে বললেন—তা যে হালত্ই হোক, মাহমুদাকে নিয়ে আমাকে সরে পড়তে হবেই।

দিলওয়ার আলী বললেন—আমার ব্যাপারেও এতটা নিরাশ হচ্ছেন কেন আম্মাজান ? মরেই যাবো, সেরেফ একথা ভাবছেন কেন ? যুদ্ধে গেলেই কি মারা যায় সবাই ? আল্লাহর রহমে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটাই তো বেশী।

আজিজুন নেছা বললেন—তাই যেন হয় বাপজান। আল্লাহ তায়ালা তাই যেন করেন।

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—মন্দের সাথে ভালর আশাটাও করেতে হবে আমাদের। দিলওয়ার আলীভাই এদের সাথে সামিল হলে আর দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই।

কিন্তু মায়ের মন বলে মন। এত অল্পতেই তা ভরবে কেন ? কত প্রশ্ন, কত সংশয় তাঁর অন্তরে। মৃদু সমর্থন দিয়ে আজিজুন নেছা বললেন—হ্যাঁ, সে ক্ষেত্রে তাই-ই বটে। তবে একটি মাত্র মেয়েছেলে, ভাই হলেও এরা সবাই পুরুষ মানুষ। ঐ দুর্গম পথে মেয়েটা যে একা একা কিভাবে নিজেকে সামলাবে ! সব কথা তো ভাই হলেও বলতে এদের পারবে না।



www.amarboi.org

আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—হ্যাঁ, এও একটা কথা বটে। উঃ ! শাদিটা এদের ইতিমধ্যেই হয়ে গেলে যে কি সুবিধেটাই আজ হতো ! স্বামীর কাছে তো স্ত্রীর কোন রাখ-ঢাকের বালাই নেই। দিলওয়ার আলীর সাথে মাহমুদা খাতুন নিশ্চিন্তে সর্বত্র চলাফেরা করতে পারতো।

দিলওয়ার আলীর মাথাটা নুয়ে এলো। আজিজুন নেছা বেগম আফসোস করে বললেন—সে কিস্‌মতটা আর হলো কৈ চাচাজান ? একটু সুসময় আসুক আসুক করতে করতে একেবারেই এই দুঃসময়ে পড়ে গেলাম।

আফসারউদ্দীন সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন—চিন্তা কি আম্মাজান ? দিলওয়ার আলী ভাই সাহেব যদি আমাদের সাথে সামিল হতে পারেন, তাহলে কি আর এদের বেগানা রেখে এক সাথে নিয়ে ঘুরবো ? যত সত্বর সম্ভব পথেই সে কাজটা সেরে নেবো।

আজিজুন নেছা বেগম উৎসাহ ভরে বললেন—আফসারউদ্দীন !

আফসারউদ্দীন বললেন—শাদির জন্যে তো কোন আড়ম্বর লাগে না। শরা শরীয়াত মতে যে কোন স্থলে ওটা সেরে নেয়া যাবে।

দুঃখের মধ্যেও আবিদ হোসেন সাহেব খোশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—আলহামদুলিল্লাহ ! সেটা খুব উত্তম কাজ হবে ভাই। অবশ্যই তাই তুমি করবে।

দিলওয়ার আলীর সময় বয়ে যাচ্ছিল। তিনি মাথা তুলে বললেন—ওসব কথা থাক নানাজান। এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা, এগুলো তামামই ঐ দুর্দিনের চিন্তা-ভাবনা। আমার বিশ্বাস আল্লাহর রহমে এসব কোন ঝুট্-ঝামেলাই পোহাতে হবে না আপনাদের।

ঃ দিলওয়ার আলী !

ঃ আমি এখন উঠি। আর আমার অপেক্ষা করার সময় নেই।

দিলওয়ার আলী নড়ে চড়ে উঠলেন। আবিদ হোসেন সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন—উঠবে ?

ঃ জি-জি। আমার বাহিনী দাঁড় করিয়ে রেখে আমি এখানে এসেছি। আমি চলি—

মাহমুদা খাতুন এতক্ষণ দেয়ালে ঠেশ দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। দিলওয়ার আলীর যাওয়ার কথা শুনেই সে হু-হু করে কেঁদে উঠে ওখানেই বসে পড়লো এবং মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তা দেখে আবিদ হোসেন সাহেব বললেন—এই নাও ঠ্যালা ! এ এক বড় মুসিবত হয়েছে আমাদের। নাও ভাই, আর শরম করে কাজ নেই। বড় নিদারুণ ওয়াক্ত এটা। দু' কথা যা হোক বলে, মেয়েটাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাও। নইলে একে সামলানো আমাদের বড় মুস্কিল হয়ে পড়বে।

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মাহমুদাকে উদ্দেশ্য করে দিলওয়ার আলী বললেন—একি করছেন আপনি ? এমনটি তো আশা করিনি আমি ?



www.amarboi.org

মাহমুদা খাতুন কেঁদেই চললো। দিলওয়ার আলী ফের বললেন—কি তাজ্জব। এমন কথা তো ছিল না ?

মাহমুদা খাতুনের ক্রন্দন স্মিত হয়ে এলো। কিন্তু সে মাথা তুলতে পারলো না। ঘরটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল। কাছে কাউকে না দেখে দিলওয়ার আলী বললেন—সেপাইকে মুহব্বত করবেন আর লড়াইয়ের কথা শুনলে ভেঙ্গে পড়বেন, এটা তো ঠিক নয় ?

সময় নেই। এ মুহূর্ত হারালে আর কথা বলার মুহূর্ত জিন্দেগীতে নাও আসতে পারে ভেবে মাহমুদা খাতুন মুখ তুললো। চোখ মুছে ক্ষীণকণ্ঠে বললো—কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ঠিক নয়, তাকি আর আমি বুঝিনে ?

ঃ তবে ?

ঃ আমার নসীবে শেষ পর্যন্ত এই-ই ছিল ?

ঃ এই-ই মানে ?

ঃ মনে মনে ফানুস উড়িয়েই জিন্দেগীটা আমার খতম হয়ে যাবে, এই-ই কি নসীবের লিখন আমার ?

ঃ একথা বলছেন কেন ? যুদ্ধ শুরু না হতেই সব খতম হয়ে গেল, আপনিও এ কথা ভাবছেন কেন ?

ঃ বরাবর যা ঘটে যাচ্ছে, তা দেখেই ভাবছি। দুর্দিন কেবল ঘনিভূত হওয়া ছাড়া সুদিন আমার এলো না, এর উপর আজ আবার যুদ্ধে যাচ্ছেন, এ কারণেই ভাবছি।

ঃ মাহমুদা খাতুন !

ঃ হতাশার বোঝা যার এমনিতেই একের পর এক ভারী হচ্ছে, এই যুদ্ধ বিগ্রহ আর কোন্ আশার পসরা সামনে এনে দেবে তার ?

ঃ না ! সবাই আপনারা কেন যেন বুঝিনে, ঐ মন্দ দিকটাই চিন্তা করছেন ! অথচ মন্দের সম্ভাবনা আল্লাহর রহমে খুবই কম।

ঃ স্রোত ভাঙ্গা কূলের উপর অনুক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভালর চিন্তা কি করে করবে, বলুন ?

ঃ তার মানে আপনার ধারণা, এই যুদ্ধেই সব শেষ হয়ে যাবে ?

ঃ অসম্ভব কি ?

ঃ ছিঃ ! আপনি এতটা দুর্বলচিত্ত তা আমি ভাবিনি। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিজের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ যে বিলিয়ে দিতে পারে না, তার মতো বুযদীল আর কে আছে ?

মাহমুদা খাতুন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—বটে ! চোরের বিটির বিয়ে আর মাঠের গরু দান !

ঃ মানে ?

ঃ সম্পদ যার আছে, বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে গৌরব আর আনন্দ তো তারই আছে। যার কিছুই নেই, সম্পদ যার হাতেই এলো না, মুখে মুখে সেটা বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে আহামরির কি আছে, তা আমি বুঝিনে।

ঃ মাহমুদা খাতুন !



www.amarboi.org

ঃ আপনাকে যদি আমি আমার সম্পদ হিসেবে যথাযথই পেতাম, তাহলে আজ আপনাকে বিলিয়ে দিতে আমার চেয়ে বেশী গৌরব আর কে অনুভব করতো ? যুদ্ধের জন্যে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেও কি এতটুকু দ্বিধা করতাম আমি ? না সেপাইয়ের ইজ্জত ক্ষুণ্ন হবে—এমন কোন দুর্বলতা আমার মধ্যে থাকতো ? যা পেলামই না, তা বিলিয়ে দেয়ার প্রহসন আমি করতে পারিনে।

ঃ আপনি কিন্তু কেবল আপনার নিজের কথাই ভাবছেন। নিজের পাওনাটাই কি সবসময় বড় ?

ঃ কেন নয় ? আমি তো একজন রক্ত মাংসের সাদামাটা মানুষ, কোন আসমানী কিছু নই। পেটে খেলে পিঠে সয়। ফাঁপা আদর্শের গালভরা বুলি আউড়িয়ে সস্তা বাহ্‌বা আর যার কাছেই তৃপ্তিদায়ক হোক, আমার ওতে আদৌ কোন তৃপ্তি নেই। আমি আগে পেতে চাই, বিলিয়ে দেয়ার কথাটা তার পরে।

দিলওয়ার আলী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মাহমুদা খাতুনের অকপট ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির কাছে তিনি মার খেয়ে গেলেন। মাহমুদা খাতুন যা বলছে, আসলে তো এইটেই বাস্তব। তার যে মানসিকতা সে তুলে ধরেছে, এইটেই তো প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত মানসিকতা ! আদর্শের ফাঁকা আওয়াজ নেই, অথচ অন্তরে তার বীরঙ্গনার বল। দিলওয়ার আলী থতমত করে বললেন—আমি তা বুঝতে পারছি মাহমুদা খাতুন, ফাঁকটা ধরতে পারছি। কিন্তু—

ঃ সে কথা আর এখন বলে লাভ কি ? যুদ্ধে যাচ্ছেন, যান। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হেফাজত করুন, এই কামনাই করি এখন। এরপর তো সামনে আমার অনন্ত অবসর। লোকসানের হিসেব কষার অফুরন্ত সময়।

ঃ মাহমুদা খাতুন !

ঃ আপনি যদি সহি-সালামতে ফিরে আসেন লড়াই থেকে, আল্লাহ তায়ালা যদি এই রহমটুকু শেষ পর্যন্ত করেনই, কেবলমাত্র তখনই লাভের হিসেব কষার প্রশ্ন সামনে আসবে আমার।

ঃ তাই যেন হয় মাহমুদা। আল্লাহ তায়ালা যেন সে মওকা দেন আমাদের মেহেরবানী করে। কিন্তু—

ঃ জি ?

ঃ আপনি কেবল আপনার কথাই ভাবছেন। লড়াইয়ে কি হবে আমার, তাই নিয়ে পেরেশান হচ্ছেন। জয় পরাজয়ের কথাটা তো একবারও বলছেন না ?

ঃ তা আমি বলতে যাবো কেন ? ও নিয়ে কিসের ভাবনা আমার ?

দিলওয়ার আলী হোঁচট খেলেন। সবিস্ময়ে বললেন—তাজ্জব ! জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটা আপনার কাছে কিছুই নয় ?

ঃ কিছুই নয়। ও দু'টোই এখন আমার কাছে সমান।

ঃ অর্থাৎ ?



www.amarboi.org

ঃ যুদ্ধে যদি নবাব সরফরাজ খানের জয়ও হয়, তিনি যদি সানন্দে এসে তাঁর মসনদে বসেন আবার আর আপনি যদি লড়াইয়ের মাঠেই খতম হয়ে যান, তাহলে এ বিজয় নিয়ে আমার আনন্দ করার কি আছে? আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ এ কারণে কোরবান হয়ে গেছে, একথাটা বলেও তো কেউ বাহবা দিতে আসবে না আমাকে। আমার সান্ত্বনাটা কোথায়?

ঃ মাহমুদা খাতুন!

ঃ লড়াইয়ে যদি পরাজয়ও ঘটে আর আপনাকে যদি ফিরে পাই, তাহলে এ মুলুক থেকে পালিয়ে অরণ্যে গিয়ে থাকাতেও অনেক সুখ আমার।

ঃ মাহমুদা!

ঃ জয়টাই আমি চাই আর মনে-প্রাণে চাই। কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঃ তাই?

ঃ আপনি যদি পাশে থাকেন, আপনার কোলে মাথা রেখে আমি যদি মরতে পারি, এইটেই আমার জিন্দেগীর সবচেয়ে বড় সুখ, সবচেয়ে বড় পাওনা। এর অধিক কিছুই আর চাওয়ার নেই আমার।

দিলওয়ার আলী বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—আল্লাহ্ তায়ালা যেন সেই উম্মিদই পূরণ করেন আপনার।

মাহমুদা খাতুন বললো—আমিন!

## ১৭

নবাব সরফরাজ খান এ লড়াইয়ে সেনাপতি গাউস্ খানকে সিপাহ্ সালার নিয়োগ করলেন। গাউস্ খানের নেতৃত্বে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের মজবুত এক বাহিনী তৈয়ার হয়ে গেল। বিহারের সহকারী সুবাদার আলীবর্দী খান তখন তেলিয়াগড়ি ও শরকি গলী গিরিপথ পার হয়ে সসৈন্যে এসে রাজমহলে পৌঁছেছিলেন। নবাব সরফরাজ খান তাঁর বাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ার মুহূর্তে আলবর্দী খানের এক পত্র পেলেন। রাজমহল থেকে আলীবর্দী খান জানিয়েছেন, "পরিবারবর্গের অবমাননার সংবাদ পেয়ে অনুমতি না নিয়েই এতদূর অগ্রসর হয়েছি। মনে কোন বিরুদ্ধভাব নেই। পরিবারবর্গকে আমার নিকট পাঠালেই প্রত্যাগমন করবো। ভরসা করি, আমায় এভাবে বেশীদূর অগ্রসর হতে হবে না।

পত্রখানা জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ এনে নবাবের হাতে দিলেন। দুর্বলচিত্ত নবাব কর্তব্য স্থির করতে পারলেন না। এই সময় হাজী আহম্মদ শপথ করে জানালেন, প্রভু পুত্রের সাথে আর বৈরী আচরণ তাঁরা করবেন না। তাঁকে আলীবর্দী খানের নিকট পাঠিয়ে দিলেই আলীবর্দীর বাহিনী তিনি বিদায় করে দেবেন এবং আলীবর্দীকে ধরে এনে নবাবের কাছে হাজির করবেন। এরপর মারেন, কাটেন, নবাবের যা মর্জি। কোন কথাই সে শুনছে না, ভেবেছে কি সে?



www.amarboi.org

নীরিহ ও ভীরু প্রকৃতির নবাব নরম হয়ে গেলেন। লড়াইয়ের ঝুঁকি নেয়ার দৃঢ় মনোবল তাঁর ছিল না। যুদ্ধের ঝুঁকি আপ্‌ছে আপ্ কেটে যাচ্ছে দেখে, অনেকেরই আপত্তির মুখে তিনি হাজী আহম্মদকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে সপরিবার আলীবর্দী খানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর নবাব সিপাহসালার গাউস খানকে রণপ্রস্তুতি পরিহার করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু সিপাহসালার ও সেনানায়ক মণ্ডলী এ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করলেন। তাঁরা নবাবকে বললেন, আলীবর্দী খানের দীলে ভালমন্দ যা-ই থাক, হাজী আহম্মদ কিছুতেই তাঁর ওয়াদা রক্ষে করবেন না। বরং, একখানাকে সাতখানা করে লাগিয়ে আলীবর্দী খানকে তিনি ক্ষিপ্ত করেই তুলবেন এবং লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করবেন।

নবাব নিরস্ত হলেন। বাহিনী নিয়ে সিপাহসালার গাউস খান সদাপ্রস্তুত অবস্থায় ফলাফল কি আসে, সেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেনানায়কদের অনুমানই সত্যি হলো। অচিরেই সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী গুপ্তচর খবর নিয়ে এলো, আলীবর্দী খান তাঁর বাহিনী নিয়ে আবার বেরিয়েছেন এবং মুর্শিদাবাদ লক্ষ্য করে বিপুল বিক্রমে এগিয়ে আসছেন।

এ খবরে নবাব সরফরাজ খান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গর্জে উঠলেন সদাপ্রস্তুত সেনানায়ক মণ্ডলী। নবাবের নির্দেশ পেয়েই তাঁরা বাহিনী নিয়ে অমিতবিক্রমে অগ্রসর হলেন। নবাব সরফরাজ খানও কিছু বিশ্বস্ত সভাসদ ও দেহরক্ষী সেপাই নিয়ে তাঁদের সাথে রওনা হলেন। অন্ধের কাছে রাতদিন সমান। এই বিশ্বস্ত সভাসদদের মধ্য মণি হয়ে নবাবের সাথে রইলেন নবাবের তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী রায় রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ।

মুর্শিদাবাদের দশ-বারো ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান সুতীর কাছাকাছি গিরিয়াতে সসৈন্যে পৌঁছে নবাব সরফরাজ খান দেখলেন, আলীবর্দী খানও ইতিমধ্যেই সসৈন্যে এসে গিরিয়াতে পৌঁছে গেছেন। গিরিয়ার ময়দানেই উভয় পক্ষ মুখোমুখী হয়ে গেল। শুরু হলো লড়াই।

শুরু থেকেই এ লড়াই প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। নবাব সরফরাজ খানের সেপাই সেনারা এমন দুরন্ত আক্রোশে আলীবর্দী খানের বাহিনীর উপর চড়াও হলো যে, অল্প সময়ের মধ্যেই আলীবর্দী খানের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। নবাব সরফরাজ খানের পেছনে এখনও যে এমন দুরন্ত শক্তি আর এত বিশ্বস্ত সেপাই সেনা আছে, আলীবর্দী খান তা কল্পনা করতেও পারেননি। বিপর্যয়ে পড়ে তিনি শিউরে উঠলেন। বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে আর একদণ্ডও টিকে থাকতে না পেরে আলীবর্দী খান আতংকগ্রস্ত ভাবে পেছন দিকে ছুটে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আলীবর্দী খানের সেপাই-সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা পেছন দিকে ছুটে পালাতে লাগলো। প্রাণপণ করেও আলীবর্দী খান আর তাদের ফেরাতে পারলেন না। দিশেহারা আলীবর্দী খান প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে তখনই রণস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। এরপর উপায়ন্তর না দেখে, কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ আলীবর্দী খান ভাগীরথী পার হয়ে অপর পাড়ে এলেন এবং লোক-লস্কর নিয়ে তাঁর সহায়তায় অপেক্ষমান নাটোরের জমিদার রামকান্তের আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালেন।



www.amarboi.org

নবাব সরফরাজ খান সম্পূর্ণরূপে জয়ী হলেন। আলীবর্দী খান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে গেলেন। কিন্তু নসীবের মার, কার সাধ্য ছান্দে ? বেয়াকুফের বোধোদয় কার সাধ্য করে ? নবাব সরফরাজ খান এ বিজয় ধরে রাখতে পারলেন না। অন্য কথায় বলা যায়, বেয়াকুফী করে এ বিজয় নিজেই তিনি চূড়ান্ত করতে দিলেন না। পলায়মান শত্রুদের উৎখাত করে দেয়ার জন্যে তাঁর সেপাইসেনারা যখন মারমার রবে শত্রুদের ধাওয়া করতে বেরুলেন, ঠিক তখনই নবাব সরফরাজ খান নিজে আদেশ দিয়ে সেপাইসেনাদের নিরস্ত করে দিলেন। সিপাহসালার গাউস খান মাথায় হাত দিলেন। বিপুল বিস্ময়ে অন্যান্য সেনানায়কেরা হতবাক হয়ে গেলেন।

বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। আলীবর্দী খানের শোচনীয় পরাজয়ে আলম চাঁদ বাবুরা দুই চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলেন। এর সাথে তাঁদেরও পতন অনিবার্য জেনে, জান ছেড়ে দিয়ে তাঁরা শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। চাতুর্যের সর্ববিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োগে রায় রায়ান আলম চাঁদ নবাবকে এই মন্ত্রণায় কাত করতে সক্ষম হলেন যে, রাত্রিকাল প্রায় আসন্ন, প্রচণ্ড পরিশ্রমে নবাবের সেপাইসেনারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম তাদের বড়ই প্রয়োজন। অপরদিকে শত্রুবাহিনীর ছত্রভঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, আতংকিত, একেবারেই হতোদ্যম ও প্রাণ বাঁচানো নিয়েই তারা এখন দিশেহারা। এই একেবারেই পর্যুদস্ত প্রতিপক্ষের পেছনে রাত্রিকালে নবাবের অতিশয় পরিশ্রান্ত বাহিনীকে অনর্থক হয়রান করা নিছকই নির্মমতা। তারা বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করুক। আগামী কাল দিবালোকে নবোদ্যমে বেরিয়ে প্রাণ ভয়ে হেথায় হোথায় লুকিয়ে থাকা দুশমনদের খুঁজে খুঁজে খতম করে দিলেই আপদ সাফ হয়ে যাবে।

নবাব সরফরাজ খান শুধু তরল মতিই নন, তিনি কেবল বিশ্বাস করতেই শিখেছেন, অবিশ্বাস করতে শেখেননি। এই টোপ তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গিললেন এবং অন্তিম টোপ গিললেন। সিপাহ সালার এ প্রস্তাব না-ও গ্রহণ করতে পারেন ভেবে, তাঁর তথাকথিত বিশ্বস্ত সঙ্গীদের মুখ রক্ষার মানসে নবাব সপুলকে নিজেই নিরস্ত হওয়ার ঘোষণা বাহিনীর মধ্যে প্রচার করে দিলেন। খোদ নবাবের আদেশ পেয়ে সেপাইরা মহাকলরবে ছাউনিতে ফিরে আসতে লাগলো। সিপাহসালার আর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না।

রায় রায়ান বাবুরা এবার জালের দড়ি টানলেন। আলীবর্দী খানের কোথায় কোন্ আশ্রয় আছে, সবই তাঁদের জানা। তৎক্ষণাৎ আলীবর্দী খানের কাছে খবর গেল, নবাব এখন একেবারেই অপ্রস্তুত। তাঁর বাহিনী এখন ছাউনিতে বিশ্রামরত। এই রাতের মধ্যেই সেনাসৈন্য গুছিয়ে নিয়ে এসে অতর্কিতে হামলা করলে অতি অল্পায়াসে কার্যোদ্ধার হবে।

খবর পেয়েই আলীবর্দী খান সেই মোতাবেক তৈরী হওয়া শুরু করলেন। এদিকে নবাবের প্রায় তামাম সৈন্য বিছানায় গা এলিয়ে রইলো। সেনানায়কেরাও অনেকেই শুয়ে বসে চোখ মুজলেন। একমাত্র গাউস খান, দিলওয়ার আলী ও মীর শরাফউদ্দীন ছাউনিতে ফিরলেন না। নিজ নিজ বাহিনীর কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁরা সুতী পর্যন্ত এগিয়ে এলেন এবং আলীবর্দী খানের পথ আগৃলে রইলেন।



www.amarboi.org

আলীবর্দী খান পথ পরিবর্তন করলেন। তিনি চালাকী করে তাঁর নিজের হাতী, প্রতিক ও ছত্র সেনাপতি নন্দলালকে দিয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ নন্দলালকে সুতীর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, আলীবর্দী খান নিজে এই বাহিনীতে আছেন, এই ভ্রান্তিতে নবাবের সেপাই সেনাদের ঐদিকেই ব্যস্ত রাখা। অতপর গুছিয়ে নেয়া নিজের সৈন্যদল ও রামকান্তের লোক লস্কর নিয়ে আলীবর্দী খান রাত্রিকালেই রওনা হলেন। ভাগীরথী পার হয়ে উল্টা পথ ধরে তিনি নবাবের শিবিরের পেছন দিকে চলে এলেন।

ভোর হয়ে এলেও আঁধার তখনও কাটেনি। নবাব সরফরাজ খান তাঁর ছাউনিতে ফযরের নামাযে মগ্ন ছিলেন। এই ওয়াক্তে আলীবর্দী খান সসৈন্যে এসে নবাবের শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অতর্কিত এই আক্রমণে নবাবের সেনানায়কেরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ঘুমন্ত ও অপ্রস্তুত সেপাইদের অধিকাংশই আঁতকে উঠে করণীয় স্থির করতে না পেরে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক ওদিক দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। অবশিষ্ট সৈন্যদের অর্ধপ্রস্তুত অবস্থায় নিয়ে নবাবের সেনানায়কেরা প্রাণপণে এই হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। নবাব সরফরাজ খানও নামায শেষে উঠেই তাঁর হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার হলেন এবং আলীবর্দী খানের আক্রমণের মোকাবেলা করতে লাগলেন।

কিন্তু এই পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে একেবারেই পরিকল্পনাহীন অবস্থায় ছত্রভঙ্গ সৈন্য নিয়ে তাঁরা কিছুই করতে পারলেন না। বিপদ দেখে কিছু কিছু সুবিধেবাদী সেনানায়কেরা নিষ্ক্রীয় হয়ে সরে দাঁড়ালেন। লড়তে লড়তে সেনানায়ক আলী মর্দান তাঁর তামাম সৈন্য হারিয়ে পলায়ন করলেন। সেনানায়ক মীর কামাল, মীর গাদাই, মীর সিরাজউদ্দীন, হাজী লুতফ্ আলী খান, হাজী কোরবান আলী খান ও আরো কিছু সেনানায়ক লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করলেন। নবাব সরফরাজ খানের হাতীর মাহুত নবাবকে পলায়ন করার অনুরোধ করলেন। নবাব সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বীরের মতো লড়তে লাগলেন এবং অকস্মাৎ এক গুলি এসে তাঁর কপালে লাগায় তিনিও তৎক্ষণাৎ শাহাদাত বরণ করলেন। নবাবকে নিহত হতে দেখে তাঁর পরম বন্ধুও বিশ্বস্ত সঙ্গী মীর দিলীর আলী আর বেঁচে থাকতে চাইলেন না। মাত্র ষোলজন সেপাই নিয়ে অনেক দুশমন বিনাশ করে তিনিও লড়তে লড়তে শহীদ হলেন। রাজপুত বীর বিজয় সিংহ তখন মরিয়া হয়ে গেছেন। বল্লম তাক করে ছুটে গিয়ে আলীবর্দী খানের বুক বরাবর মারার উদ্যোগ করতেই এক গোলার আঘাতে তিনিও রণক্ষেত্রেই মৃত্যু বরণ করলেন। নবাব সরফরাজ খানকে ভালবেসে তাঁর বিপুল সংখ্যক বিশ্বস্ত বন্ধুরা অকাতরে প্রাণ দিয়ে গিরিয়ার ময়দানে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

আলীবর্দী খানের বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেল। নবাবের বাদবাঁকী সেপাই সেনারা কেউ বা নিহত হলেন কেউ বা পালিয়ে গেলেন। মুহুর্মহু আলীবর্দী খানের জয়োধ্বনী উঠতে লাগলো।

এদিকে সুতীতে গাউস খান, দিলওয়ার আলী ও মীর শরাফউদ্দীন নন্দলালকে



www.amarboi.org

আলীবর্দী ভেবে সকাল বেলা সেখানে রণলিপ্ত হলেন। সেনাসৈন্য সহ প্রতারক নন্দলালকে নিহত করে অনেক বেলায় গিরিয়ায় ফিরে এসে দেখলেন, সব শেষ, নবাব সরফরাজ খান নিহত।

ক্রোধে ক্ষোভে দিশেহারা হয়ে তাঁরা ঐভাবেই আলীবর্দী খানের সংঘবদ্ধ বিশাল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। প্রাণপণে লড়ে এবং আলীবর্দী খানের বাহিনীকে পুনরায় আতংকিত করে সেনানায়ক গাউস খান তাঁর দুই পুত্র সহ শহীদ হলেন। মীর শরাফউদ্দীন ও দিলওয়ার আলী তারপরও লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁরাও তাঁদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদের হারিয়ে অসহায় হয়ে গেলেন। মীর শরাফউদ্দীনের পুনঃপুনঃ তাকিদ সত্বেও আত্মবিস্মৃত দিলওয়ার আলী একা একাই লড়তে লড়তে দুশমনের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগলেন। একেবারেই বৃথা চেষ্টা করতে দেখে মীর শরাফউদ্দীন অগত্যা দিলওয়ার আলীকে সবলে টেনে নিয়ে রণস্থল ত্যাগ করলেন।

নবাব সরফরাজ খানের নিরতিশয় ভাল মানুষী তথা নির্বুদ্ধিতার কারণে তাঁর সদাপ্রস্তুত বাহিনী প্রস্তুতি হারিয়ে এতিম হয়ে গেল। বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। চরম মুহূর্তে কেউ প্রস্তুত হতে পারলেন না, কেউবা একত্র হতেও পারলেন না। জয় হাতে পেয়েও নবাব সরফরাজ খান সবান্ধব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন।

রণস্থল ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে এসে মীর শরাফউদ্দীন ও দিলওয়ার আলী অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে বিদায় নিলেন এবং উভয় পথ ধরলেন। মীর শরাফউদ্দীন তাঁর গন্তব্য পথে রওনা হলেন, দিলওয়ার আলী মুর্শিদাবাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। এই শেষের দিকে একা একা লড়তে গিয়ে দিলওয়ার আলী অধিক আঘাতে বিক্ষত ও অবসন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের দিকে অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তিনি আর অশ্বপৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না, পুনঃপুনঃ গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলেন। এদিকে রাতও ঘনিয়ে এলো। নিরুপায় হয়ে তিনি নিকটবর্তী এক পল্লীতে ঢুকে পড়লেন এবং এক সদাশয় গৃহস্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

অর্ধচেতন্য অবস্থায় ঐ গৃহস্তের মকানেই দিলওয়ার আলীর সে রাত ও পরের দিন কেটে গেল। তার পরের দিন সকালেও দিলওয়ার আলী তেমন একটা শক্তি ফিরে পেলেন না। গৃহস্তের সহৃদয় আতিথেয়তায় দিলওয়ার আলী সে বেলাটাও সেখানেই বিশ্রাম নিলেন। দুপুরের পর তিনি অনেকখানি সুস্থ বোধ করলেন এবং শরীরেও শক্তি ফিরে পেলেন। আর বিলম্ব না করে পুনরায় যাত্রা করার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গৃহস্তটি তাঁকে আরো একটা দিন বিরাম নেয়ার জন্যে সাধাসাধি করলেন। কিন্তু দিলওয়ার আলীর সে সময় নেই। মুর্শিদাবাদ শহরটা পুরোপুরি দুশমন মুলুক বনে যাওয়ার আগেই তাঁর একবার মুর্শিদাবাদে যাওয়া চাই। মাহমুদা খাতুনেরা নির্বিঘ্নে মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন কিনা, সে খবর না করেই উড়িষ্যার পথে



www.amarboi.org

তাঁদের খুঁজতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। আজই তাঁর মুর্শিদাবাদে গিয়ে গোপনে সে খবর সংগ্রহ করা চাই।

সপরিবার গৃহস্তটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দিলওয়ার আলী আবার মুর্শিদাবাদের দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন এবং শাম ওয়াক্ত হয় হয়, এই সময় মুর্শিদাবাদ শহরের উপকণ্ঠে হাজির হলেন। সদর রাস্তা থেকে নেমে বিকল্প পথে মুর্শিদাবাদ শহরে প্রবেশ করার উদ্যোগ করতেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁর দিকে ছুটে এলো তাঁর সহকারী আসাদুল্লাহ। ব্যস্ত কণ্ঠে সালাম বিনিময় করেই আসাদুল্লাহ সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললো—সর্বনাশ ! একি উস্তাদ ! কি করছেন ? কোথায় যাচ্ছেন ?

দিলওয়ার আলী থতমত করে বললেন—এ্যাঁ ! তা-মানে, তোমাদের খোঁজে।

ঃ আপনি ক্ষেপেছেন উস্তাদ ? উঃ ! আল্লাহর কি রহম যে দেখা হয়ে গেল।

ঃ আসাদ মিয়া !

ঃ এই রকমই একটা মারাত্মক ভুল যে আপনি করে বসবেন, এ সন্দেহ বরাবর আমার ছিল। তাই গতকাল থেকেই আমি আপনার পথ আগ্‌লে আছি।

ঃ মানে ?

ঃ মুর্শিদাবাদ শহর কি আর মুর্শিদাবাদ আছে ? রাতারাতি এ শহর ভোল্ পাল্টিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে, প্রশাসনিক চত্বরে হালচাল তাজ্জবভাবে বদলে গেছে। উঠতে বসতে সকলেই আলীবর্দী খানের উদ্দেশ্যে অহরহ হাত তুলছে কপালে।

ঃ সেকি ! আলীবর্দী খান সাহেব কি মুর্শিদাবাদে পৌছেছেন ?

ঃ না, তিনি এখনো পৌছেননি। তবে তাঁর চেলা-চামুণ্ডা ফেউ-ফক্কর অনেকেই ইতিমধ্যে পৌছে গেছে আর মুর্শিদাবাদ শহরটাকে একটা জাহান্নামে পরিণত করে চলেছে।

দিলওয়ার আলী শশব্যস্তে বললেন—এ্যাঁ ! তা মাহমুদা খাতুনদের খবর কি ? সবাই তারা সহি-সালামতে শহর ছাড়তে পেরেছেন তো ?

আসাদুল্লাহ দমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এর জবাব দিতে না পেরে সে নতমস্তকে নীরব হয়ে রইলো। তার দুই চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে পড়তে লাগলো। তা দেখে দিলওয়ার আলী চমকে উঠে বললেন—আসাদুল্লাহ ! কথা বলছো না কেন ?

আসাদুল্লাহ রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—কি বলবো উস্তাদ ?

ঃ তার মানে ! তবে কি সব শেষ ?

ঃ প্রায় তাই-ই বলা যায় উস্তাদ !

দিলওয়ার আলী চীৎকার করে উঠলেন—আসাদুল্লাহ !

আসাদুল্লাহ বললো—তামামই শেষ না হলেও, যা ঘটেছে তা বললে আপনি সহ্য করতে পারবেন না !

ঃ সেকি ! কি ঘটনা আসাদ মিয়া ? কি ঘটেছে তাদের ? বলো বলো, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিনে।

ঃ কোন মতে মাহমুদা খাতুন সাহেবা আর আফসারউদ্দীন সাহেবকেই মকান



www.amarboi.org

থেকে বের করে দিতে পেরেছি। তাঁরা নামদার খাঁর সাথে নিরাপদেই ফৌজীপুরের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। কিন্তু—

ঃ কিন্তু—

ঃ ও মকানের আর কেউই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তাঁদের উপর তেমন কোন গজবের আশংকা নেই বোধে তাঁরা মকানেই রয়ে গেলেন।

ঃ আবিদ হোসেন সাহেব আর মাহমুদা খাতুনের আম্মাজানও ?

ঃ জ্বি, তাঁরাও !

ঃ তারপর ?

ঃ সব খতম হয়ে গেলেন।

দিলওয়ার আলী আর্তকণ্ঠে বললেন—খতম হয়ে গেলেন ! খতম হয়ে গেলেন মানে ?

ক্ষণিক নীরব থেকে আসাদুল্লাহ করুণ কণ্ঠে বললেন—গতকাল বিকেলে হায়াত খান তার ভাই ফৌজদার আতাউল্লাহর বাহিনীর এক অংশ নিয়ে এসে ঐ মকানে হানা দেয়। মাহমুদা খাতুন আর আফসারউদ্দীনকে না পাওয়ার আক্রোশে সে তখনই নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করেছে। চাকর-নফরও বাদ যায়নি।

দিলওয়ার আলী পুনরায় আর্তনাদ করে উঠলেন এবং এরপর অঝরে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। আসাদুল্লাহ ফের বললো—আবিদ হোসেন সাহেব আর মাহমুদা খাতুনের আম্মাজানের উপর হায়াত খান নিজে তলোয়ার চালিয়েছে। তার বাহিনীকে হুকুম দিয়ে ও মকানের ঝি-চাকর ও অন্যান্য সবাইকে হত্যা করিয়েছে।

দিলওয়ার আলী পথের উপরই বসে পড়ে আর্তকণ্ঠে বললেন—আসাদ মিয়া !

ঃ সেরেফ এখানেই শেষ নয় উস্তাদ ! ঐ শয়তান ঐ মকানে আগুন দিয়ে মকানটাও ভস্মিভূত করেছে।

সম্বিতহীন কণ্ঠে দিলওয়ার আলী বললেন—ভস্মিভূত করেছে !

ঃ সেরেফ ইটগুলোই খাড়া আছে, আর সব ছাই হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ আহাজারী করার পর দিলওয়ার আলী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ওটা যে একটা জানোয়ার, তা জানতাম। কিন্তু একেবারেই যে জাহান্নামের দোসর, তা আগে জানতাম না।

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে আসাদুল্লাহ বললো—কাজেই ওদিকে যেয়ে আর ফায়দা নেই উস্তাদ। আমাদের জন্যে এই শহরটা এখন একটা মউতের গহ্বর। ভেতরে গেলেই জানডা চলে যাবে।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর দিলওয়ার আলী উদাসকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—এখন কি করবে, স্থির করেছো ?

আসাদুল্লাহও উদাসকণ্ঠে জবাব দিলো—কি আর করবো উস্তাদ ? এই শহর আর আমার জন্যেও নিরাপদ নয়। অনেক আগেই আমি এখান থেকে চলে যেতাম। কিন্তু আপনার জন্যেই এখনও আমি রয়ে গেছি। কিছু না জেনেশুনে আপনি এসে এই শহরে ঢুকলেই যে মারা পড়বেন, এটা বুঝতে পেরেই আমি চলে যেতে পারিনি।



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠে বললেন— দোস্ত্ !

ঃ সেই থেকেই সম্ভাব্য সকল রাস্তায় আমি ছুটোছুটি করে ফিরছি। কখন যে কোন্ পথে এসে ঢুকে পড়েন আপনি !

ঃ তুমি আমার সেরেফ সহকারীই নও আসাদ মিয়া, তুমি আমার পরম দোস্ত। মস্তবড় খোশ্ কিস্‌মতির জন্যেই তোমার মতো একজন সঙ্গীকে আমি পেয়েছিলাম।

আসাদুল্লাহ নতমস্তকে বললো— আমাকে শরমিন্দা করবেন না উস্তাদ আপনি আমার ওস্তাদ, শিক্ষাদাতা। আমার কর্মসংস্থানটাও আপনিই করে দিয়েছিলেন। আপনার কাছে আমার ঋণ যে আকণ্ঠ উস্তাদ! সে তুলনায় কি আর এমন বিনিময়ে দিতে পারলাম আমি ?

ঃ অনেক, অনেক তুমি দিয়েছো আসাদ মিয়া ! এই হিংসুক দুনিয়ায় এটি বড়ই দুর্লভ !

ঃ উস্তাদ !

ঃ তা থাক এসব কথা। এখন কোথায় যাবে তুমি ?

ঃ আমি আমার নিজ এলাকায় চলে যাবো উস্তাদ। নিজের গাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো। এরপর ঝড়-তুফান থেমে গেলে অন্য জীবিকা তালাশ করবো। এ কাজে আর নয়, এখানে তো নয়ই।

ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সহি সালামতে রাখুন, তুমি সুখে থাকো— এই দোআটুকু করা ছাড়া আর তোমার জন্যে কিছু করার সাধ্য নেই আসাদ মিয়া !

ঃ ঐটিই তো আমার জন্যে পরম বস্তু উস্তাদ। ঐটিই আমার মস্তবড় পাওয়া।

ঃ অনেক গালাগালি করেছি, অনেক কটু কথা বলেছি। এ জন্যে তুমি আমাকে মাফ করে দিও ভাই।

আসাদুল্লাহ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বললো— এই অসময়ে দীলে আমার তকলিফ দেবেন না উস্তাদ ! ওগুলো তো সবই আপনার স্নেহ ছিল ! ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় ভাইয়ের মুহব্বত ছিল।

ঃ আসাদ মিয়া !

আসাদুল্লাহ চোখ মুছে বললো— আপনি এখন কি করবেন উস্তাদ ? উনাদের তালাশে বেরুবেন ?

ঃ বেরুতে তো হবেই জরুর। ওঁদের আবার কি হলো, ফৌজীপুরে গিয়ে ওঁরাও আবার কোন রকম মুসিবতে পড়লো কিনা, কে জানে ?

ঃ সে তো ঠিকই উস্তাদ। আর আপনি দেরী করবেন না। শিগ্গির গিয়ে ওঁদের খোঁজ করুন আর জলদি জলদি এ এলাকা ত্যাগ করুন। আমিও ইতিমধ্যেই সরে পড়ি—

কেউ আর কোন কথা বললেন না। পরম আবেগে উভয়েই কোলাকুলি করলেন। এরপর অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দিলওয়ার আলী রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— হয়তো এই জিন্দেগীতে আর আমাদের মোলাকাত কখনোও হবে না। আমার জন্যে দোআ করো আসাদুল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ—



www.amarboi.org

দিলওয়ার আলী অশ্বের লাগাম টানলেন। কান্না চেপে জবাব দিয়ে আসাদুল্লাহ ঝাপ্সা চোখে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

আসাদুল্লাহর কাছে বিদায় নিয়ে দিলওয়ার আলী তখনই ফৌজীপুরের দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। রাত্রির অন্ধকারে হেথা হোথা বিরাম নিয়ে তিনি পরের দিন সকালে এসে ফৌজীপুরে হাজির হলেন। ফৌজীপুরের মুনিব বাড়ীতে এসে পাইক-পেয়াদাদের জিজ্ঞেস করতেই তারা জানালো, হ্যাঁ, তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু গতপরশু বিকেলে আবার কোথায় যেন চলে গেলেন, আমাদের কাউকে বলে যাননি।

পাইক পেয়াদাদের মুখে দিলওয়ার আলীর পরিচয় পেয়ে মুনিব বাড়ীর এক আদায়কারী দিলওয়ার আলীকে আড়ালে ডেকে বললেন— গত পরশু বিকেলে তাঁরা উড়িষ্যার পথে রওনা হয়ে গেছেন। যে পথ ধরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের, তাঁরা সেই পথ ধরেই যাবেন। একমাত্র আপনাকে ছাড়া একথা অন্য কাউকে বলতে আমাকে নিষেধ করে গেছেন।

দিলওয়ার আলী আশ্বস্ত হয়ে বললেন— আচ্ছা !

আদায়কারী ফের বললেন— এ মকানের পাইক-পেয়াদারও এ খবর জানে না।

ঃ খুব ভাল কথা।

ঃ আপনার তয়তদবির করতে আমাকে বলে গেছেন আর খুব পরিশ্রান্ত হয়ে থাকলে এখানে বিশ্রাম নিতে বলে গেছেন।

বিশ্রামের চেয়ে দিলওয়ার আলীর আহারের প্রয়োজন ছিল অধিক। গতকাল দুপুর থেকে অভুক্ত ছিলেন তিনি। আদায়কারীর অল্প বলাতেই তিনি আগ্রহ করে কিছু মুখে দিলেন এবং ফৌজী লেবাস বদল করে সেখান থেকেই নিয়ে এক সাধারণ লেবাস পরলেন। আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র লেবাসের তলে লুকিয়ে নিয়ে আবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হলেন এবং উড়িষ্যার পথে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট সরাই ও মুসাফির খানাগুলোতে খোঁজ করতে করতে দিলওয়ার আলী এগিয়ে চললেন। পথে বেরিয়েই তিনি শুনলেন, লড়াইয়ে পরাজিত অনেক সেপাই ও ভীতসন্ত্রস্ত অনেক লোক এই পথেই দলে দলে উড়িষ্যার দিকে গেছে। এমনই কোন দলের সাথে আফসারউদ্দীন সাহেবেরা সামিল হলেন কিনা, একথা ভাবতে ভাবতে দিলওয়ার আলী এগুতে লাগলেন। পরপর কয়েকটি সরাইখানা ও মুসাফিরখানায় তালাশ করে তিনি তাঁদের কোন হদিসই পেলেন না। এতে তিনি অনেকখানি দমে গেলেন। আর না হোক, কোন খবরতো তাঁরা রেখে যাবেন কোথাও ? সন্দেহাকুল চিত্তে খোঁজ করতে করতে এক সরাইখানায় এসে তিনি জানতে পারলেন, একজন জেনানাসহ এই রকম তিনজন লোক এই সরাইখানায় এক রাত থেকে গেছেন। তাঁদের একজনের নাম নামদার খাঁ, এই কথা তাঁরা জানিয়ে গেছেন।

দিলওয়ার আলীর নির্জীব দীল সজীব হয়ে উঠলো। তিনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলেন। ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা এটা বুঝতে পেরে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার পথে নামলেন তিনি। কিন্তু আবার উৎসাহ তাঁর ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো।



www.amarboi.org

বিভিন্ন সরাইখানা ও মুসাফিরখানায় খোঁজ করে করে দিলওয়ার আলীর দিনরাত্রি পার হতে লাগলো, তবু তিনি আর কোন সন্ধানই তাঁদের পেলেন না। ইতিমধ্যে পথেই তিনি শুনতে পেলেন, আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করে নবাব হয়ে বসেছেন। যদিও এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা, তবু এ খবরে দিলওয়ার আলীর বিপন্ন অন্তর আরো অধিক বিষণ্ন হলো। বিষণ্ন দীল নিয়ে এক শামওয়াক্তে তিনি উড়িষ্যার সীমান্ত পার হয়ে এলেন। রাত্রি যাপনের জন্যে সেখানের এক সম্ভাব্য সরাইখানায় উঠেই তাঁর অন্তর আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি জানতে পারলেন, এই সরাইয়ে এসেও তাঁরা একরাত্রি থেকে গেছেন। নামদার খাঁর নাম তাঁরা এখানেও উল্লেখ করে গেছেন।

এই সরাইখানায় রাত্রিকালে শুয়ে শুয়ে দিলওয়ার আলী ভাবতে লাগলেন, এরপর কোন্‌দিকে কোন্ সরাইয়ে যেতে পারেন তারা ? নামদার খাঁ ছাড়া এ অঞ্চলের পথ-ঘাট বা সরাই-আশ্রয় তাঁর তেমন জানা নেই। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো নামদার খাঁর একটা কথা। নামদার খাঁ বলেছিল, উড়িষ্যায় ঢোকার পর বড় রাস্তা যেখানে বাম দিকে মোড় নিয়ে উড়িষ্যার সদরের দিকে গেছে, ঠিক ওখান থেকেই একটা ছোট রাস্তা ডানদিকে বরাবর এক মফস্বল বাজারের দিকে গেছে। সেখানে এক বড়োসড়ো সরাইখানা আছে। খুব নিরাপদ আর নামদার খাঁর খুবই চেনাজানা সরাইখানা। কোথাও তাদের সাথে যোগাযোগ না হলে, দিলওয়ার আলী যেন সরাসরি সেখানে গিয়ে খোঁজ করেন। দিলওয়ার আলীর পথ চেয়ে ঐ সরাইখানাতেই তারা অনেকদিন থাকবে। এরপরও দিলওয়ার আলী না এলে যা ভাল বোঝেন, আফসার-উদ্দীন সাহেবই তা ঠিক করবেন। নামদার খাঁ আরো বলেছিল, কোন কারণে দিলওয়ার আলী আগেই সেখানে পৌঁছলে, তিনি যেন ওখানেই অপেক্ষা করে থাকেন। যখনই আর যে পথ দিয়েই হোক, নামদার খাঁ ঐ ভাইবোনদের নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছবেই।

পরের দিন প্রত্যুষেই বেরিয়ে দিলওয়ার আলী সন্ধান করে সেই পথ ধরলেন এবং বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে সেই বাজারে এসে হাজির হলেন। বাজারে এসে দেখলেন, সামনেই একদল লোক মারাঠা বর্গীদের নিয়ে কি সব আলোচনা করছে। তাদের কথায় কান না দিয়ে দিলওয়ার আলী সরাইখানার খোঁজ করতে লাগলেন। অল্প একটু খোঁজ করতেই একজন পথচারী তাঁকে সরাইখানাটা দেখিয়ে দিলেন।

খুব নামকরা সরাইখানা। উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে এবং বিহারের দিক থেকে যেসব মুসাফির এদিকে আসে, তারা বেশীর ভাগই এসে এই সরাইখানাতে উঠে। এ কারণে, মফস্বলে হলেও, এ সরাইয়ের আয় উন্নতি ও নাম ডাক অনেক। মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা সরাইখানাটির আয়তন বৃহৎ। জেনানা, মর্দানা, মালমাত্তা, পশুপাল—সকলের জন্যেই পৃথক পৃথক চত্বর। যদিও চত্বরগুলো নোংরা আর অপরিষ্কার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যে কয়েকটি ভিন্ন কক্ষও আছে। সেগুলো বেশ পরিষ্কার আর ভাড়াও অনেক বেশী।

দোদুল্যমান চিত্তে সরাইখানার ফটকের কাছে এসেই দিলওয়ার আলী এক প্রৌঢ় লোকের সাক্ষাত পেলেন। লোকটি দুইজন মজুরের মাথায় মস্ত মস্ত দুইটি খালি ঝুড়ি



www.amarboi.org

চাপিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। আর কাউকে না পেয়ে দিলওয়ার আলী তাকেই উদ্দেশ করে বললেন — এই যে দেখুন, আমি একটু কথা বলতে চাই।

লোকটি থমকে গিয়ে বললো — আমি বাজার করতে বেরুচ্ছি, সময় আমার কম। তবু বলুন ?

দিলওয়ার আলী বললেন — আপনি কি এই সরাইয়ে কাজ করেন ?

ঃ জি অনেকদিন থেকেই করি।

ঃ অনেক দিন থেকে ?

ঃ জি-জি। আমার নাম নফর শেখ। নফর আলী শেখ। এই সরাইখানার সবচেয়ে পুরানো কর্মচারী। কিন্তু কেন, বলুন তো ?

ঃ আপনি কি বলতে পারেন, এই সরাইখানায় বাংলা মুলুক থেকে তিনজন লোক, মানে একজন জেনানাসহ —

কথার মাঝেই নফর শেখ শশব্যস্ত বলে উঠলো — তাঁদের একজনের নাম কি নামদার খাঁ ?

দিলওয়ার আলী উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ নাম। তাঁরা কি এই সরাইয়ে —

নফর শেখ খোশ কণ্ঠে বললেন — জি জনাব, জি-জি। নামদার ভাইয়ের সাথে এক সাহেব আর এক মহিলা গতকাল এই সরাইয়ে এসে উঠেছেন।

ঃ আপনি নামদার খাঁকে চেনেন ?

ঃ জি। নামদার খাঁকে এই সরাইখানার অনেকেই চেনে। অনেকদিন আগে ঐ নামদার খাঁ এই সরাইখানায় বেশ কিছুদিন নকরী করে গেছে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি-জি। আমার সাথেই তার খাতিরটা বেশী হয়। কিন্তু আধ্‌পাগলা মানুষ ! মুনিবের সাথে বনিবনা না হওয়ায় সে নকরীটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

ঃ বলেন কি !

ঃ অনেকদিন পরে আবার হঠাৎ গতকাল দেখা। আপনি কি তাঁদের সাথে মোলাকাত করতে চান ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঃ আসুন-আসুন —

বলেই নফর শেখ মজুর দু'টিকে বললো — তোমরা একটু দাঁড়াও, এই সাহেবকে আমি পৌছে দিয়েই আসছি —

ছোটবড় কয়েকটি চত্বর পেরিয়ে সরাইখানাটির এক প্রান্তে এক পরিচ্ছন্ন চত্বরে এসে নফর শেখ বললো — যান জনাব, ঐ সাহেব আর জেনানা ঐ কক্ষে আছেন।

অঙ্গুলী নির্দেশে কামরাটি দেখিয়ে দিয়ে নফর শেখ চলে গেল। উদ্বেলিত অন্তর নিয়ে এসে দিলওয়ার আলী কক্ষটির দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দরজাটি অর্ধোন্মুক্ত ছিল। ভেতরের কেউ দেখতে পাওয়ার আগেই তাঁকে দেখতে পেলো নামদার খাঁ। সে এই চত্বরের একধারে দাঁড়িয়েছিল। দিলওয়ার আলীকে দেখেই সে বিপুল উল্লাসে



www.amarboi.org

চীৎকার দিয়ে উঠলো — সোবহান আল্লাহ ! আসি গৈল্, হজৌর আসি গৈল্ — হামার হজৌর আসি গৈল্ —

নামদার খাঁ ছুটে আসতে লাগলো। নামদার খাঁর কথা কানে পড়তেই জ্যা-মুক্ত ধনুকবৎ আফসারউদ্দীন ও মাহমুদা খাতুন কক্ষের ভেতর থেকে ছিট্‌কে দরজার কাছে এলেন। দরজার পাল্লা মেলে ধরেই হাতে আসমান পাওয়ার মতো আফসারুদ্দীনও পরম উল্লাসে চীৎকার দিয়ে উঠলেন — এ্যাঁ ! একি ! আলহামদুলিল্লাহ ! ভাই সাহেব এসে গেছেন ? ভাই সাহেব জিন্দা আছেন ?

বলতে বলতে আফসারউদ্দীন এসে দিলওয়ার আলীকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। মাহমুদা খাতুনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। কিছু বলার করার না পেয়ে, আনন্দের আধিক্যে সে কেঁদেই ফেললো ঝর ঝর করে।

দিলওয়ার আলীর নজর তা এড়ালো না। আবেগে পানি এলো দিলওয়ার আলীর চোখেও। আফসারউদ্দীন দিলওয়ার আলীকে জড়িয়ে ধরে কামরার মধ্যে আনতে আনতে ফের বললেন — ওহ্ ! কি আনন্দ-কি আনন্দ ! আসমানের চাঁদটা হাতের মধ্যে পেলেও বুঝি এত আনন্দ আজ আমাদের হতো না !

তিনি দিলওয়ার আলীকে টেনে এনে খাটিয়ার উপর বসালেন। খুশীতে অধীর হয়ে নিজে তাঁর পাশে বসেই এক পাশে দণ্ডায়মানা মাহমুদা খাতুনকে উদ্দেশ করে বললেন — আয় আয়, মোড়াটা টেনে নিয়ে কাছে এসে বোস্।

নেকাবের আকারে ওড়নার আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে মাহমুদা খাতুন এসে মেঝেয় পাতা মোড়াটাতে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লো এবং আনন্দে ছটফট করতে লাগলো। এঁদের এই আনন্দ দেখে দিলওয়ার আলীর অকস্মাৎ মনে হলো — আহা বেচারীরা ! এরা যদি ঘুর্ণাক্ষরেও জানতেন, আম্মাজান নানাজান সহকারে তাঁদের গোটা পরিবারটা খতম হয়ে গেছে।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে নামদার খাঁ আনন্দে দাফাদাফি করছিল। তা দেখে আফসারউদ্দীন বললেন — এসো-এসো নামদার মিয়া, ঐ খাটিয়ায় বসো —

কক্ষের দুস্‌রা খাটিয়ায় বসতে বসতে নামদার খাঁ আবার আওয়াজ দিয়ে উঠলো — কেয়া খোশ্-কেয়া খোশ্ ! হামার হজৌর আসি গৈল্ !

নতমস্তকে বসে থেকে মাহমুদা খাতুন এবার মৃদুকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলো — আল্লাহ তায়ালার প্রতি লাখো লাখো শুকরিয়া ! আর আমাদের ভাবনা নেই। কোনই দুঃখ নেই। এমন খোশ্ কিস্‌মতি যে সত্যি সত্যিই হবে, এতটা আশা করার মনোবলই আমার ছিল না।

আফসারউদ্দীন হাসিমুখে দিলওয়ার আলীকে বললেন — আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমটা শেষ পর্যন্ত হলোই, না কি বলেন ভাই সাহেব ?

দিলওয়ার আলী বললেন — মানে ?

ঃ মানে, তিনি আপনাকে মেহেরবানী করে জিন্দাই রাখলেন ?

দিলওয়ার আলী উদাস কণ্ঠে বললেন — হ্যাঁ, অসংখ্য মহামূল্যবান জীবন



www.amarboi.org

কোরবানী হয়ে গেল, আর সে স্মৃতি বয়ে বেড়ানোর জন্যে এই নাদানকে জিন্দাই রাখলেন বৈ কি ?

মাহমুদা খাতুন ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো — সেকি ! আমাদের কথা তাহলে—

আফসারউদ্দীন বললেন — একথা বলছেন কেন ভাই সাহেব ? আমাদের মুখ চেয়েই যে আপনার জিন্দা থাকা প্রয়োজন, একথা ভুলে গেলেন কেন ?

ঃ ভুলে যাইনি ভাই। ভুলে যাইনি বলেই তো আত্মীয়বান্ধব সবাই লাশ হয়ে যাওয়ার পরও, নিজে আমি লাশ হতে পারলাম না। একজন একটু টান দিতেই আমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে এলাম।

চাপা নিঃশ্বাস ফেলে আফসারউদ্দীন বললেন — তা কি ব্যাপার ভাই সাহেব ? এতটা আশ্বাস দিয়ে ছিলেন, অথচ এমন পরাজয় —

দিলওয়ার আলী ক্ষোভের সাথে বললেন — বেঈমানী ! সীমাহীন বেঈমানী আর নজীরবিহীন বেয়াকুফীই আমাদের এই পরাজয়ের কারণ। নইলে জয় তো আমাদের হয়ে ছিলই।

ঃ তার মানে ?

দিলওয়ার আলী অতি সংক্ষেপে তামাম ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। শুনে সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আফসারউদ্দীন ম্লান কণ্ঠে বললেন — সবই নসীব ! তা ওদিকে, মানে আমাদের মকানে তো যাওয়া আপনার হয়ে উঠেনি ?

দিলওয়ার আলী অলক্ষ্যে চমকে উঠলেন। তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে গেল। এ সময়ে সে কথা তাঁদের বলার মতো সাহস তাঁর হলো না। শান্ত পরিবেশে ধীরেসুস্থে এসব তাঁদের বলবেন বলে তিনি এ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইলেন। আফসারউদ্দীনও সে সুযোগ তাঁকে এনে দিলেন। তখনই তিনি আবার বললেন — তা হবেই বা কি করে ? একেবারে আমাদের মকানে গিয়ে হাজির হওয়ার সময় আর সুযোগটা কোথায় আপনার ? সে যাক, ফৌজীপুরে কি গিয়েছিলেন ?

দিলওয়ার আলী তড়িঘড়ি বললেন — জি-জি। ওখানে গিয়েই তো ফৌজী লেবাস বদল করে এসেছি।

খেয়াল হতেই মাহমুদা খাতুন শংকিত কণ্ঠে বললো — ও হ্যাঁ, উনার লেবাসটা তুলে দেখুন তো ভাইজান, বড় রকমের চোট্ কোথাও লেগেছে কিনা ?

আফসারউদ্দীনও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন — তাইতো-তাইতো ! দেখি-দেখি—

বলতে বলতে তিনি দিলওয়ার আলীর গায়ের বেখাপ্পা শেরওয়ানীটা উপরে তুলে ধরলেন। তুলেই তাঁরা দেখলেন, দিলওয়ার আলীর বুকে পিঠে ছোটবড় অনেকগুলো ক্ষত। এই কয়দিনে অনেকখানি শুষ্ক হয়ে এলেও, রক্ত ঝরে ঝরে সেগুলো চট্‌চটে হয়ে আছে আর স্থানে স্থানে দু' একটি ক্ষত দগদগে আছে তখনও। দেখেই তারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মাহমুদা খাতুন আর্তকণ্ঠে বললো — ওমা ! কি সর্বনাশ ! ঘাগুলো তো এখনই সাফ করার দরকার আর শেক দেয়ার দরকার। তেল মলমও মালিশ করতে হবে !



www.amarboi.org

আফসারউদ্দীন বললেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, অবশ্যই তা করতে হবে। কিন্তু তুইতো তা করতে এখন — মানে, তুই কি করে করবি ? ঠিক আছে। তুই এখন আপাতত নামদার মিয়ার এই পাশের কামরায় গিয়ে থাকবি। ভাই সাহেব তোর খটিয়ায় বিরাম নেবেন। ধোয়ামুছা মালিশ-শেক যা দরকার, আমি আর নামদার খাঁই করবো।

মাহমুদা খাতুন আমতা আমতা করে বললো — কিন্তু আপনারা কি তা ঠিক মতো —

আফসারউদ্দীন হাসিমুখে বললেন — আরে বাবা, হয়েছে ! ভাই সাহেব আজ খুব ক্লান্ত। আজকের দিনটা যাক। তারপর ভাই সাহেবের খেদমত তুই একাই যাতে করে করতে পারিস, সে ব্যবস্থা আগামী কালই করে দেবো। এভাবে বেগানা হয়ে বাস করাতো সম্ভব নয়।

লজ্জায় নুয়ে পড়ে মাহমুদা খাতুন শাসনের সুরে বললো — ভাইজান !

আফসারউদ্দীন বললেন — শরম করার ফাঁক নেই। ভাই সাহেবকে সুস্থ করে তোলার ভার কাল থেকে তোকেই নিতে হবে।

দিলওয়ার আলীও শরম পেলেন। শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন — কি খামাখা পেরেশান হচ্ছেন ভাই সাহেব ? আমি তো অসুস্থ নই। আর এই ঘাগুলোও এমন কিছু মারাত্মক নয়। শুকিয়েই প্রায় এসেছে। আর কয়দিন গেলেই বিলকুল শুকিয়ে যাবে আপ্‌ছে আপ্‌।

আফসারউদ্দীন বললেন — সেটা আমি বুঝবো। কিন্তু আর কথা নয়, এখন আপনি বিশ্রাম নেবেন।

ঃ বিশ্রাম ?

ঃ উঠুন-উঠুন। হাতমুখ ধুয়ে এসে এই মাহমুদা খাতুনের খাটিয়ায় আরাম করে বসুন। নামদার মিয়া খানার আনযাম দেখুক।

দিলওয়ার আলী গড়িমসি করে বললেন — তাতো বুঝলাম। কিন্তু এখানে আমরা কয়দিন ধরে থাকবো ?

ঃ থাকিনে কিছুদিন। বেশ চমৎকার আশ্রয়। কোনই অসুবিধে নেই।

ঃ কিন্তু খরচটাতো আছে। পথেই বসে বসে পুঁজিপাট্টা ক্ষয় করলে, নিরাপদ স্থানে গিয়ে আমরা কি দিয়ে চলবো ?

আফসারউদ্দীন হেসে বললেন — আরে কি যে বলেন ভাই সাহেব ? একেবারেই কি খালি হাতে বেরিয়েছি ? কমছে কম বছর খানেক সবাই মিলে রাজার হালে চলার মতো পুঁজিপাট্টা হাতে নিয়েই বেরিয়েছি।

ঃ তা-মানে —

ঃ উহুঁ, আর কথা নয়। এবার বিশ্রাম।

বলেই আফসারউদ্দীন উঠে দাঁড়িয়ে নামদার খাঁকে বললেন — এসো তো নামদার মিয়া, প্যানিটানি ঠিক আছে কিনা আর তোমার ঘরটা কেমন আছে, দেখি। রাতে ভাই সাহেবের ব্যবস্থাটা তোমার ঘরেই করা যায় কিনা দেখি, চলো। পাশাপাশি থাকলে আমরা সবাই মিলে তাঁর খেদমতটা করতে পারবো।



www.amarboi.org

নামদার খাঁ সহকারে আফসারউদ্দীন বেরিয়ে গেলেন। দিলওয়ার আলীকে একা পেয়ে মাহমুদা খাতুন সলজ্জ হাসিমুখে বললো—আল্লাহ তায়ালা আমার আরজটা ঠিকই পূরণ করেছেন।

দিলওয়ার আলীও হাসিমুখে বললেন—কি রকম ?

ঃ লড়াইয়ে যদি পরাজয়ও হয়, তবু যেন আপনাকে পাশে পাই, এই ছিল আমার একান্ত কামনা। তাই-ই পেয়ে গেলাম। এখন আমার চেয়ে আর অধিক খুশী কে ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ আর ফেলে যাওয়ার মওকা নেই। যেখানেই যাবেন, পাশছাড়া আর হচ্ছিনে।

দিলওয়ার আলী রসিকতা করে বললেন—যদি অরণ্যে যাই ?

মাহমুদা খাতুন বললো—ওভি আচ্ছা, সাথেই আছি।

ঃ তা না হয় হলো। কিন্তু আমার খেদমতটা ? সেটা কি ঐ নামদার খাঁ-ই করবে?

মুখটিপে হেসে মাহমুদা খাতুন বললো—তা করে করুক গে ! আমার কি ঠেকা ?

দুপুরটাও পেরুলো না। মাহমুদা খাতুনের খাটিয়ায় শুয়ে দিলওয়ার আলী গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। আফসারউদ্দীন, মাহমুদা খাতুন ও নামদার খাঁ–সবাই ঐ কক্ষে বসে গল্প গুজব করছিলেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নফর শেখ সেখানে এসে হাজির হলো এবং সরাসরি দিলওয়ার আলীকে লক্ষ্য করে বললো—হুজুর, আপনি কি ফৌজীলোক ?

সকলেই অবাক হলেন। দিলওয়ার আলী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কেন, একথা বলছেন কেন ?

নফর শেখ একটু ইতস্তত করে বললো—না মানে, নামদার ভাই বলেছিলো, তার হুজুর একজন মস্তবড় ফৌজীলোক। তিনি এখানে আসবেন। আপনি কি সেই লোক ?

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু কেন ?

নফর শেখ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—তাহলে তো হুজুর, আপনাকে এখনই সাবধান হতে হয় !

ঃ মানে ?

ঃ তল্লাশী শুরু হয়েছে যে।

ঃ তল্লাশী !

ঃ জি। বাজার করতে গিয়ে এইমাত্র শুনে এলাম। বাজারে সবাই বলাবলি করছে, সরাইখানা মুসাফিরখানা, লোক বসতি, সবস্থানে তল্লাশী চলবে। বাংলা মুলুকের কোন ফেরারী সেপাই বা ফৌজী লোক কেউ থাকলে, তাদের খুঁজে খুঁজে ধরা হবে।

ঃ কি রকম ?

ঃ লড়াইয়ে পরাজয় হওয়ার পর মরহুম নবাব সরফরাজ খানের সেপাই-সেনারা এদিকেই তো পালিয়ে এসেছে হুজুর। বিহার নয়া নবাব আলীবর্দী খানের এলাকা। ওদিকে তো যাওয়ার উপায় নেই ! বাংলা ছেড়ে পালালে, একমাত্র এইদিকটাই খোলা। তাই এইদিকেই তালাশ করে ধরতে আসছে তাদের।



www.amarboi.org

ঃ কে ধরতে আসছে ?

ঃ নয়া নবাব আলীবর্দী খানের সালার। আতাউল্লাহ খান, না কি যেন নাম। ফৌজদার ছিলেন কয়দিন আগে। উনিই মস্তবড় এক বাহিনী নিয়ে তল্লাশীতে বেরিয়েছেন।

সকলেই অতিশয় শংকিত হয়ে উঠলেন। দিলওয়ার আলী বললেন — এসব কথা তোমাদের বাজারের লোক কোথায় পেলো ?

ঃ বাংলা থেকে যেসব অশ্বারোহী সওদাগরেরা এই বাজারে এখনই এসেছে, তারা নিজেরা সেটা দেখে এসেছে। নবাবের ফৌজ পথের মাঝে থেমে থেমে বাজার বস্তী তালাশ করছে আর এগিয়ে আসছে। এই উড়িষ্যার প্রায় কাছাকাছি নাকি এসে গেছে তারা।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে দিলওয়ার আলী বললেন — তাজ্জব ! তা কি করে হয় ? লড়াই সেই কবে শেষ হয়েছে আর এখন এই তল্লাশী —

নফর শেখ বললো — অমনি অমনি নয় হুজুর। সওদাগরেরা শুনে এসেছে, অনেক সেপাই এই উড়িষ্যায় এসেছে। এদিকে উড়িষ্যার শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী বাহাদুর নয়া নবাব আলীবর্দী খানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে যাননি। তামাম শাসনকর্তারা সে কাজ শেষ করেছেন, কিন্তু ইনি এখনও যাননি। নয়া নবাব তাই নাকি ভয় করছেন, এই এতসব ফেরারী সেপাই-সেনা হাতে পেলে উড়িষ্যার শাসনকর্তা জোট পাকাতে পারেন, এই আর কি।

ঃ তুমি কি ঠিক জানো ?

ঃ আরে, এই সরাইয়ের তামাম লোকজন তা জেনে গেছেন, দুই একজন সেপাই যাঁরা এই সরাইয়ে আছেন, তাঁরাও এখন বেরিয়ে পড়ছেন, আমি ঠিক জানবো না কেন ?

এমন সময় অদূরে সরাইখানার খোদ মালিকের গলা শুনা গেল। সরাইখানার চাকর-বাকরদের উদ্দেশে তিনি বলছেন, "প্রত্যেক চত্বরে গিয়ে এলান দিয়ে এসো। বাজারের চৌকিদার এসে জানিয়ে গেল, নবাবের ফৌজ নাকি আমাদের সীমান্তে এসে পৌছে গেছে। আজ রাতের মধ্যেও এই এলাকায় আসতে পারে। কাজেই, বাংলার কোন সেপাই বা ফৌজী লোক থাকলে, এখনই তাঁদের সরাইখানা ছেড়ে দিতে বলো। নইলে, তাঁরা তো মারা পড়বেনই, আমাদেরও মুসিবত হবে।"

একথা শুনার পর সকলেরই মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়ে গেল। নফর শেখ বললো — ঐ শুনুন, আমাদের মালিকও এখন কোন ফৌজী লোককে থাকতে দিতে রাজী নন।

আফসারউদ্দীন বিবর্ণমুখে দিলওয়ার আলীকে বললেন — তাহলে ভাই সাহেব, আমরা এখন কি করবো, ভাবছেন ?

দিলওয়ার আলী বললেন — আর ভাবাভাবির প্রশ্ন নেই, এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

ঃ ভাই সাহেব।



www.amarboi.org

ঃ উড়িষ্যাও যে আমাদের জন্যে নিরাপদ স্থান নয়, এটাতো জানা কথা।

ঃ কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিনে, এ নিয়ে এই সরাইয়ের মালিক পক্ষও এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ? এখানে সত্যিই কেউ তল্লাশী করতে আসবে, কিনা, তার ঠিক কি ? বিশেষ করে এই মফস্বল এলাকায় ?

দিলওয়ার আলী ঘরপোড়া গরু। এই রকম অগ্রাহ্য করেই আবিদ হোসেন সাহেবেরা খতম হয়ে গেছেন। এখানেও আসছে ফের ঐ হায়াত খানেরই ভাই আতাউল্লাহ্ খান। ঐ বেয়াকুফী দিলওয়ার আলী আর কিছুতেই করতে রাজী নন। তিনি শক্ত কণ্ঠে বললেন—আসুক না আসুক, এখানে আর একদণ্ডও নয়। মালিক পক্ষ আপত্তি না করলেও, এই সন্দেহের মধ্যে থাকতে আমি নারাজ।

ঃ তাহলে কোন্ দিকে যাবো এখন আমরা ?

ঃ এই নামদার খাঁর এলাকায়, এই মাত্র জানি। এই উড়িষ্যায় আর নয়।

ঃ কিন্তু পথঘাট—

ঃ সব এখন নামদার খাঁর উপর। যেদিকে সে নিয়ে যাবে, তাই সই।

নামদার খাঁ বললো—নাই-নাই, কুছু ডর নাই হজৌর। রাহা হামার বিলকুল পয়চান আছে বটে। জানা আছে। বরাবর ছিধা পশ্চিমে যাইবেক তো ঠিক যাইবেক।

নফর শেখ এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে এঁদের কথাবার্তা শুনছিলো। নামদার খাঁর কথা শুনে সে চমকে উঠে বললো—সেকি ! বরাবর পশ্চিমে ! তুমি কি পাগল হয়েছো নামদার মিয়া ?

নামদার খাঁ বললো—কেনে ? হামি পাগেলা বনি যাইবেক কেনে ?

নফর শেখ বললো—তুমি কোনই খবর জানো না ? উড়িষ্যার এই পশ্চিম এলাকা এখন বর্গীতে ছেয়ে গেছে। পথে কোন নিরাপত্তা নেই।

ঃ কিয়া কহা ?

ঃ পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মারাঠা লুটেরা এসে ও অঞ্চলে পৌছেছে। ওরা সরে না গেলে কি ওপথে পারতপক্ষে কেউ যায় ?

দিলওয়ার আলীর খেয়াল হলো। এই রকমই কি সব কথাবার্তা বাজারের লোক বলাবলি করছিলো। তিনি উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন—সরে যাবে মানে ? সরে ওরা কোথায় যাবে ?

নফর শেখ বললো—শুনছি, ওদের লক্ষ্য বাংলা মুলুক। বাংলা মুলকের ধন-সম্পদের লোভে ওরা এখন হন্যে হয়ে বাংলার দিকে ছুটে আসছে।

ঃ বাংলার দিকে ?

ঃ ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে হুজুর। ওদিক থেকে যেসব লোক এখন এদিকে আসছে, তারাই একথা বলছে।

ঃ তার মানে ? কোথা থেকে এলো এসব বর্গীরা ?

ঃ সেকি হুজুর ! এসব খবর কিছুই জানেন না ? উড়িষ্যার একজন অদ্‌না আদমীও কিন্তু এ খবর জানে। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল বাদশাহরা কেউ তো আর ঐ মারাঠা দস্যুদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। তামাম হিন্দুস্তান ওরা



www.amarboi.org

চষে বেড়িয়েছে এযাবত। এখন বাংলার দিকে যাচ্ছে। শুনছি, মারাঠা নেতারা বাংলার মসনদের দিকেও হাত বাড়াতে পারে।

ঃ তাজ্জব ! আপনি এত কথা —

ঃ বাজারে গেলেই যে শুনতে পাই হুজুর। বাজারে যে এখন সবসময় এই আলোচনাই হয়। বাংলায় পার হয়ে যাওয়ার আগে উড়িষ্যার যে কি দুর্গতি করে তারা, এই চিন্তায় সকলেই এখন অস্থির।

ঃ শেখ সাহেব !

ঃ ওদিকের পথঘাটে এখন বড়ই মুসিবত হুজুর ! সন্ধ্যার আগেই তামাম ময়দান সাফ। কাউকেই আর পথে প্রান্তরে দেখবেন না। বাগে পেলেই বর্গীরা পথিকদের সবকিছু লুট করে নেবে।

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নামদার খাঁ বললো — তব্ কিয়া হৈল্ রে বা ? পথের কেনারে কেত্তো সরাইখানা, মুসাফিরখানা, বস্তি বাজার আছে। শাম ওয়াক্ত হো যাইবেক তো হামরা সরাইখানায় চলি যাইবেক। বর্গী আছে তো কৌন্ ঠেকা, তুম কহো ?

নফর শেখ চিন্তা করে বললো — তাতো বুঝলাম। কিন্তু মুসিবত ওদিকে এখন খুবই বেশী। তার উপর ইনারা সবাই যদি সাথে থাকেন, তাহলে আরো বিপদ। সবাই এঁরা সম্ভ্রান্ত লোক। দৌলতমান্দ আদমী। সাথে ফের জেনানা। দৌলত আর জেনানার উপরই যে বর্গীদের নজর খুব তীক্ষ্ম।

আফসারউদ্দীন ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন — তাহলে কোন্ দিকে যাওয়া যায়, তা কি কিছু আপনি বাতলে দিতে পারেন ?

চিন্তান্বিত কণ্ঠে নফর শেখ বললো — সেটা তো বলা মুস্কিল। সোজা উত্তর দিকে বিহারে গেলে চলে। কিন্তু সেখানে আপনারা —

আফসারউদ্দীন বাধা দিয়ে বললেন — না-না, ঐ নয়া নবাবের আঁওতা থেকে দূরে থাকতে চাই আমরা।

ঃ তাহলে তো আপনাদের ঐ পশ্চিম দিকেই যেতে হয়। ঠিক আছে, তাই আপনারা যান। নামদার খাঁর লোক আপনারা বলেই এত কথা ভাবছি।

ঃ শেখ সাহেব !

ঃ খুব বেশী ঘাবড়ানোর কিছু নেই হুজুর। লোকজন তো কিছু কিছু চলাচল করছেই। তবে হুশিয়ার থাকবেন সবসময়। রাত্রি নেমে এলে আর পথে প্রান্তরে থাকবেন না।

ঃ জি ?

ঃ নিরাপদ যখন এ জায়গাও নয়, তখন এত ভেবে আর করবেন কি ?

সাঁতারের উপর পানি নেই। পরিস্থিতির নির্মম চাপে বিষণ্ন দীলে সকলেই সরাইখানা ত্যাগ করলেন। মাহমুদা খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বললো — কি গুনাহ্ই যে করেছি এই জিন্দেগীতে, এতটুকু সুখের মুখ একদিনও দেখলাম না।



www.amarboi.org

আফসারউদ্দীন অসহায় কণ্ঠে বললেন—আবার যে কোন্ মুসিবতে পড়তে হয়, কে জানে? কিন্তু তবু তো উপায় নেই।

দিলওয়ার আলী উদাস কণ্ঠে বললেন—তুফানের মধ্যেই ডুবে আছি। মরা কাকের আর চড়কে কি ভয় ভাই সাহেব?

ঃ জি?

ঃ ঐ এলাকায় যাবো বলেই বেরিয়েছি। যাওয়ার জায়গাও যখন আর নেই, মুসিবতের ভয় করলে চলবে কেন? আল্লাহ তায়ালার যা ইচ্ছে, তা তিনি করবেন। আমাদের চেষ্টা আমরা করি।

নামদার খাঁ সাহস দিয়ে বললো—মুসিবত নাই হুজৌর। শাম ওয়াক্ত হইবেক তো মুসাফিরখানায় চলি যাইবেক। খুব নযদিক এক আচ্ছা মুসাফিরখানা আছে। বহুৎ লোকজন, মস্ত মকান। কুছু ডর নাই।

বাজার থেকে বেরিয়ে তাঁরা পল্লীর মেঠো পথ ধরলেন এবং সরাসরি পশ্চিম দিকে যেতে লাগলেন। পথে নেমে দেখলেন, পথ বিলকুল নির্জন নয়। অল্প হলেও লোক চলাচল আছে। যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন ততই তাঁরা লক্ষ্য করলেন, পথিকেরা সকলেই চঞ্চল এবং গতি সবার দ্রুত। দেখলেই বোঝা যায়, বেলা ডোবার আগেই সবাই গন্তব্য স্থানে পৌঁছা নিয়ে ব্যস্ত।

প্রাণপণে তাঁরাও অনেক পথ এগিয়ে এলেন। কিন্তু বেলা যখন একেবারেই শেষ হয়ে এলো, নামদার খাঁর ঐ 'আচ্ছা মুসাফিরখানা' তখনও অনেক দূরে। আরো দু'টি মাঠ ও একটি নির্জন বনবাদার পেরুতে হবে তখনও। মাঠ বলেই মাঠ নয়, এক একটা মহাদেশ। এপার থেকে ওপারের লোকবসতি ছায়ার মতো দেখায়।

পায়ের গতি আরো তাঁরা দ্রুত করলেন। কিন্তু যথাসাধ্য করেও একটা মাঠ পেরিয়ে এক গ্রামে এসে পৌঁছতেই সূর্য পাটে বসে গেল। সামনে আর এক বিশাল মাঠ ও তারপর কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া গাছ-গাছড়ার পথ। নামদার খাঁর মতে, বহুৎ বিরামের রাহা, রোদ মাথায় লাগে না। কিন্তু এখন যে চাঁদের আলোও পশবে না, সে খেয়াল নামদার খাঁর নেই।

অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠলেন সবাই। মুসাফিরখানায় না পৌঁছলে আর রাত কাটানোর জায়গা নেই। জীবন মরণ পণ করে ফের মাঠে নামলেন তাঁরা। গ্রাম ছেড়ে রশি কয়েক এগুতেই দুইতিনজন পথিকের সাথে সাক্ষাত হলো তাঁদের। পথিকেরা হন্তদন্তভাবে এই গ্রামের দিকে আসছিলেন। তাদের মধ্যে একজন প্রবীন লোক ছিলেন। তিনি থমকে গিয়ে বললেন—একি! কে আপনারা? একি করছেন?

জবাবে দিলওয়ার আলী বললেন—আমরা মুসাফির। সামনেই নাকি একটা মুসাফিরখানা আছে, সেখানে যাবো আমরা।

যারপরনেই তাজ্জব হয়ে প্রবীণ লোকটি বললেন—সর্বনাশ! সেতো অনেক দূরে। এই বিশাল মাঠ, তারপর আরো পথ। এত পথ পেরিয়ে সেখানে আপনারা যাবেন এখন? আপনারা সব পাগল নাকি?



www.amarboi.org

ঃ কি করবো বলুন ? অনেক দূরের লোক আমরা। মুসাফিরখানায় না পৌছলে যে দাঁড়াবার আমাদের জায়গা নেই।

ঃ কিন্তু তার আগেই তো মারা পড়বেন আপনারা। এই রাত্রিকালে মাঠটাই তো পার হতে পারবেন না ?

ঃ জি ?

ঃ এ মাঠ বিশাল মাঠ। এটা পেরুতেই অনেক রাত হয়ে যাবে। পথঘাটের কোনই খবর রাখেন না ?

ঃ হ্যাঁ, তাতো কিছু শুনেছি।

প্রবীণ লোকটি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কিছু মানে ! মহামুসিবত। হাজার হাজার মারাঠা লুটেরা এসে এ এলাকা ছেয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে অনেক পথিক দিনেই প্রাণ হারিয়েছে। আর আপনারা মাঠে নামছেন এই রাতে ?

ঃ তা-মানে—

ঃ এতদিন এই বর্গীরা এখান থেকে অনেক পশ্চিমে ছিল। কিন্তু ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে তারা। এই দুইদিন হলো এই এলাকায় এসে পড়েছে। এখন দিনেই পথ চলা দায়, আর আপনারা এই রাত্রিকালে—মারা পড়বেন, নির্ঘাত মারা পড়বেন !

ঃ কিন্তু—

ঃ এই গাঁয়েই আমাদের বাড়ী। গাঁয়ে প্রায় পৌছেই গেছি। তবু আমরা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি, আর আপনারা—

দিলওয়ার আলী অসহায় কণ্ঠে বললেন—কি করবো ? এখন আমরা কোথায় যাই ? পথে বসে থাকলে তো—

ঃ বাড়ী কোথায় আপনাদের ?

ঃ অনেক দূরে। বাংলা মুলুকে।

ঃ ওরে বাপ্‌রে ! তা আপনাদের চেনাজানা কোন কেউ—

ঃ এলাকাটাই চিনিনে, চেনাজানা কে থাকবে, বলুন ?

ঃ বড় মুস্কিল ! তাহলে তো খুবই আপনারা অসহায়।

দিলওয়ার আলী ম্লান কণ্ঠে বললেন—সে কথা আর কি বলবো।

প্রবীণ লোকটি একটু চিন্তা করলেন। এরপর তিনি বললেন—আসুন, আপনারা আমার সাথে আসুন—

ঃ জি ?

ঃ আশ্রয়ের অভাবে একেবারেই মারা পড়বেন আপনারা, জেনে শুনে তা কি করে হতে দিতে পারি ? আপনারা আমার মকানে আসুন—

আপনার মকানে ?

ঃ হ্যাঁ। আমি গরীব মানুষ। তবু আপনাদের থাকতে দেয়ার মতো কিছু স্থান আমার আছে, খানাও দু' মুঠো দেয়ার সঙ্গতি আল্লাহ আমাকে দিয়েছে।

অকূলে কূল পেয়ে আফসারউদ্দীন এবার আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—সত্যি বলছেন জনাব ? এতটা মেহেরবানী সত্যিই আপনি করবেন ?



www.amarboi.org

মুরুব্বীটি এবার সহৃদয় কণ্ঠে বললেন—আরে-আরে ! বলে কি ? মানুষের মুসিবতে মানুষইতো সাহায্য করবে মানুষকে ! মেহেরবানীর কি আছে এখানে ? আসুন-আসুন—

ঃ জনাবের নামটা ?

ঃ আমার নাম কাসেদ বক্‌শী। এই গাঁয়েরই পুরাতন বাসিন্দা।

কাসেদ বক্‌শী সদাশয় লোক। গ্রামের কৃষক। কিছুটা সঙ্গতি সম্পন্নও বটেন। তিনখানা ঘরের দুইখানাই মাটির দেয়ালের শক্ত ঘর। ছাউনিও মজবুত। তৃতীয় ঘরটির বেড়াগুলো ছনের হলেও, বেশ সুন্দর করে বাঁধা। বাঁশের বাতা দিয়ে নকসা কাটা বেড়া। পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন বাড়ী। এ গাঁয়ে এমন বাড়ী আর কয়েকটা মাত্র আছে। এঁরাই গাঁয়ের সঙ্গতি সম্পন্ন লোক। আর সবাই এদের চেয়ে গরীব।

কাসেদ বক্‌শী পরিবারেও লোকমাত্র তিনজন। এক জোয়ান পুত। শাদি এখনো হয়নি। শাদির কথাবার্তা চলছে। এরপর বক্‌শী সাহেব আর বক্‌শী সাহেবের বিবি —এই মোট তিনজন। ছেলেটা শেষ বয়সের। অনেক কামনার পর, হয়েছে। কাসেদ বক্‌শী এখন একজন বৃদ্ধ লোক। এই দুই মজবুত ঘরের একটাতে ছেলে থাকে, আর একটাতে সস্ত্রীক বক্‌শী সাহেব থাকেন। ছনের বেড়ার ঘরটায় মজুর-কামলা থাকে। মজুর-কামলা না থাকলে এ ঘর ফাঁকাই পড়ে থাকে। আজ ফাঁকাই পড়েছিল।

কাসেদ বক্‌শীর অতিথি পরায়ণ মানুষ। দিলওয়ার আলীদের এনে তিনি ছেলের ঘরে তুললেন। সাধ্যমতো খানা-পিনা করানোর পর দিলওয়ার আলী ও আফসার-উদ্দীনের শোয়ার ব্যবস্থা ছেলের ঘরে করলেন। মাহমুদা খাতুনকে তাঁর বিবির কাছে ঐ দ্বিতীয় ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, কাসেদ বক্‌শী পুত্রসহ ঐ ছনের বেড়ার ঘরে বিছানা পেতে নিলেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায়, নামদার খাঁকে এই গাঁয়ের এক প্রান্তে এক আত্মীয়ের মকানে পাঠিয়ে দিলেন।

দিলওয়ার আলীর সাথে অস্ত্রপাতি দেখে কাসেদ বক্‌শী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—"আপনারা কি ফৌজী লোক ?" জবাবে আফসারউদ্দীন বলেছিলেন, "আমি নই, এই ভাই সাহেব।" কাসেদ বক্‌শী বলেছিলেন, "বেশ-বেশ ! এই দুর্দিনে ফৌজী লোক সাথে থাকলে সাহস বাড়ে।" তিনি খুশী হয়েছিলেন।

কাসেদ বক্‌শীর বিবি বর্ষীয়সী জেনানা। মাহমুদা খাতুনের প্রায় নানীজানের তুল্য মহিলা। প্রথম থেকেই এই দুয়ের মধ্যে ভাব জমে উঠেছিল। শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই এরা দুইজন গল্পের মধ্যে মশগুল হয়ে গেলেন। বক্‌শী সাহেবের বিবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে লাগলেন, মাহমুদা খাতুনের খসম ঐ দুইজনের মধ্যে কোন্‌জন, কেন শাদি এতদিনেও হয়নি, কবে তাহলে হবে, মুহব্বত আছে কিনা—ইত্যাদি।

পরিশ্রান্ত দেহে আহার পড়ার পর দিলওয়ার আলী ও আফসারউদ্দীন অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মকানের অন্যান্যেরাও ঘুমিয়ে পড়লেন আস্তে আস্তে। নিরুদ্বেগ নিদ্রা।

রাতটা প্রায় গোটাই আরামে কেটে গেল। সুবেহ সাদিকের আর মাত্র লহমা কয়েক বাঁকী। কিন্তু নসীবের মার ! এইটুকু আর কাটলো না। অকস্মাৎ শুরু হলো



www.amarboi.org

মহাপ্রলয়। 'হা-রা-রা' রবে একদল সশস্ত্র বর্গী এসে আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো পাড়ার উপর। পড়বি পড়, এই মকানেই আগে এসে পড়লো। অত্যন্ত নির্মম ও জানোয়ার মাফিক অমানুষ লুটেরা। লুটতরাজে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তারা আশেপাশের মকানে আগুন ধরিয়ে দিলো এবং যাকে যেখানে পেলো অমনি তাকে ওখানেই হত্যা করলো। এরপর এই মকানে ঢুকেই তারা দরজা কপাট ভেঙ্গে ফেললো। একদল শুরু করলো লুটপাট ও আর একদল লিপ্ত হলো হত্যাকাণ্ডে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র তাদের গতি। দিলওয়ার আলী চমকে উঠে অস্ত্রহাতে বের হতেই অমনি কয়েকজন এসে ঘিরে ধরলো তাঁকে। এদের হাত এড়াতেই অন্য কয়জন গিয়ে ঐ ছনের বেড়ার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েই কাসেদ বক্‌শী ও তাঁর পুত্রের উপর চড়াও হলো। দিলওয়ার আলী সেইদিকে যেতেই আবার একদল এসে ঘিরে ধরলো তাঁকে। এদের হাত না এড়াতেই কাসেদ বক্‌শী আর তাঁর পুত্রকে ঐ নিষ্ঠুর বর্গীরা তৎক্ষণাৎ হত্যা করলো। দিলওয়ার আলী এবার সবার সাথে রণলিপ্ত হতেই তাঁর কানে এলো মাহমুদা খাতুনের চীৎকার। চীৎকার শুনেই তিনি সেইদিকে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, কাসেদ বক্‌শীর বিবির রক্তাক্ত লাশ মেঝের উপর পড়ে আছে আর সাত আটজন বর্গী মাহমুদাকে টেনে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

দিলওয়ার আলী মরিয়া হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে এবার সমস্ত বর্গীরা এসে তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। শুরু হলো তুমুল লড়াই। দিলওয়ার আলী একা আর তাঁকে ঘিরে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন সশস্ত্র মারাঠা দস্যু। আফসারউদ্দীনও তাঁর সাহায্যে এলেন না। একখানা বাঁশহাতে বর্গীদের ঠেকাতে এসে বেসামরিক আফসারউদ্দীন ইতিমধ্যেই লাশ বনে গিয়েছিলেন। দিলওয়ার আলীর সাহায্যে আসার মতো আর একটা লোকও এ মকানে নেই তখন।

তবু দিলওয়ার আলী অকুতো ভয়। তিনি একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সুশিক্ষিত সৈনিক। অপরূপ তাঁর কৌশল। বর্গীরা লুটেরা দিলওয়ার আলীর মতো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেপাই নয়। তারা থমকে গেল। দিলওয়ার আলীর তলোয়ারের সামনে ভিড়তেও তারা পারলো না, টিকে থাকতেও পারলো না। দেখতে দেখতে দুইতিন বর্গীর লাশ জমিনে গড়িয়ে পড়লো। তিনচারজন বর্গী মাহমুদাকে নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দিলওয়ার আলী ছিটকে গিয়ে তাদের উপর চড়াও হলেন এবং এখানেও এক বর্গীকে জমিনে শুইয়ে দিলেন। বর্গীরা আঁতকে উঠলো। তারা তালকানা হয়ে গেল। এই ফাঁকে মাহমুদা খাতুন বর্গীদের হাত ফস্‌কে দিলওয়ার আলীর পেছনে এসে দাঁড়ালো। আরো সুবিধে হলো দিলওয়ার আলীর। মাহমুদাকে আগলে নিয়ে এবার তিনি নিশ্চিন্তে অসি চালনা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যেই চারদিক ফর্শা হয়ে গেল। জেগে উঠলো সারা গাঁয়ের লোক। বাঁশ লাঠি হাতে তারা মার মার রবে ছুটে আসতে লাগলো। বর্গীরা প্রমাদ গুণলো। লড়াই পরিহার করে মালমাত্তা সহকারে তখনই তারা ক্ষিপ্রবেগে পলায়ন শুরু করলো।

বর্গীরা পড়িমরি অন্দর থেকে বেরিয়ে গেলে দিলওয়ার আলী তলোয়ার হাতে সামনে এগিয়ে এলেন। এই সময় মাহমুদা খাতুন হঠাৎ লক্ষ্য করলো, দেউটির আড়াল



www.amarboi.org

থেকে পলায়মান এক বর্গী দিলওয়ার আলীকে তাক করে ধনুকে তীর সংযোজন করেছে। চমকে উঠে মাহমুদা খাতুন যেই দিলওয়ার আলীকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে গেলো, অমনি তীরটা এসে মাহমুদা খাতুনের পাঁজর ভেদ করে পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। তীর ছুড়েই বর্গীটা পালিয়ে গেল, আর্তনাদ করে উঠে লুটিয়ে পড়লো মাহমুদা খাতুন।

চমকে উঠে তা দেখেই দিলওয়ার আলীও বিপুল শব্দে আর্তনাত করে উঠলেন। এরপরেই মাহমুদাকে তুলে নিয়ে কোলের উপর শোয়ালেন এবং শক্ত একটান মেরে তীরটা বের করে নিতেই মাহমুদা খাতুন মূর্ছা গেলো। হু হু করে কেঁদে উঠলেন দিলওয়ার আলী। লোকজন অনেকে এসে ইতিমধ্যেই জুটেছিলেন। সবাই মিলে বিভিন্নভাবে পরিচর্যা করার ফলে মাহমুদা খাতুনের জ্ঞানটা ফিরলো বটে, কিন্তু তখন তার একদম অন্তিম অবস্থা। তীরটায় বিষ ছিল। মাহমুদা খাতুনের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কি করবেন— কোথায় নেবেন বলে দিলওয়ার আলী ব্যস্ত হয়ে উঠলে, মাহমুদা খাতুন দুর্বল হাত ইশারায় মুমূর্ষু কণ্ঠে বললো— আর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমাকে আর নড়াবেন না। এভাবেই কোলে করে রাখুন।

জার জার হয়ে কেঁদে উঠে দিলওয়ার আলী বললেন— একি সর্বনাশ করলাম মাহমুদা খাতুন ! বাঁচাতে গিয়ে আপনাকে এনে এভাবে মেরেই ফেললাম আমি ?

যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠে মাহমুদা খাতুন টেনে টেনে বললো— আমার কোন আফসোস্ নেই। আপনার কোলে মাথা রেখে আমি মরতে চেয়েছিলাম। আমার সে আশা পূরণ হয়েছে। এইতো আমার পরম সুখ !

ঃ একি হলো ? আমি তীরবিদ্ধ হলে আপনারা আমাকে বাঁচালেন, আর আমি আজ—

অত্যন্ত অস্পষ্ট কণ্ঠে মাহমুদা খাতুন বললো— সবই নসীব ! একটু কলেমা পাঠ করুন—

দিলওয়ার আলী আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ !

মাহমুদা খাতুনের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। "মাহমুদা খাতুন" বলে একবার বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠে দিলওয়ার আলী পাথর হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না বা আহাজারীও করলেন না। মাহমুদাকে কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

নামদার খাঁ এই সময় ওপাড়া থেকে ছুটে এলো। এ দৃশ্য দেখেই "হায় আল্লাহ ! একি গজব হো গৈল্— একি তুফান হো গৈল্" বলে আর্তনাদ করে উঠে সে জমিনে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

দাফন সমাপ্ত হলো। দুই ভাইবোন দুই কবরে পাশাপাশি শুয়ে রইলেন। এঁরা জানতেও পারলেন না, তাঁদের আম্মাজান-নানাজান তাঁদের আগেই কবরবাসী হয়েছেন। চোখ মুছে দিলওয়ার আলী ঘুরে দাঁড়ালেন। কবরের পাশে বসে নামদার খাঁ


www.amarboi.org

অঝরে কাঁদছিল। ইশারা পেয়ে নামদার খাঁ চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে বললো—হজৌর!

দিলওয়ার আলী নির্বিকার কণ্ঠে বললেন—চলো—

ঃ কাঁহা যাইবেক হজৌর?

ঃ তোমার মুলুকে।

ঃ হাইরে বা! তামাম তো খতম হো গৈল্! আখুন আর উধার কেনে হজৌর?

ঃ উধার ছাড়া আর যাওয়ার জায়গা নেই।

ঃ কেনে হজৌর, বাংলা মুলুক?

দিলওয়ার আলী এবার কিঞ্চিৎ কম্পিত কণ্ঠে বললেন—আমি আর লাশ দেখতে পারিনে নামদার খাঁ! এত লাশ দেখলাম আমাদের ঐ মুসলমান হুকুমাত আর আজাদীর লাশ দেখতে ও মুলুকে কখনোও আমি যাবো না।

ঃ কেনে হজৌর? ওহি হুকুমাত আউর আজাদী ভি মূর্দা হো গৈল্?

ঃ এখনো হয়নি, তবে মৃত্যু ঘন্টা বেজে গেছে।

ঃ হজৌর!

ঃ আমাদের হুকুমাতের গলা টিপে ধরে আছে ভেতরের কায়েমী দুশমন। এতই ওটা মুমূর্ষু। তার উপর বাইরে থেকে ছুটে আসছে হিংস্র হায়েনারা। জলপথে রাজ্য লোভী ইংরেজ আর স্থলপথে সর্বগ্রাসী মারাঠারা। এ হুকুমাতের বাঁচার আর উপায় নেই নামদার খাঁ, বাঁচতে আর পারে না। আজ হোক, কাল হোক, এ হুকুমাত খতম হয়ে যাবেই। চাই কি, মুলুকটার আজাদীও।

ঃ হাইরে বা!

ঃ তকলিফ আর সহ্য হয় না নামদার খাঁ। আমাকে তোমার মুলুকে নিয়ে চলো—

ঃ চলিয়ে হজৌর—

নামদার খাঁর কাঁধের উপর ভর দিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত দিলওয়ার আলী অজানার পথে পা বাড়িয়ে দিলেন।

সমাপ্ত



www.amarboi.org

## লেখক পরিচিতি

**নাম ঃ**

শফীউদ্দীন সরদার

**জন্ম ঃ**

ইং ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

**বর্তমান ঠিকানা ঃ**

গুরুলপট্টি, পোঃ+জেলা—নাটোর, ফোন-২৯০।

**শিক্ষা ঃ**

ইং ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন।
অতপর–আই.এ.; বি. এ. (অনার্স);
এম. এ. (ইতিহাস); এম.এ. (ইংরেজী);
বি. এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন্-এড্ (লন্ডন)।

**কর্মজীবন ঃ**

প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

**সখ ঃ**

প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

**সাহিত্য ঃ**

**উপন্যাস (ঐতিহাসিক)**

১। বখতিয়ারের তলোয়ার—প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ—প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায়—প্রকাশিত
৪। বিদ্রোহী জাতক—প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ—প্রকাশিত
৬। রাজবিহঙ্গ—প্রকাশিত
[illegible]—প্রকাশিত
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা—[illegible]
৯। বিপন্ন প্রহর—প্রকাশিত
১০। সূর্যাস্ত—প্রকাশিত
১১। পথহারা পাখী—প্রকাশিত
১২। বৈরী বসতি—যন্ত্রস্থ

**উপন্যাস (সামাজিক)**

১। শীত বসন্তের গীত—প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা—প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৪। পাষাণী—প্রকাশিত

**নাটক**

১। পাজী মণ্ডলের দল—প্রকাশিত
২। সূর্যগ্রহণ—প্রকাশিত
৩। বনমানুষের [illegible]—প্রকাশিত
৪। [illegible]রের বন্দী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

**রম্য রচনা**

১। ঘাসকাটা গল্প—প্রকাশিত
২। চার চান্দের কেচ্ছা—যন্ত্রস্থ

**রূপকথা**

১। সুলতানার দেহরক্ষী—প্রকাশিত

**কবিতা**

১। সার্বজনীন্ কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)